চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু

নিউ এজ পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

সময়ের ছাই সরে গেলে দেখা যায় ইতিহাসে দাঁড়িয়ে আছেন এক অগ্নিপুরুষ : তাঁর নাম ঋত্বিক কুমার ঘটক।

সত্তরের দশকের শুরুতে যখন আমরা প্রথম তাঁর সান্নিধ্যে আসি তখন মনে হয়েছিল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'— তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রজন্মের মুখপাত্র। আজ যাবতীয় কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়ে প্রমাণিত হতে চলেছে যে ঋত্বিক এমন এক শিল্পকর্মী যিনি চলচ্চিত্র-শাস্ত্রটির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তাকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন সৌন্দর্যের সর্বাধুনিক অভিব্যক্তিতে। শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বা ছবি অথবা কাব্য যেমন শুধুই শিল্পকর্ম নয়, ঋত্বিকের চলচ্চিত্র ঠিক তেমনই নিছক ছায়াছবি নয়। মাধ্যমের সীমা পার হয়ে তারা যৌগধ্বনির প্রত্যাশী। এ কথা দাবি করতে আমার কিছুমাত্র সংকোচ নেই যে চলচ্চিত্রের আপাত ভঙ্গুর কাঠামোটিতে যাঁরা নশ্বরতা মুক্ত করতে চেয়েছেন তেমন স্রষ্টাদের পাশে সসম্মানে সংরক্ষিত তাঁর বসার আসন।

জীবনানন্দ তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন—'এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে।' সিনেমা যদি আলোর শিল্প হয়, ঋত্বিকের নির্মাণে তবে এই 'অপর আলো'র কারুকার্য আছে। চলচ্চিত্র-স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটক, দৃশ্য ও শ্রুতির প্রথা-স্বীকৃত হাতছানিকে উপেক্ষা করে, চলচ্ছবির জন্যও চেয়েছিলেন একটি 'অপর' ভাষার স্থাপত্য। আজ যদি তার চেতনার উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত আমরা পরিক্রমা করতে চাই তা হলে, বলতেই হবে তাঁর হাতে গোনা আটটি কাহিনী চিত্র ও আরো কয়েকটি ছোটো ছবি, কিছু অসমাপ্ত প্রকল্প লক্ষ্য করাই যথেষ্ট নয়, সিনেমা বিষয়ে তিনি যে-সমস্ত লিখিত পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য রেখেছেন তাকেও প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে হবে। না হলে এই শিল্পীর বিষয়েও আরো বড়ো ভাবে দেখলে ভারতীয় সিনেমার আধুনিকতা প্রসঙ্গে কোনো সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে না।

সেজন্যই ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র বিষয়ক সমালোচনা ও প্রতিবেদনগুলির একত্র সন্নিবেশ ছিল জরুরি। ঋত্বিকের নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার ও ছোটো লেখাগুলি অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে নানা কৃশতনু, ও অবহেলিত পত্রপত্রিকায়। এক সময় 'চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু' নামের একটি ছোটো সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তা খুব যত্নে মুদ্রিত ছিল না আর দীর্ঘ দিন তা জনচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে।

এই বইতে রচনাগুলিকে সাজানোর সময় আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছে এই-সব শব্দ সমাবেশ খুলে ধরছে এক বিপ্লবের দরজা; তারা যেন ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের সঙ্গেই হাত ধরাধরি করেই আছে। তত্ত্বায়নের ক্ষেত্রেও ঋত্বিক ছিলেন এক পথ-প্রদর্শক সুতরাং আমরা নিশ্চিত যে এই লেখাগুলি নেহাত সিনেমার পাদটীকা নয়। তিনি যখন 'মানব সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি করা ও আমার প্রচেষ্টা'— নামের রচনাটিতে চলচ্চিত্রের রূপকলাগুলিকে আমাদের যৌথ অবচেতন স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত দেখেন অথবা সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে পরীক্ষা করার কোনো প্রকল্প উপস্থিত করেন, চলচ্চিত্রবিদ্যার ছাত্র হিসেবে আমি শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ি কেননা অব্যর্থভাবে প্রমাণিত হয় ঋত্বিক চলচ্চিত্রকে শুধু শিল্পকর্ম বিবেচনা করেন না; ইতিহাসের পরিসরে তার আখ্যানকর্ম একটি প্রত্ন-সাম্প্রতিকের অবতারণাও করে। বুনুয়েল ও ফেলিনি প্রসঙ্গে তাঁর উচ্ছ্বাস শুধুই নান্দনিকতা নয় বরং সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যে সেতু তাঁরা রচনা করেন 'লা দলচে ভিতা' ও 'নাজারিনের' মতো ছবিতে, ঋত্বিক সেই দৃষ্টান্তের মধ্যে আবিষ্কার করেন জাতিস্মরতা। তিনি ভ্রষ্টস্মৃতি স্ব-সমাজকে ফিরিয়ে দিতে চান সক্রিয় স্মরণের অধিকার। কিংবা যদি 'ছবিতে শব্দ' লেখাটিকে আমরা সাজিয়ে নিতে চাই এখনকার মূল্যচেতনার মধ্যে তা হলে দেখতে পাব ঋত্বিক ঘটক কী অবিশ্বাস্য ভাবে অগ্রগামী চিন্তার পরিচয় দিচ্ছেন। ছবিতে তখনো পর্যন্ত দৃশ্যের প্রাধান্য। ছবিকে প্রাথমিক ভাবে চিত্রের শর্তেই ভাবা হচ্ছে। সত্যজিৎ রায় সহ সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি মেরুতে দাঁড়িয়ে ঋত্বিক আমাদের জানালেন চলচ্চিত্রে শব্দের প্রাধান্য ততখানি, যতখানি ছবির। এই একই কথা গতিচিত্রের প্রামাণ্যতা বিষয়ে গোদার নিবেদন করেছেন 'ভিভর্ সা ভি' ছবি নির্মাণের শেষে। হয়তো মার্কসবাদী ঋত্বিকের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল আইজেনস্টাইন-পুদভকিন-আলেক্সান্দ্রভদের উনিশো সাতাশ সালে স্বাক্ষরিত শব্দ বিষয়ক বিবৃতি। কিন্তু ক্রিস্তঁ্যা মেৎজ প্রমুখ মহাজন সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রতত্ত্বে শব্দের গুরুত্ব যেভাবে নির্দেশ করেছেন তাতে ঋত্বিকের ব্যতিক্রমী দৃষ্টির অবদান আরো বেড়ে যায়।

কীভাবে সম্পূর্ণ আলাদা পৃথিবীর অধিবাসীকে অভিবাদন জানাতে হয়, 'একমাত্র সত্যজিৎ রায়' রচনাটি তার নথি। কিন্তু ঋত্বিকই বোধহয় প্রথম সমালোচক যিনি 'অপরাজিত' ও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'কে 'পথের পাঁচালী'র তুলনায় বেশি দাম দিয়েছেন। বাস্তব যে-সমস্ত পার্থিবতাকে অস্বীকার করে নিজেই আর্কিটাইপে পরিণত হতে পারে, ওই লোলচর্মা বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকুরণ যে রূপসী বাংলার আত্মার প্রতিমা এ কথা উচ্চারণ করার জন্য, সম্ভবত সত্যজিৎ-এর চাইতেও অধিকতর বাঙালির দরকার ছিল। আর সেই 'বাঙালি', আমরা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সহমত হবে : ঋত্বিক। অত্যন্ত গভীরভাবে স্বদেশের শিকড়ে পৌঁছে যেতে পারেন বলেই তিনি প্রতীচ্যের বুনুয়েলকেও আত্মার আত্মীয় ভাবতে পারেন। হিন্দুধর্ম ও রোমান ক্যাথলিকতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনায় দেখাতে পারেন কেন, কোন্ অতিকথার উপমারহিত প্রয়োগে, 'নাজারিন' সভ্যতার মিথ্যাচরণের চরম দলিল হয়ে উঠল। 'কোমলগান্ধার প্রসঙ্গে' নামের অত্যন্ত ছোটো লেখাটি কী মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ

হয়ে উঠেছে আধুনিক সংস্কৃতিবিদ্যার পক্ষে। সেখানে ঋত্বিক বলেন, 'একটি বাস্তব-ধৃত, বহু বিষয়-সমন্বিত জটিল নকশা প্রস্তুত করাই ছিল অভিপ্রেত।' একটু সাহস করে আমি দাবি করব এই তো সেই স্ফুলিঙ্গ যা থেকে ছড়িয়ে পড়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পলিফোনিক ডিসকোর্স। ভারতীয় সমালোচকদের সম্পর্কে তাঁর তিক্ত মন্তব্য বোধহয় এই সূত্রেই 'ওঁরা অন্যান্য শিল্প, ওঁদের নিজেদের দেশের এবং সভ্যতার ইতিহাস, এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। এঁরা বোধহয় ছবি ছাড়া অন্য কিছুতে কোনো উৎসাহ খুঁজে পান না'। কতদিন আগেই না ঋত্বিক বুঝেছিলেন ছবির আসল অর্থ থেকে যায় ছবিঘরের বাইরেই। আর সেইজন্যই যেমন ছবিতে তেমনই লেখায় তিনি সচেতনতার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মনীষার সর্বতোমুখী বিস্তারকে।

এই প্রথম সম্ভবত ঋত্বিকের অ-কাহিনীমূলক গদ্য রচনাগুলিকে সংহত করার প্রয়াস নেওয়া হল। আমরা আগের উদ্‌যোগগুলিকে ছোটো করে দেখতে চাই না। কিন্তু সেই সংকলনগুলি হয় সাক্ষাৎকার ভিত্তিক হয়েছে, নয়তো সম্পাদকীয় নির্বাচনের মুখাপেক্ষী থেকেছে— ফলে প্রার্থিত সমগ্রতার স্বাদ অধরাই থেকে গেছে।

অন্যদিকে এই সংকলনে চেষ্টা করা হয়েছে শ্রী ঘটক-প্রণীত ও বাংলাভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় অ-কাহিনীমূলক রচনাকে দুই মলাটের মধ্যে বেঁধে রাখার। হয়তো তা সত্ত্বেও আমাদেরই অনবধানে কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হতে পারল না। সুধী পাঠক যদি এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেন পরবর্তী সংস্করণে আমরা সে ত্রুটি সংশোধন করে নেব।

ঋত্বিক-রচনার কালানুক্রমিকতার প্রসঙ্গটি বেশ জটিল। রচনাটি প্রথম কোন্ পত্রিকায় কী নামে এবং কী ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তা আবিষ্কার করা যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। একই রচনা ভিন্ন শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আমরা সাধ্যমতো সচেষ্ট থেকেছি মূল লেখাটি পুনরুদ্ধারে। সংকলনে কালানুক্রমিকতা বজায় রাখা হয় নি। তবে প্রতিটি রচনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়েছে, রচনাকাল যেমন পাওয়া গেছে বঙ্গাব্দ বা খ্রিস্টাব্দ— তেমন ভাবেই আছে। রচনাগুলিকে সাজানোর সময় আমরা বিষয়ভিত্তির দিকে নজর দিয়ে তাকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে দিয়েছি। ফলে পাঠক ঋত্বিকের চিন্তা-প্রণালীর পারম্পর্য বুঝতে কিছুটা সাহায্য পাবেন। প্রথম পর্বের শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অধিবেশনে পেশ করা ঋত্বিক ঘটকের একটি খসড়া প্রস্তাব যা গণ সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি ক্রোশপ্রস্তর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে আর সংযুক্ত হয়েছে 'অভিনয় দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আটটি সম্পাদকীয়। সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে গ্রন্থশেষে ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রপঞ্জি যোগ করা আছে।

আমরা এমন দাবি করব না যে আমাদের প্রয়াস ত্রুটিমুক্ত বা তার বিন্যাস সংযোজন ও সংশোধনেব অপেক্ষা রাখে না, তবু যে প্রতিসংস্কৃতির প্রতি ঋত্বিক ঘটকের আকুলতা ও আগ্রহ সুবিদিত তার বিষয়ে একটা ধারণা এই বইয়ের পাঠক পেয়ে যাবেন এমন আশা করা যেতেই পারে। অকৃপণ সহায়তা ও উদার সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীমতী সুরমা

ঘটক, ও শ্রী ঋতবান ঘটকের পক্ষ থেকে। তাঁরা ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ভাণ্ডার আমাদের জন্য উন্মুক্তই করে দিয়েছিলেন; আমি নানা সময়ে, নানা কাজে তাঁদের স্নেহ ও ভালোবাসা পাই। এই সুযোগে তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রী চন্দন গোস্বামী এই বইয়ের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেছেন তার জন্য ভালোবাসা রইল; অগ্রজপ্রতিম শ্রী সুবিমল লাহিড়ী লিপি সংশোধনে আমাদের উল্লেখযোগ্য অভিভাবকত্ব দান করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। যে-সমস্ত সম্পাদক ও সংস্কৃতিকর্মী ঋত্বিক ঘটককে দিয়ে প্রায় জোর করে এই-সমস্ত লেখাগুলি একদা আদায় করে নিয়েছিলেন তাঁরা তো সমস্ত জাতিরই কৃতজ্ঞতাভাজন— আমার অতিরিক্ত মন্তব্য করা সাজে না।

সূচি

৬

৭

৮

চলচ্চিত্র মানুষ
এবং
আরো কিছু

গণ-নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে

মানবজাতির ইতিহাসে নানাপ্রকার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। পিথেক্যান্থ্রোপাস থেকে নিয়ানডারথাল পর্যন্ত মানবজাতির নানাপ্রকার ক্রমবিকাশ হয়েছে, এবং শেষে হোমো সেপিয়নেজ্-এতে পর্যবসিত হয়েছে। তাদের আমরা বুদ্ধিমান মানুষ বলি। তারপর সমাজের বিকাশ নানা স্তরে নানাভাবে হয়েছে এবং তারই একটি আত্মপ্রকাশস্বরূপ নাটকের উৎপত্তি।

নাটকের প্রাচীন জন্ম গ্রীকদেশে, অথবা বলা চলে এথেন্স শহরে। সেখানে ইস্কাইলস, সোফোক্লেস, এউরিপেদেস ও আরিস্তোফানেস ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়ে গিয়েছেন ; যার তুলনা আজও পৃথিবীর সাহিত্যে নেই।

ভারতীয় নাট্য আন্দোলন মূলত আরম্ভ হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছর আগে। তখন হয়তো 'আন্দোলন' কথাটি বর্তমানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থে হত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ওই সময় থেকেই নাট্য আন্দোলনের সূচনা। 'মাইম' ইত্যাদির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে।

এরপর গ্রীকরা এদেশে আসে। মোটামুটি নাটক সম্পর্কে একটা ধারণা তাদের কাছ থেকেই তৎকালীন সমাজের নেতারা গ্রহণ করেন ; এবং তাদের প্রেরণায় আমাদের দেশে নাট্যধারা গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। তারই বিকাশ আদি বৌদ্ধ এবং কালিদাস-ভবভূতির মধ্যে আমরা পাই। 'যবনিকা' কথাটি থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে গ্রীক প্রভাব ভারতীয় নাট্যধারাকে কতখানি প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু এরপরই নাটক সম্পর্কে আসে সমাজের প্রচণ্ড রিঅ্যাকশন, পরিণামে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে নাটককে এদেশের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখতে আরম্ভ করে। ফলে নাট্যধারা আস্তে আস্তে মৃত্যুপথের দিকে এগোতে থাকে। ধর্মের অনুশাসন বা ধার্মিক গোঁড়ামিই এর মূল কারণ। কিন্তু এরই মধ্যে যাত্রাভিনয় ও লোকাভিনয় মোটামুটিভাবে বেঁচে থাকে।

এরপর শুরু হয় ঐসলামিক যুগ ; স্বভাবতই ইসলামি ধর্মের গোঁড়ামিতেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নাটক প্রায় একদম বিলীন হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে থাকে। কারণ ইসলামি ধর্মে নাটক করা ধর্মবিরুদ্ধ।

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ এদেশে আসে। এই সময় সাহেবদের কল্যাণে নাটক আবার উজ্জীবিত হয়। যদিও তা সম্পূর্ণ সাহেবি ধাঁচে। ভারতীয় নাট্যধারা তাদের ব্যর্থ অনুকরণে আবার প্রাণ পায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যচিন্তা বেশ রবরবাও হয়ে ওঠে। কারণস্বরূপ, এই সময় বেশ-কিছু মহান শিল্পী মঞ্চে আসেন। কিন্তু নাটক বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্বোক্ত স্তরেই থেকে যায়। এই সময়ই দেশাত্মবোধক বা ওই-জাতীয় কিছু কিছু নাটক লেখা হয়। দীনবন্ধু মিত্র,

মাইকেল, ডি এল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি মহাশয়েরা নাটক রচনায় ব্রতী হন। দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেলই প্রথম জনতার নাটক লেখেন 'নীলদর্পণ', 'জামাইবারিক', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' তার নিদর্শন। কিন্তু পরবর্তীকালে রচিত নাটকগুলো ভিক্টোরিয়ান আমলের ধরনে রচিত হতে থাকে। এগুলি লেখা হয় পিনেরো প্রমুখের অনুকরণে। এরই সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে জমতে শুরু করে সমাজজীবনের ক্লেদ। ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের নাট্যজগতের নামে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে উঠত। রথী মহারথী অনেক শিল্পী মঞ্চে এসময়েই আসেন— যাঁদের তুলনা আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমাদের।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'সীতা', 'তখৎ-এ-তাউস' এই সময় মঞ্চস্থ হয়। এধরনের নাটকের প্রোডাকশন ভ্যালিউজ তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় সত্যিকারের রেভোল্যুশনার ছিল। শিশিরবাবুর অভিনয়-প্রতিভা আজ পর্যন্ত তুলনাহীন একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এঁরা সবাই ঘুরপাক খাচ্ছিলেন বুর্জোয়া ধ্যানধারণার মধ্যে। কাজে কাজেই সত্যকারের জনসাধারণের ধ্যানধারণার সমস্যা নাটকে প্রতিফলিত হয়নি।

যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যখন বাংলাদেশে একটা ডামাডোল চলছিল ১৯৪১-৪২ সালে, তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দেশের সর্বস্তরে যেমন, তেমনি সাংস্কৃতিক স্তরেও একটা প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। তার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট শিল্পী সংস্থা, যা বিভিন্ন নাটক এবং সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে (যেমন, 'লেবরেটরি', 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' ইত্যাদি) গড়ে ওঠে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং গণ সাহিত্যিক সংস্থা।

এই জোয়ারের ঢেউ পেশাদারি মঞ্চ ও অথবা তাদের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ এড়াতে পারল না। তাই শিশিরকুমার তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ করলেন এবং সেটা তথাকথিত সাধারণ মঞ্চ-প্রেমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করল। যদিও শিশিরবাবু সে নাটকে নিজে নামেননি।

গণ-নাট্য আন্দোলন ১৯৪১ সালে আরম্ভ হয় 'লেবরেটরি', 'আগুন' এবং 'জবানবন্দী' নাটকের মধ্য দিয়ে, আগেই বলেছি। পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় 'নবান্ন'র মাধ্যমে। মৈমনসিংহের সারা ভারত চাষী সম্মেলন যখন হয় সেখানে 'নবান্ন' একটা অপূর্ব মানসিকতা প্রাপ্ত হয়। তার পর মেদিনীপুরে চাষীদের সম্মেলনে হাজার হাজার চাষী 'নবান্ন' দেখে এবং দেখে তারা মোটামুটি পাগল হয়ে যায়। এই ছিল গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম শুরু। নাটক বিষয়ে উদ্যোক্তাদের তখন কোনোরকম মানসিক আলোড়ন ছিল না, মানুষকে জাগানোই ছিল প্রশ্ন। এবং সেই যুগে যে উত্তাল উদ্দীপনা, সেটা জন্ম নিয়েছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসার জন্য এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সহমর্মী হিসেবে। গণনাট্য আন্দোলনের বক্তব্য— মানুষকে ভালোবাসো এবং তার দুঃখ-দুর্দশার সহমর্মী হও। এর থেকেই গণনাট্য আন্দোলন জন্মগ্রহণ করেছিল। আমি অবশ্য কিছু পরে এসেছি, কিন্তু ওই চেতনা থেকেই আমিও যোগদান করেছিলাম। তখনকার দিনে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু ছিল না।

সেই উদ্দেশ্য কিছুদিন এদেশে কাজ করেছিল, 'ভুখা হ্যায় বাঙ্গাল', 'শহীদের ডাক' পালা নিয়ে সারা উত্তর ভারত ভ্রমণ ইত্যাদি। তার পরে সব ভেঙে গেল। তার মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা তো ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত সমস্যা ও সংঘর্ষ কাজ করেছিল। সেগুলো আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। ফলে একটা বিরাট সম্ভাবনা মিলিয়ে গেল।

আজকে গণ-নাট্যের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় না। সেখানে দু-একটি আজব কথা ব্যবহার করা হয়— তার নাম নবনাট্য, সৎনাট্য ইত্যাদি। এ ব্যাপারটাকে আজও পর্যন্ত আমি ধরতে পারিনি। এবং যে তীব্র আদর্শ নিয়ে গণ-নাট্য আরম্ভ হয়েছিল, তার কিছুই আমি অন্তত আজকে দেখতে পাই না। হতে পারে আমি সেকেলে পন্থী, কাজেই আজকালকার ছেলেমেয়েদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করতে হয়তো অনুপযুক্ত। কিন্তু আমি তীব্র অনুযোগ রেখে যাব। আমার কাছে এটা ক্ষমার যোগ্য নয়। এখন যা চলছে সেই বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের কোনো ভারই তারা বহন করছে না। আমি এই জিনিসটা গ্রহণ করার পক্ষপাতী নই।

গণ-নাট্য কোনোদিনই পেসিমিজ্‌ম্ নিয়ে ব্যাপৃত ছিল না, বরঞ্চ বলিষ্ঠ জীবনবাদের জন্য তারা লড়াই করে গিয়েছিল, যদিও তারা ক্ষণস্থায়ী। পেসিমিজ্‌ম্ জীবনের বিপক্ষে, গণ-নাট্য জীবনের সপক্ষে। কাজেই এ ধরনের প্রশ্নই উঠতে পারে না যে গণ-নাট্য কোনোদিন পেসিমিজ্‌ম্-এর চর্চা করেছে। আমি নিজেও দু-একটি নাটক লিখেছি, সেসব জায়গাতে মানুষের নৈরাশ্য বোধকে দূর করে দিয়ে সংগ্রামী চিন্তাই জাগ্রত করতে চেষ্টা করেছি। আমার পূর্বসূরীও তাই করেছেন।

আজকের ন্যাকামি আমাদের কাছে অসহ্য লাগে। এগুলো শিল্প নয়, বেশির ভাগই বিদেশিদের কাছ থেকে সংগৃহীত। এই করে কতখানি ডাল গলবে তা আমার পক্ষে বোঝা মুশকিল। কিন্তু মহাকাল এদের ক্ষমা করবে না। দিন বদল হচ্ছে, মানুষও এদের ক্ষমা করবে না।

নাটক সম্বন্ধে

আমরা এককালে নাটক করতাম, সেটা ছিল অন্য একটা যুগ। আমাদের যুগে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘে। তখন রাজনৈতিক এবং আদর্শগত প্রেরণাই ছিল বড়ো কথা। তখনকার যুগে, আমরা মানুষকে তীব্রভাবে 'ভালোবাসা' একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং সেই 'ভালাবাসা' কথাটা সোচ্চারে দাঁড়িয়ে বলার ব্যাকুলতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখা দিত, তাই আমাদের নাটক করার লক্ষ্য ছিল।

অর্থাৎ, নাটকের জন্যে নাটক করা নয়— মানুষের জন্যে, জীবনের জন্যে নাটক করা। এই ছিল আমাদের জীবনের ব্রত। ফলে, কারখানায় মজুর খেটে উৎপাদন করে, চাষী মাটিতে ফসল ফলায়, ছোটো কেরানিরা এই বড়ো বড়ো ব্যাবসাদারদের তল্পিবাহক হয়ে দু-পয়সা কামায়, আমরাও তেমনি শিল্পমাধ্যমকে একটা ফ্রন্ট ভেবে ধরে নিয়েছিলাম। এবং তার ফল কী ফলেছে সেটা সবারই জানা আছে। ভারতীয় গণনাট্যের অবদান ভারতীয় নাটকে যে কী তা আজ স্বীকৃত ঘটনা। আমাকে এই সংঘের পুরো দায়িত্ব বেশ-কিছুদিন পালন করতে হয়েছিল। তার পরে আমরা সবাই এ-দিক ও-দিক ছড়িয়ে ছিট্‌কে গেলাম। এদের মধ্যে অনেকেই এখন অভিজ্ঞ এবং পৃথিবী বিখ্যাত। কেউ নাটকের সঙ্গে যুক্ত, কেউ নয়।

এতদিন পরে— প্রায় কুড়ি বছর বাদে, আমি হঠাৎ নাটকে মেতে গেলাম। এবার এসে দেখি যে, যুগ গেছে পালটে। প্রাথমিকভাবে, টেকনিক্যাল অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অনেক, অর্থাৎ যান্ত্রিক 'সাজিগুজি' বেশ ভালোই চলছে-টলছে। দ্বিতীয়ত, আদর্শ-ফাদর্শ বলে কোনো পদার্থ আর নেই, স্রেফ টাকা। এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সেই উত্তাপ আর পাচ্ছিই না, সেই পবিত্র ব্রতচারী মনোভাব আর কোথাও নেই। এরা সব পয়সা সংগ্রহ করতে এসেছে। এবং দুঃখের বিষয় পয়সা পাচ্ছেও। নীতির বালাই কোথাও নেই। বড়ো চিন্তা কোথাও নেই, সংগ্রামী মনোভাব কোথাও নেই। এরা সস্তা যৌন আবেদন বেচে খাচ্ছে, এদের মনগুলো বিকৃত ও ইতর হয়ে গেছে। এইসব দেখলে কষ্ট লাগে বৈকি। এই বয়সে আমাদের উত্তর পুরুষের এই চেহারা দেখে যাব তা না ঘটলেও পারত। একটা মানসিক শৈথিল্য ও উদাসীনতা এবং একটা নৈরাজ্যের হতাশা এই সব ছেলেদের মধ্যে বিরাজমান। এটা দুঃখের, কিন্তু এটা ঘটনা।

এইসব কথা বলবার আমার কোনো দরকার ছিল না, ভালোবাসি তাই বলে ফেলি। এর পেছনে যে রাজনৈতিক-সামাজিক দ্যোতনাগুলো খেলা করছে সেগুলো সম্বন্ধে আমি খুবই অবহিত। এবং নেতৃত্বের যে চূড়ান্ত অভাব ঘটেছে এদেশে সেটাও যে এই ছেলেমেয়েদের পথ পরিষ্কার করে দিতে পারছে না সেটাও আমি জানি।

বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কই— চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। নেতৃত্ব এই বাচ্চাদের মধ্যে থেকেই বের করতে হবে। নইলে এরা জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাক্। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। ইতিহাস অমোঘ। তার আইন সে মেনে চলবেই। ছেলেমেয়েরা যদি এটা না বোঝে তবে তার পরিণতি তারাই ডেকে আনবে।

এর বাইরে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। আশা আমার থাকবেই, কারণ ইতিহাসের গতি আমার খানিকটা অনুধাবন করা আছে। কোন্ পথ দিয়ে কীভাবে সে আসবে, তা আমি জানি না।

কিন্তু আসবেই।

সাম্প্রতিক নাটকের একটি সমস্যা

একটি নাটকের কাগজ পরিচালনা করতে গিয়ে আমি নানারকম নাটকের সম্মুখীন হয়েছি। এগুলো দেখে আমার মোটামুটি ধারণা জন্মেছে— নবীনরা যা করেছেন, তার অধিকাংশই গজভুক্ত কপিত্থবৎ। দেশজ ঘটনাগুলোকে এঁরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ এবং অনুশীলন করতে পারেন বলে আমার মনে হয়নি।

এঁদের কেউ কেউ একটা ফরাসি ব্যাপার অনুসরণ করছেন, যাকে এঁরা নাম দিয়েছেন অ্যাবসার্ড ড্রামা। ব্যাপারটা ঠিক আমি বুঝে উঠতে পারি না।

ফরাসিদের একটা স্বভাব আছে, বদভ্যাসই বলতে পারেন। শিল্পীরা কাজ আরম্ভ করেই একটা ম্যানিফেস্টো বের করেন। জাঁ আনউইল এই অ্যাবসার্ড ড্রামা কথাটির জন্ম

দিয়েছেন। এ ব্যাপারটাই আসলে অ্যাবসার্ড। স্ট্রীন্ডবের্গের এক্সপ্রেশনিস্ট ড্রামা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন আনউইল নতুন কিছু করেননি। বেকেট সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। আজকালকার ছেলেরা স্ট্রীন্ডবের্গ বা ইবসেনের শেষদিকের কাজগুলো পড়েননি বলেই মনে হয়। এখনকার আনউইল আর বেকেট— এঁদেরকে নিয়ে এত নাচানাচি তা হলে হত না।

আসল ঘটনাটা হচ্ছে, আমাদের অধিকাংশ সাম্প্রতিক নাটকে মানবজীবন থেকে দূরে সরে যাওয়ার একটা ব্যাপার ঘটছে। প্রতিটি শিল্পীর কাছে মানুষের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যাবার একটা প্রশ্ন আছে। সেই জায়গা থেকে বিচ্যুত হলে পরে নানা কিসিমের উদ্ভট জিনিসের ব্যবস্থা করতে হয়, যাতে করে সস্তায় কিস্তিমাত করা যায়। আমাদের তরুণদের অনেকে তাই করছেন।

বাংলাদেশে এখন দুটো দিকের ব্যাপার ঘটছে। এক দিকে আমাদের গ্রামীণ জীবনযাত্রা প্রচণ্ডভাবে বদলানোর জন্য সি. আই. এ.-র টাকা ; আর-এক দিকে কিছু সৎ মানুষ সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু চেষ্টাচরিত্তির করছেন— কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা নেই। সত্যিই ঘটনাটা গুলিয়ে গেছে। নজরুলের ভাষায় বলতে হয়, "দে গরুর গা ধুইয়ে।" ব্যাপারটা হয়েছে তাই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, দেশ এগোচ্ছে। নতুন শিশুদের জন্ম হচ্ছে এবং তারা নতুন জগৎ দেখছে। তাদের সম্বন্ধে তাদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলতে হবে। আজকের বাংলা দেশের যে দুঃখ-দুর্দশা আমরা মাঠে ঘাটে দেখি, সেটি কলকাতা শহরে বসে অনুভব করা সম্ভব নয়। তাকে ভাষা দেওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। সেই ভাষা ফুটিয়ে তোলার পক্ষে মঞ্চ হচ্ছে সবচেয়ে সোজা রাস্তা। সেখানে নিছক অনুবাদ আর অনুকরণ আর অনুসরণ দিয়ে নিছক মানুষের মন ভোলানো চোখ ধাঁধানো পাপ বিশেষ। আজকের তরুণ নাট্যকাররা এই কথাটি যেন দয়া করে মনে রাখেন।

আমার দেশ প্রচণ্ড দেশ। এদেশের মানুষের তুলনা নেই। এদের দেখলে প্রাণের মধ্য থেকে আমার ভালোবাসা উথলে ওঠে। সাধারণ গ্রামীণ মানুষ, তাঁদের যখন আমি খাটতে দেখি— আমার মন তখন ভালোবাসায় উদ্‌বেল হয়ে ওঠে।

এঁদের জীবনযাত্রাকে প্রকট করার কি কোনো রাস্তাই পাওয়া যাবে না? তা হলে আমরা কীসের শিল্পী? শিল্পী বলে গৌরব করার আমাদের কী আছে? আমরা কী করেছি? কিছু করতে পারিনি। নাটক একটা অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। তার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কথা বলতে পারতাম। পারিনি।

আমি নিজে স্বীকার করছি যে আমার যেটুকু করণীয় ছিল— তা আমি করে উঠিনি। অনেক হারিয়েছে। কিন্তু তরুণরা— যাঁরা দাবি করেন নাটকের ব্যাপারে খুব কিছু একটা করছেন— তাঁরা কি একবারও গোটা ব্যাপারটাকে ভেবে দেখবেন না?

দেশের মানুষকে ছেড়ে তাঁরা কেন এইসব আজেবাজে টেকনিকের মধ্যে ঢুকলেন' (টেকনিক সম্পর্কে অবশ্য এঁদের অনেকেই কিছু বোঝেন না)। কেন এঁদের অনেকেই শুধু মন ভোলানো চোখ ধাঁধানো নাটক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন?

এই তরুণদের মধ্যে সত্যিই কি মেরুদণ্ডশালী কেউ নেই যিনি সত্যিকারের কাজের

কাজ করতে পারেন?

দেখুন, সব শিল্পই শেষে গিয়ে পৌঁছয় কবিতাতে। এবং সে কবিতা হয় মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ঘামে ভেজা কবিতা। এ ছাড়া কোনো শিল্পের শেষ অবধি টেঁকার কোনো ব্যাপার থাকে না, কোনোদিন থাকেনি। বলতে দুঃখ হচ্ছে যে এই পোড়া বাংলা দেশে এইসব বহু পুরাতন কথা আজ আমাকেই আবার বলতে হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে— এই কথাগুলো আজ আবার বেশ চেঁচিয়ে বলা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।" আমিও মানুষকে অবিশ্বাস করার মতো অবস্থায় এখনো পৌঁছইনি। আমি জানি এই শিশু, এই ছেলেপুলে, এই তরুণদের মধ্যে থেকেই আবার মানুষ উঠবে এবং বাংলা দেশের তারাই আবার তুলে ধরবে। এদের ওপরই ভরসা। এরাই নাটককে কোনো নতুন দিকে মোড় ফেরাবে। এরাই সেই ব্যাপারটা করে ফেলবে— যেটা আমরা এখনো ধরতেও পারছি না। এদের ভরসাতেই আশা করা যায়।

১৯৫১ সালে সাংবাদিক হিসেবে কলকাতা শহরে এক মাসে মোট ৩৬টি আত্মহত্যার ঘটনা আমাকে রিপোর্ট করতে হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে নাটক না লেখা পর্যন্ত আমার নিজের জ্বালা মিটল না।

ব্যাপারটা কী? মৃত্যুর পর ৬টি চরিত্র একটা কাল্পনিক জায়গায় মিলিত হয়েছে। তারা কথাবার্তা বলে বুঝল— সংসারে ছেলেপিলেরা তো আছে। ও আত্মহত্যা-ফত্তা কোনো কাজের কথা নয়, কোনো পথ নয়। তখন পৃথিবীতে তারা খবর পাঠাল যে 'সবাই বাঁয়ে হঠো।'

ব্রেশ্‌ট্‌ ও আমরা

ব্রেশ্‌ট্‌ সম্পর্কে আমরা জানি না বললে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমত দেখুন, আমরা জর্মন জানি না। দ্বিতীয়ত তাঁর কোনো মঞ্চপ্রয়োগই আমরা স্বচক্ষে দেখিনি।

দেখার মধ্যে দেখেছি, কিছু তথ্য চিত্র. তাঁর 'বেলিনার অন্‌সম্বল'-এর। আর পড়েছি, ইংরেজি-অনুবাদে, তাঁর কয়েকটি নাটক আর 'অরগানন' এবং অন্যান্য কিছু মতবাদগত লেখা।

আর জানি তিনি কম্যুনিস্ট।

জানা আছে, যখন তিনি এবং এরভিন পিস্‌কাতোর মিলে ফ্রীফোক্‌সব্যুয়েনে (স্বাধীন গণনাট্য মঞ্চ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই ভাইমার সাধারণতন্ত্রের যুগে, তখন কীভাবে 'মহাকাব্যিক' মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে তাঁরা কেমন লড়েছিলেন। নাটক দেখতে এসে কিছু লোক আহ্লাদে গলে গেল, কাল্পনিক চরিত্রের দুঃখে কেঁদে ফেলল— তার বিরুদ্ধে সোচ্চার তাঁর বাণী সে-যুগে। নাটকের মঞ্চ, আলোচনার মঞ্চ, সেখানে কিছু কথা ফেলা হবে, বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তর্কাতর্কি হবে কিছুটা— শেষে দর্শকের ঘাড়ে ফেলে দেওয়া

হবে দায়িত্ব। সে দায়িত্ব হচ্ছে— যুক্তি যদি পছন্দসই না হয়, তা হলে তার যুক্তি দেখাও। যদি হয়, তবে বাইরে বেরিয়ে সত্যিকারের জগতে সে-সব সমস্যার সমাধানের জন্যে কোমর বাঁধো। আহ্লাদ করে নাটক তোমাদের দেখাতে আমাদের বয়ে গেছে।

সে ছিল 'রাত্রির দামামা'র যুগ ('ট্রোমেলন ইন ডের নাখ্‌ট্‌')। এ ছাড়া, শোনা গেছে, ব্রেশ্‌ট্‌ নাকি জর্মনির রকবাজদের ধরে ফেলে অনবদ্য কাব্যের সৃষ্টি করেছিলেন। নাট্যকার প্রযোজক ইত্যাদির সঙ্গে কবির ভূমিকাও তাঁর ছিল।

যা পড়েছি তার থেকেই বলতে পারি কবি শেক্ষপীরের (কমল মজুমদারের বয়ানে) পরে এত বড়ো প্রতিভা পৃথিবীর মঞ্চে অবতীর্ণ হননি।

মনে হতে পারে, কথাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

কিন্তু যখন আমার জর্মন-জানা কিছু বন্ধুর সাহায্যে দু-একটা বঙ্গানুবাদের চেষ্টা করি তখনই পদে পদে মুগ্ধ হয়েছি।

মুগ্ধ হয়েছি হঠাৎ ছেনালিপনা থেকে উত্তুঙ্গ নিঃসঙ্গতার অনুভূতিতে, হয়েছি চরিত্রগুলির সমাজরূপক হিসেবে অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট মানবিক গুণপনা দেখে, হয়েছি অবলীলাক্রমে কথা থেকে গানে আর গান থেকে কবিতায় দোলানি দেখে।

অন্যান্য নাট্যকার, তাঁদের মধ্যে অতি মহৎরাও, নাটকের দিগন্ত বিস্তারের এমনভাবে প্রয়াস পাননি। মার্লো এবং শেক্সপিয়রের পরে অবশ্য। তাই জন্যে ব্রেশ্‌ট্‌ আমার কাছে এত মূল্যবান।— চেষ্টার দিক থেকে, নাটকের ছড়িয়ে পড়ার দিক থেকে গুণীজনরা অপরাধ নেবেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই এমন নাড়াঘাঁটা খেয়ে যান না এত সহজে।— তাঁরা আটঘাট বেঁধে কাজ করেন।

কিন্তু ব্রেশ্‌ট্‌ আমার কাছে তা-ই থাকবেন। আগে যা বললাম।

এর মানে কিন্তু এ নয়, ব্রেশ্‌ট্‌-এর সম্পূর্ণ মতবাদ আমি গ্রহণযোগ্য মনে করি। ওঁর প্রধান মতবাদমূলক 'অরগানন' পড়ে আমার বারবার মনে হয়েছে, উনি একটা দৃঢ় মতবাদ তৈরি করতে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন, লোভে পড়ে যাচ্ছেন কটা কথার।

তার পর তাঁর 'ভেরফ্রেমেডুং' সম্বন্ধে এত পড়ে, তাঁর নিজের প্রযোজিত 'মুট্টার কুরাজ'-এ শেষ দৃশ্যে হেলেনে ভাইগেল-এর অন্তর্ভেদী অভিনয় সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হয়।

তাঁর আলোর ব্যবহার সম্পর্কেও নানা মত উগ্র তার্কিকের মতো হয়ে থাকবে আমার কাছে!

আসলে মতবাদ ব্যাপারটাই মুশকিলের। যে-কোনো শিক্ষাগত মতবাদের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। তার গোপনতার কারণ হচ্ছে, শিল্প সমগ্র জীবনের সমষ্টির কারবার করে। আর যে-কোনো শিক্ষাগত মতবাদ, তা সে যত উদারই হোক— সেই সমষ্টির কোনো একটা অংশকে মাত্র উদ্ভাসিত করে। ফলে, সমগ্র জীবন সম্বন্ধে, শিক্ষা সম্বন্ধে ও-ধরনের মতবাদের পঙ্গুত্ব লাভের সম্ভাবনা।

আমার মনে হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এ-সব মতকে আস্তে আস্তে মার্জিত করেছিলেন তিনি। প্রথম দিকের এবং শেষ দিকের লেখার তফাতের মধ্যে তার প্রমাণ নিহিত।

আমি যদি ব্রেশ্‌টের শেষ দিকের নাটকগুলো করি— যাত্রা হবে আমার আদর্শ। কিন্তু

গোড়ার দিকের নাটকে— ওদেশের 'অপেরা' এবং তিন দেওয়ালের মঞ্চের প্রাধান্য।

অবশ্য, এ-সবই আমার নিজের মনে হওয়ার কথা। এবং নিজেকে আমি ব্রেশ্‌টের বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কোনো কথা বলার অধিকারী বলে ধরি না।

বিজন ভট্টাচার্য : জীবনের সূত্রধার

সবারই জানা আছে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশে গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। সকলেই জানেন 'নবান্ন'-এর কথা। কিন্তু এটা সাধারণত জানা নেই যে 'নবান্ন' নাটকটির জন্ম হয় 'আগুন' বলে একটি একদৃশ্যের ছোট্ট নাটিকার থেকে। তার অভাবনীয় সাড়া জাগানো দেখে বিজনবাবু লেখেন 'জবানবন্দী' বলে একাঙ্ক। সেটাও মানুষকে অভিভূত করে, এবং তারই বিস্তারিত রূপ 'নবান্ন'।

শুধু রচনাশৈলীর দিক থেকে নয়, প্রয়োগ এবং অভিনয়পদ্ধতির দিক থেকেও বিজনবাবু বিপ্লব আনেন আমাদের মঞ্চে। বঙ্গভূমি রত্ন-প্রসবিনী। তাঁর থেকে মহৎ ও মহীয়ান অভিনয়শিল্পী তাঁর আগে বহু জন্মে গেছেন এই বাংলা দেশে। তফাতটা সেখানে নয়। তফাতটা হচ্ছে— অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, গিরিশ ঘোষ থেকে আরম্ভ করে শিশির ভাদুড়ী পর্যন্ত মহারথী ছিলেন একক সূর্যের উপাসক। ব্যক্তিগত অভিনয়প্রতিভার স্ফুরণের দিকেই তাঁদের ছিল ঝোঁক এবং প্রয়োগকর্তা হিসেবে তাঁরা বিভিন্ন মঞ্চকে সম্পূর্ণ আপন বশে রেখে নাট্যকারদের দিয়ে নাটক লেখাতেন এবং নিজেদের বিকাশের সমস্ত পথ খুলে নিতেন। ফলে তখনকার নাট্যপ্রয়োগ ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তার সঙ্গে আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যভিচারগ্রস্ত জমিদারশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট এক বিশেষ ধরনের নটীরা সুযোগসুবিধে পেতেন। তখনকার বিভিন্ন মঞ্চকে ঘিরে যে ক্লেদাক্ত ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হত, তার কিছু কিছু রেশ আমরাও দেখেছি।

ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা বলব না— কিন্তু সেটা ব্যতিক্রমই। প্রধান ধারাটি ছিল ওই কলুষিত আবহাওয়াতে পর্যবসিত। তার থেকেও বড়ো কথা, নাটক যে সামাজিক মানুষের সংগ্রামের অংশীদার শুধু নয়, হাতিয়ারও বটে— এ-বোধ ছিল অনুপস্থিত।

এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বিজনবাবুর নেতৃত্বে গণ-নাট্য সংঘের আবির্ভাব। তখন প্রথমে নাটক আরম্ভ হয় ফ্যাসিবিরোধী লীগের ছত্রছায়ায় প্রগতি লেখক সংঘের নামে। কিছু বাদে তারই শাখা হিসেবে ভারতীয় গণ-নাট্য সংঘের জন্ম।

বিজনবাবুই প্রথমে দেখালেন কী করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কী করে সম্মিলিত অভিনয়ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কী করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ড রূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়। আমরা যারা তখন চেষ্টা করেছিলাম, সে-সব দিনের কথা ভুলব না। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আলোড়ন বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ শিহরিত করে তুলল।

বাংলা নাটকে এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। তার পরে নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে

বাংলা নাট্য আন্দোলন নানা দিকে পল্লবিত প্রসারিত হয়ে উঠেছে, বেশ-কিছু বাবুদের 'নবনাট্য আন্দোলন', শম্ভু মিত্র মশায়ের 'সৎ নাট্য আন্দোলন', মোহিত চাটুজ্জে, বাদল সরকারের 'কিমিতিবাদী নাটকের আন্দোলন' ইত্যাকার নানা প্রকার শব্দোচ্চারণে দিগ্‌বিদিক্ উদ্ভাসিত। আমরা অপেক্ষা করে আছি, আবার কোন্ নতুন বাবু-বিবি, নতুন কোন্ নামের জন্ম দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করেন।

বিজনবাবু এ-সবের মধ্যে একটেরেতে পড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর লেখনী আজও বন্ধ হয়নি। তিনি 'কলঙ্ক'-এর থেকে অনেক অনেক দূরে চলে এসেছেন, কিন্তু মূল সিদ্ধান্তে অটল থেকে। তাঁর 'নবান্ন'-এর পরেই লেখা যে নাটক, তার নাম 'অবরোধ'। আঙ্গিকের দিক থেকে সেটা সম্পূর্ণ অন্য একটা পথের সন্ধান খোঁজবার চেষ্টা করেছিল। একটা লক্-আউট্ হয়ে যাওয়া ফ্যাক্টরির গেটে একটা বুড়ো দারোয়ানের চোখ দিয়ে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা বিধৃত।

তার পরেই তিনি একেবারে সরে চলে যান অন্যদিকে। লিখে বসলেন— 'জীয়নকন্যা'। এটি সম্পূর্ণ রূপকধর্মী গীত-নৃত্য-কথ্য নাটক। এর আঙ্গিকের বাহার ছিল একেবারে নতুন ধরনের।

তার পর তিনি বহু নাটক লিখে গেছেন এবং লিখে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটাতেই আঙ্গিকের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই স্বল্প পরিসরে দু-একটির নাম বলা যেতে পারে। যেমন 'কলঙ্ক'। এটি বীরভূম অঞ্চলের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উপরে যুদ্ধের সময় আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যের দল যে কলঙ্ক রেখে যায় তারই কাহিনী, কালো সাঁওতাল মেয়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে ধবধবে সাদা ছেলে। তাকে কীভাবে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করা হল, এই হচ্ছে উপজীব্য।

'মরাচাঁদ'। একটা বাউল, অন্ধ, তার যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা জড়িয়ে এই নাটকটি।

'গোত্রান্তর'। এইখান থেকে তিনি প্রচণ্ডভাবে সংকেতময় নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এর পটভূমি বিশাল। একজন মাস্টারমশায়ের চোখ দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বস্তির এক বিরাট গাথা।

'দেবীগর্জন'। এখানে মাতৃশক্তির প্রকাশের এক চণ্ডরূপের প্রকাশ।

'স্বর্ণকুম্ভ'। চার যুগে মানুষের সমস্ত অভাব বঞ্চনা জমা হতে হতে এক সময়ে এসে ফেটে পড়ে সুন্দরের প্রকাশ ঘটবে, তারই এক অপরূপ সংকেতময় ব্যঞ্জনা।

'কৃষ্ণপক্ষ', 'সুন্দরবন'। এর পরে বিজনবাবু আরও অনেকগুলো লেখার কথা আমাকে বলেছেন এবং যেগুলো বললাম সেগুলো ছাড়াও উনি আরও অনেক লেখা লিখেছেন। তাঁর সব লেখা আমার পড়ার বা মঞ্চে অভিনীত হতে দেখার সুযোগ হয় নি ; কারণ আমি উত্তরোত্তর মঞ্চজগৎ থেকে সরে গেছি। কিন্তু এটা আমি জানি যে তিনি কখনো থেমে থাকেননি। তাঁর একটাই মাত্র পুঁজি, সেটা হচ্ছে শুভ্র সততা। কাজেই যখন যে সমস্যা তাঁকে আলোড়িত করে তার মধ্যে তিনি গভীরভাবে ডুবে যান। সবই যে উৎরোয়, এ কথা বলা সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু তাঁর মতো এরকম মুক্ত মন নিয়ে সারা জীবন ধরে নাট্যচর্চা করতে বাংলা দেশে আমি কাউকে দেখিনি।

এবং তিনি নাম করা নিয়ে ব্যস্ত নন। একটা কিছু নাম দিয়ে একটা ইস্কুল তৈরি করা, এটা ওঁর ধাতে আসে না।

অর্থাৎ ভদ্রলোক চালবাজি শেখেননি।

আমাদের সেই গঙ্গাদা : শান্ত মানুষটি

গঙ্গাদা-র মৃত্যু-সংবাদ শুনে খুব মর্মাহত হয়েছিলাম। আরও খারাপ লাগছিল যে তার দুদিন আগে যখন তিনি বোম্বেতে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন, তখন আমি সেখানেই ছিলাম। তা সত্ত্বেও দেখা করিনি। দেখা করতে গেলে হয়তো গঙ্গাদা-কে শেষবারের মতো দেখতে পারতাম।

গঙ্গাদা-র স্মারকগ্রন্থে কিছু লিখতে পারলে ভারাক্রান্ত মনটা হয়তো খানিকটা হাল্‌কা হবে। এই ধরনের স্মারকগ্রন্থ গঙ্গাদা-র জন্যে বেরুবে, এটা অপ্রত্যাশিত। কেননা তাঁর মতো মানুষ মারা গেলে স্মৃতিরক্ষার চেষ্টার চাইতে, স্মৃতিটাকে ধ্বংস করে ফেলার প্রবণতাই বেশি হয়ে ওঠে। আমার মতে কারণটা দ্বিবিধ। প্রথমত আজকের যুগটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমনই একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, মনে হয় মৃত্যুর পর কারো সম্বন্ধে কিছু করতে হলে, জীবিতাবস্থায় তাকেই পাবলিসিটি ক'রে নিজের শোকসভার বা স্মারকগ্রন্থের জোগাড়যন্তর করে তবে তাকে মরতে হবে। দ্বিতীয়ত, গঙ্গাদা-র মতো অভিনেতা, বিজনবাবুর মতো অভিনেতার কৃতিত্বকে ধামা চাপা দিতে পারলে তবেই গণনাট্য আন্দোলনের ইতিহাস থেকে তাঁদের নাম বুঝিবা মুছে দেওয়া যাবে।

আগামী দিনের নাট্য-প্রেমী মানুষেরা এঁদের নাম ভুলে যাবেন কি না জানি না, তবে আমি ভুলব না। আমি এঁদের কাছে অভিনয় শিখেছি, এঁদের সাহচর্য পেয়েছি— এটাই আমার গৌরব। ১৯৪৬ সালে আমি গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলাম সাধারণ কর্মী হিসেবে। তখন গণনাট্য সংঘই ছিল সবচেয়ে সম্মানিত নাট্যসংস্থা। সেখানে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়াটাই ভাগ্যের কথা। সেই সুযোগ আমি পেয়েছিলাম ১৯৪৮ সালে 'নবান্ন' নাটকের একটা ছোট্ট ভূমিকায়। গঙ্গাদাকে আমি তখন থেকেই জানি। তিনি গণনাট্যে ছিলেন একেবারে গোড়া থেকেই। কাজেই অভিনয়ে তখন তাঁর সুনামও হয়েছে যথেষ্ট। ওঁদের সঙ্গে অভিনয় করতে আমার খুব ভয় করত। কারণ আমি তখন একেবারেই কাঁচা, তার ওপর আবার গাঁয়ের ছেলে। 'নবান্ন' নাটকের দুই পরিচালক বিজন ভট্টাচার্য এবং শম্ভু মিত্র মশাই উভয়েই অনেক সাহায্য করেছিলেন আমাকে, তবে তাঁদের হাতে দায়িত্ব ছিল পঞ্চাশ-ষাটজন শিল্পীর। কাজেই অভিনয়ের ব্যাপারে বিশেষভাবে আমাকে যে দুজন শিল্পী সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা হলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও গঙ্গাপদ বসু। এঁদের দুজনের সাহায্য ছাড়া আমি যেটুকু অভিনয় সেদিন করতে পেরেছিলাম, তাও করতে পারতাম না।

এর পরে গণনাট্য সংঘ থেকে আমরা চলে আসে এবং 'নাট্যচক্র' নাম দিয়ে একটি নাট্যসংস্থার উদ্ভব হয় যাতে গণনাট্য সংঘের অনেকেই ছিলেন। গঙ্গাদা, বিজনবাবু, শম্ভুদা,

দিগিনবাবু এবং আরো অনেকেই। 'নাট্যচক্রে'র প্রযোজনার 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ হয়, এবং প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি যে 'নীলদর্পণ' নাটকেই আমার প্রথম একটা পরিচিতি হয়। ভাবতে অবশ্য আজ হাসি পায় যে আমিও এককালে মঞ্চাভিনেতা ছিলাম। তা যাই হোক, সেই নাটকে ভুলতে পারব না দুটি চরিত্রকে। একটি বিজন ভট্টাচার্যের তোরাপ, অপরটি গঙ্গাপদ বসুর গোপী দেওয়ান। 'নবান্নে'র প্রধান সমাদ্দার-এর চেয়েও বিজনবাবুর তোরাপ আমার বেশি ভালো লেগেছিল। আর গঙ্গাদার একটি সংলাপ তো এখনো আমি যেন শুনতে পাই। একটি দৃশ্যে খুন অত্যাচার ইত্যাদি ঘটিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে একটা সংলাপ উচ্চারণ করতেন স্টেজে একা দাঁড়িয়ে 'সাতশো শকুনি মরলি পর একটা নীলকুঠির দেওয়ান হয়।' চোখের দৃষ্টি, সংলাপ উচ্চারণের বিশিষ্টতা— সব মিলিয়ে তাঁর যে অভিনয় আমি দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, এটা একমাত্র গঙ্গাদা-র পক্ষেই সম্ভব— আর কেউ তাঁর কাছাকাছিই আসতে পারবে না।

'নীলদর্পণ' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলেও নাট্যচক্র দীর্ঘায়ু হল না। এর সমসাময়িক কালেই বহুরূপীর গোড়াপত্তন। যদিও তখন 'বহুরূপী' নামকরণ করা হয়নি। তুলসীবাবুর 'পথিক' নাটক নিয়ে বসা হয়েছে। গঙ্গাদা, শম্ভুদা, মনোরঞ্জনবাবু, মণিদি (তৃপ্তি মিত্র), অমর গাঙ্গুলী, এঁরা সব রয়েছেন। তুলসীবাবু তো আছেনই। আমিও আসি রোজ। রিহার্সাল রোজই হয়, কিন্তু নাটক আর হয় না। এগারো মাস ধরে রিহার্সাল হচ্ছে, তবুও নাটক মঞ্চস্থ হবার কোনো লক্ষণ নেই। পয়সাকড়ির অভাব। সকলেরই এক অবস্থা। এই সময় লক্ষ করতাম যে শেষের দিকে অনেকেরই উৎসাহে যেন কিছুটা ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। আমার তো মনে হত যে, আর কতদিন ধরে রিহার্সাল দেব এভাবে! যেতাম না, এমনও অনেকদিন হয়েছে। কিন্তু আমি এমন একটি মানুষ দেখেছিলাম যিনি প্রতিদিন ঠিক সময়ে রিহার্সালে হাজির থাকতেন, তিনি হলেন গঙ্গাপদ বসু। এত 'ডিসিপ্লিনড' অ্যাকটর আমি কখনো দেখিনি আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'পথিক' নাটক মঞ্চস্থ হবার আগেই মতান্তরের ফলে আমি এই সংস্থা ছেড়ে দিয়ে চলে যাই এবং যার ফলে গঙ্গাদা-র সঙ্গে স্টেজে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমার আর হয়নি। এই সময় আমি একটা নাটক লিখেছিলাম। তার নাম দিয়েছিলাম 'দলিল'। যে-কারণে মতবিরোধ ঘটেছে সে কাহিনীর অবতারণা করতে চাই না, তবে এ কথা বলব যে বহুরূপী (তখনও নামকরণ হয়নি) ছেড়ে চলে এলেও গঙ্গাদা-র সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমার আগের মতোই ছিল। 'দলিল' নাটকটি পরে গণনাট্য সংঘে অভিনীত হলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা— ইত্যাদি পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছিল এবং এর কৃতিত্বে গঙ্গাদা-ও অংশীদার ছিলেন, কেননা আমি নাটকের প্রতিটি দৃশ্য লেখা হলেই গঙ্গাদা-কে পড়ে শোনাতাম এবং তিনিও বলতেন, 'ঋত্বিক, এটা বদলাও, এ দৃশ্যটা এরকম করে করো, চরিত্রগুলো বদলে এইভাবে করো— এইরকম।

মোটামুটিভাবে এই পর্যায়ে মঞ্চে গঙ্গাদা-র সঙ্গ ছাড়া হলেও চিত্রজগতে যেখানেই আমি যুক্ত ছিলাম, সেখানেই গঙ্গাদাকে নিয়ে গিয়েছি অভিনয় করবার জন্যে। স্বর্গত নির্মল দে মশাই-এর 'বেদেনী' ছবিতে আমি সহকারী পরিচালক ছিলাম, গঙ্গাদা-কে নিয়ে গিয়েছিলাম ওই ছবির একটি চরিত্র রূপায়ণের জন্যে। শ্রীবিমল রায়ের 'তথাপি' ছবিতে

আমি ছিলাম প্রধান সহকারী পরিচালক, সেখানেও গঙ্গাদাকে দিয়ে একটা ভালো কাজ করিয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার ইতিপূর্বে ১৯৪৮ সালে শ্রীনিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে দুটি প্রধান ভূমিকায় গঙ্গাদা এবং আমি একসঙ্গে অভিনয় করি। এটাই গঙ্গাদার এবং আমার প্রথম চিত্রাভিনয় এবং 'ছিন্নমূল' যে কী অসাধারণ ছবি, তা যদি আজকালকার ছেলেমেয়েরা দেখেন তবেই বুঝতে পারবেন। 'ছিন্নমূল'ই ভারতবর্ষের প্রথম বাস্তববাদী ছবি, আর গঙ্গাদা কত বড়ো অভিনেতা তারও প্রমাণ মিলবে এই ছবিতে।

আমার প্রথম নিজস্ব ছবি 'নাগরিক'। এই ছবিতে গঙ্গাদা অভিনয় করেছেন। কিন্তু ছবিটি মুক্তি পায়নি। আমার প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'অযান্ত্রিকে'-ও গঙ্গাদা এক অদ্ভুত সিরিও-কমিক চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন। আট-দশ দিনের আউটডোরের কাজ ছিল রাঁচিতে কিন্তু তিনি ছিলেন প্রায় মাসখানেক ধরে। তখন গঙ্গাদা-কে দেখে মনে হত যে আজকের দিনে তাঁর মতো নিষ্ঠাবান শিল্পী পাওয়া সত্যিই দুর্লভ। নতুনদের তিনি কী নিঃস্বার্থভাবেই না উৎসাহ দিতেন।

গঙ্গাদা-র মৃত্যুতে তিনি যে ধারার অভিনেতা, তার মৃত্যু ঘটল। অর্থাৎ ক্রূর চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তাঁর সৃষ্ট ক্রূর চরিত্র আর পাঁচজন অভিনেতার চোখবাঁকানো ভিলেন নয়, কাজেই তারা জীবন্ত। আর সিরিও-কমিক রোলেও তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীছিল না। তাঁর তৈরি কমিক চরিত্র ভাঁড় নয়, স্বাভাবিক মানুষ। কাজেই এইসব চরিত্রসৃষ্টিতে ভবিষ্যতে আর কার দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যাবে, আমি জানি না।

এটুকু বলতে পারি অভিনেতা হিসেবে এবং গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে আগামী দিনের ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে— নতুন মানুষের নতুন সমাজে।

গঙ্গাদা-র অভিনয়-প্রতিভার দীপ্তিতে ম্লান হয়ে যাবার ভয়ে যারা ভীত ছিল, সেইসব নকলনবিশদের ভাবা উচিত যে শিশিরকুমারকে অনুকরণ করে গলার কায়দা দেখিয়ে যেমন বড়ো অভিনেতা হওয়া যায় না, তেমনি গঙ্গাদা-র মতো আজীবন-সংগ্রামী মানুষকে অবহেলা করেও ইতিহাসকে কখনো বদলে দেওয়া যায় না। আজ বহুরূপী-র খুব নামডাক হয়েছে, কিন্তু এই বহুরূপী-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল খুবই দীনভাবে। এবং সেই সাংগঠনিক দারিদ্র্যের মধ্যে যাঁরা সর্বতোভাবে স্বার্থ ছাড়াই সাহসের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসুরাই ছিলেন কয়েকজন মাত্র। তাই আজ যখন গঙ্গাদা-র মৃত্যুর দিনেও তাঁরা অভিনয় বন্ধ করেন না, বা তাঁর মৃত্যুর পর একটা দিনের জন্যেও স্মৃতি-আলোচনার ব্যবস্থা করেন না, তাঁর কর্মময় জীবন সম্বন্ধে কোনো আলোকপাত করা হয় না, তখন বড়ো দুঃখ হয়। কী জানি, কিসের ভয়? যে লোকটা জীবিত অবস্থায় কখনো খেতাবের জন্যে কান্নাকাটি করেনি, সেই মানুষটা মৃত অবস্থায় এসে কার পাকা ধানে মই দেবে বলে আশঙ্কা, কে জানে।

পরিশিষ্ট

১
নাটক ও বর্তমান কাল

প্রিয় সম্পাদকমশাই,

আজকের নাট্যকৃতি সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে বলেছেন। প্রথমত বহু বছর নাটক করা বা দেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছি, কাজেই হালফিল ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই ; দ্বিতীয়ত আপনাদের অনেক শ্লোগানই আমার অনুধাবন করতে বেশ অসুবিধা হয়।

যেমন ধরুন, আপনাদের এই 'নব-নাট্য আন্দোলন' ঘটনাটি। মশাই, নব-নাট্যটা কোত্থেকে এসেছে এবং কেন— খুব রহস্যজনক মনে হয় আমার। এক কালে— সেই একযুগ আগে— আপনাদের নাট্য আন্দোলনের আমিও শামিল ছিলাম। তখন আমরা 'গণনাট্য' আন্দোলন করতাম। ঠিক-ভুল যাই করি, নিজেদের হদিশটা ঠিক ছিল। সামাজিক রাজনৈতিক দিকনির্দেশ সময় সময় ভুল হয়েছিল— কিন্তু কোন্ শক্তির শরিক আমরা, কার প্রতি আমাদের দায়িত্ব— সে বোধে কোনো ধোঁয়াটে ভাব ছিল না। বিদেশি ভাষায় যাকে বলে, আমরা Engage শিল্পী ছিলাম।

এবং আজও, অন্তত আমার নিজের মনে কোনো দ্বিধা নেই। আজও মনে করি, আমরা ঠিক পথই চিনেছিলাম। তীব্রভাবে সামাজিক ক্লেদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন এবং বাস্তবের শ্রদ্ধেয় অংশের প্রতি আকুলভাবে ভালোবাসা দেখানো— সর্বযুগের সর্বশিল্পীর এ হচ্ছে পবিত্র দায়িত্ব।

এর পর জীবনের এবং জীবিকার তাগিদে বহু দূরে সরে যেতে হয়েছে। এখন স্বচ্ছচোখে অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনুভব করি, '৪২-এর পর থেকে যে তীব্র বৈপ্লবিক চেতনা আমাদের গণনাট্য আন্দোলনকে প্রেরণায় বেগবান করেছিল, সেইটুকুই ছিল আসল পুঁজি। এখন বাইরে থেকে দেখি, ইতিহাসের দেউলিয়াপনার ইতর কার্যকলাপ। একটি বেগবান প্রেরণা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দীভূত হয়ে আসে, কতকগুলো ঋণাত্মক গুণের [negative virtues] সমন্বয় ঘটায় সেই বস্তাপচা মালগুলোর সঙ্গে, এবং নবকলেবরে সেই ফাঁকির সওদা নতুন নামে চলে।

এবং তাই চলছে। সাহস, মেরুদণ্ড, আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা, অপ্রিয় সত্য-ভাষণের পরম প্রসাদ— এগুলো নেই। তাই নবনাট্য আন্দোলন। তাই এই ভাবের ঘরে চুরি।

এরজন্য দায়ী আমরা সবাই। যাঁরা সেদিন চেষ্টার পুরোভাগে ছিলেন, তাঁরাও সব বিকিয়ে গেছেন ; নতুন দর্শন, নতুন অজুহাত তৈরি করেছেন।

সেদিনের চেষ্টার ফলে নাটক নতুন আয়ু পেল এদেশে, পেশাদারি মঞ্চগুলো পর্যন্ত এর প্রভাবের আওতায় এসে পড়ল। কিন্তু সে তীক্ষ্ণ সততা হল এই মোড়ফেরার পথে প্রথম বলি।

তার পর আসরে প্রবেশ করলেন এক ধরনের মাস্টারের দল। এখানে অবশ্য আমি সবার কথা বলছি না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। তাঁরা এখন উলটো-পালটা আনতাবাড়ি বিচারে

বসে গেলেন। এই-জাতীয় প্রাণীগুলি শিল্পের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে চিরকাল প্রধান বাধা। এঁদের ওস্তাদির পথ পরিষ্কার, কারণ একদিকে সত্যিকারের বেগবান প্রেরণা আজ নেই, অপর দিকে কিছু দুষ্টবুদ্ধি ব্যাবসাদার আজকাল জুটেছেন। তাঁদের পয়সার অভাব নেই— তাঁদের নবনাট্য আন্দোলনের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্যে এই ভাড়াটে মাস্টারগুলো কাজে আসে। ওদের ফরমায়েশমতো ইতিহাস ভাঙা-চোরার কাজে লোকগুলো খুবই দড়।

আর-একটা জিনিস দেখি। নাটক করার কারিগরি দিকটার প্রতি আক্রমণ চলছে একদিকে, অপরদিকে তাকেই গ্রহণ করে পয়সা পেটা হচ্ছে। তাপস সেনকে নিয়ে দেখি বেশ-কিছু লোক মর্মাহত। বেচারী ছেলেটা মঞ্চ আঁকড়ে ধরে কিছু কাজের কাজ করার চেষ্টা করে চলেছে। খ্যাপা নেকড়ের পালের দ্বারা তাকে আক্রান্ত হতে দেখেছি।

আসল যে বাপারটি, নাটক— তার ঘাটতিটা এরা সঠিক সুষ্ঠু পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে কেউ দেখছেন না। তীব্র আবেগসঞ্জাত যে সত্যদৃষ্টি— যে দায়িত্ববোধ, সেটা যে দু-একজন মানুষের মধ্যে আজও বর্তমান, তাদের গলা টিপে রাখা হয়েছে, চারপাশ থেকে তাদের বলা হচ্ছে, তুমি ছোটো, তুমি কিছু না!—

এমন একজন মানুষ হচ্ছেন বিজন ভট্টাচার্য। ইদানীং কালেও তাঁর নাটকেই প্রতিভার স্পর্শ দেখি। শুধু বাস্তববাদের ঊর্ধ্বে ওঠার স্পর্ধা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। অবশ্য নতুন বহু নাট্যকার আছেন, যাঁদের কাজ আমি দেখবার সৌভাগ্য পাইনি, কাজেই এ বিষয়ে আমার মতের মূল্য অতি সামান্য।

ভরসা এখনও রাখা চলে উৎপলের ওপরে। কিন্তু ও এত অগভীর যে সত্যকারের শিল্প সৃষ্টি ওর দ্বারা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ হয়। তা নইলে এত পড়াশুনো ওর, অথচ এত তাড়াহুড়ো ছেলেমানুষী ক'রে নাটক মঞ্চস্থ করে যে, কোনো অনন্ত মুহূর্তের সৃষ্টি হয় না। আর বড়ো চেঁচায়। 'তিতাস'-এর মতো উপন্যাসকে ডোবালো।

তবু ও-ই হয়তো পারবে। জানি না।

সম্পাদকমশাই, এই তাড়াহুড়ো করে লেখা চিঠিতে অনেক চিন্তাকেই এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে গেলাম। পরে সুযোগ পেলে সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

তবে, যে অন্ধকার যুগের মধ্যে আমরা বাস করছি, তাতে কাউকেই বড়ো একটা দোষ দেওয়া যায় না। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে যেদিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পিঠে ছুরি মেরে আপসের স্বাধীনতা এল। এই বিশ্বাসঘাতকতার ক্লেদ ধীরে ধীরে চেপে বসছে।

তার জঘন্যতম প্রমাণ তো এই জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির কলকাতাতেই দেখা গেল। সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, কলেজের ল্যাবরেটরি ভাঙা, হেডমাস্টারের মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মারা, একটা ঘোর দুঃস্বপ্নের জগৎ আমাদের ছেয়ে ফেলেছে। এত বছরের এত আন্দোলন এক ফুঁ-তে উড়ে গেল! আজকের অবসন্ন বাংলার নৈতিক মেরুদণ্ড চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে।

সাহিত্যেও পরিপূর্ণ অবক্ষয়। পয়সার জন্য লেখাতে বাজার ভর্তি। সৎ লেখকেরা অনুপস্থিত। চলচ্চিত্র একটা সাড়া এনেছিল, সেটাও উত্তরোত্তর নেমে যাচ্ছে সস্তা প্রমোদের স্তরে। নতুন শিল্পীরা সে জগতেও আসছেন না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের বোধ হয় যুগের ব্যথাকে ভাষা দেবাব দায়িত্ব ছিল।

আমাদের নৈতিক বলকে দৃঢ় করতে নাটক হয়তো একটা ভূমিকা নিতে পারত। হয়তো তেমন শিল্পীটির আবির্ভাব আশা করে নিতান্তই আশাবাদী মোহ বলে ধরা হবে না।

আজ যে শিল্পী মাথা তুলে দাঁড়াবে এর বিরুদ্ধে, তাকে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের মতোই হতে হবে একক, নিঃসঙ্গ। এবং বক্তৃতাবাজি করে সে শিল্পী জন্মাবে না। ভেতর থেকে তার আসবে উত্তাপ, এবং যখন সে আসবে, তখন এক লহমায় তাকে চিনে নেওয়া যাবে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে :— রবি ঠাকুরের ভাষায়— মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

১২.৪.৬৬ ভবদীয়

ঋত্বিক ঘটক

২

আমাদের কথা

আজিকাল নাট্যচর্চা প্রভূত পরিমাণে দেশের বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। প্রতিদিনই সংবাদপত্র খুলিলেই তাহার সন্দেশ পাওয়া যাইবে। আকারে প্রকারে দেখিয়া মনে হয় প্রতিনিয়তই নব্য নূতন গোষ্ঠীর জন্মলাভ ঘটিতেছে। ইহার ফলে দেশের নাট্যচিন্তা ও চেষ্টার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হইতেছে, এবম্বিধ প্রতীয়মান হয়। বহু জ্ঞানী, গুণী, স্রষ্টা ও শিল্পী তাহাদের সৃজনী প্রতিভা রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া যুগপৎ পুলক এবং আনন্দ জাগে।

অতীতে, গত ২০-২৫ বৎসর পূর্বে যখন রঙ্গমঞ্চকে প্রথম মানুষের ক্ষেত খামারে, কারখানায়, বস্তিতে, এবং পথের ধুলায় রাজ আসন পাতিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হইয়াছিল, সেই দিনগুলির সাথে আজিকার দিনগুলির কতই না তফাত, কতই না গুণগত পার্থক্য।

সেই দিনগুলির সাথে এই দিনগুলির তারতম্য এবং গুণগত চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন, তাহার হিসাবনিকাশ করিয়া মীমাংসায় উপনীত হইবার কাল এখনও আসে নাই বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা। আমাদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই কোনো-না-কোনো রকমভাবে এই দুইটি যুগের সাথে ওতপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত। আমরা বৃক্ষগণনা করিতে পারি, কিন্তু সম্পূর্ণ অরণ্যানীকে অনুধাবন করার মতো উদাসীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করিতে পারিব কি না, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। তত্রাচ মনে বহুপ্রকার প্রশ্ন জাগিয়া থাকে। কোনো সময় আগেকার ধূলিমলিন সেই ক্লান্ত দিনগুলির কথা মনে পড়ে, কোনো সময় আজিকার বলদৃপ্ত সাধন প্রচেষ্টার আবেশে মন মগ্ন হইয়া যায়। এর ধারাবাহিকতার যে সূত্রটি প্রবহমান, সেই সম্পর্কে চিন্তাশীল পাঠক ও লেখকদিগের নিকট হইতে গভীরতাময় নিবন্ধ প্রাপ্তির আশা প্রকাশ করা যাইতেছে।

তবে এইস্থলে একটি প্রসঙ্গে কথা তুলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাহা হইতেছে সত্যকারের শিল্পগুণ-মণ্ডিত আদি-নাট্যসাহিত্যের একান্ত দুর্ভিক্ষ। অনুকরণ,

অনুসরণ অথবা অনুবাদ কোনোকালেই, কোনো শিল্পেই, কোনো দেশেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বরঞ্চ ইহারা যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দুঃখ এই কারণে, যে সমাজ যখন ক্ষয়িষ্ণু এবং ভ্রষ্টামানস গজভুক্তকপিত্থবৎ অন্তঃসারশূন্য, তখনই এই লক্ষণটি ফুটিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বারেবারে ; আনন্দ এই কারণে যে এই লক্ষণ ভগ্নদূতের লক্ষণ। বড়ো একটা ভাঙন আসিতেছে, তাহারই বিজয় কেতন লইয়া এই ভগ্নদূতের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ।

মহাশক্তিপূজার পূর্বে যেমন পিপীলিকার পক্ষ গজাইয়া থাকে নিতান্তই মরিবার জন্য ঠিক তেমনই মহাকাল এইসব শিল্পকে বর্জিত কাগজের পেট্‌রায় নিক্ষেপ করিবেন ; ইহার আর কোনো প্রতিকার নাই। এই শিল্পগুলি তাই আমাদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করিতেছে। মহাষ্টমীর সন্ধি পূজায় যেমন ঢাকের বাদ্যি বাজিয়া ঘোষণা করিতে থাকে যে নূতন আসিতেছে, তেমনই এইসব শিল্প বৃক্ষচূড়া হইতে লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া ঘোষণা করিতেছে যে '— আমরা যাহারা যাইবার তাহারা আসিয়া গেছি, যাহারা থাকিবার তাহাদের আগমন-বার্তার বহিধ্বজা দেখো ঐ কারখানার ধূম্র উদ্গীরণে, দেখো ঐ বায়ুতে আন্দোলায়িত পাকা ফসলের পক্ক-ধান্যশীর্ষে।'

আমরা অবশ্য আমাদের মতামত অন্য কাহারও উপর চাপাইয়া দিতে চাহি না, তবু আমাদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। গ্রহণ করা যাক "নবনাট্য আন্দোলন"। এই ব্যাপারটি যে কী, তাহার শীর্ষ কেন, তাহার পুচ্ছ পর্যন্ত আমরা আজিও বাগাইয়া ধরিয়া উঠিতে পারি নাই। এই ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করার জন্য কোনো তাত্ত্বিক যদি আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আগাইয়া আসেন, আমরা বাধিত হইব। আমরা মোটামুটি বুঝি একটি কথা : গণনাট্য আন্দোলন। শিল্প কখনো শ্রেণী-বহির্ভূত হইতে পারে, ইহা আমাদের ধ্যান-ধারণার অতীত, এবং আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের চিত্তে যুগপৎ হাস্য ও করুণ রসের উদ্রেক করে। ইহা একটি আক্রমণ হইয়া রহিল।

তবে একটি কথা। ঐ যাহা পূর্বে বলিয়াছি। আমরা আমাদিগের মতামত পরের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া দিব, এমন কোনো বাসনা বা স্পৃহা আমাদের নাই।

এই কথার অর্থ ইহা নয় যে আমরা এতগুলি ব্যক্তির এত সৎপ্রচেষ্টা তুড়ি দিয়া নস্যাৎ করিয়া দিতেছি। একমাত্র জৈবিক কারণ-পরম্পরার জন্যই তাহা সম্ভব নয়। সময় অগ্রসর হইতেছে, মানুষ অগ্রসর হইতেছে, দেশ অগ্রসর হইতেছে ; কোন্ পথে— তাহার সালতামামি করিবেন সমাজতাত্ত্বিক ব্যক্তিবর্গ। মবলগ একটা-কিছু ঘটিয়া যাইতেছে। কলাকৌশলের দিক, প্রয়োগরীতির দিক, শিল্পশৈলীর দিক, ইহারাও ইস্তক কিছু অগ্রগমন করিবার ছাড়পত্র পাইয়াছে। পৃষ্ঠপোষকতা যেই দিক হইতেই হোক-না-কেন, আসিতেছে। দেশীয় রাজন্যবর্গের স্থলে দেশী 'স্বাধীন সরকার' ইস্তক সি. আই. এ. পর্যন্ত প্রচুর উপুড় হস্ত করিতেছেন। উহা যাউকগ্যা, কিছু ব্যক্তি তো কর্মকুশলতার দিক হইতে হস্তপক্ক করিয়া ফেলিলেন, ইহাই লাভ। এক দিন আগ্নেয়াস্ত্রই তাহার নলিটার মুখ ঘোরাইয়া তাহারই পৃষ্ঠপোষকবর্গের বক্ষস্থলে, (পৃষ্ঠে নয়), একটি রন্ধ্রের বিন্যাস করিবে, এবং একটি ইস্পাতগোলক তাহাদের হৃৎপিণ্ডটি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

অথচ যখন ভাবি, কী বিরাট সম্পদই আমরা সঞ্চয় করিয়া যক্ষের ধনের মতো

আগুলাইয়া বসিয়া আছি। আমাদের দেশ মহাকাব্যের দেশ। আমাদের নাটকগুলি চতুষ্প্রহর ব্যাপী চর্বিতচর্বণ করা একই চরিত্রগুলির ভাগ্যের ঠিকানা নির্দেশ করে, যেমন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, হনুমান, রাবণ, বিভীষণ, অথবা রাধা, কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, অহল্যা, ইত্যাদি। আমাদিগের মেজাজ মহাকাব্যের মেজাজ ; ইহার মানেই এই নয় যে এ-জাতীয় পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যেই নিজেদেরকে পর্যবসিত করিতে হইবে। ইহার মানে শুধু এইটুকু যে এই মেজাজের সুর্মা চক্ষুতে লাগাইয়া আজিকার বাস্তবের শামিল হইতে হইবে। লোকনৃত্য, লোকসংগীত, এবং লোকনাট্য এই মেজাজের সাহায্যে এক ভিয়ানে চড়াইয়া জারিত রসের এক অখণ্ড আত্মার মূর্তি দিতে হইবে। মাঠে, ফুটপাথে, কারখানায় গঞ্জে প্রতিনিয়তই এই মহাকাব্যের উপাদান জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই নবজাতককে শঙ্খ-উলুধ্বনির দ্বারা শিল্পের স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া সম্মানের সর্বউচ্চ আসনে অধিষ্ঠান করাইতে হইবে। যেমন করিয়াছিলেন মহাকবি বের্টলট্ ব্রেশ্ট্।

কারণ কোনো শিল্পই নিরালম্ব বায়ুভূত নহে, তাহার একটি বাতাবরণ আছে। ইহা মানবজীবনের সম্পর্কে আত্মীয়। সর্বশিল্পই সৌন্দর্যনির্ভর কিন্তু সত্যনির্ভর না হইলে তাহা শিল্প হয় না। সত্যনিষ্ঠতা সর্বাগ্রে, তাহার পর সৌন্দর্যনিষ্ঠতা। এই বিষয়ে আরো অধিক আলোচনা করিবার বাসনা চিত্তে রহিয়া গেল। বারান্তরে ইহার সবিশদ পর্যালোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া রাখিলাম।

অনেক আশা লইয়া এ পত্রিকাটি প্রকাশ করা গেল। এখন পাঠকবর্গের হস্তে ইহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

আমরা সংগ্রাম করিবার জন্য প্রস্তুত। কারণ বর্তমান দেশ-কাল-পাত্র বিচারে, ঘৃণাই হইতেছে একমাত্র পবিত্র বস্তু।

৩

শিশিরকুমার বিধান রায়কে বলিয়াছিলেন যে, আমাকে 'খেতাব' দিবার কোনো প্রয়োজন নাই ; তোমরা একটা জাতীয় নাট্যশালা প্রস্তুত করো দেখি! বিধান রায় মাথা অবনত করিয়া সেদিনের শ্রীরঙ্গম হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার পর, রবিবাবুর নামে একটি নাট্য সদন খোলা হইল, যাহার কথা ছিল 'জাতীয় নাট্যশালা'য় (কাগজে পত্রে তৎকালে আমরা তাহাই জানিয়াছিলাম) পরিণত হওয়ার। এই সদনকে সাজাইবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয়ও করা হইল। একটি অবাঙালি প্রতিষ্ঠান সেই সদনটি তৈয়ারি করিবার জন্য প্রচুর টাকাও নষ্ট করিল।

এখনকার যুগ কৃত্রিমতার যুগ। মানুষ পয়সার জন্য এখন সব-কিছু ব্যবহার করে, তাহার বাহিরে কিছু নহে। তাহারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ— আজকে আপনারা যাহাকে রবীন্দ্রসদন বলেন। যামিনী রায় মহাশয় একজন মহৎ শিল্পী। তিনি কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার শিল্পকে পৃথিবীবিখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে এক-এক সময় চমক লাগে, তাঁহার সুযোগ্যপুত্র সদনটির অঙ্গসজ্জার নামে বাহিরে যাহা করিয়াছেন তাহা দেখিলে লজ্জায় মাথা আপনিই নত হইয়া আসে। ভিতরে বাহিরে রবীন্দ্রসদন যা চেহারার রূপ লইয়াছে তা ঐ

শুধু শ্মশ্রুমণ্ডিত ভদ্রলোকের উপযুক্ত নহে ; এ কথা আমরা জোর গলায় বলতে পারি। রবিবাবু একজন অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারা অন্যপথে ধাবিত হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি সেই ভদ্রলোকের শুধু নামটুকুই ব্যবহার করা হইতেছে।

সত্যি কথা বলিতে কী, রবিবাবু আমাদের বাংলা ভাষার গতি দিয়াছেন। আমাদের কথাবার্তা নানারকম উল্টোচালের হইতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেষ কথা ছিলেন। তাঁহার পর বাংলা সাহিত্য সত্যই আগায় নাই। অন্যেরা আসিয়া নানা কথা বলিতে পারেন কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার পর আমরা একপদও আগাই নাই।

তাই— রবীন্দ্রনাথের নামে যাহা চলিতেছে তাহা কতদূর চলিবে তাহা আমাদের জানা দরকার। রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করিয়া আরো কত বেলেল্লাপনা চলিবে তাহা আমাদের বুঝা দরকার। আমরা সরাসরি প্রধান মন্ত্রীকে এই প্রশ্ন করিতেছি ইহাতে তাঁহার কতখানি সায় আছে? তাহাও আমাদের জানা দরকার।

এই ঘরটি খোলার পর কংগ্রেস সরকার মোটামুটি একটি আজ্ঞাধীন 'পরিচালনা বোর্ড' করিয়াছিলেন ; যাহা মন্দের ভালো ছিল। কিন্তু তাহার পর আমাদের শ্রীমান যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার ঐ সামান্য পরিচালক মণ্ডলী বাতিল করিয়া উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া (?) সেটিকে 'উপদেষ্টা পরিষদে' রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।

(কংগ্রেস সরকার 'পরিচালক কমিটি'র কার্যসূচী আমরা জানি ; আগেই বলিয়াছি মন্দের হইলেও ইহা মোটামুটি একটা কিছু হইলেও হইত, কিন্তু 'উপদেষ্টা পরিষদ' তো দেখিতেছি একমাত্র সদনটি ভাড়া ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার কথা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না।) তাহার পর শ্রীযুক্ত ধরমবীর মহাশয়ও সেই উপদেষ্টা পরিষদই বজায় রাখিয়াছেন।

হায়— (বলিতেও লজ্জা লাগে) রবীন্দ্রসদন শুধু মাত্র একটি ভাড়া বাড়িতে পরিণত হইয়াছে!

আমাদের জানা আছে, শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র মহাশয় বিভিন্ন দল লইয়া দেড় বছরের জন্য রবিবার ও ছুটির দিন মঞ্চটি ভাড়া চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাহা দেওয়া তো দূরের কথা ভদ্রলোককে একটি উত্তর দেওয়াও হয় নাই। ইহার আমরা তীব্র প্রতিবাদ করি।

ঘটনা পরম্পরায় মনে হইতেছে রবীন্দ্রসদন একটি জাতীয় কেলেঙ্কারি। ইহার আগা হইতে পাছা পর্যন্ত সমস্ত ভুল পন্থায় পয়সা নষ্ট করার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাকে ঠিক করিতে হইবে। তাহার জন্য আমরা সংগ্রামে প্রস্তুত। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্মৃতি স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, দেশকে জাগাইতেই হইবে ; এবং তাহার প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে মঞ্চ। কতকগুলি সরকারি চাকুরীয়াদের কথার ভিত্তিতে আমাদের দেশে মঞ্চ চলিবে ইহা ঘটিতে দেওয়া যায় না। এইখানে আক্রমণের একটি প্রশ্ন আছে। আমরা সেই আক্রমণ করিব। দেশ-মাতৃকার রাতুল চরণারবিন্দে এখনও আমাদের কিছু দিবার আছে। আমরা তাহা হইতে সরিব না। ইহা আমাদের মাতৃদেবীর প্রতি কর্তব্য। ভবিষ্যতে হয়তো আপনাদের কাছে আরো কিছু চিন্তাধারার প্রকাশ করিতে পারিব।

শ্রীযুক্ত ধরমবীর মহাশয় কথাগুলা যেন একবার ভাবিয়া দেখেন।

ফিল্ম সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র আমাদের হাতে আসিয়াছে। আপাতভাবে তাঁহারা সেন্সর বোর্ডের নিয়ম-কানুন কিছু বদল করিতে চাহেন, কিন্তু মোটামুটি দেখা গেল ইহারা

'চুম্বন' সম্পর্কে আতঙ্কিত অথবা ঈর্ষিত। চুম্বন দেখানো যায় কি না যায়, ইহা কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির চিন্তার বস্তু নহে, চিন্তার প্রশ্ন হইতেছে সত্যকারের সেন্সরের ব্যাপার। আমরা সেন্সর প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীতে। উদাহরণ দেওয়া যাক— সুইডেনে সেন্সর যখন উঠাইয়া দেওয়া হইল, তখন দেখা গেল যে অশ্লীল এবং অভদ্র ছবি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কদিনের জন্য যদিও বা করে তাহার পর উহার আকর্ষণ কমিয়া যায়। কারণ মানুষ দুই দিন এইসব অভদ্রতা দেখিবে, তাহার পর তাহাদের প্রকৃত ভালো জাগ্রত হইবে।

আসল কথা, রাজনৈতিক চেতনা মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার প্রধান মাধ্যম হইতেছে ছবি। দেশ যাহারা এখন পরিচালনা করিতেছেন তাহারা এইটিকে ভয় পান, তাই সেন্সর। তাই তাঁহারা এই সমস্ত কাগজপত্র লিখিয়া লোকদের দোরে দোরে পাঠাইতেছেন। আমরা এই সেন্সর বোর্ডের চিঠির তীব্র নিন্দা করি। ইহা করিয়া ভারতের চিত্রজগতে কিছুই ভালো করা যাইবে না বলিয়া অনুমিত হয়। করিতে হইলে একট সৃষ্টিভঙ্গিজনিত দৃষ্টি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা নইলে কিছুই হইবে না।

ইহার জন্য আমরা প্রস্তুত। কারণ, দেশমাতৃকাকে আমরা আজও ভুলিতে পারি না— পারা সম্ভবও নয়।

৪

শরতের নির্মল আকাশ হাসিতেছে। মা আসিতেছেন, আমাদের চিরকালের সেই দুর্গা, আমাদের মেয়ে বাঙালির প্রাণের বস্তু— তিনি আসিতেছেন।

— এই সব কথা আপনারা প্রচুর পড়িবেন। এই ধরনের ঘটনা প্রচুর চলিবে এবং আমরা, আপনারা তাহাতে আনন্দও পাইব। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতেছে মা নাই। মা ছিলেন। কিন্তু সে-যুগ গত হইয়াছে। এখন চোঙা প্যান্ট পরা কয়েকটি বালখিল্য বিকৃত উল্লাসে অভব্য আচরণ করিয়া বেড়ায় তাহাকে আপনারা বলেন দুর্গাপূজা। আমাদের শৈশবের যে স্মৃতি, তাহার সহিত আজকের এই অসহ্য কানফাটানো লাউডস্পীকারের আওয়াজ তক্ মেয়েদের মুখের লাল নীল রঙ— এ একদম মেলে না। মনে হয় অঙ্কে কোথাও একটা গরমিল হইয়াছে। আমাদের ধারণামতো মনে হয় দেশ বিভাগই ইহার মূল কারণ।

ইহারই ভিত্তিতে আজিকার অবক্ষয়ের একটি দিককে দেখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বাঙালিরা এই তথাকথিত স্বাধীনতার ফলে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারই ফলে দুই পাশে আমরা এইসব শিশুদের দেখি, যাহারা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে— অতীতকে না জানিয়া। ইহারা রাস্তায় ঘাটে অভদ্র আচরণ করিবে, নোংরামি করিবে, ইহা উহাদের দোষ নহে। যুগের দোষ, নেতৃত্বের দোষ। এই যে মাতৃপূজা আসিতেছে, ইহাতে এই ধরনের বালখিল্যদের প্রচুর বেলেল্লাপনা চলিবে, কিন্তু ইহাদের ক্ষমা করা উচিত। সম্পূর্ণ দোষ আমাদের, যাহারা এই তথাকথিত স্বাধীনতার প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে পারি নাই। আসল দুর্ঘটনাটি ২০ বছর আগেই ঘটিয়া গিয়াছিল। আজিকার দিনের কিশোর যুবকেরা ইহার কিছুই জানে না। ইহারা সোনার বাংলা দেখে নাই। কাজেই মা আসিতেছেন— এই কথাটি ইহাদের কাছে পরিহাসের মতো শুনাইবে। ইহারা বাংলা মাকে দেখে নাই। ইহারা জানেও

না যে ইহারা কী হারাইয়াছে।

সে কথা আমরা বুকে বহন করিতেছি। ইহার আর কোনো পরিত্রাণ নাই।

৫

শ্রদ্ধেয় নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারূপে প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ আপনার-আমার মনোরঞ্জন. করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু ভূমিকাই আমরা ভুলিতে পারি নাই ; বিশেযত কর্ণার্জুন-এ শকুনির অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সে অপূর্ব অভিনয় কখনোই ভুলিতে পারিবেন না। শিশিরবাবু, দুর্গাদাসবাবু, নরেশবাবু যখন অভিনয় করিতেন, তখন একটি অপরূপ নাট্যকলার সৃষ্টি হইত। সে যুগ আর নাই। সে যুগের মানুষগুলো কেমন যেন আজকে হারাইয়া গিয়াছেন। এ কথা ঠিক নাটকের গোড়া এবং শেষ হইল অভিনেতা। তাঁহাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান দিবার প্রশ্ন আছে। যাহা আমরা আজিও দিতে পারি নাই। নরেশবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ইহার বেশি কিছু বলিবার আমাদের নাই। তাঁহার আত্মা গত হইয়াছে, তাহার জন্য আমরা পরিপূর্ণ শোক প্রকাশ করিতেছি। শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি তাঁহার আত্মা শান্তি লাভ করুক।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে-সব বিভিন্ন ধরনের নাট্যক্রিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা কোনো কারণে আমাদের শ্রদ্ধা জাগ্রত করে নাই। তাহার প্রধানতম কারণ হইতেছে নাটকগুলি, যেগুলিকে সম্মান দিবার মতো কোনো অবস্থা আমাদের জাগ্রত হয় নাই। টমাস বেকেট অথবা 'জাঁ আনউইল' ইঁহাদের নাটক আমরা মোটামুটি পড়িয়াছি, কিন্তু ইঁহাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজেদের জড়িত করিতে পারি নাই।

'অ্যাবসার্ড ড্রামা' কাহাকে বলে? ইহার কোনো উত্তর (সঠিক) নাই, কারণ ঘটনাটার মধ্যে কোনো সার্থকতা নাই।

শিল্প সর্বসময়ে মানব-আশ্রিত, মানুযকে ধরিয়াই শিল্প বাঁচে। এই অতি সাধারণ কথা ভুলিয়া যাঁহারা নাচানাচি বা মাতামাতি করেন, তাঁহাদেরকে অতি বিনীতভাবে 'ইসকাইলাস' 'সোফোক্লেশ', 'আরিস্তোফানিস', 'মলিয়ের', 'স্ট্রীন্ডবের্গ', 'চেকভ', 'গর্কি', 'হাউফ্‌ম্যান', 'পিরানদেল্লো', ইত্যাদি ব্যক্তিদের কথা শুনাইব। আশা করি, এই সমস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আপনাদের খানিকটা ধারণা আছে। আপনারা যাঁহারা আজিকে নাট্যচর্চা করিতে আছেন, তাঁহারা মানবজীবনের দিকে ফিরিবেন, ইহা একান্ত কাম্য।

সর্বশিল্পীর শেষকথা মানুষকে ভালোবাসা। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ম্যাক্স রাইনহার্ডও করিয়াছিলেন, তাঁহারও ইতিহাস লিখিত আছে। 'আঁদ্রে আতোয়া' হইতে আরম্ভ করিয়া কন্‌স্টানটিন্ স্ট্যানিস্লাভস্কির মধ্য দিয়া অটো ব্রাহমের ইতিহাসও আমরা ভুলি নাই। কিন্তু সর্বস্তরেই একজায়গায় পৌঁছোনো গিয়াছে, সেটি মানুষকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার প্রচণ্ড অভাব দেখিতেছি আজিকালকার নাটকের তোড়ে। ইহাদের শিক্ষিত হওয়া দরকার। নহিলে সব বরবাদে যাইবে। আমাদের কথা হইতেছে, শিল্পকে সর্বসময়ে মানুষনির্ভর হইতে হয়, তাহার বাহিরে কোনো শিল্পসত্তা গ্রহণ করা আজিকার দিনে অসম্ভব।

বাংলার ছবি চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র-নির্দেশক হিসাবে তপন সিংহ ('হাটেবাজারে'), পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায় ('চিড়িয়াখানা') ও শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্যে উত্তমকুমার ('চিড়িয়াখানা' ও 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি') এই সম্মান পাইয়াছেন। এই সম্মানের জন্য আমরাও সম্মান বোধ করিতেছি, এবং অকুণ্ঠচিত্তে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি। বাংলা ছবির সামগ্রিক মান যাহাই হউক-না-কেন, চলচ্চিত্র-কলাকুশলীদের প্রাপ্তিযোগ যাহাই হউক-না-কেন, প্রযোজক পরিদর্শক-দর্শক কুলের অহিনকুল সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা যাহাই হউক-না-কেন— এই সম্মানজয়ে আমরা যথার্থই পুলকবোধ করিতেছি। এই জাতীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতার বিচারক যাঁহারাই হউন-না-কেন, তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞানবোধ, রুচিবোধ ও সর্বোপরি রসবোধের তারিফ না করিয়া পারা যায় না। তাঁহাদের এ যাবৎকালের ক্রিয়াকলাপ যতখানি ধন্যবাদার্হ হইয়াছে এবারকার বিচার তাহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। এ-জাতীয় পুরস্কার যতই বাড়িবে, উৎসাহও ততই বাড়িবে— বাংলা ছবির মান দ্রুত হইতে দ্রুততর শ্রীবৃদ্ধির পথে ধাবমান হইবে। আমরা সেই ধাবমান প্রাণগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া কৃতার্থবোধ ছাড়া আর কিছুই করিতে পারি না।

চলচ্চিত্রের ন্যায় নাট্যক্ষেত্রেও বাংলার দুই প্রখ্যাত ব্যক্তি সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। সংগীত নাটক আকাদেমি কর্তৃক সর্বভারতীয় 'অ্যাওয়ার্ড' সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন নাট্যকার শ্রীবাদল সরকার এবং প্রখ্যাত লোক (যাত্রা)-শিল্পী শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়।

অবশ্য আরও বহু আগে শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই সম্মান পাওয়া উচিত ছিল। এতদিনে আকাদেমি কর্তৃপক্ষ এই প্রবীণ শিল্পীকে জাতীয় সম্মানে ভূষিত করিয়া নিজেদের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, ইহাই লাভ।

শ্রীবাদল সরকার এবং শ্রীফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদের এই সম্মানে আমরা যুগপৎ গর্বিত ও আনন্দিত। ইঁহাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

৬

এককালে আমরা শিশিরকুমারের সান্নিধ্য পাইয়াছিলাম। তিনি একবার নিভৃতে আমাদেরকে বলিয়াছিলেন— "এদেশের শিল্পীর শেষ পরিণতি হইতেছে পথকুক্কুরের মৃত্যু।"

কথাটি আমরা আজও ভুলি নাই। শিল্পীর মৃত্যু এদেশে পথকুক্কুরের মতোই হয়। স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও তার কোনো প্রতিকার হয় নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদেরকে দু-এক টুকরা পাঁউরুটি ছুড়িয়া ফেলা হয় যাহাকে বলা হয় জাতীয় পুরস্কার। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান হইল সংগীত নাটক আকাদেমি, আর একটি হইল তথাকথিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার। এই ঘৃণ্য ঘটনার একটা সীমা থাকা উচিত এবং তীব্র প্রতিবাদের একটি প্রশ্ন আছে। ইহাকে বিশ্লেষণ করা যাক।

এইবারকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার যাহা শ্রীশচীন দেববর্মনকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা

হইতেছে 'পদ্মশ্রী'। শচীন দেববর্মন গুণী লোক তাই তিনি নিশ্চুপ থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতন মহৎ শিল্পীকে এ জাতীয় পুরস্কার দেওয়া অপমানের চূড়ান্ত। যেখানে পুরস্কৃত তালিকায় অতি সাধারণ স্তরের ব্যক্তিরা— যাহাদের কোন শিল্পীসত্তা নাই, তাহাদেরকে আদর করা হয়। সেইখানে শচীন দেববর্মনের মতো মহাগভীর শিল্পীকে একই পঙ্‌ক্তিতে অথবা তাহার নীচে ঠেলিয়া যে চরম ধৃষ্টতা দিল্লির আমলা এবং উহাদের পিছে কলকাঠিনাড়ার ব্যক্তিবর্গ দেখাইল তাহার তীব্র প্রতিবাদ আমরা করি।

আর-একটি উদাহরণ দেখাইতেছি। এটি সংগীত নাটক আকাদেমি সম্বন্ধে। আজ পর্যন্ত ইঁহারা ভারতবর্ষের গণ-নাট্যের নতুন যুগের যিনি মহানায়ক এক প্রকার স্রষ্টাই বলা যাইতে পারে সেই বিজন ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাঁহাদের নজরেই পড়ে নাই। অথচ বেশ-কিছু মূষিক সম্মান এবং অর্থ লাভ করিল। ইহার পিছনে ষড়যন্ত্র আছে, তাহার কিছু কিছু আমাদের জানা আছে। ব্যক্তিগত নাম করিয়া লাভ নাই। কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিরা যতদিন আমাদের ধারক ও বাহক হইবেন, ততদিনে ভারতবর্ষ কোথায় গিয়া পৌঁছাইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ইহা দেখিয়া হাসিও পায় কান্নাও আসে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান নাটকগুলিকে বিচার করিতে হইবে। মনে হয় ইহারা সম্পূর্ণ মেকী এবং কৃত্রিম। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা করার মতো কোনো সহানুভূতি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদের বক্তব্য— মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকিলে তাহা শিল্প বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, বর্তমানে যাহা দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখিবার চেষ্টা করে বলিয়া মনে হয় না। এইগুলিকে শিল্প বলিয়া অভিহিত করিবার স্পৃহা আমাদের নাই। এগুলিকে করুণা করা উচিত।

আমাদের বক্তব্য হয়তো কিছু কঠোর, কিন্তু ইহাই সত্য।

বাংলাদেশে এ দেশীয়রা আবার প্রমাণ করিলেন যে এদেশ এখনও মরে নাই। ইহা শিল্পের পক্ষে এবং শিল্পীর পক্ষে মহা উৎসাহব্যঞ্জক। যাঁহারা আমাদের মাথার উপর গদিতে আসীন হইয়াছেন, তাঁহারা বিধাতা নন, বিধাতা জনতা। তাহাদের মধ্য দিয়াই মাত্র জনতার রায় প্রকাশ পাইতেছে। শিল্পের মধ্যে নাটক একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী মাধ্যম, যাহাকে তাঁহারা ১৯৪৪ সাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন নিজেদের কাজে। অথচ সেই নাটকই পরম অবহেলিত এদেশে। রবীন্দ্রসদন তো একটি চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি হইয়া রহিল— জানি না তাঁহারা এবিষয়ে কী ভাবিতেছেন বা করিবেন।

জন্তুদের মধ্যে একমাত্র মানবই রুচিবোধ লইয়াই জন্মায়। শুধু পেটেব ভাতের চিন্তা করিলেই তাহার চলে না, মনের খোরাকও লাগে।

নেতারা যেন কথাটি মনে রাখেন।

৭

আমাদের এক বৎসব পূর্ণ হইল। এটি-ই অভিনয়-দর্পণের বর্ষ-পূর্তি সংখ্যা। এই সব পত্রিকাকে সাধারণত আগাছা বা ব্যাঙের ছাতা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। আমরা আমাদেব এক বৎসরের জীবন দ্বারা প্রমাণ করিলাম যে, ইহা সত্য নহে। আমরা এখনও

আগাইয়া যাইতেছি, সম্ভব হইলে আরো আগাইয়া যাইব।

গত এক বৎসরের সালতামামি করা আমাদের পক্ষে শোভন নহে। তবুও সামান্য কিছু বলিবার অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। যেমন রবীন্দ্রসদন প্রসঙ্গে। ইহা লইয়া আমরা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছিলাম এবং তাহার ফলে সামান্য কিছু সু-লক্ষণও পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখনো রহিয়া গেল। মফস্‌সলের নাট্যসংস্থাগুলির প্রতি যে ঔদাসীন্য তথাকথিত কলিকাতা মহানগরীর নাগরিকদের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার তীব্র নিন্দা আমরা আগেও করিয়াছি, ভবিষ্যতেও করিব। এই সম্বন্ধে সজাগ হইবার সময় আমাদের আসিয়াছে। কলিকাতা শহর বাংলাদেশ নহে। আমরা আরো চাই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভদ্র লেখা এবং শিল্পোত্তীর্ণ লেখা। বাংলা নাটকের বাঁচিবার তথা পরিপূর্ণ বিকাশ হইবার পথ এই দিকেই। আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছি, বাংলার কোণায় কোণায় যে-সব শিল্পী কর্ম-প্রচেষ্টায় ব্যস্ত আছেন তাঁহাদের কাছ হইতে লেখা পাওয়ার। এজন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

আমাদের এই পত্রিকাটি কোনো গোষ্ঠীভুক্ত নহে। সেইজন্যে কর্তৃপক্ষের স্পষ্টকথা বলিবার সাহস আছে। একই কারণে এই পত্রিকার লেখকদেরও সাহস থাকিবার কথা। কোনো কোনো স্পষ্ট কথায় কোনো দল, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যদি কুপিত বোধ করেন তাহা হইলেও কিছু করিবার নাই। সময়ই এই রোগের চিকিৎসা কবিবে— আমাদের কিছু করিবার নাই।

সংবাদপত্রে সকলেই দেখিয়াছেন যে, দেশে এক নতুন হাওয়া আসিয়াছে। আমরা এখনো এই হাওয়ার পরশ পাই নাই। যেদিন পাইব সেদিন দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া নৃত্য করিব। ততদিন আশায় আশায় অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। সেই শুভদিন আমাদের জীবনে দীর্ঘদিন বিলম্বিত না হইলেই ভালো।

৮

একটা সালতামামির প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিক হইতে আমাদের ভাবিতে হইবে যে বাংলার নাট্য আন্দোলন কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে। চিত্রজগতের অবয়ব তো ভয়াবহ। সর্বসাকুল্যে যা চেহারার রূপ লইয়াছে তাহাতে শ্রদ্ধা করিবার মতো কিছুই নাই।

উৎপল দত্ত মহাশয়ের তো দেখিতেছি আর কোনো আনন্দ সংবাদ নাই। যা শোনা যাইতেছে তা গুজবে পরিণতি লাভ করুক এই আশাই পোষণ করা ভালো। শম্ভু মিত্র মহাশয়ের অবস্থাও ঠিক বোঝা যাইতেছে না। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সম্মিলিতভাবে একটা ভালো কিছু করিবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু বর্তমান ডামাডোলে ব্যাপারটা কত দূর গড়াইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও আমরা দেশবাসী আশায় রহিলাম।

তবুও এই বাংলাদেশ— তাহার অপূর্ব সুন্দর নীল আকাশ লইয়া, তাহার খণ্ড খণ্ড মেঘেদের অভিযান লইয়া যে যাত্রা নিরন্তর করিয়া যাইতেছে, তাহা তো কোনোদিন ক্ষয় হয় নাই।

বাংলাদেশ চাষীর দেশ। ইহার যে প্রাণ-আহরণের ক্ষমতা আছে তাহা তো ছাড়িয়া

যাইবার কোনো অবকাশ নাই। অনুবাদ-নাটকে এই জীবনগাথা গ্রহণ করিবার কোনো ক্ষমতা কাহারও নাই।

তাই আমাদের বক্তব্য এইসব মেকি জিনিস ছাড়িয়া, মানুষের শামিল হউন, এইসব 'সস্তাদরে কিস্তিমাৎ' করিবার ব্যাপার বন্ধ করিয়া ধ্যান-নিমগ্ন হউন। মানুষকে ভালোবাসা হইতেছে সর্বশিল্পে গভীরতম প্রশ্ন। তাহার পরে শিল্পের বিকাশের জন্য আঙ্গিককে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্ব হইলে চলিবে না। প্রধান প্রেরণার উৎস হইতে সরিয়া গেলে চলিবে না।

আশা করি 'নাট্য আন্দোলন' অথবা চিত্র আন্দোলনের হোতাগণ ইহা মনের নিভৃত কোটরে জমাইয়া রাখিবেন।

কারণ ইতিহাস কখনো কাহাকেও ক্ষমা করে না। তাহার উদ্যত খড়্গ যথাসময়েই নামিয়া আসে। ইহার প্রমাণ আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। অতএব।

৯

শারদ-সংখ্যায় 'মা আসিতেছেন' বলিয়া এক স্তম্ভ সম্পাদকীয় লিখিবার একটি সাংবাদিক প্রথা আছে। শারদসংখ্যা প্রকাশও একটি শারদীয় প্রথা। গতবার এই প্রথা রক্ষা করিতে আমরা অবক্ষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম যাহার জন্ম একুশ বছর আগে। এবার আর অবক্ষয়ের কথা বলিব না— কারণ নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। 'তাসের দেশ'-এর নিয়মের মতো 'মা আসিতেছেন' যেমন বাঙালি জীবনে নিয়মে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অবক্ষয়ও তেমনি যেন একটি নিয়ম— ইহার ব্যত্যয় হইবার জো নাই। কাহাকে দোষ দিয়াও লাভ নাই।

সুখবর ঝুটা হইলেও আপাত ভালো। চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার সম্ভাবনা সুখবর না হইলেও একটি সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। ছুচিবাই হইতে মুক্ত হইতে অনেকদিন সময় লাগিয়াছে— দেরিতে হইলেও এই সম্ভাবনাকে স্বাগত জানানো উচিত।

যদিও প্রামাণ্য খোসলা কমিটির রিপোর্ট জনসাধারণ্যে এখনো প্রকাশিত হয় নাই তবুও ইহার বয়ান লইয়া নানা বাকবিতণ্ডা শুরু হইয়া গিয়াছে। চুম্বন ও নগ্নতার পক্ষে ও বিপক্ষের মতামত অশ্লীল সাহিত্যের মতোই মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। এই মতামত সহ্যের সীমা অতিক্রম করাতে স্বয়ং জাস্টিস খোসলাও শেষ পর্যন্ত আসরে নামিয়াছেন— বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই অভিমত ('আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকায় যাহা দেখিয়াছি) সমস্ত তিক্ততার ও আশঙ্কার নিরসন করিবে বলিয়া মনে হয়। যথার্থ শিল্পীব রঙের তুলিতে যাহা নয়নাভিরাম, শিশুর হাতে তাহা খেলার সামগ্রী, অপটু শিল্পীর হাতে তাহাই অস্পষ্ট। আমরা খোসলা কমিটির এই অভিমতকে স্বাগত জানাইতেছি।

পশ্চিমবাংলায় অক্টোবর মাসে এবার উৎসবের আসর বসিতেছে। ঢাক পিটাইয়া এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে— কোনো কোনো সংবাদপত্রে তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকাটি অসম্পূর্ণ। কলিকাতার কয়েকটি নিয়মিত মঞ্চের বালসুলভ একাঙ্ক বা পূর্ণাঙ্গ নাটকের নাম ইহাতে নাই।

৩

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ

পশ্চিম বাংলা

মূলনীতির খসড়া

প্রাদেশিক খসড়া প্রস্তুতি কমিটি

প্রাদেশিক খসড়া কমিটির বক্তব্য

গণনাট্য সংঘের মূলনীতির খসড়া প্রণয়ন করার জন্য গত ১২ই মার্চ যে পশ্চিম বাংলা প্রাদেশিক খসড়া প্রস্তুতি কমিটি নির্বাচিত করা হইয়াছিল সেই কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়াটি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইল।

গণনাট্য সংঘ শিল্পীদের সংগঠন। এই খসড়া মারফত দেশের সকল স্তরের শিল্পীদের কাছেই গণনাট্য সংঘের আবেদন পৌঁছাইয়া দেওয়া হইতেছে। অতএব ভাষা এবং প্রকাশ-ভঙ্গি শিল্পীর প্রতি শিল্পীর সম্ভাষণের মতো করিয়াই ব্যবহার করা প্রয়োজন বলিয়া খসড়া প্রস্তুতকারীগণ মনে করেন।

গণনাট্য সংঘের ইতিহাসে এইভাবে মূলনীতির খসড়া প্রস্তুত করা এই প্রথম। এই খসড়া প্রস্তুতকল্পে প্রস্তুতকারীগণ একটি প্রশ্নাবলী প্রচার করেন। প্রশ্নাবলীটির জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার জন্য তাহা সাধারণ্যে আশানুরূপ সাড়া জাগাইতে পারে নাই। তথাপি মোট ১১টি প্রশ্নোত্তরেব মধ্যে জেলাগতভাবে চারিটি জেলা যথা কলিকাতা (আংশিকভাবে), ২৪ পরগনা গ্রামাঞ্চল, ব্যারাকপুর (আংশিক) ও আসানসোল অংশগ্রহণ করেন। ইহা ব্যতীত কয়েকটি স্থানে আলোচনা হইলেও লিখিত প্রশ্নোত্তর পাওয়া যায় নাই। হুগলী জেলা একটি পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করিতেছিলেন, পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেন। কলিকাতার তিনটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রশ্নোত্তর পাঠান। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলা চলে যে বর্তমান খসড়াটিতে সাধারণের কিছুটা অংশগ্রহণ আছে। ইহা ব্যতীত প্রস্তুতকারীগণ বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। সর্বোপরি গণনাট্য সংঘের অতীতের সকল খসডা বা ঘোষণাপত্র এবং অন্যান্য প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানের ঘোষণাপত্র প্রস্তুতকারীগণ বিশেষভাবে অনুধাবন কবেন। সেই সকল অভিজ্ঞতাকে একত্র করিয়া প্রস্তুতকারীগণ কলিকাতা গণনাট্য সংঘের ঋত্বিক ঘটককে খসডাটি লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার রচনাটিই বদবদল করিয়া বর্ধিত খসড়া প্রস্তুতি কমিটি গ্রহণ করেন।

বর্তমানে খসড়াটিকে নির্ভুল মনে করা উচিত হইবে। প্রস্তুতকারীগণ আশা করেন যে এই খসড়াটিকে ভিত্তি করিয়া যে ব্যাপক আলোচনা ও গঠনমূলক সমালোচনা হইবে তাহার ফলেই একটি নির্ভুল নীতি নির্ধারিত হইবে।

গণনাট্য আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ে আজ গণনাট্য সংঘের ও সকল প্রগতিকামী শিল্পীদের মধ্যে আত্ম-জিজ্ঞাসা শুরু হইয়াছে। দেশের মাটি ও অতীত ঐতিহ্যের সহিত গণনাট্য আন্দোলনের যোগাযোগ ; মুক্তি ও প্রগতির পথে জগতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মানবতামুখী ধারার সহিত আমাদের সম্বন্ধ ; দেশের সাংস্কৃতিক দৈন্য ঘুচাইবার পথ কী ; নগর ও গ্রামের প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন ; গণশিল্পের রূপ ও প্রচলিত শিল্পের প্রতি তাব মনোভাব ও সম্বন্ধ ; দেশের সকল প্রগতিকামী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত গণনাট্য সংঘের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আজ বারবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে।

দেশের সামগ্রিক সংস্কৃতি আন্দোলনের পটভূমিতে এই সকল প্রশ্নকে যথাযথ স্থানে বসাইয়া প্রত্যেকটি বিষয়ে গণনাট্য সংঘের নীতি স্থির করার প্রচেষ্টা হইয়াছে। সেইজন্য খসড়াটির কলেবর একটু বৃদ্ধি পাইয়াছে। খসড়া প্রস্তুতি কমিটি আশা করেন যে ব্যাপকতম আন্দোলনের পথে এই খসড়াটি সার্থকতা লাভ করিবে। ইতি,

৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা
১।৬।৫১

সুরপতি নন্দী
গণনাট্য সংঘের
প্রাদেশিক খসড়া প্রস্তুতি কমিটির পক্ষে

মূলনীতির খসড়া

(প্রাদেশিক খসড়া প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক রচিত)

১। গণনাট্য সংঘ জনগণের ব্যথা-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শিল্পের মাধ্যমে রূপ দেয়। দেশের জনগণের সর্বাপেক্ষা অধিক অংশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল করাই গণনাট্য সংঘের পরমতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে স্থির রাখিয়াই সে তাহার সর্ব শিল্প-কর্মকে নিয়োজিত করে। জনগণই হইল গণনাট্য সংঘের নায়ক।

গণনাট্য সংঘ আশা করে দেশের সাংস্কৃতিক রূপকে বদলাইয়া সে এমন এক ভারতবর্ষের জন্ম দিবে যেখানে মানুষ হইবে স্বাধীন, সুখী ও সমৃদ্ধ ; সংস্কৃতি ভারতের সর্বমানবের সম্পত্তি হইবে।

গণনাট্য সংঘ জানে অতীতে বার বার স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের এই গণতান্ত্রিক ইচ্ছা সংস্কৃতির মধ্যে দেখা দিয়াছে। সেই সংগ্রামী জাতীয় ঐতিহ্যকেই সংগঠিত ভাবে তাহার যুক্তিযুক্ত পরিণতিতে লইয়া যাওয়া গণনাট্য সংঘের কাজ। দেশের মাটির সহিত তাহার অচ্ছেদ্য যোগ থাকার গৌরবের কথা সে ঘোষণা করিতেছে। এই ঐতিহ্যকে টানিয়া লইয়া গিয়া বিশ্বমানবের প্রগতির ধারার সহিত মিলাইয়া দেওয়া সে তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, ছোট ব্যাবসাদার প্রভৃতিদের দ্বারাই আজ দেশের অগণন জনতা সংগঠিত। ইহারাই দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক অংশ। ইহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে সব অতীতমুখী ও বিজাতীয় ভাবধারা কাজ করিতেছে ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইহাদের পরিপন্থী হইতেছে— গণনাট্য সংঘের শত্রু তাহারাই। সে জানে দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাহার কাজের সহায়।

এই আদর্শকে ভিত্তি করিয়া ১৯৪৩ সালে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ সৃষ্ট হইয়াছে এবং দেশের সাংস্কৃতিক মুক্তিচেতনাকে প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।

বাংলার সংস্কৃতির পরিণতি :

২। দুই শত বৎসরের বিদেশী শাসন ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে কুঠারাগাত করিয়াছে। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের আজ যে সাংস্কৃতিক দৈন্য যে মানব বিমুখতা দেখা দিয়াছে তাহা এই শাসননীতিরই প্রত্যক্ষ ফল।

লোক-সংস্কৃতি :

৩। আজ নিদারুণভাবে বাংলার গ্রামে গ্রামে ইহারই ফল প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। নদীমাতৃক বাংলা, যাহার গ্রামকেন্দ্রিক সু-য়ে কু-য়ে মিশ্রিত সমাজ বিন্যাস এমন একটা অবস্থায় আসিতে সক্ষম হইয়াছিল, যাহার ফলে গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের তীরে তীরে অপরূপ লোক-গাথা-লোককাব্য ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। কাঞ্চনমালা-মহুয়া-কঙ্কাবতীরা সুরে সুরে দেশকে ছাইয়া দিয়াছিল, জারী-সারী-ভাওয়াইয়া-জিগীর-ভাটিয়ালী-বাউল-কীর্তন জনতার

কর্মক্লান্ত অবসরকে রঙে রসে ভরিয়া তুলিয়াছিল,— সেই মহা সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতি তাহার আদিম ঋজু সৌন্দর্যকে হারাইয়া কোনোরকমে শেষ শ্বাস টানিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে। বর্তমানকে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। সে তাই ভাবগত ভাবে বার বার পশ্চাতের দিকে মুখ ফিরাইল নিজের সার্থকতা খুঁজিতে। তাই সে বহু স্থলে অতীতের মধ্যে, সামন্তিকতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করিল। একদিন যাহা জীবনের গভীরে শিকড় গাড়িয়া ছিল, আজ সে জীবন পিছনে ফেলিয়া আসিলেও শুষ্ক শিকড়গুলি নাগপাশের বন্ধনের মতো সেই মৃত যুগকে টানিয়া আনার চেষ্টা করিতেছে এইজন্যই।

৪। তবু,— বার বার জীবন লোক-সংস্কৃতির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা দেখি, ধর্মমূলক অজানা বৃন্দাবন-মথুরাপুরীর বর্ণনা-সংক্রান্ত কীর্তনে বার বার রচয়িতার পারিপার্শ্বিক ও নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়, বিভিন্ন চিরাচরিত কাঠামোর মধ্যে বিষয়বস্তু থাকিয়া থাকিয়াই দেশজ হইয়া উঠে। যে সমাজে অনুষ্ঠানে-উপলক্ষে-মাধ্যমে সনাতন ধর্ম এবং সামন্তসুলভ সম্পর্ককেই প্রধান স্থান দেওয়া হয়— সেখানেও রহিয়া রহিয়াই লোক কাহিনী ও লোক গৌরব নিজেদের প্রকাশ করে ও একটি বলিষ্ঠ পুষ্ট খাঁটি বাঙালি দিনগত জীবন পরিষ্কার হইয়া উঠে। অর্থাৎ জীবন এইসব পিছুটানকে এড়াইয়া বার বার নিজেকে জাহির করে। এই হইল লোক-সংস্কৃতির মহা বিজয় গৌরব।

এমনটি আসিল কোথা হইতে? লোক-সংস্কৃতির কাছে কোন্ রক্ষা কবচ ছিল?

তাহার সহজাত কুণ্ডল ও কবচ তাহার নিজের কাছেই ছিল। লোক-সংস্কৃতি দুটি প্রেরণার উৎসের এত কাছে বাস করে যে তাহার এড়াইবার কোনো উপায় নাই।

প্রথম উৎস হইল জনতা। লোককবি ও লোকসাহিত্য দুটিই সমাজের সর্বাপেক্ষা বেশি লোকের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া বাস করিতেছে। দিন নাই-রাত নাই, এই মানুষগুলার অপরিসীম ক্লেশ ও অসীম মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখিয়া আর বাস্তব হইতে মুখ ফিরাইতে পারে নাই।

দ্বিতীয় উৎসটি হইল প্রকৃতি। বাংলায় যে প্রকৃতির পটভূমিতে এই মানুষেরা খাটে এবং উপায় করে, সে এক বিচিত্র পদার্থ। এই এতটা বড়ো তাহার দিগন্তলীন ব্যাপ্তি তাহার নদীগুলি ক্ষীরস্রোতা, তাহার মাটির বিশেষ গন্ধটি শিশুর গায়ের গন্ধের মতোই নামগোত্রহীন এবং তাহারই মতো দুর্বার বেগে হৃদয়জয়ী। লোককবির চেতনাকে ইহারা বড়ো বেশি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। হাজার চেষ্টা করিলেও তাই যমুনার ছবি আঁকিতে গেলে পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র আদর্শ হইয়া উঠে, শ্রীরাধিকা বার বারই বাঙালি ঘরের বধূর সহিত মিলিয়া যান, আগমনী ও বিজয়ার গাথায়-গানে বাংলা সমাজের বাল্য-বিবাহ ও কন্যার বিচ্ছেদকাতরতা বড়ো মধুর ভাবে রণিয়া ওঠে।

এই ধাপ হইতে এক পা আগাইয়া এই সংস্কৃতি মানুষের দুঃখের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে নানারূপে লোকসমাজে ছড়াইয়া দিয়াছে। পরবর্তীকালে বিদেশি ঔপনিবেশিকদের অত্যাচার লোক-সংস্কৃতির ঘৃণার এবং রাগের বস্তু' হইয়াছে।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

৫। গণনাট্য সংঘ তাই হাজার হাজার নামগোত্রহীন এই সব জাতীয় কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমগ্র লোক-সংস্কৃতিকে জাতীয় জীবনের ব্যথা-বেদনা-আশাকে মূর্ত করার প্রধান পন্থা হিসাবে ব্যবহার করিবে এবং এই ঐতিহ্যকে উন্নত স্তরে লইয়া যাইবে। এই সব পূর্বসূরীদের অজ্ঞাতবাস ঘুচাইয়া তাহাদের রচনারত্নগুলিকে দেশময় ছড়াইয়া দিবে। বর্তমানের অন্ধকারে পড়িয়া থাকা লোককবিদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তলে যাইবার ব্যূহভেদ কৌশল তাঁহাদের কাছ হইতে শিখিবে ও তাঁহাদের উৎকর্ষতা লাভের পথে সহায়তা করিবে। এইভাবে তাঁহারা গণনাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইবেন।

নাটক :

৬। নাটক শহরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং দেশের মানুষের বাঁচিবার বাসনাকে ভাষা দিয়াছে। এই নাটকের জন্ম শহরে, বিশেষত কলিকাতায়। যদিচ হিন্দুযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক পুষ্ট ধারার এটিও একটি ছিল, এবং তাহার পর হইতে ইহার সংস্কৃত রূপ ক্রমশ বহিরাক্রমণের মুখে লোকায়ত রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রাকৃত অপভ্রংশের মধ্য দিয়া আসিয়া এবং অন্যান্য লোকরীতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাত্রা, পালাগান, তরজা, গম্ভীরা ইত্যাদি সাজিয়া আজিও বহমান, তবুও যখন নূতন করিয়া নাটক জন্মাইল, তখন এই স্রোতধারাকে অস্বীকার করিয়াই জন্মাইল। এবং আজও প্রায় অস্বীকার করিয়াই আসিতেছে এবং নিজের প্রভাব লোকনাট্যের মধ্যে বিস্তার করিয়া দিয়াছে খানিক পরিমাণে।

এই শহুরে নাটকের উৎস কোথায়?— বিদেশে। পৃথিবীর অন্যান্য অগ্রসর দেশের, বিশেষত ইংলন্ডের, যে বলিষ্ঠ নাট্যধারা, তাহাকেই অনুসরণ করিয়া ইহা বাড়িল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা এদেশের আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করিল না। জাতীয় সচেতনতায়, বিশেষ করিয়া নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, ইহার অবদান অপরিসীম। এবং জাতি যখনই বৈদেশিক অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা তাহার সহগামী হইয়াছে। মাইকেল, দীনবন্ধুর নাটকসমূহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত তাহার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের চেষ্টা করিয়াছে।

কিন্তু, সেইসঙ্গে শহরের বুকে বসিয়া, বিদেশি বণিকের ভ্রূকুটির নীচে থাকিয়া ও দেশি সামন্তদের অর্থগত চাপে পড়িয়া নিজের ভূমিকা তাহাকে বার বার বিসর্জন দিতে হইয়াছে। এবং যে দেশের শ্রমিক, কৃষক, নিম্নবিত্তের সহিত তাহার কোনোদিনই নাড়ীর যোগ ভালো করিয়া হইল না, তাহাদের বিদ্রোহের রূপ দিতে গিয়া সে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতিপন্ন হইল। গণচেতনার বিরাট জাগরণ তাহার অপ্রশস্ত বুকে স্থান করিতে পারিল না। আজ যে যুগের দাবি বার বার ঘোষিত হইতেছে, মঞ্চ দেখিল তাহার গলায় অতবড়ো ভাষা নাই। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, আজ তাই মঞ্চ ক্ষয়িষ্ণু, অত্যন্ত অপকৃষ্ট সামন্তবাদী চিন্তাধারার মধ্যে আবর্তমান, সমাজের ও জীবনের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী হইয়া পড়িতেছে। শরৎচন্দ্রের

ও অন্যান্য সমাজসচেতন শিল্পীর রচনাও পেশাদার মঞ্চের এই আবহাওয়ায় প্রযোজিত হওয়ায় সামাজিক মূল্য হারাইতেছে। এই অবস্থার ফলে এবং গত দশ বৎসরের গণনাট্য আন্দোলনের ফলে মঞ্চের বন্ধ্যাত্ব আজ প্রকট হইয়া পড়িতেছে। তাই, বহু পেশাদারী ও অপেশাদারী শিল্পীগোষ্ঠী, নূতন নূতন সমাজসচেতন নাট্যকার আজ নাটকের সামাজিক ভূমিকা বলিষ্ঠভাবে টানিয়া লইয়া যাওয়ার প্রতিজ্ঞা লইয়া গণনাট্য আন্দোলনের শিবিরে সমাবিষ্ট।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

৭। এই যে শহরে মঞ্চের বলিষ্ঠ জীবনবাদী ধারা, তাহাকে টানিয়া বাহির করিয়া তাহার বিকৃত প্রযোজনার রূপ ঘুচাইয়া সামাজিক মূল্যটিকে জনসমক্ষে তুলিয়া ধরা কর্তব্য। অপর কর্তব্য হইতেছে দেশের মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি দিয়া যে আদিম ধরা যাত্রা, পালাগান, গম্ভীরা, কবিগানের মধ্য দিয়া কোনোমতে টিকিয়া থাকার চেষ্টা করিয়াছে ও আজ একেবারে সামন্তবাদী ভাবধারার বাহক হইয়া পড়িতেছে তাহাকে জীবনবাদী বিষয়বস্তুর সাহায্যে পরিপূর্ণ মর্যাদার আসনে বসাইয়া দেওয়া এবং নূতন ধারার প্রবর্তন, যাহা এই শহুরে নাটক ও গ্রাম্য যাত্রার সুফলগুলি আহরিত করিয়া নতুনতর মাধ্যমের প্রবর্তন করিবে।

শহরের গোষ্ঠীগুলির কর্মধারা গণনাট্য সংঘের পরিপোষক এবং তাহার অভিনন্দনযোগ্য। এই অভিনন্দনকে কার্যে রূপ দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার পন্থা কার্যসূচীতে লওয়া প্রয়োজন।

সংগীত :

৮। বাংলাদেশে প্রচলিত সংগীত তিনটি ধারা হইতে উদ্ভূত। প্রথমত, লোকসংগীত, যাহা আজও প্রচুর সম্ভাবনা লইয়া অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার মধ্যে পুরাতনরক্ষা ও পলাতকমনোবৃত্তি প্রচুরভাবে ছড়াইয়া আছে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চাঙ্গসংগীত, যাহা একদিনকার লোকসংগীতেরই ধারাবদ্ধ, প্রথাবদ্ধ ও সংস্কৃত রূপ। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতকে গণনাট্য সংঘ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। কিন্তু শত শত বৎসরের রাজারাজড়া নবাব-বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতা তাহাকে জীবনের সহগামী হইতে শিক্ষা দেয় নাই, জনতার সংগ্রামে অংশীদার করে নাই। ফলে, যে উচ্চাঙ্গ সংগীত একদিনকার লোক-সংগীতেরই সংস্কৃত রূপ, তাহা অতীতের কোন এক দরবারী আবহাওয়ার মধ্যেই তাহার সত্তাকে বিলীন করিয়া দিয়া আজও সেইখানে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে। ফলে উহা বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন শুষ্ক আঙ্গিকসর্বস্ব মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে। তাহার সম্ভাবনা ও গণ-চেতনার উপর তাহার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা আপাতভাবে লুপ্ত হইয়াছে।

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্য সংগীত রীতি, যাহা অধুনা ইহাদের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। বলিষ্ঠভাবে তাহার প্রয়োগ খুব কমই হইয়াছে। পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ রীতি অপেক্ষা বর্তমানের চটুল সমাজবিমুখী রীতির আমদানি বেশি হইতেছে এবং তাহা বৈদেশিক শাসক ও শোষকের আশীর্বাদপুষ্ট হইতেছে।

এই তিনের সংমিশ্রণে উদ্ভূত আধুনিক এক ধরনের সংগীত ও ছায়াচিত্রের সংগীত সম্পূর্ণভাবে গণজীবনকে প্রতিফলিত করিতেছে না। বরং মানুষের সুস্থ রুচিবোধকে বিকৃতির পথে টানিয়া নামাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, কান্তকবি, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ওইগুলিকে নানাভাবে মিশাইয়া যে নবধারাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে সাহায্য করিয়াছিল। হালে আসিয়া পেশাদারী সংগীত সে ধারাকে যেন হারাইয়াছে এবং রেকর্ড, রেডিও সংগীত ইত্যাদি এক মহাসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। জনপ্রিয়তা হারাইতে বসিয়াছে।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

৯। লোকসংগীতকে আজ প্রধান আসন দিতে হইবে। তাহাকে ক্লেদমুক্ত করিয়া জনগণের ব্যথা বেদনাকে রূপ দেওয়া সর্বাপেক্ষা ভালোভাবে সম্ভবপর। এই কার্যে গণনাট্য সংঘ কৃষক এবং মজুরদের মধ্য হইতে শিল্পী সংগ্রহকে সর্বাধিক মূল্য দেয়। সে বিশ্বাস করে গণ-শিল্পের ইহারাই পুরোধা।

উচ্চাঙ্গ সংগীত আজ মুক্তি পাইবার জন্য কাঁদিতেছে। গণনাট্য সংঘ উচ্চাঙ্গ সংগীত-শিল্পীদিগকে আহ্বান করিতেছে যে তাঁহাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতকে প্রকৃত সার্থকতার পথে লইয়া যাইবার জন্য উচ্চাঙ্গ সংগীতকে আঙ্গিকসর্বস্বতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে জীবনবাদী বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ করুন ও জনসাধারণের কাজে তাহা প্রয়োগ করুন। গণনাট্য সংঘ সর্বতোভাবে তাঁহাদের এই কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবে।

বৈদেশিক সংগীত রীতিকে আমাদের পদ্ধতিগুলির মধ্যে অঙ্গীভূত করিয়া নব নব রস পরিবেশন করিবার প্রয়োজনীয়তাও আজ অত্যন্ত বেশি। এই তিনের সংমিশ্রণে ও জীবনবাদী বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়া জনপ্রিয় সংগীতের জন্ম, একথা গণনাট্য সংঘ বিশ্বাস করে।

ফিল্ম-শিল্প :

১০। আজ চিত্রশিল্প ক্রমশই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে এবং সুদূর-প্রান্তবর্তী গ্রামেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম চিত্রনির্মাণকারী দেশ এবং বাংলা তথা কলিকাতা ভারতীয় ফিল্মের দুটি প্রধান প্রাণকেন্দ্রের একটি। মার্কিনী সস্তা ফুর্তির প্রভাব হলিউড হইতে বোম্বাইয়ের পথ ধরিয়া বাংলার অস্থিতে মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে। বোম্বাইয়ের প্রাচুর্যের সামনে বাংলার চিত্রশিল্প দিশেহারা হইয়া পড়িতেছে এবং এক-একবার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছে। এই প্রভাব মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে গিয়া বাংলার চিত্র প্রায়ই অসুস্থ বা অবাস্তব ঘটনা ও গল্পের সাহায্য লইতেছে। জাতীয় চেতনা বা দুঃখ-দুর্দশার আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ইহাতে ফুটাইবার চেষ্টাও হইতেছে। এবং এই ধরনের চিত্র জনসম্বর্ধনাও পাইতেছে। তবু যে প্রধান ধারারূপে ইহা দেখা দিতেছে না বা সত্যিকারের বলিষ্ঠ জাতীয় জীবনবাদ পরিস্ফুট হইতেছে না তাহার কারণ চিত্রশিল্প নির্মাণের সমস্ত পর্যায়-ই কোনো-না-কোনোভাবে বৈদেশিক শোষক ও তাহার দেশীয় অনুচরদের অনুশাসনের আওতায়। কিন্তু শিল্পীর উপলব্ধি শুরু হইয়াছে। দেশীয়

ব্যাবসাদারও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তি কামনারই পথে শিল্পরূপে ও ব্যবসারূপে ইহার সম্ভাবনা।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

১১। জাতীয় জীবনের সুস্থ প্রতিরূপ এবং বাস্তব জগতের সমস্যাসমূহ চিত্রের প্রধান উপাদান ; চিত্র এ যুগের সর্বাপেক্ষা সামাজিক শিল্পরূপে তাহার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এড়াইতে পারে না ; বিজাতীয় শিল্পসৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রাচুর্য ও ব্যয়বাহুল্য দ্বারা বাংলার শিল্প দাঁড়াইতে পারিবে না,— একমাত্র উৎকৃষ্ট ও জনপ্রিয় বাস্তব ছবিই তাহার ব্যাবসা ও শিল্পকে টিকাইয়া রাখিতে পারে,— এই চিন্তাধারা চিত্রশিল্পের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার দায়িত্ব গণনাট্য সংঘের। লোক-সংস্কৃতির বিশাল ভাণ্ডার চিত্রশিল্পকে ঐশ্বর্যশালী করিবে— একথাও প্রমাণ করার ভার তাহার উপর।

নৃত্য :

১২। ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি ও তাহাদের সংমিশ্রণ আজ শহরের নৃত্যশিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হইতেছে। এবং লোকনৃত্য আজও তাহার আদিম মাধুর্য লইয়া দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। যাহার কিছুকে উদ্ধার করা হইয়াছে, কিন্তু কাজ আজও অনেক করিবার আছে।

নৃত্য একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম। ইহার মধ্য দিয়া দেশের মানুষের স্বার্থকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করা যায় এবং অতীতে গিয়াছে। বৈদেশিক নৃত্যরীতিকে লইয়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেক হইয়াছে। আরও করা যায়।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

১৩। দেশের সমস্ত নৃত্যশিল্পীর গণতান্ত্রিক জাতীয়শিল্পকে গণনাট্য সংঘ জনপ্রিয় করার চেষ্টা করিবে। উচ্চাঙ্গ রীতিগুলি হইতে সে প্রয়োজনীয় অংশ সংগ্রহ করিবে। লোকনৃত্যের পদ্ধতিগুলিকে সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহার করিবে ও তাহার মধ্যে জাতীয়তাবাদী বিষয়বস্তুকে স্থান দিবে। বৈদেশিক রীতিগুলি হইতে প্রেরণা লাভ করিবে।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাইয়া দেশবাসীর লোকরীতিগুলি শিক্ষা করার উপর গণনাট্য সংঘ জোর দিবে।

ছায়ানাট্য, পুতুল নাচ প্রভৃতি :

১৪। ছায়ানাট্য অতীতে ভারতে জন্মিয়াছিল। তার পর এদেশ হইতে ইহা প্রায় বিলুপ্ত হইলেও দ্বীপময় ভারতে তাহার প্রমাণ আজও বর্তমান। কাজেই উদয়শংকর ও গণনাট্য সংঘ যখন ছায়ানাট্য ব্যবহার করিলেন, প্রায় পরীক্ষামূলক-ভাবেই ব্যবহার করিলেন।

পুতুল নাচ বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে আজও জনপ্রিয়। ইহাকে গ্রহণ করা, ইহাকে

লইয়া পরীক্ষা করা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিষয়বস্তু দিয়া ব্যবহার করা,— এ-সবের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

১৫। ছায়ানাট্য, পুতুলনাচ ইত্যাদি পরীক্ষামূলক মাধ্যমগুলি অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। এগুলিকে লইয়া নূতন নূতন শিল্পসৃষ্টি করা আজ অত্যন্ত প্রয়োজন। এইরূপ পদ্ধতিগুলি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়া যাইতে হইবে ; সম্ভাবনার দিক হইতে ইহারা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মাধ্যমের মধ্যে পড়ে।

বিজাতীয় সংস্কৃতির আক্রমণ :

১৬। এ কথা আজ পরিষ্কার যে কী লোকসংস্কৃতি, আর কী তথাকথিত মার্জিত সংস্কৃতি, আজ একদিক হইতে সাম্রাজ্যবাদী উদ্দাম ও দায়িত্বহীন অশিল্প ও অপর দিক হইতে সামন্তবাদী সংস্কারাচ্ছন্ন অতীতমুখী ভাবাদর্শ,— ইহাদের যুগপৎ আঘাতে মরণোন্মুখ। আজ সংস্কৃতির শুধুই বাঁচার প্রশ্ন। সেইসঙ্গে সংস্কৃতিবিদদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য ও কৃষক লোককবি যেমন শ্যাওলা ও শালুক খাইয়া বাঁচিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, তেমনি শহরের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও জীবন সংগ্রামে পরাজয় বরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মারিতেছে সাম্রাজ্যবাদ। তাঁহাদের বাঁচাইবে জাতীয় জনতার শিবির।

আর্থনীতিক জগতে যে জগন্নাথের রথ চালাইয়াছে সাম্রাজ্যবাদ— ভাব-জগতে তাহার চাইতে কিছু কম করে নাই। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাকে সে কাজে লাগায়। সে ভাষাগত বৈসাম্যের সুযোগে হিন্দী ভাষা জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছে, সে হিন্দু-মুসলিম-মিলিত সংস্কৃতিকে টুকরা করিয়া মানুষের গভীরে ঢুকাইয়া দিয়াছে বিভেদ বোধ। এই সংস্কৃতি অধ্যাত্মবাদকে ব্যবহার করিয়াছে, ধর্মান্ধতাকে ব্যবহার করিয়াছে। এই সংস্কৃতি প্রত্যক্ষভাবে জনগণের স্বার্থ-বিরোধী ; তাই যৌন আবেদন-সংবলিত অসুস্থ বিকৃত শিল্পের জন্ম দিয়াছে। জনগণের সমস্ত আশা, সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে এই সংস্কৃতি অগ্রাহ্য করে, তাই কাল্পনিক প্রদোষের দেশের নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বের ছবি তুলিয়া ধরিয়াছে। এই সংস্কৃতি বাস্তবকে অস্বীকার করে এবং এইভাবে সমাজের শাসক শ্রেণীর শোষণকে গোপন করে। এই সংস্কৃতি যাহা কিছু মিথ্যা, তাহার বেসাতি করে।

এবং এই সংস্কৃতি— যাহা-কিছু অতীতের যাহা-কিছু নাকচ হইয়া গিয়াছে, তাহাকে চালু করার জন্য তাহার সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্যকে ব্যবহার করে। অতীতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী বিদ্রোহী সংস্কৃতিবিদদের জীবিতকালে তাহাদের মারিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে এই সংস্কৃতি ; এবং তাঁহারা গত হইলে তাঁহাদের ব্যর্থ অংশবিশেষকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বিকৃত করিয়া তাঁহাদের নামকে নিজের কাজে লাগায়। অর্থাৎ জাতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করিয়া জনসাধারণের মনের উপর চাপাইয়া দেয়।

সাম্রাজ্যবাদী নীতির ভূমিকা :

১৭। ইংরাজ বণিকের এ দেশের কার্যকলাপের ইতিহাস, লুণ্ঠনের ইতিহাস। এই লুণ্ঠনকে কেন্দ্র করিয়া সে তাহার ভূমিকা ঠিক করিয়া লইয়াছে। একদিকে সে নানাপ্রকার ভেদবোধ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে চাপাইয়া দিয়াছে। অপরদিকে সে অপরিসীম অত্যাচারের শাসন চালাইয়া গিয়াছে। এ দেশে আসিয়াই সে মিলিত হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতিকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া, কৃত্রিম প্রদেশ ভাগকে কেন্দ্র করিয়া, শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবধান টানিয়া দিয়া, দেশীয় রাজ্য ও উপজাতি অঞ্চল ইত্যাদির জন্ম দিয়া সে নব নব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে।

তাহার প্রথম আক্রমণ বাংলায় স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উপর। রেলপথ এবং বড়ো শহরের জন্ম দিয়া সে, গ্রামকে চুরমার করিয়া দিয়াছে। বাংলার অভিশাপ কচুরিপানা-সর্বস্ব বদ্ধ গ্রামের জন্ম দিয়াছে। সে গ্রামের পটুয়া বা অন্যান্য লোকশিল্পী চিত্রকরকে ক্রমশ কারিগর শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছে। ঢাকার মসলিন শিল্পী বিখ্যাত জনার্দন ও গোবিন্দ তাঁতি হইতে শুরু করিয়া সহস্র তন্তুবায়ের হাতের আঙুল কাটিয়া দিয়াছে। অগণিত জেলের জাল ডিঙি কাড়িয়া লইয়াছে। ধানের ক্ষেতে নীলের চাষ পাটের চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতো বিভীষিকা বার বার আমদানি করিয়াছে।

এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনকে তছনছ করিয়া দিয়াছে— ঔপনিবেশিক বণিকেরা।

বড়ো শহরের জন্ম দিয়া সেখানে দেশীয় বৃহৎ বাণিজ্য-শিল্পের জন্ম সে দেয় নাই। এমনি ভাবেই সে শিল্প-ব্যবস্থা চালু করিয়াছে যাহাতে দেশ প্রধানত কাঁচামালই রপ্তানি করে ও শাশ্বত কাল ধরিয়া তাহার বড়ো শোষণের বাজার হইয়াই থাকে।

স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদ এ দেশের বিরাট গ্রামাঞ্চলের বুকে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" বোঝা চাপাইয়া জাতীয় বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

শহরের কার্য চালনের জন্য তাহাকে অনুচর শ্রেণীর জন্ম দিতে হইয়াছে— পাশ্চাত্য রীতি ও কিছুটা শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইয়াছে।

বাংলা এ শোষণকে সহ্য করে নাই। প্রথম দিককার মীরকাশেম ও বিভিন্ন মুসলমান ভূম্যধিকারীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমিরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্য দিয়া সে বার বার রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শহরের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ও চুপ করিয়া থাকে নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, অগ্নিযুগের উদ্দীপনা, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে তাহারই প্রমাণ।

সাংস্কৃতিক কর্মীরাও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে এই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর— ইঁহাদের সমাজ ও শিক্ষার আন্দোলন ; মাইকেল, দীনবন্ধু— ইঁহাদের সংস্কৃতি সাধনা ; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতির ইতিহাসের মিথ্যা ও বিকৃতির উন্মোচন ; রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা, নজরুলের অগ্নিদীপ্তি— এইভাবেই এই শিক্ষিত সম্প্রদায় সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এবং জনপ্রিয় লোক-সংস্কৃতির তরফ হইতে মুকুন্দ দাস ও শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তরফ হইতে নজরুল তাহাদের সংস্কৃতি সাধনার ফলে এমন একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন যেখানে এই দুই ধারা সম্পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া দেশের সকল স্তরের জনগণের ব্যথা বেদনাকে ভাষা দিয়া একটি খাঁটি জাতীয় সংস্কৃতির দিক নির্দেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাই নজরুল ও মুকুন্দদাস জাতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

উপরি-উক্ত কারণগুলির মিলিত ফলে দেশের জাতীয় চেতনা উদ্‌বুদ্ধ হয় এবং মজুর, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি দেশের সকল শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শিবিরে সমাবিষ্ট হন।

এই সময়ে ঔপনিবেশিক সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। বাংলার বুকে নামিয়া আসে পঞ্চাশের মহামন্বন্তর। যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়টিতে দেশের মুক্তি কামনা বলিষ্ঠ রূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সাধারণ শোষণের পথে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয় বুঝিয়া সাম্রাজ্যবাদ চাল চালে। দেশের বড়ো পুঁজিবাদীদের এক অংশকে অংশীদারত্বে লইয়া "স্বাধীনতা" দিবার নামে সাম্রাজ্যবাদ তাহার সাইনবোর্ড ও কর্মচারী পাল্‌টায় ও ভারতের জমিতে আত্মগোপন করে।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নূতন পর্যায় :

১৮। দেশের শোষণ বা দুরবস্থা কিছুই তো কমিল না। শুধু জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইল। দেশ বিভক্ত হইয়া এক অংশ অপর এক অংশের উপর থাবা উঁচাইয়া রহিল। স্বাধীনতার চটকদার মোহ খুব বেশি দিন কাজ করিতে পারিল না। বাস্তব অবস্থা এদিকে খারাপ হইতে খারাপে নামিয়া চলিল। দেশভাগের ফলে অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উভয়ই মারাত্মক মার খাইয়াছে। ব্যাবসা শিল্পে বিন্যাস জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের একটি বিরাট শ্রমশীল অংশকে বাস্তুহারা করা হইয়াছে। কৃষক শ্রেণীর অংশ বিশেষ, ছোটো কারিগর শ্রেণী, ছোটো ব্যবসায়ী ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ উদ্বাস্তু হইয়া স্রোতের পানায় পরিণত হইয়াছে।

খাদ্য ব্যবস্থা ও বস্ত্র ব্যবস্থা প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। দেশের সব সাধারণ লোক উহার সম্মুখীন। ছিয়াত্তরের ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। ইহার উপরে দেশব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি ও যুদ্ধের অন্যান্য ফলগুলি দেখা দিতেছে। দেশের অর্থনৈতিক কার্যপন্থা শান্তিপূর্ণ পুনর্গঠনের পথে না গিয়া নবতর সংকট ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধোন্মাদনার মধ্যে আকৃষ্ট হইতেছে। আন্তর্জাতিক ইঙ্গ-মার্কিন ব্যবসা সংকটও তাহার করাল ছায়া বিস্তার করিতেছে।

জনতা বার বার এই অর্থনৈতিক শোষণের চক্র হইতে মুক্তি চাহিতেছে— বৈদেশিক অর্থনীতির লেজুড় না হইয়া, তাহার শোষণের যুদ্ধের জোগানদার না হইয়া, তাহার পুঁজি ও পণ্যের বাজার না হইয়া— দেশ স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি কামনা করে। এইরকম জাতীয় মুক্তির পথেই সংস্কৃতির নবজোয়ার আসা সম্ভবপর। এই জাতীয় মুক্তি কামনা ও সংস্কৃতির মুক্তি কামনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

গণনাট্য সংঘের অভিমত :

১৯। গণনাট্য সংঘ মনে করে '৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা তো পাই-ই নাই, উল্টা নবতর বিভ্রান্তির মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছি। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য কিছুদিনের জন্য পিছাইয়া গিয়াছে। ইহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া পরিপূর্ণ সফল করাই হইল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নবপর্যায়ের কাজ এবং ইহার উপর দেশের সাংস্কৃতিক সার্থকতা নির্ভর করিতেছে।

দেশের জনগণের দৈনন্দিন বিরাট সমস্যা সমাধানের পথে এই মুক্তি সংগ্রামের গতি। এই সংগ্রামকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিস্তারিত করিয়া দেওয়া গণনাট্য সংঘ তাহার কাজ বলিয়া মনে করে। সে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি যোদ্ধা। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই কার্যে তাহার সহকর্মী দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির প্রতি তাহার মনোভাব সৌভ্রাতৃত্বমূলক।

গণনাট্য সংঘ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সমাবিষ্ট প্রতিটি শ্রেণীর স্বার্থ লইয়া শিল্প রচনা করা তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। কাজেই তাহার শিল্পক্ষেত্রে শিল্পকে জাতীয় মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক শিবিরের শিল্প বলা যাইতে পারে।

গণনাট্য সংঘ মনে করে শিল্পী জনগণচিত্তের পথদ্রষ্টা। সেই হিসাবে বর্তমান অবস্থায় তাহার কর্তব্য :

১। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্বার্থে নিজেদের সংঘবদ্ধ করা।

২। সর্ব শিল্পকর্মকে নিয়োজিত করিয়া জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিশালী করা।

৩। জনতার স্বার্থের কথা ভাবিয়া ও তাহাকে অনুধাবন করিয়া সৃজনশীল সত্যকার জনগণের শিল্প সৃষ্টি করা ও তাহাকে লইয়া জনতার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

৪। জাতীয় সংস্কৃতির উপর যে-কোনো রকম আক্রমণকে প্রতিহত করা।

শিল্পের নিজস্ব প্রশ্ন ; বিষয়বস্তু ও রূপরীতি [Form] ;
জনপ্রিয়তা ও উৎকর্ষ :

২০। গণনাট্য সংঘ মনে করে— যে-কোনো শিল্পকর্ম বিষয়বস্তু ও রূপরীতির (form) সমন্বয়ের ফল। এই দুইটির সুন্দর সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে শিল্পের পর্যায়ে কোনো শিল্পীর কাজই উঠিতে পারে না।

এই দুইটি মিলিত হইয়া জনপ্রিয় ও উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি করে।

আজিকার সর্বশিল্পকর্মে জনপ্রিয়তা সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রশ্ন। গণনাট্য সংঘের নিজের সমস্যা— ব্যাপকতর গণসংযোগের সমস্যা। ব্যাপকতর গণসংযোগের একমাত্র পন্থা জনপ্রিয় বিষয়বস্তু ও রূপরীতি (form) নির্বাচন। সেদিক হইতে জনতার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও তাহার দৈনন্দিন দুঃখদুর্দশা ও অন্যান্য বাস্তব অভিজ্ঞতা শিল্পীর সামনে বিরাট জনপ্রিয় বিষয়বস্তুর ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছে। সেইসঙ্গে অতীতের ও বিদেশের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামশীল ঐতিহ্য— (যাহা সোজাসুজি জাতীয় সংগ্রামকে প্রভাবিত করে) ইহাদের উপর গণনাট্য সংঘ যথেষ্ট নজর দিবে।

সহজগ্রাহ্য, লোকায়ত্ত, সুপরিষ্কার ভাবে বাস্তবধর্মী রূপরীতিই হইতেছে জনপ্রিয় রূপরীতি। ইহাকেই তাই গণনাট্য সংঘ তাহার সর্বসৃষ্টিকর্মের ভিত্তি বলিয়া ধরিয়া নিবে।

গণনাট্য সংঘ— জনপ্রিয়তা মানে সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী সংস্কৃতির প্রচলিত জনপ্রিয়তা মনে করে না। যাহা সত্তার বিকাশকে সাহায্য করে, তাহাকেই গণনাট্য সংঘ সত্যকার জনপ্রিয়তা মনে করে। জনপ্রিয়তা সর্বসময় উৎকর্ষের দিকে নজর রাখিয়াই আনিতে হইবে। উৎকৃষ্ট শিল্পকার্যের দিকে আগাইয়া যাওয়াই গণনাট্য সংঘের কাজ। কিন্তু উৎকর্ষতার সৌধ উঠিতে পারে একমাত্র জনপ্রিয়তার ভিত্তি হইতেই। আবার জনপ্রিয়তার খাতিরে জনপ্রিয়তা গণনাট্য সংঘ চায় না। **উৎকৃষ্ট হইবার জন্যই জনপ্রিয় হইতে চায়।** ইহা গণনাট্য সংঘ সর্বদা মনে রাখিবে।

গণনাট্য সংঘ দর্শকের পরিপ্রেক্ষিত হইতে শিল্পকে দেখে। কাজেই জনপ্রিয়তা যেমন একটি তাহার মুখ্য প্রশ্ন, তেমনি দেশের অংশে অংশে রূপরীতির বা বিষয়বস্তুর নির্বাচনের বৈচিত্র্যে আসিতে পারে একমাত্র বিষয়বস্তুর ধারণার একত্ব হইতেই।

শহরের পেশাদারী শিল্পী :

২১। গণনাট্য সংঘ জানে শহরের পেশাদারী শিল্পীরা বর্তমান সংকটে মরণাহত। তাই তাঁহাদের প্রতি তাহার মনোভাব সৌভ্রাতৃত্বমূলক। তাঁহাদের জাতীয় কৃষ্টিকে রক্ষার প্রচেষ্টাকে সে অভিনন্দনযোগ্য মনে করে। গণনাট্য সংঘ আরো মনে করে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে পেশাদারী শিল্পীদের বহু দিবার আছে। তাই তাঁহাদের গণতান্ত্রিক শিল্পকর্মকে জনগণের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া গণনাট্য সংঘ তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। পেশাদারী শিল্পীদের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে গণনাট্য সংঘ পূর্ণ সমর্থন জানাইতেছে।

পেশাদারী শিল্প জগতের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলাইয়া সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা সম্ভবপর বলিয়া গণনাট্য সংঘ মনে করে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাহার দাম আছে বলিয়া ভাবে।

বিশ্বশান্তি :

২২। গণনাট্য সংঘ মনে করে শান্তির সমস্যা আজিকার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রের মূল সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগ পৃথিবীতে শেষ হইয়া আসিতেছে। তাহার নিজস্ব দুরবস্থা ও বাহিরের চাপ আর সে সহ্য করিতে পারিতেছে না। জনগণকে আর বিভ্রান্ত করা যাইতেছে না। সে সদাই সশঙ্ক কখন শান্তি বাধিয়া বসে। এই সমস্তের প্রতিষেধক হিসাবে এবং নিজের বাঁচার মেয়াদ বাড়াইবার জন্য সে ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধকে পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

গণনাট্য সংঘ জানে, এবারকার যুদ্ধে একটি গুণগত ভেদ দেখা দিবে— পারমাণবিক বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহারের জন্য। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার যুদ্ধ দিয়া তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে বিচার করিলে ভুল করিব। ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন বিভীষিকা। জল এবং বাষ্পের গুণগত ভেদের মতোই আগেকার যুদ্ধের সহিত ইহার পার্থক্য। এবারকার যুদ্ধ

সভ্যতাকে চুরমার করিয়া দিবে।

গণনাট্য সংঘ মনে করে এই উন্মাদ মানবতাবিরোধীদের একঘরে করা সম্ভবপর। একমাত্র বিশ্বজনতাই তাহা পারে। পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী জনতা যদি এক হয় তবে যুদ্ধকে ঠেকানো সম্ভবপর। জনতার মনোবল ও সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত এ যুদ্ধ চালানো সম্ভবপর নয়। শান্তিকামী জনতা বলিতে গণনাট্য সংঘ সমগ্র দেশব্যাপী সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনতাকেই ভাবে।

গণনাট্য সংঘ বিশ্বাস করে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ শান্তির শিবিরে যোগ দিবে। কারণ, মানুষ সৃষ্টিশীল। শিল্পী তাহার শিল্প, জ্ঞানী তাহার জ্ঞান, কর্মী তাহার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ সৃষ্টি করে— হয়তো একটি পরিবার, একটু ভালোবাসা। সমগ্র মানবজাতি সৃষ্টিকামী।

যুদ্ধ, বিশেষত পারমাণবিক যুদ্ধ, সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্য আবির্ভূত। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী আইনস্টাইনের ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত করিতে সে আসিবে। সেই ভবিষ্যৎ বাণী,—

"চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র হইবে— প্রস্তর নির্মিত কুঠার।"

অর্থাৎ তৃতীয় যুদ্ধে সভ্যতা বিলুপ্ত হইবে।

ভারতের সমস্ত মানুষকে গণনাট্য সংঘ শান্তিকামী বলিয়া মনে করে এবং সবাইয়ের সঙ্গে এক শিবিরে কেন্দ্রীভূত হইবার আশা রাখে।

গণনাট্য সংঘ বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের মৃত্যুপথে বিশ্বাসী।

সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধের হোতা। এই সাম্রাজ্যবাদই এশিয়াখণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ বাধাইতেছে। সাম্রাজ্যবাদেরই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্ররোচনায় আজ কোরিয়ায়, ফরমোজায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, কাশ্মীরে ও মধ্যপ্রাচ্যে সমরানল জ্বলিতেছে বা জ্বলার মুখে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকামীরা তাই এশিয়ায় শান্তিভঙ্গকারী।

উহারাই আমাদের দেশের উপর শোষণের পেষণ চালাইতেছে। সে পেষণ হইতে বাঁচিবার জন্য দেশের যে জাতীয় সংগ্রাম তাহা শান্তিরই সপক্ষে সংগ্রাম, শান্তি সংগ্রামে পরস্পরের পরিপূরক। গণনাট্য সংঘ সেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষ হইতে শান্তির শিবিরে সমাগত। গণনাট্য সংঘ শান্তির মঞ্চ হইতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লড়া তাহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করে।

যেহেতু গণনাট্য সংঘ শান্তির প্রশ্নকে মূল প্রশ্ন বলিয়া মনে করে কাজেই সে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শিবিরের শিল্পকে শান্তির মঞ্চোপযোগী করিয়া এবং শান্তির শিবিরকে শক্তিশালী করার দিকে নজর রাখিয়া শিল্প রচনা করিবে। শান্তির প্রশ্নে সে দেশের অন্যান্য শিল্পীর সহিত মিলিবে।

গণনাট্য সংঘের অতীত :

২৩। যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও কর্তব্য সমূহ গণনাট্য সংঘ আজ তাহার সামনে উপস্থিত করিল, সে জানে তাহার অতীতে সে বার বার এই পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

গণনাট্য সংঘ অতীতে শহরের উপর বেশি জোর দিয়াছিল এবং সংগ্রামী ভাবাদর্শ ও দেশের বেশির ভাগ জনতার আদর্শ হইতে সরিয়া গিয়াছিল। মজুর এবং কৃষক, যাহারা দেশের অধিকাংশ, তাহাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার প্রশ্নে জোর দেয় নাই। লোকসংস্কৃতি ও মার্জিত সংস্কৃতির মধ্যে মিলন সাধন করিতে প্রায় অক্ষম হইয়াছিল।

যাহার ফলে সে চেষ্টা সত্ত্বেও শহরাঞ্চলের একটা অংশে সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল।

তাহার পরে সে মত বদলাইল। কাল্পনিক একটা বৈপ্লবিক অবস্থা মনে করিয়া সে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। মজুর কৃষকের নামে সে মধ্যবিত্তসুলভ অতিবিপ্লববাদ বাস্তবতার উপর চাপাইয়া দিল। ফলে সে দেশের বন্ধুবর্গকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিল এবং মজুর কৃষকের স্বার্থকেই সম্পূর্ণ বিসর্জন দিল। কাল্পনিক বিপ্লবের আপাতবাস্তবের উপর জোর দিয়া সে শিল্পসুলভ আঙ্গিককে অবজ্ঞা করিল, ফলে শিল্প আর শিল্প রহিল না, জিগিরে পরিণত হইল। ইহার ফল সে সংগঠনগত ভাবে ভোগ করিল। তাহার সংগঠন ভাঙিয়া গেল।

কিন্তু গত দশ বৎসরের ইতিহাসে সে শুধু ভুলই করে নাই, ভুল সত্ত্বেও উজ্জ্বল ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে অন্তত এক পাও অগ্রসর হইয়াছে। বাংলার দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য পাঞ্জাব ভ্রমণ, "নবান্ন" অভিনয়, "নবজীবনের গানের" সৃষ্টি, "শহীদের ডাক" লইয়া বাংলা ও আসাম ভ্রমণ ইত্যাদি গণনাট্য সংঘের অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন। তাহার আন্তরিকতা অনস্বীকার্য এবং অদম্য। অতীতের ভ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিলে চলিবে না, অতীতকে উড়াইয়া দিলেও না— বর্তমানের যাহা কিছু তাহা অতীতেরই দান। আত্ম-সন্তুষ্ট মৃত্যুর শামিল, আত্ম অবমাননাও তাই।

অতীত হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া গণনাট্য সংঘ তাহার পথে অগ্রসর হইতেছে। তাহার একমাত্র আশ্বাস তাহার জ্বলন্ত আন্তরিকতা ও জনগণের শিক্ষা। জনগণ তাহাকে প্রতিপদে বুঝাইবে সে পথভ্রষ্ট হইতেছে কি না। আন্তরিকতা তাহাকে বৈপ্লবিক কর্মে ঠেলিয়া লইয়া চলিবে।

গণনাট্য সংঘ তাহার চারিপাশে তাকাইয়া দেখিতেছে। জনগণ আগাইয়া চলিয়াছে, গণনাট্য আন্দোলন আগাইয়া চলিয়াছে, ইতিহাস আগাইয়া চলিয়াছে। এই পথে আজ তাহার বহু সহযাত্রী। তাহাদের প্রত্যেককে সে অভিনন্দন জানাইতেছে, হাত বাড়াইয়া দিতেছে। গণনাট্য সংঘ জানে, বাংলার জনগণ তাহার সংস্কৃতিকে লইয়া আগাইয়া চলিবেই। বার বার হয়তো নেতৃত্বের স্খলন হয়, কিন্তু বাংলার মহান জনতা ঠিক চলিয়াছে।

আহ্বান :

২৪। গণনাট্য সংঘ তাই আজ সবাইকে আহ্বান করিতেছে। সমস্ত শিল্পীর যে সামাজিক, যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাহা প্রতিপালন করার সময় সমাগত।

গণনাট্য সংঘ দেশের প্রত্যেকটা প্রগতিকামী শিল্পী ও স্রষ্টার সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য উৎসুক। গণনাট্য সংঘ দেশের প্রত্যেকটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সহিত ব্যাপকতম একতার ভিত্তিতে সংযুক্ত ভাবে কাজ করিবার জন্য ঐকান্তিক ভাবে

প্রচেষ্টা করিবে, পেশাদার, অপেশাদার, দল-মত-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একটি সম্মিলিত কার্যক্ষেত্রে একত্রিত করার স্বপ্নকে সফল করিবে।

দেশের সমস্ত সংস্কৃতি-প্রেমিকরা এক হউন্।
দেশের সমস্ত সৃষ্টিশীল শিল্পীরা এক হউন!!
দেশের সমস্ত শ্রমশীল জনতা এক হউন্!!!

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য— সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপর ও তাহাদের স্বার্থবাহকদের বিরুদ্ধে ; আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য— আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকামীদের বিরুদ্ধে ; মানবতার প্রগতির জন্য— মানবতার শত্রু সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে— এক মহান্ সংগ্রামের শিবিরে সংঘবদ্ধ হউন্।

গণনাট্য আন্দোলন জিন্দাবাদ!
বাংলার শিল্পী-সাধারণ জিন্দাবাদ!!
বাংলার শ্রমশীল জনগণ জিন্দাবাদ!!!

অভিনয়ে নব-অধ্যায়

আমাদের দেশের অভিনেতাদের মঞ্চের প্রতি একটি বিশেষ পক্ষপাত আছে। বহুকালের ঘনিষ্ঠতা তার একটি কারণ। সে ক্ষেত্রে ছবির অভিনয় আমরা দেখেছি চিনেছি অল্পকাল, ভালো করে তার প্রধান সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামাই নি। বহু বিখ্যাত ও কৃতিত্বসম্পন্ন মঞ্চ-অভিনেতারা তাই এমন কথাও বলেন, চিত্রে অভিনয় নাকি আসল অভিনয় নয় ; পরিচালকদের হাতে থাকে প্রায় সব স্বাধীনতা, তাঁরা যা খুশি করেন। আর অভিনেতাও তাঁদেরই হাতের অনেকটা যন্ত্রের মতোই। কিন্তু এ তর্কে প্রবেশ করার আগে, মঞ্চ ও ছবি উভয়কেই অভিনব প্রমাণের ক্ষেত্র মেনে নিয়ে তার পর তাদের ব্যবধান বিচার কিছুটা সহজ হবে।

দেখা যাবে মঞ্চ বা ছবির অভিনয়ের বক্তব্য প্রধানত এক। শিল্পী বাস্তবকে বুঝে অর্থাৎ নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তাঁর সমালোচনা সমেত বাস্তবকে আবার ফুটিয়ে তো'লেন। এ কথা সব শিল্পেরই মুখ্য কথা, অভিনয়েবও কথা। আগে আসা যাক অভিনয়ের আঙ্গিকের বিষয়ে, যেখান থেকে মূল সমস্যাগুলির উদ্ভব। আঙ্গিক কী ও কেমন করে আসে? সমস্ত শিল্পে আঙ্গিক হচ্ছে এমন একটা উপায় যা সেই শিল্পকে প্রাণদান করে। অভিনয়ে বিশেষ বিশেষ আঙ্গিকগুলি মঞ্চের সহজাত বাধা অতিক্রম না করে শুধু অভিনয়কেই প্রকাশ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। মঞ্চ অভিনয়ের মস্ত বড়ো অসুবিধা এই যে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যে দূরত্ব সেটা পরিবর্তনীয় নয়, বরং স্থির। অল্প দূরত্বই তার পরিধি— প্রয়োজন হলেই অভিনেতা পারেন না দর্শকের শারীরিকভাবে অন্তরঙ্গতা পেতে, একেবারে নিকটতম হতে। কিন্তু প্রত্যেক অভিনয়েই অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, উচ্চারণ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে পিছনের শেষ দর্শকটি পর্যন্ত তা অনায়াসে পৌঁছুতে পারে। অভিনেতাকে তাই বাধ্য হয়ে স্বাভাবিকতাকে ভেঙে কৃত্রিমতার সাহায্য নিতে হয়। কানে কানে বলার যে কথা তার গোপনতাটুকু সভাময় বিস্তারিত করার জন্য অভিনেতাকে কানের কাছে মুখ নিয়েও তারস্বরে উচ্চারণ করতে হয় অথবা বিস্ময় প্রকাশের জন্য যে সামান্য ভ্রূ তোলা তাও অনেকগুণ বড়ো করেই তাঁকে দেখাতে হয়। বহুকাল ধরে মঞ্চ তাই উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি কয়েকটি বিশেষ রীতির জন্ম দিয়েছে। এরা অকারণে অথবা কারো খেয়ালে তৈরি হয় নি।

আজ সব দেশে বাস্তবধর্মী নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠছে, জীবনই বিষয়বস্তু শিল্পের। অর্থাৎ জীবনের যে সহজ গতি তাকেই রূপ দেবে শিল্প। অভিনয়েও এর জোয়ার লেগেছে। অভিনয়ে এই প্রগতিধারার বাহক হিসেবে আমরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রবর্তিত প্রকাশভঙ্গিকে মানতে পারি। অনেককাল সঞ্চিত মঞ্চের অপ্রয়োজনীয় স্তূপকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এঁরা বাস্তবকে রাতারাতি মঞ্চে তুলে এনে মঞ্চেও বিপ্লব ঘটিয়েছেন। কিন্তু এখানেও

ব্যক্ত করার রীতি উক্ত আঙ্গিকেরই মুখাপেক্ষী। উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি, মঞ্চের ভারসাম্য রক্ষা সবই আগের কৃত্রিমতাকে মেনে নিয়েই রয়েছে। কারণ মঞ্চে এটা প্রয়োজন, এরই ভিতর দিয়ে বাস্তবকে তার রূপ দিতে হবে। আর এই রূপ দেবার উপায় আঙ্গিক।

কিন্তু চলচ্চিত্র এদিক থেকে অনেক এগিয়ে গেছে, তার কর্মক্ষেত্র অনেক প্রসারিত। মঞ্চের মতো তিনদিকে ঘেরাটোপ লাগানো কাঠের কয়টি পাটাতনের উপর সব-কিছুর কল্পনা করার প্রয়োজন নেই। বিশ্বময় ঘুরে বেড়ানোর ক্ষমতা নিয়েই তার সৃষ্টি হয়েছে। ভারি আশ্চর্য, এই মুক্তি আর এই ব্যাপ্তি কেমন করে সে পেল! পেয়েছে দুটি যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে। একটি ক্যামেরা অর্থাৎ চিত্র-গ্রহণ যন্ত্র, সব জায়গায় গিয়ে সব-কিছু ছবি নিজের বুকের মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারে। আর-একটি, শব্দ-ধারণ যন্ত্র ; এরও শক্তি অসাধারণ। মঞ্চের দর্শককে কানের ও চোখের যে পরীক্ষা দিতে হত তার এরাই সে কাজগুলি সেরে শুধুই নাটকটি দর্শকদের উপহার দেবে। এরা যেখানে-সেখানে যাবার যে অবাধ স্পর্ধা রাখে, সেইটেই হল চিত্রের শক্তিশালী চিত্র-মাধ্যম হবার কারণ। দর্শক পরম সুখে দিব্যি বসে বসে নানান জায়গায় ছড়ানো ঘটনাবলীর গাঁথা মালা দেখে যাবেন। কত কষ্ট কমল।

মঞ্চের আঙ্গিকের জন্ম সেই দূরত্ব এবং কৃত্রিমতাকে কাজে লাগানোর সহজাত ধর্ম থেকে। চিত্রের আঙ্গিকের জন্ম খুঁজতে গেলে এ দুটি আশ্চর্য যন্ত্রকে কেন্দ্র করেই আমাদের সন্ধান চালাতে হবে।

মঞ্চের সেই দূরত্বের ব্যবধান আর রইল না। চিত্র-গ্রহণ যন্ত্র সামান্য ভ্রূ তোলাটাও কত কাছে এসে তুলে নিয়ে হাজার গুণ বড়ো করে দেখাবে। ফিসফিস করে যে কথা বলার সে কথা তেমনই বলা চলবে ; শব্দ-গ্রহণ যন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম কান ঠিক খাড়া আছে, শুনবেই। কথা বলা বা হাত-পা নাড়া কিছুই বাড়িয়ে করবার দরকার নেই। স্বাভাবিকতাই আবার এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ মঞ্চ-প্রচলিত আঙ্গিককে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেও রূপ-রসের সঞ্চার এখানে সম্ভব। আর তা না করে উপায় নেই। মঞ্চের কৃত্রিমতা এখানে অচল। আমাদের মন সে কৃত্রিমতা এখানে গ্রহণ করবে না।

কিন্তু মঞ্চে দর্শকের মন আলাদাভাবে প্রস্তুত থাকে। তিনি দিতেও যান, নিতেও যান। যেখানে যেটুকু কমতি তিনি সেটুকু তাঁর কল্পনা দিয়ে ভরে নিতে সব সময়েই রাজি। কিন্তু এমন কেন হয়? কারণ, মঞ্চের দৃশ্যসজ্জা, পারিপার্শ্বিক সব-কিছুই দর্শকের কাছে কল্পনা দাবি করে। তিনি কল্পনা করেন, অর্থাৎ নিজেও আরো কিছু সৃষ্টি করেন। একটা দোদুল্যমান পটকে কখনো শিবির, কখনো যুদ্ধক্ষেত্র আর কখনো রাজপ্রাসাদ ভাবতেও তাঁর কষ্ট হয় না। তা যদি হত তা হলে নাটকের গতি রুদ্ধ হত। একটু আগে যে কাঠের পাটাতনটি ছিল দিল্লির প্রাসাদকক্ষ, পর্দা একবার পড়ে আবার উঠলে দেখি রাজপুতানার মরুভূমি। এখানে আমরা অর্থাৎ দর্শকরা এই সুবিধা দান করি মঞ্চকে। তাই গ্রহণে বাধা আসে না কখনো।

ছবির কথা ভিন্ন। মরুভূমি সেখানে পটের উপর তেল রঙ-এর পোঁচ নয়, প্রাসাদও পটের উপর আঁকা নয়। এ-সব ছাড়াও চিত্রযন্ত্রের চোখকে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা কৌশল সব সময়েই ব্যবহৃত হচ্ছে, যাতে অস্বাভাবিক কিছুকেও অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হতে পারে। পরিবেশ এখানে তাই বাস্তব-ঘেঁষা। এতে বাস্তবের মায়া বা 'ইল্যুশন' বেশ জোরালো হয়।

এখানে অতিরঞ্জিত কিছু রস সঞ্চার করে না বরং ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। মঞ্চের আঙ্গিক এখানে বোঝা। কিন্তু এখানে অভিনয় বহন করার বাহন কোথায়?

তাই এটাই অভিনেতার একমাত্র বিষয়। এই অভিব্যক্তির সাহায্যের জন্য কিছু আঙ্গিকের জন্য মঞ্চ দিয়েছিল, কিন্তু চিত্রে তা অচল। তবু চিত্রে তো আঙ্গিক চাই। সে আঙ্গিক কোথায় খুঁজব? মঞ্চে যে চলাফেরায় বাধা নেই, এখানে যান্ত্রিক প্রয়োজনে তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু একদিকে যেমন এই সীমাবদ্ধতা অভিনেতার সমস্যা, আবার এর সমাধানের মধ্যেই নতুন আঙ্গিক আবিষ্কারের বীজ লুকানো আছে।

চিত্র-গ্রহণ যন্ত্রের লেন্স এবং ফোকাস-এর একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে, যার বাইরে অভিনেতা কখনো যেতে পারেন না। চিত্রগ্রহণ কক্ষের আলোকিত পরিধির মধ্যেই বিশেষ কতকগুলি স্থান অভিনেতার জন্য নির্দিষ্ট। তাঁর স্থান-বদল, যা-কিছু আগে থেকে নির্দেশ দেওয়া। অনেক মহড়ার ভিতর দিয়ে এগুলিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে তার পর চিত্র-গ্রহণের সময় তিনি অভিনয় করেন। শব্দের বেলাতেও ঠিক একই নিয়ম অর্থাৎ তিনি কখন কটি শব্দ ব্যবহার করবেন তাও আগেই ঠিক থাকে। মহড়াতে একটি পর্দা ঠিক করে নিয়ে তিনি সংলাপ বলেন। বাচন স্তরের সমতা ও মহড়ার কথা তাঁকে শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হয়।

এই যান্ত্রিক বাঁধাবাঁধি সব-কিছুর প্রথম দিকে অভিনেতাকে বেশ বাধা দিতে থাকে। মহড়ার গতিবিধির কথা স্পষ্ট মনে করে করে অনুকরণ করতে অনেক অসুবিধা হয় তাঁর। চরিত্র ফোটানো বা তার কিছু করা তখন বেশ দূরের কথা ; সম্মান ঠিক রেখে নিখুঁত চলাফেরার দিকে স্বভাবতই তাঁর ঝোঁক গিয়ে পড়ে।

কিন্তু এটা কষ্টের হলেও বাহ্যত কষ্টের। যে-কেউই একটু কষ্ট করে এই বাধাগুলি কাটিয়ে অভ্যাসের সাহায্যে নিজের আয়ত্তাধীনে আনতে পারেন ; এবং প্রত্যেক অভিনেতাকেই তাই আনতে হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো শিল্পীরই সমস্যার বিষয় এগুলো হয় না। কিন্তু যান্ত্রিক প্রয়োজনে ছবি তোলার যে পদ্ধতি আজ স্টুডিওতে প্রচলিত, তাই থেকে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যাগুলিকে একে একে আনি। স্টুডিওতে দর্শক নেই। অভিনেতার প্রথম দর্শক দুটি ভ্রাম্যমাণ যন্ত্র যারা একান্ত বিশ্বাসে অভিনেতার অভিনয়কে গ্রহণ ও শ্রবণ করে। তারা অনুভব করে না, হৃদয় তাদের নেই। কিন্তু মঞ্চের অভিনেতার অভিনয় প্রথম দর্শকেরাই চরম স্থানে গ্রহণ করে ; তার যথাযথ মূল্য নিরূপিত হয় তৎক্ষণাৎ। অভিনেতা তাঁর অভিব্যক্তির মজুরি পান সঙ্গে সঙ্গে। প্রেক্ষাগৃহের মিলিত অনুভব তিনিও অনুভব করেন, বোঝেন তাঁর অভিনয় সার্থকতায় পৌঁছল কি না। দর্শকের উৎসাহ তাঁরও মনে সঞ্চারিত হয়, তাঁকে আরো কিছু দিতে প্রেরণা জাগায়। অভিনয়ে মনের এই আদান-প্রদানের প্রভাব অপরিমেয়। ছবি তোলার সময় প্রেরণার এ উৎস কোথায় থাকে? সেখানে অভিনেতাকে অভিনয় করতে হয় ভবিষ্যতের হাজার জনের হাততালির অথবা আরো কিছুর কথা ভেবে। এই অদেখা হাজার জনকে তাঁর পক্ষে কল্পনা করে নিয়ে প্রেরণা পাওয়া বাস্তবিক কঠিন।

একটা সমাধান এর খুঁজে পাওয়া যায়। পরিচালক নিজে অনেক দর্শকের হয়ে অভিনয়ে অভিনেতাকে প্রেরণা দিতে পারেন। অভিনয়কে ভালো করে অনুধাবন করে, বিশ্লেষণ করে

অভিনেতাকে তিনি উৎসাহিত করতে পারেন। বুঝিয়ে-শ্রোতাদের সামনে যেমন গানের গলা খুলে যায়, বুঝিয়ে-দর্শক পেয়ে অভিনেতার মনও তেমনই পাখা বিস্তার করে। অভিনয়ের তারিফ (অভিনেতার নয়) অভিনয়কেই এগিয়ে দেয়।

স্টুডিওর পদ্ধতি কতটুকু অভিনয়কে ব্যাহত করে?

চিত্র-গ্রহণেরও একটি পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি হচ্ছে, একই স্থানে অবস্থিত বহু জিনিসের মধ্যে যন্ত্রটি বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপর দৃষ্টি ফেলে। দৃশ্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে শুধু প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই পর্দায় প্রতিফলিত করে। চিত্রের কাহিনী বলার আঙ্গিকের মধ্যেও এটা পড়ে। ধরুন, একটা দৃশ্যে কোনো একটি বক্তৃতায় কোনো একজন বক্তাকে দেখা যাচ্ছে বক্তৃতা করতে ; মাঠে জনতা জমায়েত হয়েছে। প্রথমে গোটা দৃশ্যটাকে দেখিয়ে নেওয়া হল। তার পর শুধুই বক্তাকে আমরা দেখলুম, হাত নেড়ে নেড়ে বলে যাচ্ছেন, পরে দেখলুম জনতা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে বক্তৃতা শুনে। আবার বক্তাকে দেখা গেল, হাত নামিয়ে চুপ করে আছেন ; মিলিত কণ্ঠস্বরের উৎসাহধ্বনি তাঁকে স্পর্শ করেছে। তিনি সবার দিকে তাকিয়ে আছেন। প্রথম ও তৃতীয় ছবিটি নেওয়া ফাঁকা মাঠে। বহুদিন পরে হয়তো স্টুডিওর অভ্যন্তরে বাকি ছবি দুটি নেওয়া। একটা অসুবিধা, অভিনেতাকে এইখানে কল্পনা করে নিতে হয় আগেকার সেই আনন্দের স্মৃতিটি, কানেও শুনতে হয় অসংখ্য জনতার উল্লাস ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক দেখবেন কয়েকটি আলো, কয়েকজন কর্মী আর বন্ধ একটি ঘরে তিনি হাঁটাচলা করবেন।

অথবা, কোনো দৃশ্যে অভিনেতা উদ্‌বিগ্নভাবে কারো জন্যে একটি ঘরে অপেক্ষা করছেন, হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে এল গাড়ি থামার শব্দ ; তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে জানালায় এলেন। মুখে হাসি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি, যেন বাইরের আগন্তুককে অভ্যর্থনা করার জন্যই, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছবি তোলার সময় গাড়ির শব্দ হয় নি, বাইরে তিনি কিছুই দেখেন নি। অর্থাৎ অভিনেতাকে সব-কিছুই কল্পনা করে নিতে হয়েছে। এবং বহু পরে ছবি গ্রহণেরও শেষে, সম্পাদনা কক্ষে ছবিটির সঙ্গে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত স্টুডিওতে প্রতিদিনই ঘটছে, প্রতি ক্ষেত্রেই এই কল্পনা করে নেবার বিশেষ চাপ আসে অভিনেতার উপর।

পদ্ধতির প্রয়োজন ছাড়াও অভিনেতাকে আরো কল্পনা করতে হয়। যে নাটকটি চিত্রে অভিনীত হবে এবং যে চরিত্রটি তিনি অভিনয় করবেন, সেটি বিশেষভাবে পড়ে, নানান অবস্থায় চরিত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাত্ম হতে হয়েছে। বহুবার পড়ে দেখার পর তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। চরিত্রটিকে নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির সঙ্গে মিলিয়ে তার পরে তফাত করে সম্পূর্ণ গঠন করতে হয়েছে তাঁকে মনের মধ্যে। মঞ্চেও কিছু পরিমাণে তাঁকে এ-সব করতে হত, চিত্র-মঞ্চেও হয়েছে। কিন্তু মঞ্চে পটভূমির পরিবর্তনে অসুবিধা থাকায় স্থান ও কালের পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ চরিত্রটিকে বাস্তবিক বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় না। চিত্রে সহজেই স্থান-কাল বদলানো যায়, অনেক বড়ো এর পরিধি, অনেক বেশি ঘটনাস্রোত স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে স্থান পেতে পারে। ফলে, চরিত্রটি অনেক বৈচিত্র্যময় প্রবাহে পড়ে, অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণতার পথে সহজ হতে পারে। এইজন্য অভিনেতাকে গভীর চিন্তা করতে হয়েছে, তলিয়ে যেতে

হয়েছে নাটকটির হৃদয়ে। মঞ্চের কিছু শিক্ষা এই ক্ষেত্রে কিছু সাহায্য করতে পারে অভিনেতাকে।

কল্পনাকে বেঁধে নিতে, চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে, স্বাভাবিক গতি দিতে সাহায্য করে মহড়া। ছবিতে অভিনয় করার সময়ে অনেক মহড়ার সাহায্য অভিনেতার লক্ষ্যকে কতখানি সাহায্য অভিনেতার লক্ষ্যকে কতখানি সাহায্য করে সে হিসেব দেওয়া কঠিন। মঞ্চের অভিনেতাকে একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে চরিত্রকে বিকাশের পথে ফুটিয়ে তুলতে হয়। তাছাড়া প্রতিদিন নিজেকে নতুনভাবে ছড়িয়ে দেবার অবকাশ তিনি পান। আজ যে অংশের অভিনয় তাঁর মনঃপূত হয় নি, কাল তা শোধরাতে পারেন। ছবিতে কিন্তু এ সুযোগ নেই। আজ যে অভিনয়ের ছবি গৃহীত হল, অভিনেতার অভিনয়ে অসম্পূর্ণতা থাকলে সে অংশের ছবি আবারও তুলতে হবে ; আর যে ছবিতে তাঁর অভিনয় তোলা হল, তাকে আর ইচ্ছে করেও বদলাতে পারবেন না তিনি ; তা চিরকালের জন্যই গৃহীত হয়ে গেল। কাজেই, সম্পূর্ণ অভিনয়টি তৈরি করেই তবে চিত্র-গ্রহণ যন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে তাঁকে। আরো, মঞ্চের মতো এখানে চরিত্র ধারাবাহিকভাবে এগোতে পারে না। চিত্র গ্রহণের সুবিধামতো আজ হয়তো মৃত্যুর দৃশ্যটি তোলা হল, কাল অসুখের, পরশু বিয়ের ইত্যাদি ; এরকম সর্বদাই হচ্ছে। মঞ্চে এটা নেই। চরিত্রটিকে ধারাবাহিকভাবে ফুটিয়ে তোলার অভাব তিনি সর্বক্ষণ অনুভব করেন। তাঁকে তাই আরো পটু হতে হয় অভিনয়ে, সমগ্র ঘটনাটিতে নিজেকে মিশিয়ে রাখতে হয় সর্বদা এবং তখনই তার যে-কোনো অংশের অভিনয়েই তিনি নিজেকে সহজ বোধ করেন। অভিনয়টি এবং চরিত্রটি সম্পর্কে তাই স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার অভিনেতার। আর এজন্যই অনেক মহড়া তাঁকে সাহায্য করবে। যেমন, আজ কোনো একটি অংশের ছবি তোলা হল, সাতদিন পরে সেই অংশেরই শেষটুকু তোলা হবে ; আজকের মানসিক ও শারীরিক অবস্থাগুলিকে সাতদিনের জন্য বিশ্রাম দিতে হবে। সাতদিন পরে যাতে আবার তিনি সেই অবস্থায় ফিরে যেতে পারেন এইজন্য ধারারক্ষীর কাজ চিত্র পরিচালক করলেও অভিনেতার দায়িত্বই সবটুকু। মনের এই স্যুইচিং অফ্ আর অন্ করবার অভ্যাস একমাত্র বার বার মহড়া থেকেই আসে।

অধুনা, কোনো একজন বিখ্যাত এবং চিন্তাশীল বিদেশি পরিচালকের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। তিনি ধারাবাহিকতার অভাবকে ছবির অভিনয়ে অন্যতম বাধা মেনে নিয়েও চিত্র-গ্রহণ পদ্ধতির অনেকগুলি সুবিধার কথা বলছেন। তিনি মনে করেন, একজন অভিনেতা তাঁর অভিনয়ের চরিত্রটির মধ্যে ডুবে থাকেন অনেককাল ধরে, তিনি আরো সুবিধা পান চরিত্রের উপরে যা-কিছু পড়াশুনো করবার, ভাবার ও অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দেবার। মঞ্চের থেকেও ছবির এই পদ্ধতিতে অনেক বেশি সময় তিনি পান। কোনো চিত্র-গ্রহণের দিনে অভিনেতা ব্যস্ত থাকেন আট ঘণ্টা। সারাদিন তিনি তাঁর অভিনয়ের চরিত্রটির পোশাকে ঘুরে বেড়ান, একেবারে বাস্তবের অনুরূপ দৃশ্যসজ্জার ভিতরে বাস করতে হয় তাঁকে। তাঁর কল্পনাকে খোরাক দিতে থাকে এ-সব, তাই তাঁর অভিনয় আরো উন্নত হতে পারে।

এভাবে ধারাবাহিকভাবে চরিত্র ফোটানোর অভাববোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কী রকম, আর দীর্ঘ সময় নিয়ে চিত্র-গ্রহণের পদ্ধতির কেবল ভালোটুকু দেখা বৈজ্ঞানিক কি

না সেটা চিন্তার বিষয়। সোজা মহড়ার পথে চরিত্র বিশ্লেষণে না গিয়ে কেবল চিন্তার ভিতর দিয়ে অভিনয়ে উন্নতি হবে এটা খুব গোছানো কথা নয়। তার পরে, বহু সপ্তাহ ধরে একই অবস্থায় ডুবে থাকা একজন অভিনেতার পক্ষে বাস্তবিক জীবনে কতখানি সম্ভব তাও বিচার করা উচিত। মঞ্চে তিন ঘণ্টার জন্য হলেও ধারাবাহিকভাবেই অভিনেতা পরিণতিতে আসেন– সেখানে তাঁর নিজস্ব সত্তাও ওই কিছুক্ষণ ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু ছবিতে অভিনয় একদিনে কিছুক্ষণের জন্য নয়, এখানে পোশাকের মতোই তিনি ব্যবহার করেন চরিত্রটিকে। স্টুডিওতে ঢুকে অভিনয়ে নামার সময়ে চরিত্রটিকে পরিধান করেন, আবার স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাকে ফেলে আসেন। আরো, বহু সপ্তাহ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও ঘাতপ্রতিঘাত আছে, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁকেও পার হতে হয়। অর্থাৎ তাঁর চিন্তাধারাকে এককেন্দ্রিক করবার অন্তরায় থাকে অনেক। বরং মঞ্চে সুবিধা একটু আছে। সেখানে পর পর কয়েক রাত্রি একই ঘটনার মধ্যে তাঁর গতিবিধি থাকায় প্রতিদিনই নতুন কিছু চিন্তার খোরাক তিনি পান। ছবিতে এ সুবিধা নেই। ধরুন, একদিনে যে আট ঘণ্টা অভিনেতা কাজ করবেন, স্টুডিওর আবহাওয়ায় তিনি ঐ কয়েকঘণ্টাও নিরবচ্ছিন্ন তাঁর কাজে ডুবে থাকতে পারবেন না। চারদিকে যান্ত্রিক গোলমাল আছে, খাওয়ার ছুটি আছে, চিৎকার, নানান আলোচনা ইত্যাদি (তিনি অভিনয়ে চরিত্রের পোশাক পরে বাস্তব-ঘেঁষা দৃশ্যসজ্জার মধ্যে ঘুরলেও) তাঁর কাজে বাধা দেবে। কিন্তু অনেক মহড়ার গুণ এই, বাস্তবিক এত গোলমালের মাঝেও তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, অনেকবার আবৃত্তির মতো সহজ হয়ে আসে চরিত্রটি। তাই মহড়াই অভিনেতার কাছে তখন একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হবে। ছবিতে এই মহড়ার প্রয়োজন অনেক বেশি।

চিত্রশিল্প স্বভাবতই যৌথশিল্প। ব্যক্তিগতভাবে পরিচালকের দায়িত্ব থাকলেও অনেক কর্মীর অনেক কাজের যোগফল এ শিল্পে। কিন্তু এই নানান কর্মীর কাজের অংশগুলিকে গুছিয়ে দেবার শেষ দায়িত্ব পরিচালকের। চিত্রশিল্পের জন্মেরও আগে এই যৌথ সৃষ্টির ভালো উদাহরণ ছিল মঞ্চ। মঞ্চেও অভিনেতাকে লেখকের বন্ধনী আঁকা গণ্ডিতেই থাকতে হয়, প্রযোজক অনেক পরিমাণে তা ঠিক করে দেন। অভিনেতাকে মঞ্চে একটা নির্দিষ্ট নকশায় নড়াচড়া করতে হয়, সমস্ত নাটকটির অর্থ পরিস্ফুট করবার জন্যই। সহঅভিনেতার সঙ্গে থাকার সময়েও তাঁকে মঞ্চের ভারসাম্যের কথা মনে রাখতে হয়।

ছবিতেও পরিচালকেরই নির্দেশমতো চলতে ফিরতে হয় অভিনেতাকে। পরিচালকের চরিত্র ব্যাখ্যা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত তিনি জানবেন না অভিনয়ের কতটুকু অংশ শেষ পর্যন্ত ছবিতে থাকবে আর কতটুকু বাদ দেবেন সম্পাদক-কক্ষ কাঁচি চালিয়ে। অনেক অভিনেতা বলেন, এখানে তিনি গোটা ছবির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হন পরিচালকের হাতে।

আবার পরিচালক বহুক্ষেত্রেই সিম্বল বা দ্যোতক ব্যবহার করেন। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর কাছে অভিনেতা ছাড়াও আরো উপাদান আছে। তাদের ব্যবহার ছবিটির পক্ষে অনেকক্ষেত্রেই মূল্যবান। অভিনেতার অভিনয়কেও নানাভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই প্রয়োগের পদ্ধতিতে অভিনেতার অনেক কাজ কমে যায়। কিন্তু যৌথশিল্পে

এরকম বিচার চলে না।

অভিনেতার কাজের অংশগুলি অর্থাৎ অভিনয়ের ছবিগুলি সম্পাদনা-ঘরে চলে যায়, সম্পাদক ও পরিচালক পরামর্শ করে কিছু বাদ দিয়ে কিছু রেখে অর্থাৎ কোন্ অংশ ভালো হয়েছে, কোন্ অংশ থাকবে, থাকবে না ইত্যাদি ঠিক করেন। এতে অভিনয়ের মান অনেকখানি নির্ভর করে তাঁদেরই উপর। কাজেই দেখা যায়, সম্পাদনা-কক্ষেই অভিনয়ের আরো একটা জন্ম হয়। যদিও অভিনেতার কাজ স্টুডিওতেই আরম্ভ ও শেষ। এতে সম্পাদকের বিচার ও পরিচালকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে সব-কিছু শেষ পর্যন্ত।

সম্পাদককে আমরা তা হলে ধরে নিতে পারি, চিত্র মাধ্যমে অভিনয়কে দর্শকমনে সঞ্চারিত করে দেবার একটা আঙ্গিক হিসেবে। মঞ্চে এ আঙ্গিককে অভিনেতা নিজেই ব্যবহার করবেন। ছবিতে এ ব্যবহারকে ছাড়তে হয়েছে। এর স্থান গ্রহণ করেছে সম্পাদনা-কক্ষ।

এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনেতার সমস্ত কাজকে নির্ধারিত করা হয় বলেই একটা ধারণা অনেকেরই আছে যে, ছবিতে অভিনয় আসল অভিনয়ই নয়। অভিনেতার অভিনয়কে না বোঝাই বোধহয় এ ধারণার একমাত্র কারণ। এটা ঠিক, নতুন মাধ্যমে কোনো কিছু করতে যাওয়াতে প্রথমে অপবাদ আসে। লুমিয়েরদেরে চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পর কোনো ফরাসি চিত্রকর বলেছিলেন, 'এ হচ্ছে ছেলে ভোলানো খেলনা।' চলচ্চিত্র যে কোনো দিন শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের মতোই আশ্চর্য 'কম্পোজিশন' আর মধুর ভাব প্রকাশের বাহন হতে পারে এ কথাকে অনেকের মতোই তিনিও হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি প্রমাণ করেছে (অদূর ভবিষ্যতে আরো করবে) আর্টের রাজ্যে ফিল্ম কী করতে পারে।

পুরোনো মতো বিশ্বাসী, জীবনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু লোক আছেন, তাঁরা অভিনয়েরও পরিবর্তনের কথা ভাবেন না বা ভাবতে পারেন না। সকলের সঙ্গে একত্রে কিছু সৃষ্টি— এ তাঁরা তাই আয়ত্তে আনতে পারেন না। কিন্তু ছবিকে আরো এগিয়ে নিতে হলে এ কথা সকলের মতোই অভিনেতাকেও মানতে হবে। ছবি তৈরির সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যৌথশিল্পের এই পদ্ধতি।

চিত্রের আঙ্গিক সম্পাদনা, এ ধারণা পুরোনো দিনের ; অভিনেতার অভিনয়কে কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করে পরিচালক ও সম্পাদকের অভিনয়বোধ দেখানো যাবে এ মতেরও পরিবর্তন তাই দরকার। যৌথশিল্পের সবচেয়ে বড়ো কথা সমবেত দৃষ্টিভঙ্গি ; সকলের মধ্যেই এ চেষ্টা থাকা দরকার। অভিনেতারও এই দাবি হোক। প্রচলিত আঙ্গিক অভিনেতার কাছ থেকে তাঁর ক্ষেত্রকে কেড়ে নিয়েছে, তাঁর কাছে এই দাবিই অভিনয়কে আবার নতুন করে ফিরে পাওয়ার উপায় বা পথ। সম্পাদনার বিভিন্ন পদ্ধতি জানা যেমন পরিচালকের দরকার তেমনই অভিনেতারও প্রয়োজন অভিনয় ছাড়া সম্পাদনা, পরিচালনা ইত্যাদি ভালো করে শেখা। যাতে তিনিও সক্রিয়ভাবে সকলকেই কাজে সাহায্য করতে পারেন। এ সিদ্ধান্ত অবাস্তব কিছু নয়, কাজে লাগালে পরিচালকও লাভবান হবেন।

মঞ্চে যা ছিল সহজ ও একান্ত ব্যক্তিগত কাজ, সমবায় আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য তা অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে, আর কাজও জটিল হয়ে উঠেছে। অথচ ছবির উদ্দেশ্য

কোথাও খর্ব করছে না বরং উদ্দেশ্য আরো সফলতা লাভ করতে পারে এ পথে। কিন্তু অভিনেতার একমাত্র বাহন চরিত্র বিকাশের জন্য থাকবে তাঁর অভিনয়। শক্তিশালী অভিনেতা দরকার আজ তাই অভিনয় ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ছবির অভিনয় ক্ষেত্রে।

অভিনেতাকে চিত্রনাট্য রচনার শেষে আসতে হবে প্রত্যহ মহড়ায়। দিনের পর দিন মহড়ার ভিতর দিয়ে আরো পরিষ্কার করতে হবে অভিনয়কে, আবার সম্পাদক ও পরিচালকের পাশে থেকে তাঁকেও কাজে সাহায্য করতে হবে। শুধু অভিনয়ই নয়, সব কাজই অভিনেতাকে জানতে বুঝতে হবে ও সকলকেই সাহায্য করতে হবে। আর এই সমবেত চেষ্টার সঙ্গমেই আছে ভালো ছবি গড়ে ওঠার পথ।

কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং প্রদর্শনী হয়ে গেল। কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনে ইদানীং কালের এটাই যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আজকের দিনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শিল্প-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র কলকাতার নাগরিক জীবনে নিজের স্থান করে নিয়েছে। এবং এই উৎসব সেই জীবনেই বেশ একটা যে সাড়া আনতে পেরেছিল, বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের ভিড়গুলো তারই সাক্ষ্য দিয়েছে।

এতবড়ো এবং এত অভূতপূর্ব এই যে ঘটনা, এর পরিপূর্ণ তাৎপর্য আমাদের পক্ষে এখনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখা দিয়েছে আজকে, যে তাদের অনুধাবন করা দরকার।

প্রদর্শনীর দিকটাই আগে ধরা যাক। কলকাতা ভাগ্যবান যে অন্যান্য শহরের চেয়ে এখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ থেকে অনেক বেশি সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে। জনপ্রিয় প্রেক্ষাগৃহগুলো পাবার দরুন দর্শকগোষ্ঠী এখানে এই সুযোগটির পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছেন।

এই উৎসবের আগে এবং পরে— দুটোর মধ্যে যেন একটা বিরাট পার্থক্য বর্তমান। অনেকগুলো চলতি ধারণা ছিল এদেশে, যেগুলো অগ্রসর দেশগুলোতে রূপকথা বলে গৃহীত হলেও আমাদের অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে শোনানো হত। এ-সমস্ত ধারণা আমাদের ওপর চালিয়ে দেবার মূল হচ্ছে হলিউডি সংস্কৃতি! এদেশের বাজার একচেটিয়া করে রেখেছিল হলিউড সংস্কৃতি। এদেশের বাজার একচেটিয়া করে রেখেছিল হলিউড এবং ইংলন্ডের ফিল্ম। তারই বিষাক্ত প্রভাব বোম্বাইয়ের পথ ধরে দেশি দর্শকদের রক্তের সঙ্গে মিশে যেতে আরম্ভ করেছিল। আমাদের শোনানো হত, চলচ্চিত্র আমোদলাভের জন্য। গম্ভীর বিষয়, শিক্ষাপ্রদ বিষয় জনতা চায় না। বাস্তবকে বাস্তবের মতো করেই দেখালে বাস্তবিকই দর্শক হবে না। যদি কখনো গুরুপাক কোনো বিষয় পরিবেশন করতে হয়, সেন্টিমেন্ট এবং কল্পনার প্রলেপ দিয়ে সহজপাচ্য করে দিতে হবে। এই হল 'আর্ট ফর কমার্সেস সেক'-এর দলের বক্তব্য।

আর-একটা কথা বলা হত। চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রচার ডকুমেন্টারির বিষয় হতে পারে, কিন্তু প্রচারমূলক কাহিনী চালাতে গেলে মার খেতে হবে? আর্ট ফর আর্টস্ সেক। চলচ্চিত্র একটি শিল্প, ওতে প্রচার ঢুকিয়ো না।

ট্যাপডান্স, জ্যাজ্, লং আইল্যান্ড আর বেদিং বিউটির রপ্তানিদারেরা এই কথাগুলো বললেও আমাদের চলচ্চিত্রের ধারা এদের গ্রহণ করে নিচ্ছিল। এই দর্শনের প্রতি টান থেকে নয় অবশ্য, পয়সার প্রতি টানের জন্যই।

আমাদের কাছে প্রমাণ করা দরকার ছিল, শিল্প-টিল্পর কথা নয়, বাস্তবধর্মী ছবি যে পয়সারও খনি, এই কথাটা— এবং ঠিক সেইটিই হয়েছে। এই-সমস্ত মিথ্যার ঊর্ণাতন্তু প্রথম দরজাখোলার হাওয়াতেই উড়ে গেছে।

যে হলিউড চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম দিয়েছে, সেই গ্রিফিথের হলিউড, সেই আমলের ডিয়েটার্লের হলিউড, *গ্রেপ্স্ অফ রথ*-এর জন ফোর্ডের হলিউড, মানবতার ধ্বজাবাহক সে হলিউড আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজকের বলিষ্ঠ জীবনের ধারা চলে এসেছে ইতালিতে, রাশিয়ায়, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। এ-সব দেশের ছবি কোনোদিনই আমাদের দেখানো হত নাই বলা চলে। আজ আমরা, সাধারণ দর্শকরা, প্রথম দেখার সুযোগ পেলাম, বুঝলাম— কত বড়ো মিথ্যের ধোঁকা দিয়ে আমাদের রাখা হয়েছিল। প্রচারমূলক ছবি মিসেস ডেরী, লাইট রিটার্নস টু এ সিটি, ফল অফ্ বার্লিন আমাদের মধ্যে কী উদ্দীপনারই না সৃষ্টি করেছে! যথাযথ জীবনের দর্পণ বাইসিক্ল্ থিফ্, ওপন সিটি, আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। কলকাতার দর্শকের কাছে এই উৎসব শিক্ষার একটি উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে। আগে আমরা যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনটি আমরা থাকতে পারিই না। আমরা জীবনকে এবার চাইবই চলচ্চিত্রের কাছ থেকে।

এই উৎসব ব্যাবসাদার এবং চিত্রকুশলীদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। স্টুডিও মহলে কিছু ঘোরাঘুরি করলেই নানারকম কথাবার্তা আজকাল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে— বিশেষ করে ইতালিয়ান ছবিগুলি আলোড়ন এনেছে। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো নানারকম রূপ নিচ্ছে কিন্তু কাজে এর সুফল কিছু-না-কিছু ফলবেই। আমাদের ছবি মোড় ঘুরতে শুরু করবে। এতদিন মুষ্টিমেয় দু-একজন যে জাতের ছবি সম্বন্ধে হয় ঘরে বসে গভীর আলোচনা করছিলেন, নয়তো দোরে দোরে বৃথাই ঘুরে মরছিলেন, সেই জাতের ছবি এবার হতে আরম্ভ করবে, এর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গির যে সংকীর্ণতার জন্যে বাংলা ছবি ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে আসছিল, সেই সংকীর্ণতা এবার কিছুটা ঘুচবে, এ আশা করা যাচ্ছে।

কাজেই এ-প্রদর্শনী আমাদের চিত্রসংস্কৃতির জীবনে একটা পর্যায়ের শেষ ঘোষণা এবং নতুন পথের দিক নির্দেশ করছে, এ কথা বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

প্রদর্শনীর দিক সম্বন্ধে যেমন এতগুলো ভালো কথা বলা গেল, বোধহয় উৎসবের দিকটা সম্বন্ধে তা যাবে না। এই উৎসবকে উপলক্ষ করে বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত কুশলীরা এখানে এসেছিলেন। শত বাধা সত্ত্বেও তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় কর্মীদের ভাবের যেটুকু আদানপ্রদান হয়েছিল, সেইটুকুই আমরা লাভ করতে পেরেছি। বিশেষ করে সোভিয়েট কর্মীরা এখানে

ডকুমেন্টারির কিছু কাজ করে গেছেন। তাঁদের কাজ করার পদ্ধতি, ব্যক্তিগত ব্যবহার এবং জ্ঞানের গভীরতা কোনো কোনো স্টুডিওর কর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পেরেছেন। এটা একটা বিরাট লাভ। আমরা প্রচুর শিখতে পেরেছি। এ ছাড়া বিশেষ করে যে-সব কর্মী বিখ্যাত ডকুমেন্টারি-পরিচালক ভার্লামফের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছেন, তাঁরা সত্যিই সৌভাগ্যবান। গালিনা মঙ্গলবস্কইয়া, আন্দ্রি সোলোগুবভ, ইভান্ ইভানোভিচ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি ক্যামেরাম্যানদের কাজ করতে দেখা একটা অভিজ্ঞতা। এঁদের মধ্যে আন্দ্রি আন্তর্জাতিক শান্তি-পুরস্কার প্রাপ্ত। গালিনা শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী এডুয়ার্ড টিসের ছাত্রী। ইভান্ ইভানোভিচ ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের ফ্রন্ট-লাইন ক্যামেরাম্যান। এঁদের অভিজ্ঞতা, চরিত্রের অপরূপ মাধুর্য, কাজ করার সরল সুন্দর ভঙ্গি অতুলনীয়।

তার ওপরে যাঁরা সেমিওনফকে চিত্র সম্বন্ধে বলতে শুনেছেন, ভাখতাম্গোভ থিয়েটারের কর্মী নিনা আরকিপোভা, সোভিয়েট ইউনিয়নের পিপল্স্ আর্টিস্ট শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ভেরা মারিয়েতস্কাইয়া, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা চেরকাসফ বরিসফ— এঁদের শিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যাঁরা শুনেছেন,— নিজেদের দিগ্দর্শনের পথে তাঁরা সত্যিই অগ্রসর হবার পাথেয় পেয়েছেন।

এ ছাড়া চীনা, হাঙ্গেরিয়ান ইত্যাদি দেশের প্রতিনিধিরাও মেশার চেষ্টা করেছেন যতটা সম্ভব। চীনা ক্যামেরাম্যানরাও কিছু ছবি নিয়ে গেছেন।

এঁদের সান্নিধ্য এনে দিয়ে এই উৎসব একটা বড়ো কাজ করেছে। কিন্তু এখানেই বোধহয় ভালো কাজের শেষ। ইডেন গার্ডেনে যে আসল উৎসবটি হল, সেটা আমাদের হৃদয়ের দৈন্য প্রকট করে দিয়েছে। ঠিক যেমন দিয়েছে অন্যান্য দেশের ছবির পাশে আমাদের দেশের নিষ্প্রভ ছবিগুলি। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিরা দেশের কী চেহারাই না দেখে গেলেন!

ইডেন গার্ডেনের উৎসবটা প্রথম থেকেই সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে থেকেছে। সরকার এবং বাংলার চিত্র প্রযোজক সংঘ হয়েছেন এর উদ্যোক্তা। উৎসব মূলত শিল্পের দিকটা নিয়েই বেশি চর্চা করে। সেদিক থেকে এই উদ্যোক্তাদের চেয়ে অকেজো কিছু কল্পনা করাই কঠিন। বাংলার চিত্র-কুশলী সংঘ ম্রিয়মাণ হলেও এতে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবেই গ্রহণ করে এইজন্যেই। সারা ইডেন গার্ডেনে চিত্র ব্যাপারটাই সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছিল।

মোটের ওপর এই উৎসব পরিচালনার দোষে একটা বড়ো সুযোগের অপব্যবহার করেছে। যতটা লাভ করা উচিত ছিল আমাদের তার সিকিভাগও হয় নি।

শুধু প্রদর্শনীটিই আমাদের উপকার করেছে। এত বৈচিত্র্যময়, অপরূপ, ভদ্র, পরিচ্ছন্ন যে চিত্রশিল্প, মার্কিন ছবির কল্যাণে আমরা সেটা জানতেই পারি নি। এই জ্ঞান আমাদের হল।

এই বিরাট লাভ।

সোভিয়েট ছবি 'গ্রান্ড কন্‌সার্ট'

বলশয় অপেরা এবং মস্কো কন্‌সারভেতোরে সম্বন্ধে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি। ডকুমেন্টারি ছবির সঙ্গে কাহিনী গেঁথে ছবিটি তৈরি করা হয়েছে। মুসোরগস্কির মতোই এটিও একটি সংগীতমুখর ছবি। কয়েকখানি ব্যালে নৃত্যও আছে, কাহিনীর উপপাদ্য বিষয় হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নে শিল্পীদের সঙ্গে মেহনতি জনতার গাঢ় সৌহার্দ্য কীভাবে হয় এবং কী করে জনতার মাঝ থেকে শিল্পী জন্মগ্রহণ করে।

নৃত্য-গীতসংবলিত ছবি বলতেই আমাদের একটি বিশেষ ধরনের ছবির কথা মনে হয়। হলিউড এবং বোম্বাই আমাদের মাথায় সে ধারণাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। মুসোরগস্কি এবং গ্র্যান্ড কন্‌সার্ট দেখে সে ধারণা বিরাট ধাক্কা খেল। ক্লাসিকাল সংগীত এবং নৃত্য সোভিয়েত ফিল্মে অত্যন্ত বেশি সম্মান পায়।

এমন-কি গ্রেট ক্যারুসো ইত্যাদির মতো ঐতিহাসিক ছবিতেও হলিউড ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। কাল্পনিক কাহিনী খাড়া করেছে, সে-সব ছবি দেখে এলে মনে হয়, বড়ো জোর কোনো একটি গায়কের কয়েকটি ভালো গান শুনে এলাম। আর সোভিয়েট ছবিগুলি ইতিহাসকে উঁচু ক'রে ধরে। একটা যুগ, একটা সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ছবিগুলিকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠিয়ে দেয়।

গ্র্যান্ড কন্‌সার্টে এ জিনিসটি আছে। পৃথিবীর ব্যালে নৃত্যের পীঠস্থান বলশয় অপেরার ভেতরে প্রবেশ করে সেখানকার মহান শিল্পীদের শিল্পচর্চা এবং তাঁদের সঙ্গে যৌথখামারের মেহনতি জনতার যোগাযোগ আমরা দেখতে পেলাম।

এ ছবিতে আলেকজান্ডার বোরোদিনের অপেরা— "প্রিন্স ইগর" সম্পূর্ণটুকুই আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর রাশিয়ার এক প্রিন্সের দেশ রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের এই কাহিনীতে প্রিরোগোফ্, মিখাইলফ, স্মলেন্‌স্কইয়া প্রভৃতির মতো শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেছেন।

চাইকোভস্কির বিশ্বখ্যাত ব্যালে— "সোয়ান্ লেক" এখানে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দিয়ে দেখানো হয়েছে। মস্কো কন্‌সারভেতোরের শিক্ষাপদ্ধতিও এইসঙ্গে দেখানো হয়। গ্লিনকার অপেরা "ইভান্ সুসানিন" থেকে খানিকটা আছে ছবিটিতে।

কিন্তু শুধু এই সব ক্লাসিকাল সংগীত এবং নৃত্যই একমাত্র সম্পদ নয় ছবির। আধুনিক সংগীতকারদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট সুরকার সার্‌গি প্রোকোফিয়েকের ব্যালে "রোমিও-জুলিয়েট" থেকে একটি দৃশ্য করে দেখানো হল। শ্রেষ্ঠা নৃত্যশিল্পী গ্যালিনা উলানোভা জুলিয়েটের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

এবং যৌথখামারের কর্মীদের উৎসবে বিভিন্ন লোকসংগীত শোনানো হয়েছে। বিখ্যাত গায়িকা ভাবিভোভা, মাক্‌সাকোভা প্রভৃতির একক সংগীতও ছবিতে আছে।

সংগীত এবং নৃত্যের সৌন্দর্যে ছবিটি পরিপূর্ণ। তার সঙ্গে মিলেছে সোভিয়েট কালারের' স্নিগ্ধ বর্ণসম্ভার। টেকনিকালারের মতো এর রঙ চোখকে পীড়া দেয় না। শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের আঁকা ছবি যেমন, তেমনি আল্‌গোছে মিলিয়ে যায় এক রঙ অপর রঙের সঙ্গে।

যাঁরা সংগীত, নৃত্য এবং মঞ্চকলা ভালোবাসেন বা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে এটি একটি

অবিস্মরণীয় ছবি। এত শিক্ষণীয় জিনিস আছে ছবিতে যে বার বার দেখতে হয়। তবে দর্শকসাধারণের কাছে এ ছবি হয়তো খুব আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। কারণ কাহিনীতে গতির অভাব এবং ডকুমেন্টারি দিকটাই ভরে রেখেছে বিরাট অংশ। টেক্‌নিকের দিক থেকেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই ছবিতে। এর প্রাণ হচ্ছে সংগীত এবং ব্যালে নৃত্য।

বাইসাইক্‌ল্ থিফ

ভিস্তোরিও ডি সিকার এ-ছবিটির কথা ভাবলেই একটা কথা কেবল মনে পড়ে— বয়োবিজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে ইংরেজিতে বলে "অ্যাডাল্ট অ্যাপ্রোচ"। একটা প্রাজ্ঞ সংযম সমস্ত ছবিময় ছড়িয়ে আছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাস্তবের যথাযথ রূপায়ণকে পরিণতির কোন্ স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় তা বোঝা গেল ছবিটি দেখে। বাস্তবকে চিত্রায়িত করতে হলে মাধ্যমের উপযোগী করে নেবার খাতিরে খানিকটা অতিরঞ্জন করতেই হবে— এই ধারণার সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছেন ডি সিকা। বাইসাইক্‌ল্ থিফ-এ গল্প বলাটা একেবারেই যেন একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।

একটি ছোটো গল্প তার পরিপূর্ণ স্বকীয়তা নিয়ে ছবিতে রূপ পেয়েছে। একটিই ধারণা, তারই পল্লব-প্রসারণ, এবং সবশেষে একটি স্পর্শে দর্শকের সমস্ত মনকে উদ্ভাসিত করা, প্রদীপের মতো। সেই মীড়ের অনুরণন চলতে থাকে মনের মধ্যে বহুক্ষণ ধরে। শহরের সমস্যাসংকুল নিম্নবিত্ত জীবন তার সমগ্র বাস্তবতা নিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে ছবিটির মধ্যে। মহানগরীর জীবন চলেছে তার নির্বিকার উদাসীনতা নিয়ে, তারই মধ্যে একটি বেকারের সাইকলসহ চাকরি পাওয়া ; সেটি চুরি যাওয়া, নিজের ছেলেটিকে নিয়ে সেই সাইকেলটির অনুসন্ধান, এবং শেষ অবধি তা না পেয়ে চুরি করতে গিয়ে বিফল হওয়া— নিষ্ফল একটা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঠিক পরিণতি তার সমস্ত অসহায়তা নিয়ে ফুটে উঠেছে।

আর গল্পটা যেন একটা উপলক্ষ। বিরাট জীবনের স্রোতোধারাকে তার তরঙ্গের পর তরঙ্গের ভিতর দিয়ে গতিসমেত ধরে ফেলা হয়েছে ছবিটিতে। মনে হয়, জীবনের একটি টুকরোকে তার মুহূর্তগত খুঁটিনাটি সমেত দেখে এলাম— কোনো ছবি নয়। গণৎকার বৃদ্ধাটির কথাগুলো, বাস ড্রাইভারের সহজ ভঙ্গির উক্তি— নিষ্পেষিত জীবনের প্রতিটি রবিবার ভরা থাকে শুধু বৃষ্টির কান্নাতে— রাস্তার অ্যাকর্ডিয়নবাদক ভিখারিকে পোস্টার লাগানো লোকটির লাথি মারা, গির্জার উপাসনা চলা আর তার সঙ্গে সঙ্গে চোরের বন্ধুটিকে চেপে ধরে নায়কের কথা বলা— সমস্ত ছবি জুড়ে অজস্র ছড়িয়ে আছে এমনি সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশিত সর্বহারা জীবনের সমালোচনা। দেখার সময় কোনো কৃত্রিম ভঙ্গির, কোনো কৃত্রিম সাজানোর কথা মনেই পড়ে না— ধীরে ধীরে মনে জেগে ওঠে অপূর্ব কবিতার মতো একটি জীবনদর্শন। এই যে আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, সরল গতিতে— এ যে কী অনবদ্য তা শুধু অনুভব করা যায়।

আর কী অপরূপ সংযম। বহু জায়গায় কৃত্রিম মাধ্যমে অভ্যস্ত মন চেয়েছে প্রতীকের

ব্যবহার, আবেগের প্রকাশ, নাটকীয় প্যাঁচ। কিন্তু প্রতিবারই ডি সিকা চমকিত করে তুলে দর্শকের মন অপরূপ এক মাধুর্যে ভরে দিয়েছেন। অথচ প্রত্যেকবার তিনি মনকে প্রস্তুত করে গেছেন সেই আশা জাগিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর আয়ত্তের মধ্যে আছে এ-সমস্তই। সিনেমার পোস্টার লাগানোর সময় নায়কের হাতে দিয়েছেন রিটা হেওয়ার্থ-এর পীনোদ্ধত আবক্ষ ছবি, যা নায়কের জীবনের পাশে এক অপূর্ব বিরোধাভাস (কনট্রাস্ট), এবং যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে একটা তীব্র ঘৃণা। আমাদের মনের মধ্যে চকিতে খেলে গেল এর ফিল্মপ্রকরণগত সম্ভাবনা। ডি সিকা কিন্তু পোস্টারটিকে কোনো আমলই দিলেন না— পরিণত প্রবীণ ভঙ্গিতে এড়িয়ে গেলেন প্রতীকের ব্যবহার, এমনভাবে ক্যামেরা ব্যবহার করলেন যাতে সবচেয়ে অনুল্লেখযোগ্য অবস্থানে সেটা থাকে।

নায়ক নিজের ছেলেটিকে নিয়ে সাইকেল খুঁজতে খুঁজতে চলেছে, সারা দিনের ক্লান্তি পায়ে জড়িয়ে। ছেলের সঙ্গে হয়ে গেল রাগারাগি। ছেলেও কঠিন ছেলে, কিছুতেই আর কাছে আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি চলল বটে, তবে মাঝখানে হাত বিশেক ফাঁক রেখে। খানিক বাদে বাবা ছেলেটিকে দূর করে দিয়ে একাই নদীর ধারটা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ ভেসে এল কোলাহল, একটি ছোটো ছেলে জলে ডুবছে। বাপের মন আঁতকে উঠল, ছুট দিল উদ্‌বিগ্ন মনে। গিয়ে দেখে অন্য ছেলে। ঘুরে নদীর ধার থেকে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে যাবে, দেখে একেবারে ঘাটের উপরে তার ছেলে গালে হাত রেখে বিজ্ঞের মতো বসে আছে। ক্লান্ত একটি ফুল যেন। তার মাথার উপর দিয়ে বিরাট উদার আকাশটা দেখা যায়, ধীরমন্থর গতিতে পরম উদাসীন কটা মেঘ ভেসে চলেছে। বাপ উঠল, কাছে গেল। আমরা আশা করলাম ঝগড়াটা মিটল বুঝি, এবার নিশ্চয়ই ছেলেটিকে আদর করবে। মোটেই না। একটা চাঁটি মারতে গেল, ছেলেটা তড়াক করে সরে গেল। আবার দুজনে চলল!

ছবির শেষটা। চোর ধরতে না পেরে নায়ক শেষ অবধি নিজে চোর হয়ে অপরের সাইকেল নিতে গিয়ে ধরা পড়ল। বেদম মার খেল। ছেলেটা ভিড়ের বাইরে থেকে বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরল লোকদের বোঝাতে গিয়ে। যে-ভদ্রলোকের সাইকেল, তিনি কিন্তু ওকে ছেড়ে দিলেন— যথেষ্ট মারই তো হয়েছে! আর থানা-পুলিসের ঝামেলায় গিয়ে কী হবে?

দুজনে আবার পথ চলতে লাগল। পিছনে ভিড়ের থেকে বিদ্রূপ ভেসে আসে। নায়কটির সারাদিনের ক্লান্ত মুখে মারের দাগ। ছেলে কাছে এল, হাত ধরল। নায়ক হাঁটতে হাঁটতে একবার ছেলের দিকে তাকাল। সে জলভরা চোখে সান্ত্বনা দেবার শিশুসুলভ চেষ্টা করছে। নায়ক তার হাতটা একবার টিপে দিল। নিজের থুতনিটা দুবার কেঁপে উঠল। তার পর অক্ষম ক্ষোভের কান্না একা জীবনের লড়াইয়ের সমস্ত ধিক্কারসমেত বেরিয়ে এল। কিন্তু ওদের পা চলতেই থাকে। তখন সন্ধ্যা— সারা শহরের ছুটির সন্ধ্যা।

দৈনন্দিনের কবিতা। এ ছাড়া আর কিছু একে বলা যায় না। সত্যের থেকে একবারও বিচ্যুত না হয়ে সৎ থাকার এ-উদ্যমের জুড়ি নেই। এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত, এমন ভাবের ছোটো ছোটো ছোঁয়া সারা ছবিময়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এ-ছবি ক্রোধ জাগায়, হতাশায় ভরে দেয় না। এই কানাগলির ভিতর থেকে, এই নিষ্পেষণের জাঁতাকলের তলা থেকে ঠেলে ওঠার একটি পবিত্র রাগ ভিতরে ফুলে ফুলে ওঠে।

ডি সিকার ক্যামেরাও এই সহজ সরলতার খাতিরেই অকৃত্রিম ভঙ্গিতে তাকিয়ে গেছে।

যেখানে যে-ঘটনার গাল্পিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেছে সেখানেও ক্যামেরা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেছে। হঠাৎ বুঝতে পেরেছি সেই অপ্রয়োজনীয় প্রতীক্ষাটুকু গল্পের আসল বক্তব্যকে জোরদার করেছে। তাই ছটি বিছানার চাদর বাঁধা দিয়ে যখন বন্ধক-রাখা সাইকেলটি নায়ক ছাড়িয়ে আনল, তখন সাইকেল ডেলিভারি নেওয়ার সময় সেই চাদরগুলি নিয়ে একজন কর্মচারী চলে গেল। নায়ক একবার তাকিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। আমরা কিন্তু থেকে গেলাম। গুদোমঘরের ছাদের উঁচু তাকে সেই চাদরগুলোর নিশ্চিন্তে জমা হওয়াটা দেখে নিয়ে তবে আবার নায়কের সঙ্গ ধরলাম।

রাস্তায় নায়ক পোস্টার মারা শিখছে অভিজ্ঞ লোকটির কাছে। পিছনে এল একটি ভিখারি। লোকটি একবারও না তাকিয়ে সবুট পা চালিয়ে দিল ভার বুকে। ভিখিরিটা চলতে শুরু করল। আমরা ঘুরে চেয়ে রইলাম।

খানিকদূর গিয়ে সে আবার গান ধরল। একেবারে মোড়ে গিয়ে একবার সে ফিরে তাকাল। তাকে অতদূর অবধি রওনা করিয়ে দিয়ে তবে আমাদের নিশ্চিন্দি।

কম্পোজিশন যে ডি সিকার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আছে তার প্রচুর প্রমাণ দেখলাম। কিন্তু তারা আসে স্বাভাবিকভাবে, মিলিয়ে যায়— ঠিক বাস্তবে যেমন। "মন্টাজ"-এর অপূর্বতা দেখলাম— পর পর ছয়টা শটে বৃষ্টিভেজা পথ দিয়ে ওদের দৌড়নো থেকে শুরু করে খটখটে পথে ওদের দাঁড়ানো পর্যন্তর মধ্যে।

হঠাৎ জীবনের মধ্যে চলে এলাম যখন দারোগা বলে, একটা তুচ্ছ সাইকেল খোঁজার জন্যে এত খরচ করে পুলিস পোষা হয় না। ওটা নায়ককেই খুঁজে নিতে হবে। তবে সে যখন এত আইনানুগত লোক, তখন সাইকেলটি পেলে সে যেন একবার জানিয়ে যায়— ডায়েরিতে টুকতে হবে।— আর পরমুহূর্তেই দারোগা হুকুম দিল ট্রাক বোঝাই পুলিস এখনই পাঠাতে হবে, একটা মিছিল বেরোচ্ছে মজুরদের।

আর-একটা জায়গায় চমক লাগে। ছোটো ছেলেটি বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত। এক ফোঁটাও অবসর পায় নি। বাবা একটু অন্য দিকে গেছে। ছেলে একটি বাড়ির কোণা দেখে নিয়ে প্যান্টের বোতাম খোলে। বাপ ডাক দিল। চমকে বেচারি বোতাম আঁটতে-আঁটতে দৌড়ল। জীবনে একেবারে অবসর নেই।

অভিনয় সম্বন্ধে এর পর আর কিছু বলার দরকার করে না। ডি সিকার কাছে ক্ষুদ্রতর ভূমিকাটিও একটি পরিপূর্ণ ইতিহাসওয়ালা মানুষ। এবং মানুষগুলো একেবারে আমাদের চারপাশের। বিশেষ করে নায়ক ও ছোটো ছেলেটির কথাই বার বার মনে হয়।

আমাদের শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে-ধরনের অনাড়ম্বর সংযত কথন খানিকটা পাওয়া যায়, সেই সহজ রসটিই এ-ছবির প্রাণবস্তু। বসিলিনির থেকে শুরু হয়েছে যে নতুন ইতালিয়ান ধারা তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি এই 'বাইসাইক্‌ল্ থিফ" ছবিটি।

এ-ছবির সম্বন্ধে আগে পড়েছিলাম। কিন্তু না দেখা পর্যন্ত অত উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কারণ বুঝতে পারি নি। এর সম্বন্ধে কোনো লেখা পড়েই বোঝা সম্ভব নয়। দেখাই হচ্ছে একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা। এর যে সাধারণ আবেদনটি তা দেখামাত্র তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অভিভূত করে দেয় না। ধীরে ধীরে, যত সময় যায়, মনের মধ্যে থেকে থেকে জেগে ওঠে— পদ্মার শাদা ধূ-ধূ চরের মতো।

আমাদের দৃষ্টিতে বাস্তববাদী ধারা

সর্বজনগ্রাহ্য কতকগুলো কথা প্রচলিত আছে আমাদের মধ্যে— যেমন চিত্রই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাস্তবমুখী শিল্প ; সবচেয়ে শক্তিশালী বাস্তবতার মাধ্যম ; বস্তুমুখী জীবনকে তার সর্ববৈচিত্র্য সমেত ধরতে পারে একমাত্র চলচ্চিত্রই,— ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলো তলিয়ে দেখা বিশেষ হয় নি এতদিন, অবকাশও তার বিশেষ ছিল না। গণনাট্যের নতুন জোয়ারের মধ্যে ছবিটা কোনো সময়ই এসে পড়ে নি।

আজ অবস্থার বদল হচ্ছে। এবং অতি নিকট ভবিষ্যতে আরো বদল হবেই। ছবি মোটেই কোনো দূরের জিনিস থাকবে না আর। গণনাট্যের চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত বা তার সহগামী একটা শক্তি চিত্রজগতে তার স্থান করে নিচ্ছে। কিছুদিন বাদে নেতৃত্বও নেবে— এ অবধারিত।

আইজেনস্টাইন, পুদোভকিন বা গ্রিয়ারসন্ পড়ার দরকার আছে, স্টানিস্লাভস্কির মূল বক্তব্যকে চিত্রের মাধ্যমের মতো করে গুছিয়ে নেওয়া সম্বন্ধেও আলোচনা চলবে। ইতালিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান বা রাশিয়ান ছবির ইতিহাস জানার দরকার নিশ্চয়ই আছে,— কিন্তু তার আগে দরকার বাংলা এবং ভারতের ছবির গতি-পরিণতি, বাংলার দর্শকদের বৈশিষ্ট্য এবং বাংলার নিজস্ব বাস্তবকে ভালো করে অনুধাবন করা। বিদেশি বই কিছু পড়াশুনা করলেও বিলিতি ছবি নিয়ে ঘোরতর আলোচনা চালালেও— নিজেদের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মোটামুটি উন্নাসিকই থেকে গেছি আমরা। Rise of American films থেকে ফোর্ড, চ্যাপলিনের শিল্পজীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আমরা জেনেছি, কিন্তু একটা মেহবুব কি শান্তারামের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে নীবব থেকে গিয়েছি।

একজন বড়ুয়া কি মেহবুব আলোচনার অনেক মালমশলা দিতে পারেন আমাদের। আর বাস্তববাদ সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে সর্বাগ্রে নিজেদের চারপাশের বাস্তবকে যদি আমরা হিসেবের মধ্যে না আনি, তা হলে সেটা হবে হাওয়ায় ইমারত গড়া। এ সাবধানবাণীর দরকার আছে মনে হয় প্রগতিশীল পত্রিকাগুলোতে চিত্র-সমালোচনা পড়ে। ভারতীয় ছবিরও একটা ঐতিহ্য আছে। আজ মার্কিনী ঢঙ আর ইতর ন্যাকামিই আমাদের একমাত্র অবদান নয়— রোটি, আদমি আর দেবদাস, গৃহদাহও আমাদের চিত্রজগতের একটা বিরাট ধারা। সেই ধারাই জয়ী হয়ে চলেছে আজও পর্যন্ত। শুধু ইতিহাসকারের অভাবে সেই বিশ্লেষণ এবং পথ কখনো চিত্রনির্মাতাদের সামনে তুলে ধরা হয় নি। বাংলাদেশে, আমি তো বলব : সমাধান, ভাবীকাল, উদয়ের পথে, পরিবর্তন, বিদ্যাসাগর, বাবলা-র মধ্যে দিয়ে সেই ধারাই আজও বলিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে চলেছে।

এই সব বইগুলোর কি দুর্বলতা নেই? আমরা যখন ছবি করতে যাব, তখন এই ধরনের বই করে যাব কি? মোটেই না। দুর্বলতা, অবাস্তবতা— এদের মধ্যে আছে ; কিন্তু কোথাও আন্তরিকতা এগুলোর মধ্যেও ছিল, এই সম্মানটুকু এদের দিতে বলছি। তা হলেই দুর্বলতাগুলো শুধুই দুর্বলতা হয়ে দেখা দেবে, অপাঙ্‌ক্তেয় করে তুলবে না এদের।

"বাংলা বই যাচ্ছেতাই" "ভারতীয় ছবি না দেখাই উচিত", "এগুলো"র সম্বন্ধে বিদ্বানসমাজে আলোচনাই করা চলে না।"— এসব অনেক বলা হয়েছে। কিন্তু কাজে কিছু

করা হয় নাই একমাত্র "ধরতী কে লাল" বাদে। এইসব ধরনের কথা বলা ছেড়ে, এখন কাজ দেখাবার সময় এসেছে।

বক্তব্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে যে দুর্বলতা ছিল, প্রধানত তা অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দুর্বলতা। এর ফলেই শস্তা সেন্টিমেন্টের মধ্যে বারে বারে ছবিগুলি আবর্তিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বাস্তবকে অনুধাবন করে শিল্পসুলভ হৃদয়াবেগের সংযোগে ছবি করা এইটেই আজকের প্রগতিশীল কাজ। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে বই করা হয়েছিল, তাতে হৃদয়াবেগের অবকাশ থাকলেও এবং বিষয়বস্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও শিল্প হিসেবে ছবিটি উৎরোয় নি। সেটি হচ্ছে, "ছিন্নমূল", শুধু বিষয়বস্তু নয়, প্রকাশভঙ্গিতেও কাঁচা ছিল ছবিটি। তবু বাস্তববাদী বিষয় এবং আঙ্গিক ভারতে প্রথম ব্যবহৃত হয় এই ছবিতে। ছবির নিজের শিল্প অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে জায়গায় জায়গায় প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাই সমস্ত খুঁত থাকা সত্ত্বেও সোনার অক্ষরে 'ছিন্নমূল'-এর নাম লেখা থাকবে প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোভাগে প্রথম দিকদর্শক হিসেবে। 'ছিন্নমূল' আমাদের গৌরব।

জার্মান উফা'র ছবি, ফরাসি 'আভাঁ গার্দ'— আন্দোলন, রাশিয়ার আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন, ডভ্‌শেঙ্কো, আলেকজান্দ্রভ্‌দের নতুন পথের দিকসংকেত, হলিউডের গ্রিফিথ থেকে আরম্ভ করে ডিয়েটার্ল ফোর্ড, চ্যাপলিন পর্যন্ত, গ্রিয়ারসনের নেতৃত্বে ইংলন্ডের ডকুমেন্টারি আন্দোলন,— আজকের রসেলিনী ডিসিকার ইতালি, সারা পৃথিবীর বাস্তববাদী চিত্রের যে বিরাট বৈচিত্র্যময় অভিযান, সে সম্বন্ধে আমরা অনেক জানি।

শুধু জানি না একজন বড়ুয়া কী করে 'অপরাধী' থেকে 'দেবদাস'-এর মধ্যে দিয়ে 'গৃহদাহে' এসে পৌঁছল। তার পর তাঁর পতন, এর কারণ বিশ্লেষণের কোনো চেষ্টাই আমরা করি নি। দেবকী বসুর বিরাট প্রতিভা শেষ অবধি পৌরাণিকেই সীমাবদ্ধ হলেও মাঝে মাঝে 'কবি' ইত্যাদির মধ্যে কেমন করে চমক দেয়? আজ মেহবুব্ 'আন্' তোলেন। কিন্তু তাঁর 'রোটি' 'Only way' এসব বইয়ের কথা আমরা ভুলে গেছি। আমাদের মনে রাখা উচিত, বোঝার চেষ্টা করা উচিত। কারণ নতুন ছবির আন্দোলন যাঁরা করবেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হলেই চলবে না, সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোককে নেতৃত্বও দিতে হবে— এটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবকে বার বার অনুসন্ধান করতে হবে। একটা 'বাইসাইক্‌ল্ থিফ' তৈরি হয় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ঘন যোগসূত্রের মাধ্যমেই— চমক লাগানোর চেষ্টার দ্বারা নয়। আমাদের 'বাইসাইক্‌ল্ থিফ' পথে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। শ্রদ্ধা নিয়ে খুঁজলে দেখব, তার ইতালির ঘটনার সঙ্গে গল্পের সঙ্গে কোনো যোগই নেই, অথচ তার মতোই দেশের মরমের কথাটি সে বলছে।

আঙ্গিকের উপর পরিপূর্ণ দখল নিতেই হবে। তার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকে অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সে আঙ্গিক হবে একেবারেই দেশজ আঙ্গিক। একেবারেই তার জন্ম হবে না— হবে ধীরে ধীরে, যেমন শিল্পী অনুভব করতে করতে চলবেন সেই পথে।

চিত্রে বাস্তবতা কীভাবে ব্যবহার করা যায়, কেমনভাবে তার ব্যবহার হয়েছে, এ-সব বিষয়

নিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। তার থেকেও যেটাকে বেশি জরুরি মনে হয়েছে, সেই কথাটাকে ঘুরে ফিরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে।

তবু, এটা জানা দরকার যে আজও বহু প্রভাবশালী এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার লোক আছেন, যাঁদের বিশ্বাস ছবিতে আমোদই দেওয়া উচিত ; সেখানেও জীবনের দুঃখ-কান্নার প্রতিফলন বিরক্তিরই উদ্রেক করবে! র‍্যাশন নেই, খাওয়া হচ্ছে না এ আর ছবিতে দেখে কী হবে, দেখবেই না কেউ।... এঁদের যুক্তির সমর্থনে অবশ্য এরা একটিও ছবি দেখাতে পারবেন না যাতে ঐ-সব যথাযথভাবে দেখানো হয়েছে। কাজেই বিরক্তির কথাটা তাঁদের মনগড়া এ কথা বোঝানোর দরকার আছে।

সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরা উচিত, যে ছবি বাস্তবের যতটা কাছে গেছে, সেই ছবি ঠিক ততটাই জনপ্রিয় হয়েছে। অবশ্য শিল্প হিসেবে উৎরোলেই সে কথা বলা চলে।

এই সব কথাগুলিকে বলার জন্যে আজ 'ছিন্নমূল'-এর সহযাত্রী বহু শক্তিশালী শিল্পী সমাবিষ্ট হয়েছেন। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা বাস্তবকে চিত্রে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করবেনই। সত্যেন বাসুর 'ভোর হয়ে এল', সলিল চৌধুরীর 'রিক্সাওয়ালা' ইত্যাদি ছবি আমাদের মনে সেই আশাই জাগিয়েছে। এই পথে পা বাড়াবেন আরো অনেক নতুন ও পুরোনো শিল্পী, সে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলার চিত্রজগৎ আমাদের কাছ থেকে সকৌতূহল ও সচেতন দৃষ্টিপাত দাবি করছে। এদের যা দরকার, তা হচ্ছে সত্যিকারের দরদী ও ভালো সমালোচনা। আমরা কি রীতিমতো সেটা দিয়ে যাব?

এইটাই প্রশ্ন।

১৯৫২ সালের সালতামামি

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে ১৯৫২ সাল একটি ঐতিহাসিক বছর। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প যে সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছিল— ১৯৫২ সালের শেষের দিকে তার নিরসনের পথের আভাস পাওয়া গেছে। সেই দিক দিয়ে ১৯৫২ সাল একটা নতুন যুগের সূচনার ইঙ্গিত দিয়েছে ও একটা পুরোনো পর্বের পরিসমাপ্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। এখন কথা হল যে, চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মীরা ও চলচ্চিত্র শিল্পের প্রধানতম কর্ণধার অর্থাৎ অগণিত দর্শকশ্রেণী এই নতুন পথের যাত্রাকে কত ভালো করে সংগঠিত ও পরিচালিত করবেন।

চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোনো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ও নতুন অধ্যায়ের শুরু বলতে আমরা কী বুঝি সে কথা বলতে গেলে প্রথমেই এই চলচ্চিত্র শিল্পের হালফিল অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা পর্যালোচনা করা দরকার। অতএব প্রথমেই সেই আলোচনা করা যাক।

যুদ্ধের পূর্বের ও পরের অবস্থা :

যুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া। মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি, সেকেলে ভাবধারা ও সামন্তযুগীয় বিধিব্যবস্থা চিত্রশিল্পের মধ্যে বিরাজ করছিল। ফিল্ম কোম্পানি ছিল মাত্র কয়েকটি, ছবির হাউস ছিল সংখ্যায় অল্প কয়েকটি। এই অবস্থার মধ্যেও যে ভালো ছবি তৈরি হয় নি, তা নয় তবে সমগ্র ব্যবস্থাটাই ছিল অত্যন্ত অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল। ফিল্ম শিল্পকে সেই সময়ে একটা 'শিল্প' মোটেই বলা চলত না। অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে স্টুডিও এবং নির্মিত ছবির সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতীয় শিল্প পরিমাণগত ভাবে মোটেই সামান্য ছিল না, কিন্তু, তথাপি গুণগতভাবে এর মান ছিল খুবই নীচে। একটা সামন্তযুগীয় আবহাওয়া সর্বত্রই বিরাজ করত।

বিগত মহা বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ও তার পরে এই অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন এল। চতুর্দিক থেকে বহু প্রযোজকের দল এসে ভিড় করলেন চলচ্চিত্র শিল্পে। বহু অর্থ ব্যয়িত হতে থাকল এই শিল্পে। এই টাকাগুলির অনেক অংশই যুদ্ধের মধ্যে কালোবাজারি মুনাফালব্ধ আয়। কিন্তু রাতারাতি এই মূলধন বিনিয়োগের ফলে সমস্ত শিল্পটা হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে উঠল। অবশ্য যদি এই বিরাট পরিমাণ অর্থ সু-সংগঠিত ভাবে নিয়োজিত হত ও সুপরিকল্পিতভাবে তা পরিচালিত হত তা হলে হয়তো অবস্থা অন্য রকম দাঁড়াত। কিন্তু এই নিত্য নতুন প্রযোজকের ভিড় ও নিত্য নতুন চিত্র-নির্মাণ-প্রচেষ্টার ফলে শিল্পের অবস্থা উন্নত হওয়া দূরে থাকুক একটা প্রচণ্ড অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ল। অন্যান্য প্রদেশের চেয়েও এই অবস্থার চাপ বোম্বাই শহরে গিয়ে পড়ল সবচেয়ে বেশি।

চিত্র নির্মাণের তিনটি মূল সূত্র :

যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বোম্বাই প্রদেশে ছবি তৈরি করার একটা অদ্ভুত নিয়ম সৃষ্টি হল। প্রতিষ্ঠাবান, স্বাধীন ও স্বাবলম্বী প্রযোজকের বদলে সেখানে দেখা যেতে থাকল একদল নতুন প্রযোজকের। ধরুন একটা নতুন ছবি তোলা হবে। একজন বা একদল প্রযোজক মিলে একটা ফিল্ম কোম্পানি খুলে বসলেন। কিন্তু এই কোম্পানির হাতে নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। অতএব প্রথমই তারা গেলেন কোনো এক পরিবেশকের (Distributor) কাছে। সেখানে গিয়ে ছবির পরিকল্পনা জানালেন ও ছবিটি তৈরি হয়ে গেলে বিভিন্ন স্থানে তা প্রদর্শন করার বা পরিবেশন করার অধিকার দিয়ে দিলেন এক-একটি পরিবেশককে। এই প্রকার পরিবেশনের অধিকার দিয়ে দেওয়াকে বলা হয় আঞ্চলিক অধিকার (territorial rights) বিক্রি করা। এইভাবে আঞ্চলিক অধিকার বিক্রি করা হয়ে গেল ছবি প্রস্তুত হবার আগেই। এবং এইভাবে ছবির স্বত্ব বন্ধক দিয়ে প্রযোজকরা কিছু অগ্রিম টাকা নিলেন। এই অগ্রিম টাকা নিয়ে তাঁরা গেলেন নামজাদা কোনো চিত্রতারকার কাছে, কারণ, নাম-করা চিত্রতারকা ভিন্ন ছবি তোলার অনেক বিপদ। এইভাবে কোনো নামজাদা তারকা-গোষ্ঠীকে মনোনীত করা হল, হয়তো তাদের কিছু অগ্রিম টাকাও দেওয়া হল এবং সম্ভবত তাদের ইচ্ছানুসারে কোনো পরিচালককে নিয়োগ করা হল। একেই বলে তারকা-সম্বল ছবি তৈরি করা বা স্টার সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে ছবি তোলা। এবং তারকা মনোনয়নের পর ধরা

হল কোনো-এক নাম-করা সংগীত-পরিচালককে। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল খুব শস্তা চটকদার যৌন-আকর্ষণমূলক সুর ও গান তৈরি করার জন্যে। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, ছবির গল্প বা কাহিনী ঠিক হবে সব শেষে— কাহিনীর কোনো মূল্যই নেই। অতএব ছবি তৈরি করার পদ্ধতি দাঁড়াল : প্রথমত, আঞ্চলিক অধিকার বন্ধক দিয়ে টাকা জোগাড় করা, দ্বিতীয়ত, স্টার সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে ছবি তোলা এবং তৃতীয়ত যৌন-আকর্ষণমূলক ছবি তৈরি করা। এই পদ্ধতিতে কোনো ভালো ছবি যে তৈরি হতেই পারে না তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তার কারণ কী? একটি ছবি তৈরি করতে গেলে যে-দুটি জিনিস প্রধান তা হল প্রথমত প্রযোজক ও দ্বিতীয়ত দর্শক। কিন্তু যে শিল্পে প্রযোজকের কোনো স্বাধীন, স্বাবলম্বী ভূমিকা নেই— সমস্ত টাকাটা আসে বাইরে থেকে, ছবির স্বত্ব বন্ধকী দিয়ে— সেই শিল্পের সমগ্র প্রক্রিয়াটাই হল উল্‌টো এবং উদ্ভট। এবং এইভাবে আর যাই হোক-না-কেন, সত্যিকার ভালো ছবিও তৈরি হতে পারে না, এবং শিল্প হিসেবেও এই চলচ্চিত্র বেশিদিন টিকতে পারে না। সে যাই হোক— গত কয়েক বছব ধরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ফিল্ম শিল্পের এই ছিল প্রধান গতি। যদিও বোম্বাই প্রদেশেই এই পদ্ধতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় সবচেয়ে বেশি— তথাপি সমগ্র ভারতবর্ষেই এর প্রভাব পড়েছিল এবং সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকেই এর কু-ফল ভোগ করতে হয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে ফিল্ম শিল্পের মূল জিনিস হল প্রযোজকের স্বাধীন ভূমিকা এবং এই ভূমিকাই উলটো পথে চলতে শুরু করেছিল। দর্শকদের উপর এর প্রভাব কীভাবে পড়েছে তাও সহজেই নিরূপণ করা যায়। দর্শক-সাধারণ কিছু সময়ের জন্য হয়তো এই সব ছবিগুলিতে ভিড় করেছে কিন্তু ধীরে ধীরে এর প্রতিবাদে তাদের সুরুচি-সম্পন্ন মন মুখর হয়ে উঠেছে সে কথা সকলেই জানেন। বরং এই দর্শকদের ভূমিকা হল শেষ পর্যন্ত ছবির ভাগ্যনিয়ন্তা। এবং এই ধরনের ছবিতে দর্শকের সমাগম আস্তে আস্তে কমে এসেছে এবং এই ধরনের ছবির চাহিদাও গেছে কমে। অতএব আমরা দেখতে পেলাম, যে-তিনটি মূল সূত্রের ওপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষের চিত্রজগৎ যুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধ-পরবর্তী যুগে চলেছিল— তা চলচ্চিত্র শিল্পের কোনো মূল সমস্যারই সমাধান করতে পারে নি এবং সংকটের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

সংকটের পরিণতি :

আমরা দেখেছি যে শিল্প হিসেবে চলচ্চিত্রকে ধরতে গেলে তার প্রধান ভিত্তি হল প্রযোজক ও দর্শক। এর মাঝখানে আছে অনেকগুলি সংস্থা ও তাঁদের ভূমিকা। তাঁরা হলেন একদিকে ছবির পরিবেশক, বিভিন্ন চিত্রগৃহের মালিক, অন্যদিকে সরকারি বিভাগ। গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্রমাবনতি রোধ করার পথে এইসব সংস্থাগুলি কোনোপ্রকার সহায়তা তো করেনই নি বরং এঁরাও এই সংকটকে বাড়িয়ে নিয়ে গেছেন।

ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ১৯৫১ সালের ফিল্ম-অনুসন্ধান কমিটির এক রিপোর্টে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে গড়পড়তা হিসেবে প্রত্যেক ছবি তৈরি করতে লাগে সাড়ে তিন লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ টাকা। এবং গড়পড়তা হারে ভারতে প্রস্তুত প্রত্যেক ছবির আয় হল আড়াই লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ টাকা। এই হল অবস্থা : অর্থাৎ ভারতে প্রস্তুত প্রত্যেক ছবির

জন্য গড়ে লক্ষাধিক টাকা লোকসান হয়। এবং সামগ্রিক ভাবে একটা গোটা শিল্পের প্রত্যেক ছবি প্রতি যখন লক্ষাধিক টাকা লোকসান হয়— তখন সে ছবির মর্মান্তিক অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প আজ ধ্বংসের পথে চলেছে— তার নাভিশ্বাস উঠেছে। এই অবস্থা চলেছে গত কয়েক বছর ধরেই— কিন্তু সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে গত বছরেই। গত কয়েক বছরের প্রক্রিয়া ১৯৫২ সালেই তার পূর্ণতা লাভ করেছে। শিল্পে লগ্নীকৃত মূলধন বহু প্রযোজকের ঘরে আর ফেরত আসে নি। ধীরে ধীরে এক-এক করে বহু প্রযোজক অন্তর্হিত হয়ে গেছেন। অনেকেই দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। এবং অনেকে আবার আদায়ীকৃত অর্থ একত্র করে নতুন ভাবে নিয়োগ করার কথা ভাবছেন। কিন্তু একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে— এবং তা হল : পুরোনো কায়দায় পূর্ববর্ণিত তিনটি মূলমন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে এই শিল্প আর অগ্রসর হতে পারবে না— এভাবে তাকে আর এগোতে দিতে পারা যায় না।

কিন্তু কথা হল বাঁচার পথ কী? কীভাবে ফিল্ম শিল্প আবার সংগঠিত হতে পারবে? এবং এই প্রশ্নটাই সমগ্র '৫২ সাল ধরে সকলকেই নানা ভাবে নাড়া দিয়েছে এবং গত বছরের নানান ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে দিয়ে অনেকের মনে অনেক ভাবে উদয় হয়েছে।

পট পরিবর্তন :

সকলের দৃষ্টিই আজ বাংলা দেশের ওপর নিবদ্ধ। অর্থনৈতিক ভাবে বাংলা দেশকে পাল্লা দিতে হয়েছে এই 'তারকা-সম্বল' ছবিগুলির সঙ্গে। ভাবগত দিক দিয়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছে বোম্বাই-মার্কা 'যৌন-সম্বল' ছবির সঙ্গে। কিন্তু সে লড়াই করেছে নিরস্ত্রভাবে, কারণ বাংলা দেশেও প্রযোজকরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন নি— এখানেও অধিকাংশ প্রযোজকই বিভিন্ন মধ্যবর্তী সংস্থার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তার ওপর বাংলা ছবির বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ— পুঁজি অত্যন্ত সামান্য। এর ওপর আছে ছবির হাউস-প্রোটেকশান, ন্যূনতম গ্যারান্টি, চিত্রপরিবেশকদের কারসাজি, সরকারি ট্যাক্সের বোঝা ও অন্যান্য নানান অসুবিধা।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বাংলা দেশের ওপরই সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে, তার কারণ কী? কারণ, বাংলা দেশের সমগ্র ছবি তোলার পদ্ধতিটাই হল একটু স্বতন্ত্র, একটু পৃথক। বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল তার ছবি নির্মাণের ব্যয়ের স্বল্পতা। অন্যান্য যে-কোনো প্রদেশের তুলনায় এখানে ছবি তুলতে অনেক কম খরচ হয় এবং এই কারণে বাংলা ম্রিয়মাণ অবস্থাতে থেকেও কোনোদিন মরে যায় নি। ধুঁকে ধুঁকেও সে ধীর-গতিতে এগিয়ে চলেছে। বাংলার দ্বিতীয় সুবিধে হল যে এখানে আমাদের কোনো স্টার-সিস্টেমের বিষময় ঐতিহ্যকে বহন করে চলতে হয় না। এবং এই কারণে এখানে কোনো যৌন-আকর্ষণমূলক ছবি তোলার প্রকোপ নেই। বাংলা দেশে এখনও ছবির কাহিনী যথেষ্ট মর্যাদা ও গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং ধারাবাহিক ভাবে বাংলা দেশ সমাজ-সচেতন, সুস্থ ও সুরুচি-সম্পন্ন ছবি তৈরি করার প্রচেষ্টাকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

অবশ্য বাংলা দেশের অসুবিধাও অনেকগুলি— এবং তা আগেই বলেছি। কথা হল বাংলা দেশ কি তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে? সে আলোচনাই এখন করা যাক।

পথের সন্ধান :

এই অবস্থা গত কয়েক বছর ধরে সচেতনভাবে ও অচেতনভাবে এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তিদের বার বার আঘাত করেছে। একটা প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে আরো সুষ্ঠুভাবে আরো সংগঠিত ভাবে চলার, সকলেই বুঝেছেন যে ভালো ছবি তৈরি করতে হবে, নতুন কিছু করতে হবে— আরো সারগর্ভ কিছু সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু কোন্ পথে গেলে তা সম্ভব হবে? কেউ কেউ মনে করেছেন কেবলমাত্র চিত্রের আঙ্গিকগত দিক দিয়েই উন্নতি বিধান করতে পারলে চিত্রশিল্পকে বাঁচানো যাবে আবার কারো ঝোঁক গিয়ে পড়েছে প্রধানত চিত্রের কাহিনীর ওপর। আবার কেউ কেউ ইংলন্ড বা আমেরিকার দিকে তাকিয়ে আছেন সংকটের সমাধানের জন্যে।

কিন্তু সর্বাগ্রে যে জিনিসটি আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল আজ বাংলা দেশকে এক সমগ্র ভারতীয় দৃষ্টি নিয়ে সমস্যার দিকে তাকাতে হবে। কেবলমাত্র স্থানীয়ভাবে, বা একটি দুটি ছবির দিকে তাকালে চলবে না— সমস্যাটিকে সমগ্র ভারতবর্ষের দিক দিয়ে দেখতে হবে। চিত্রশিল্পের বর্তমান সংকটের অবস্থায় এইরূপ একটি সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ ছাড়া এর কোনো সমাধান হতে পারে না। অবশ্য সর্বভারতীয় ভাবে দেখতে গেলে চিত্রশিল্পের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য নানান প্রশ্নেরও অবতারণা করতে হয়, যেমন সরকারের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক, দেশের সর্বাঙ্গীণ সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এখানে আমরা সেভাবে আলোচনা না করে চিত্র-প্রযোজনার মধ্যেই বিষয়বস্তুকে সীমাবদ্ধ রাখব। এবং সেই দিক দিয়ে আজ বাংলা দেশকে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে গেলে একটা সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ প্রথমেই নিতে হবে।

এই সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে দুটি প্রধান চিত্র 'মহাপ্রস্থানের পথে' (হিন্দি 'যাত্রিক') ও 'রত্নদীপ'— এই পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। 'মহাপ্রস্থানের পথে' 'রত্নদীপে'র সাফল্য চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মনেই নতুন উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করেছে। সকলেই অনুভব করেছেন যে অবস্থার একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।

এই অবস্থায় ১৯৫২ সালের দুটি ঘটনা আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে একটা প্রবল নাড়া দিয়ে গেছে। তা হল, প্রথমত, ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ও দ্বিতীয়ত, কলকাতার চিত্রগৃহে কয়েকটি বিদেশি ছবির মুক্তিলাভ।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত বিভিন্ন ছবি সমগ্র ফিল্ম শিল্পে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নতুন মূল্যবোধ এনে দিয়েছে। ছবির নানান বৈচিত্র্য, চিত্র-প্রযোজনার নানান রীতিনীতি আজ আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আজ সমগ্র চিত্রশিল্পেই এই চিত্রগুলি একটা নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়েছে— আমাদের সমগ্র চিন্তাশক্তিকেই যেন দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছে। সোভিয়েত, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, ও বিশেষ করে ইতালির চিত্রগুলি আমাদের সামনে এক নতুনতর সম্ভাবনার দিক-নির্দেশ করে দিয়েছে। এইসব ছবিগুলিতে দর্শকদের সমাগম আজ নতুন করে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে— ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

সমাধানের পথ :

এই অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে আজ আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে। এবং ১৯৫২ সালেই আমরা এই পথের সুস্পষ্ট হদিশ পেয়েছি। সেই পথ হল :

প্রথমত, আমাদেরকে স্বল্পব্যয়ে ছবি তুলে যেতে হবে— স্বল্প ব্যয়ে ছবি প্রস্তুত করার পথ ঠাওরাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বাংলা দেশকে হিন্দি ছবি তৈরি করতে হবে। কারণ, বাজার সম্প্রসারিত না করতে পারলে বাংলা দেশ কোনো দিনই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারবে না।

তৃতীয়ত, উপরোক্ত দুটি বিষয়কে মনে রেখে ছবির উৎকর্ষ বাড়াতে হবে, সুস্থ ও সুরুচিসম্পন্ন সরল বাস্তবানুগ ছবি তৈরি করতে হবে।

এই তিনটি মূল কথাকে ভিত্তি করে সচেতনভাবে যে প্রযোজকই দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হবেন তিনি সবচেয়ে বেশি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। এই বিষয়গুলির বিশদব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কারণ ইতিহাসই আজ আমাদের এই পথে চলার নির্দেশ দিয়েছে।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আজ বাংলা দেশই এই অবস্থায় সমগ্র চিত্রশিল্পকে রক্ষা করার নেতৃত্ব দিতে পারে। বাংলা দেশই সক্ষম। তার কারণ কী? তার কারণ হল বাংলার শিল্পীমন। সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের অধঃপতনের যুগেও বাংলা দেশ কখনো সামগ্রিকভাবে বিপথে যায় নি। বাংলার সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও বাংলার অসাধারণ দক্ষতা এই প্রচণ্ড দুর্দিনের মধ্যেও সমগ্র ভারতবর্ষকে চমৎকৃত করেছে। বাংলা দেশই অতীতেও চিত্রশিল্পের বিভিন্ন সন্ধিক্ষণে নতুনের পথ প্রদর্শন করেছে। এবং গত এক বছর ধরে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রদর্শিত ও নির্ণীয়মান চিত্রগুলি সেই প্রচেষ্টারই স্বাক্ষব বহন করে চলেছে।

কলিকাতায় সোভিয়েত ছবি

কয়েকদিন আগে কলকাতার একটি কাগজে এক সোভিয়েত ছবির সমালোচনা কবতে গিয়ে সমালোচক একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। ছবিটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, যে-কোনো সোভিয়েত ছবি একটি পরম বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত। মানুষের কাজ করার ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করার জন্যই সোভিয়েত ছবি সৃষ্ট হয়। এই মহান দেশবোধ-কর্মবোধ একটি সার্কাসের ডকুমেন্টারিতেও পরিষ্কার বেরিয়ে আসে। তাই সোভিয়েত 'সার্কাস ইয়ুথ' মানুষকে আরো কর্মঠ করে তোলে,— Birnum and Bailey-র জবর খেলা Greatest Show on Earth-এর থেকে এর তফাত এইখানেই।

কথাটা অত্যন্ত সত্যি। সোভিয়েত ছবির এই পরিপ্রেক্ষিতই তাকে বিশিষ্ট করে তোলে। আর এই বিশিষ্টতাকে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার একটি অবকাশ পরিবেশক কে-টি-ব্রাদার্স এবং 'রক্সি' প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষেরা আজ তৈরি করছেন। আগামী এক বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে সোভিয়েত ছবি দেখিয়ে যাবেন, এ নি একটা

চুক্তিতে এঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। এঁদের প্রথম প্রদর্শিত ছবি 'সার্কাস ইয়ুথ' রক্সিতে বেশ-কিছুদিন চলে উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের অন্যান্য দু-তিনটি চিত্রগৃহে প্রচুর দর্শক টানছে। রক্সিতে বুখারেস্ট যুব-উৎসবের পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টারি দেখানো হচ্ছে, এরপর "Spring on the Ice," "Stars of the Russian Ballet", ইত্যাদি দেখানো হবে।

কলকাতার সংস্কৃতিজগতে এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য দেশে specialised cinema-র মাধ্যমে দর্শকসাধারণ পেশাদারি বাজারের বাইরের ছবি দেখতে পান, এ-দেশে ও-প্রথাটি একদম নেই। ইঙ্গ-মার্কিন অধ্যুষিত বাজারে অন্তত একদিক থেকে সেই অবকাশটি তৈরি হল। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত দেশকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পাবার পথ আমাদের সামনে খুলে গেল। সবদিক থেকেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদভাজন হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটি কথা। যে-সমস্ত তালিকা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 'জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ' দিক বেশি আছে বলে প্রদর্শকদের ধারণা হয়েছে। শুধু সেই ধরনের ছবিই বিশেষ করে দেখানোর দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে কি? এই ধরনের মধ্যে মহান ছবি অনেক আছে, আর তা দেখানোটা প্রশংসনীয়। কিন্তু আশা করি এটা একটা ঝোঁকে পরিণত হবে না Donsley-এর Gorky Trilogy-এর চিত্ররূপগুলি, Dovcheinok-এর মাটির রসে মাখানো ছবিগুলি, Little Gulliver-এর ঐ জাতের ব্যঙ্গ চিত্রগুলি, ছোটোদের রূপকথার ছবি, Pudovkin-এর শেষদিকের ছবি, সবাক ছবির গোড়ার দিকের এবং যুদ্ধের মধ্যেকার নানা ছবি, বা এই রকম আরো বহু ছবি আছে, যেগুলি দেখানোর অনুমতি পাওয়া হয়তো কঠিন নয়।

উচ্চতর স্তরের সোভিয়েত ছবি প্রচুর রয়েছে, যা বার বার জগতে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছে। বর্তমান যা দেখানো হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের ছবি দেখতে পাবার আশাটাও এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা যাক।

ছবির মাপকাঠি

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আজকাল ছবিসংক্রান্ত আলোচনাতে কতগুলো ভঙ্গি আমার নজরে পড়েছে, যেগুলো সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনাতে এগোলে ছবি-করিয়ে এবং ছবি-দেখিয়ে দুজনেরই লাভ।

একটা মতবাদ আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠেছে যে ছবিটা হচ্ছে একটা রহস্যজনক কিছু— অন্যান্য শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ফেলে বা জের টেনে ছবির সমালোচনা করা ভুল। ছবিটা একটা ব্যাপার, একেবারেই ঘন, জমাট, ঘোরালো একটা ব্যাপার।

আর-একটা মতবাদ হচ্ছে, যদি কোনো ছবি কোনো বিখ্যাত বা অখ্যাত গল্পের ভিত্তি থেকে গৃহীত হয়ে থাকে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সুবাদ টানতে হবে সাহিত্যের এবং কোনোরকম বদল লক্ষ্য করলে চ্যুতি এবং ত্রুটি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এ-সব ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, ছবি-করিয়ে হচ্ছেন একজন অনুবাদক।

এই দুই ধরনের ভাবনা সম্বন্ধেই আমার মারাত্মক রকম ভীতি জন্মেছে। এতে করে সমস্ত ব্যাপারটাই গুলিয়ে যায় বলেই আমার ধারণা।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ বেরিয়েছিল *The Golden Book of Tagore* নামে। অনেকেই সেটা দেখে থাকবেন। তাতে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। ওঁর নিজস্ব শৈলীতে আঁকা একটি ঘোমটাপরা মা বসে আছেন মুখটা যাঁর দেখেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না এবং তাঁর কোলে একটি শিশু। ছবি দেখে অনুভূতি হয় যেন নিরন্তর উনি শিশুটিকে দোলা দিয়ে চলেছেন।

ছবিটির নাম Death, O my Death— রবীন্দ্রনাথের '...ওগো মরণ, হে মোর মরণ'-*এর অনুবাদ ওর কাছেই আছে।

মরণ, হে মোর মরণ অতি পরিচিত কবিতা। তার কোথাও গগন ঠাকুর-অঙ্কিত imageটি নেই। বালকোচিত পাঠ্যপুস্তকের যাকে আমরা illustrations বলি, তার ঢঙে ভাবতে গেলে ঐ ছবিটি এবং ঐ কবিতাটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গগনেন্দ্রনাথ তা মনে করেন নি, রবীন্দ্রনাথও না।

যখন সাহিত্যের কোনো কৃতকার্যতার ভিত্তিতে ছবি তৈরি হয়, এবং তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয় সাহিত্যের জের টেনে, তখন আমার এই ছবিটির কথা মনে

*কবিতাটির প্রথম ছত্র : 'অত চুপি চুপি কেন কথা কও' ('উৎসর্গ')

পড়ে ; আবার যখন চলচ্চিত্রকে অন্য শিল্পের থেকে আলাদা চিহ্নিত করে রহস্য জমাবার চেষ্টা আরম্ভ হয় তখনও আমার ঐ ছবিটির কথা মনে পড়ে।

কারণ, চলচ্চিত্র হচ্ছে অন্য সব শিল্পের একই গোষ্ঠী। এবং অন্যান্য শিল্পের মতো চলচ্চিত্রের নিজস্ব দাবি আছে, নিজস্ব বিশেষ সুবিধা ও প্রয়োজন আছে, এবং তার একটা পরিধিও আছে।

কোনো বিশেষ ছবিকে ভেবে এ আলোচনার সূত্রপাত আমি করি নি। ছবি বিচারের মূলকথাটা ভাবতে গিয়েই এ-বক্তব্য এসেছে। সর্ব শিল্পেই তার নিজস্ব গুণের অপপ্রয়োগ থাকে। কোনো বিশেষ ছবিতে থাকাটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আইজেনস্টাইন সাহেবের কিছু কথা। তাঁর মতে কোনো সাহিত্যকর্ম থেকে ছবির উপাদান নিতে গেলে ছবি-করিয়ের সামনে তিনটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে : প্রথমটা হচ্ছে, সেই সাহিত্যকর্মকে কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য মনে না করেও অনেক সময় অবস্থার চাপে পড়ে শিল্পীকে সেই উপাদান গ্রহণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সেই কর্মকে ছবি-করিয়ে বা দর্শক কেউই শিল্প বলে ধরবেন না। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, মূল শিল্পের আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন। তার মানে, সেই সাহিত্যকর্মের ভেতরে ঢুকে শিল্পী সেই সম্পূর্ণ দর্শনটাকে গ্রহণ করতে পারেন নি ; তাঁর মনে সমালোচনা জেগেছে। সেই সমালোচনা তাঁর শিল্পকর্মে প্রকাশ পেতে বাধ্য। তাতে অন্যায়ের কিছু নেই। এর উদাহরণস্বরূপ আইজেনস্টাইন নিজের একটি চিত্রনাট্যের উল্লেখ করেছেন। সেটি হচ্ছে থিওডোর ড্রাইজারের 'অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি'।

আরো একটি ভঙ্গিতে শিল্পী সাহিত্যকর্মকে গ্রহণ করতে পারেন। সেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্রহণ। সে ক্ষেত্রেও বদল আসে— চিত্র মাধ্যমের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে। আইজেনস্টাইন সে ক্ষেত্রে গর্কির 'মাদার'-এর পুদভকিন-কৃত চিত্রসৃষ্টির কথা বলেছেন। সে-ছবিটির বিশেষ কয়েকটি দৃশ্যের একটি বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন যেগুলি উপন্যাসের থেকে একেবারেই পৃথক।

একটু আগেই আমরা গগন ঠাকুরের কথা বলছিলাম। এখানে আমার নিজেরও ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ'-এর উপর ভিত্তি করে ছবি করব। তাতেও এরকম বদল থাকত। বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'ও মাথায় চেপেছিল এককালে। তাতেও এরকম বদল থাকত।

অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, কোনো সাহিত্যকর্মের ভেতরে সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়ে তাকে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ধ্যান করে আমার মনের মধ্যে যে আবেগ এবং যে প্রকাশবাঞ্ছা সতত সঞ্চরমাণ হতে থাকত— তাকে আমার চিত্রকর্মে প্রকাশ দিতে গিয়ে সেটা আমার নিজস্ব শিল্পকর্ম হয়ে উঠত।

সেটা হচ্ছে ছবি-করিয়ের দিক।

কিন্তু যাঁরা দেখবেন তাঁরা যদি 'চতুরঙ্গ' অথবা 'আরণ্যক' হাতে নিয়ে আমার ছবি দেখতে বসতেন— তা হলে স্বভাবতই আমি কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে উঠতাম। আমার শিল্পকর্মের প্রেরণার উৎসের জের টেনে নিয়ে এসে সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্পকর্ম আমার যে-ছবি তাকে বিশ্লেষণ করতে বসলে আমি মনে করি ছবিটার প্রতি অবিচার করা হয়।

ছবির নিজস্ব একটা জীবন গড়ে উঠেছে তার নিজের মধ্যে। সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার

মধ্যে দিয়ে আমি যে premise উপস্থাপিত করছি, তার মধ্যে গলদ থাকতে পারে। কিন্তু তার নিজস্ব digits-এই তাকে বিচার করা উচিত। ছবি-করিয়েদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে তার source material-এর কাছে সৎ থাকার তেমনি দর্শকদেরও দায়িত্ব রয়েছে ছবি বিচারের মাপকাঠিগুলো ভালো করে জেনে নিয়ে বিচারে বসা।

ছবি একটা রহস্যজনক কিছু নয়। শেষ বিশ্লেষণে পৌঁছলে দেখা যায়, সব শিল্পের যা মাপকাঠি এরও তাই। তবে ওপরে ওপরে যে তফাতগুলো বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে আছে ছবির সঙ্গে অন্যান্য শিল্পের তফাতও তেমনি আছে।

আর অপপ্রয়োগে ভীত বা বিচলিত না হয়ে ছবির মাপকাঠি নিয়ে অপপ্রয়োগগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়াটা ছবি-করিয়ে এবং সমালোচক দুজনের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর।

এই প্রসঙ্গে পথের পাঁচালী স্মর্তব্য। উপন্যাসটি হাতের কাছেই আছে। ছবিটিও বেশি দূরে নেই। দুটোকে পাশাপাশি রেখে সৎ আলোচনায় বোধকরি অনেক ভুল-বোঝাবুঝির নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এখানে সুবোধ ঘোষের ছোটো গল্প 'অযান্ত্রিক'কেও ভাবা যেতে পারে। আরো বহু উদাহরণ আমাদের বাংলা দেশের বিভিন্ন শিল্পীর কর্মের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে আছে যেগুলি নিয়ে চিন্তা করলে সুফল পাবার সম্ভাবনা।

চলচ্চিত্রের স্বরূপ কী?

ফরাসি ভাষায় "engage" বলে একটা কথা আছে। আমার মনে হয়, সর্ব শিল্পে সেইটিকে গ্রহণ করা উচিত। নিরালম্ব, বায়ুভূত শিল্প কখনো শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। মানুষটিকে কোথাও-না-কোথাও আত্মীকরণ করতে হয়। ভালো না বাসলে শিল্প জন্মায় না। এর প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, শিল্পীর মেজাজের উপর নির্ভর ক'রে। কিন্তু মূল সূত্রটি সেই 'সত্যম, শিবম সুন্দরম'। ভালো করে তাকিয়ে দেখুন, প্রথমে সত্য। সত্য সিদ্ধ না হলে কোনো শিল্পই শিল্পের পর্যায়ে ওঠে না। এটা প্রথম কথা। শিবম্ কথাটা বাংলায় খুব প্রচারিত নয়, কথাটার মানে হচ্ছে, যা কিছু শাশ্বত। এখানে প্রশ্ন আসে যে, কী শাশ্বত?

সেইটাই শাশ্বত, যেটা আপনি আপনার দুঃখ দিয়ে অর্জন করেছেন। শাশ্বত হচ্ছে সেই জিনিসগুলো, যেগুলো আপনি আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'দুঃখ' বলে নিবন্ধটি আপনারা যদি পড়ে দেখেন তা হলে এ কথার মানে বোধহয় খুঁজে পাবেন। ওই ভদ্রলোক এই ব্যাপারটার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন, এবং ব্যাপারটাকে বোধহয় অনুধাবন করতে পেয়েছিলেন।

সুন্দর। এর কোনো সংজ্ঞা নেই। এটা সম্পূর্ণ আপনার রুচির উপর নির্ভরশীল। সৌন্দর্যের কোনো মান নেই। দেশে দেশে, কালে কালে, সৌন্দর্যের মান বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সত্য এবং শিবকে অস্বীকার করে যে সুন্দর দাঁড়ায় তাকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

এই কথাগুলো মনে রাখলে ছবি সম্পর্কেও খানিকটা ভাবনা-চিন্তা করা চলে। কারণ, ছবিকেও আজকাল শিল্প বলে মানা হচ্ছে।

ছবিকে শিল্প বলা যায় কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবে, যদি শিল্প বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলে, এর প্রতি এই রূপ প্রয়োগ করার একটা প্রশ্ন দেখা যায়। সেদিক থেকে, এ দেশের কথা আমি আর তুলব না, বিদেশেও খুব মাঝে মাঝে চমকপ্রদ কিছু দেখা যায়। যেমন ধরুন, ওজু-র ছবি। বা ধরুন বুনুএল-এর ছবি। এরকম দু-একজন ভদ্রলোকের কাজকর্ম দেখে আমাদের মনে হয়, আমরা এখনও মরে যাই নি, এখনও কিছু সত্যিকারের শিল্পী বেঁচে আছেন। এঁদের মধ্যে দিয়েই আমরা বাঁচছি।

কিছুদিন আগে Julia Ylintsova-র 'Story of the Flaming Years' দেখলাম। ইনি দভচেঙ্কো-র স্ত্রী। ধেড়িয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটাই ধরতে পারেন নি। ধেড়িয়েছেন। সেইখানে আন্দ্রেই তারকোভস্কি-র 'Childhood of Ivan' দেখা গেল, সমস্ত প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এই ছেলেটি দভচেঙ্কো-র সমস্ত Tradition-টাকে বহন করে নিয়ে চলেছে এবং ভগবান করুন এ যেন সত্যি দাঁড়াতে পারে। এইগুলো মাঝে মাঝে চমক দেবার চেহারা করে আসে। এত ভালো লাগে, এত ভালোবাসতে ইচ্ছে করে যে, আপনাকে বলে বোঝানো হয়তো সম্ভবপর নয়।

Lindsay Anderson-এ ছবি 'A Sporting Life' দেখা গেল, যে ছেলেটা Great Britain-এ বসেও কিছু কাজের কাজ করে ফেলেছে। Carel Reisz-এর 'Lambeth Boys' দেখা গেল, অনেক নাচানাচি সত্ত্বেও ব্যাপারটা কিন্তু জমে নি।

Mary Clerks-এর 'The Connection' দেখা গেল, ওটা হচ্ছে কতগুলো Drug addicts-দের উপরে তোলা ছবি, নাকি সত্যিকারের ওই ধরনেব ব্যক্তিদের না জানিয়ে তাদের উপরে তোলা হয়েছিল। এরা নাকি প্রতিদিন Marizuna shot নিত, অর্থাৎ injection গ্রহণ করত। পুরো ছবিটি হচ্ছে যে এই লোকগুলো এই ধরনের গণ্ডগোলের মধ্যে বিনষ্ট হয়েছিল কিন্তু ছবিতে এর কোনোই বহিঃপ্রকাশ দেখা দেয় নি।

Lionel Rogosin, ভদ্রলোক কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন, ওঁর ছবি 'Come Back, Africa'— এটা নিয়ে অনেক নাচানাচি করা হয়েছে। মাল কিন্তু জমে নি। Congo-র Lumumba-এর মৃত্যুর পরে Negro-দের সমস্যা এবং তার সঙ্গে USA এর Negro-দের মিলনের যে চেষ্টা করা হয়েছে সেটা শেষ অবধি একটা হাস্যকর পরিণতিতে পৌঁছেছে। ওভাবে America-র Negro সমস্যার সমাধান হবার নয়।

Poland; আন্দ্রে ভাইদা কাজ করতে পারছেন না, তাঁকে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। আন্দ্রে মুংক হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় মারা গেল। রোমান পোলানস্কি এই একটা Neo-Existentialism-এর মধ্যে ঢুকে বসে আছে। আমি মনে করি, ওঁকে দিয়ে আর কোনো মাল বেরুবে না। জাঁ পল সার্ত-এর অক্ষম একটা অনুকরণ করার চেষ্টা আজকের Poland-এর ছবিগুলোর চালিয়াতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওঁদের দ্বারা আর কোনো কর্ম হবে বলে বর্তমানে মনে হয় না।

ভারতবর্ষের কথা তুলে লাভ নেই। দু-একজন লোক যাঁরা কিছু করতে পারতেন, তাঁদেব মধ্যে কেউ কেউ C.I.A.-এর কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছেন। আর বাকিরা হয় অকর্মণ্য

আছেন আর নইলে উল্টোপাল্টা যা-তা সব করছেন। কাজেই তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা যত কম করা যায় ততই ভালো।

আমি দুঃখিত যে ভালো কথা খুব বেশি বলতে পারলাম না, তবে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', রবিবাবুর এই কথাটা আমি মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি। ভদ্রলোক কিছু ঠিকঠাক কথাবার্তা বলে গিয়েছিলেন। এবং সে কথাকে তিনি নিজের জীবন-যন্ত্রণার মধ্য থেকে উৎসারিত করেছিলেন। সেইটেই আমাদেরকে এখানে খানিকটা পরিমাণে প্রেরণা দিচ্ছে।

মুখে বললে আমাদের মুখের ভাষাও হারিয়ে যাবে।

বাংলা ভাষায়, যে ভাষায় আমরা এন কথা বলি, সে ভাষার পথ দিয়েছেন তিনি। ওঁকে প্রণাম।

ছবিতে ডায়লেকটিক্‌স

ডি. ডবলিউ. গ্রিফিথ যখন 'ইনটলারেন্স' আর 'দি বার্থ অব নেশন' করেছিলেন, তখনই সত্যি সিনেমা জন্মগ্রহণ করেছিল। সে হলো ১৯১৮-২০ সালের ব্যাপার। তার আগেই অবশ্য 'গ্রেট ট্রেন রবারি'তে প্রথম ক্লোজ-আপ ব্যবহৃত হয়েছিল। সেটা ১৯০৩ সালে।

'ইনটলারেন্স' এবং 'দি বার্থ অব এ নেশন' যখন নবীন সোভিয়েত রাশিয়ায় পৌঁছল, তখন কুলেশভ তাঁর 'ওয়র্কশপ' খুলে ফেলেছেন এবং এক্সপেরিমেন্ট করে যাচ্ছেন। তিনি ক্রিমিয়াতে হাত-ধরাধরি একটি ছেলে ও একটি মেয়েকে দেখালেন, তার পর দেখালেন ওয়াশিংটনের হোয়াইট-হাউস, তারপর সেন্ট-পিটার্সবার্গের জারের প্রাসাদ এবং তার পরে তুষারপাত দেখালেন এবং দুটো ছেলেমেয়েদের মুখের ক্লোজ-আপ।

মন্তাজের জন্ম হল, এত দূরের বিভিন্ন ছবি মিলে একটা ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেল। দর্শক বুঝতেও পারল না যে কতকগুলো অসংলগ্ন ছবি একত্র হয়ে একটা ঘটনার সৃষ্টি করেছে। তারা ভাবল ব্যাপারটা একই জায়গায় ঘটছে। অথচ এক শট-এর সঙ্গে অন্য শট-এ হাজার হাজার মাইলের তফাত।

কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সের্গেই আইজেনস্টাইন আর আর্টিস্ট ভি. পুদভ্‌কিন— এঁরা কুলেশভের ওয়র্কশপে কর্মী হয়ে গেলেন। তাঁরা প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করলেন যে, মজাটা কী! সেইসময়েই গ্রিফিথের ছবি দুটো এসে পৌঁছল রাশিয়ায়। এ-ছবি দুটি দেখে এঁদের চক্ষু চড়কগাছ। তখন থিয়োরির দিকে মন গেল। এঁরা খাটতে আরম্ভ করলেন। আইজেনস্টাইনের প্রথম ছবি 'স্ট্রাইক'। এ দেশে কেউ দেখেছে কি না জানি না। তারপর এল 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'। তার ওডেসা স্টেপ সিকোয়েন্স আজও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র-ফর্ম বলে গণ্য হয়ে থাকে, এবং সেটা সত্যিই তাই। ওর ওপরের স্তরের কাজ আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও করতে পারে নি। পুডোভ্‌কিনের 'মাদার' (গোর্কি) তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

এই দুই শিল্পীর ওই সৃষ্টিগুলো এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ড পৃথিবীর সব চিত্রনির্মাতাদের মুখে ভাষা দিয়েছে। এই দুজন না থাকলে ছবি 'ছবি'ই হত না।

তখন ছিল ঠিক বিপ্লব-পরবর্তী যুগ। জিনিসপত্তর কিছু পাওয়া যেত না। মস্কোর পথে পথে বরফ উত্তরণ করে এঁদের স্টুডিওতে যেতে হত! কী যে কষ্টে এঁরা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতেন! সে আমরা ভাবতেও পারি না। তবু তাঁরাই ছবির জগতের ভিত্তি স্থাপন করে গেলেন।

এই দুজন ছিলেন পরমবন্ধু। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটু ঝগড়াও ছিল। পুদভ্‌কিন বললেন ছবি একটার পর একটা শট-এর মিলনের ব্যাপার। তাকে দিয়ে মানে তৈরি হয়।

আইজেনস্টাইন বললেন, এভরি শট ইজ ইন কনফ্লিকট্ উইথ দি আদার, দ্বন্দ্বের সাহায্যে তৈরি হয়। একটা শট, তার নিজস্ব মানে নেই, পরের শটটারও নিজস্ব কোনো মানে নেই ; কিন্তু দুটো মিলে একটা তৃতীয় মানে তৈরি হয়।

সোজা কথায় থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিন্থিসিস। এখানেই আসে ডায়লেকটিক্‌স, এখানে আসে কার্ল মার্কসের 'অ্যাপ্রোচ টু রিয়েলিটি'। একটা এদিকে একটা ওদিকে দুটো মিলিয়ে একটা তৃতীয় মানে তৈরি করে। এই নিয়ে রাতের পর রাত তাঁদের ঝগড়া হত। যখন বরফঝরা মস্কোতে না ছিল কাঠ, না ছিল জ্বালানি। খাবার পাওয়া যেত না। সেইসময় এই দুজনে যে-ঝগড়া করে গেলেন, তার দ্বারা আমরা মানুষ হলাম।

তার পরে এলেন দভ্‌ঝেংকো। ওঁর প্রথম ছবি 'ইজভিন-গোরা'। এ-ছবি দেকে মসফিল্মের পরিচালক এই দুজনকে ডাকলেন, আইজেনস্টাইন ও পুদভ্‌কিন বললেন, এ-ছবিতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে।

আইজেনস্টাইন বললেন, আবার দেখব, এবারে মস্কোভা থিয়েটারে। ছবি চলাকালে হলের পাশে তরুণ দভ্‌ঝেংকো। আশেপাশে ভদকা ছিল না। কিন্তু যখন ছবি শেষ হলো আইজেনস্টাইন আর পুদভ্‌কিন সম্পূর্ণ মাতাল। আইজেনস্টাইন দভ্‌ঝেংকোকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বললেন, ডায়লেক্‌টিক্‌সে এইরকম ব্যবহার কেউ দেখে নি। তুমি বিরাট।

এই তিনটি লোক মার্কসিস্ট ডায়লেকটিসিজম ছবিতে ব্যবহার করে ছবিতে প্রাণ প্রোথিত করে দিয়ে গেছেন। আজকে আমরা যারা ছবি করার নামে চালবাজি করি, তাদের সকলের অস্থিমজ্জায় এই তিন ব্যক্তি বিদ্যমান। যদি কোনো ভদ্রলোক কখনো কিছু করে থাকতে পারেন সারা পৃথিবীতে, এঁরাই হচ্ছেন তার প্রাণবস্তু।

এঁদেরকে প্রণাম।

এর পরে বহুকাল কেটে গেছে। কার্ল ড্রেয়ার তাঁর 'প্যাশন অব জোয়ান অব আর্ক' ছবিতে ফ্যালকনেত্তিকে ব্যবহার করলেন। ড্রেয়ার একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ফ্যালকনেত্তি একজন ইটালিয়ান, আর, 'জোয়ান অব আর্ক' হচ্ছে ফরাসি দেশের ন্যাশনাল হিরোইন। একটা বিদেশি পরিচালক সারা ফ্রান্স দেশে মেয়ে খুঁজে পেল না! একটা ইটালিয়ান মেয়েকে নিয়ে এসে কাজ করল। অথচ যে-চরিত্রের জন্য ব্যবহার করল তিনি হচ্ছেন সমস্ত ফরাসি জাতির প্রতিনিধি। এই নিয়ে আপত্তির প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। ড্রেয়ার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না, পুরো ছবিটা শেষ করলেন।

এ-ছবি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন পৃথিবীর চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে এতবড়ো

ঘটনা আর ঘটে নি। সমস্ত ফরাসি দেশের আত্মাকে প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল এই ছবিতে। এবং ক্যামেরার কোনোরকম গতি না রেখে দ্বন্দ্বমূলক বাস্তববাদী পরিচালনা কাকে বলে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তিন-চারখানি ছবির মধ্যে এটি পড়ে।

মুশকিল হচ্ছে যে, এইভাবে শিল্পীদের নিয়ে কাজ করতে গেলে আশঙ্কা ঘটে।

ফ্যালকনেত্তি ছবি শেষ হওয়ার পরে— যদিও তখন মাত্র আঠারো বছর বয়স— আত্মহত্যা করলেন!

তারপর অনেকেরই নাম করা যায়। যাঁরা ডায়লেকটিক্স অব সিনেমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। যেমন বার্ট হানস্ট্রা, ইয়োরিস ইভেন্স, বেসিল রাইট ইত্যাদি। রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি এবং জন গ্রিয়ারসন— এই ডায়লেকটিক্যাল অ্যাপ্রোচটাকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, তা ফ্ল্যাহার্টির 'লুইসিয়ানা স্টোরি' দেখলেই বোঝা যাবে। তার বেশি আর এগোতে হবে না। এখানে আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলতে হচ্ছে, কারণ এর ওপরে বিরাট বই লেখা চলে।

তার পর বর্তমান যুগে ডায়লেকটিক্যাল কাজে অনেকেই ব্যাপৃত। তাঁদের মধ্যে জাপানের ওজু, মিৎসোগুচি, কুরোসাওয়া এবং নবীন ওসিমা, ইটালির বিশেষ করে ফেলিনি এবং রসোলিনি, ফ্রান্সের জাঁলুক গদার এঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। মেক্সিকোর ভ্লাদিমির টোরে নিলসন, গ্রীসের কাকয়নিস— এঁরা কাজ করে যাচ্ছেন।

সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন, আমার মতে, জীবিতদের মধ্যে, লুই বুনুয়েল। তাঁর তুলনা নেই। তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি ভীষণ দুঃখিত যে, আমার দেশের মানুষ এঁদের কাজগুলো দেখতে পায় না।

আশা করি এমন একটা দিন আসবে— যখন দেশের লোকেরা এঁদের কাজ দেখতে পাবে।

শিল্প ও সততা

১৯৬১ সালে 'কানে' চিত্রসাংবাদিকরা মিকেলেঞ্জেলো আন্তোনিওনিকে তাঁর ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেছিলেন। তাতে তিনি যে উক্তি করেছিলেন তার মর্মার্থ মোটামুটি দাঁড়ায় এই :— ছবি করার গোড়ার শর্ত হচ্ছে সততা। নিজের অনুভূতি এবং উপলব্ধির সৎপ্রকাশ। ক্যামেরায় যে মিথ্যা কথা বলার মারাত্মক ক্ষমতা আছে, তা রীতিমতো ভীতিকর। কারণ মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে ক্যামেরা যত পারে তত আর কিছুই পারে না।

আন্তোনিওনির কোনো ছবি এ দেশে আসেনি, কাজেই তাঁর কথায় এবং কর্মের মিলের ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া এদেশে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর ঐ উপরোক্ত মন্তব্যগুলি শুনে আমাকে তাঁকে হঠাৎ পরমাত্মীয় বলে মনে হল।

এই গভীরতম সত্যটি সচরাচর কেউ স্পষ্ট ভাষায় বলে না বলেই কথাগুলো আমার কাছে চমকপ্রদ বলে মনে হয়েছে।

কথাটা হচ্ছে সর্বশিল্পকর্মেরই সত্যকারের শিল্পপদবাচ্য হতে হলে, সর্বপ্রথমে হতে হবে সত্যবাদী। এই হচ্ছে শিল্প বিচারের দৃঢ়তম মানদণ্ড এবং যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত।

যুগে যুগে সত্যের সংজ্ঞা পালটিয়েছে কিন্তু আপেক্ষিক ভাবে এই মানদণ্ড থেকেই গেছে।

মিথ্যা শিল্পাভিমানী যে সৃষ্টিকর্ম, তা যতই মনোহারী হোক, তাকে কঠোরভাবে বর্জনের অবকাশ আছে। বুজরুকি আর ধোঁকাবাজি, অথবা আপাতসত্যের প্রলেপে ঢাকা মিথ্যাচরণ, একে ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তার মানে এই নয় যে সত্যবাদী হলেই মহৎ শিল্প হবে। তার মানে শুধু এই, মহৎ শিল্প হলে সে সত্যবাদী হবেই। অর্থাৎ সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নন্দন-তত্ত্বগত একটা উৎকর্ষে উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই মহৎ শিল্প জন্মায়।

এখন এই যে সত্য দৃষ্টি, সর্ব শিল্পের ক্ষেত্রেই সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত শিল্পীর নিজস্ব অর্জিত উপলব্ধির যোগফল। অর্থাৎ শিল্পী বাস্তবের কোনো একটা অংশের কোনো একটা কর্মকাণ্ডের অস্তিত্বের প্রতি নিজের সমগ্র ধীশক্তি পরিচালিত করে দিয়েছেন এবং সেখানে কোনো ঠিক বা ভুল, কোনো পাপ বা পুণ্য তাঁর মনে প্রচণ্ড আবেগ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। সেই আবেগসঞ্জাত প্রকাশ-বাসনা থেকেই জন্মগ্রহণ করে শিল্প। তার প্রকাশভঙ্গি শিল্পীর বিলম্বিত মেজাজ অনুসারে যে-কোনো পথ অনুসরণ করতে পারে। লোকে ছাপার অক্ষর কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে বিশ্বাস করে নিত— যেমন খবরের কাগজে কোনো উল্লিখিত ঘটনা। ক্যামেরাতে তেমনি চারপাশের বাস্তবের মাঝখানে খানিকটা অবাস্তবকে খাঁটি মাল বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডাঃ গোয়েবেল্‌সের নির্দেশে জার্মানির শ্রেষ্ঠ কারিগররা নিউজ রীল তৈরি করত। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যেটা, সেটির একটি কপি যুদ্ধের পরে মিত্রশক্তির হাতে আসে। পরে যখন সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, তখন দেখা যায় কী অসীম ধূর্ততার সঙ্গে সত্যি ঘটনা এবং ডাহা মিথ্যে মশলা একত্রে সাজিয়ে প্রচণ্ড শক্তিশালী এই 'ডকুমেন্টারিটি' তৈরি করা হয়েছিল। যুদ্ধের মধ্যে সমগ্র জার্মান জাতির মনে যে অভাবনীয় উদ্দীপনা এবং ঘৃণার সৃষ্টি করেছিল এ ছবি, তার দাম দিতে হয়েছিল বোধহয় সেই সর্বধ্বংসী যুদ্ধের পুরো একটি বছরের বাড়তি ধ্বংসলীলায়।

এটা একটা extreme। কিন্তু এই প্রকারের ঘটনা আকছার ঘটে চলেছে ছবির জগতে। চোখ যা দেখে, তাকেই বিশ্বাস করে নেওয়া হচ্ছে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা।

আর-একটা মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে— চলচ্চিত্র নির্মাণের পদ্ধতিটা সাধারণের কাছে রহস্যময়। তাই বহু মেকিকে না বাজিয়ে বাজারে চালিয়ে দেওয়া যায়।

যেমন ধরুন, বহু নেতিবাচক ব্যাপার। স্টুডিওতে ছবি তুলব না, সত্যিকারের মাঠে-ঘাটে গিয়ে তুলব। যেটুকু স্টুডিওয় তুলব, সেটটা যেন সেট বলে মনে না হয়। আজকাল মেক-আপ ব্যবহার না করা ফ্যাসন হয়েছে, কাজেই ওটা ব্যবহার করব না। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলিয়ে অভিনেতাদের শুধু behave করাব, act করতে দেব না। emotion-এর প্রকাশ করতে গেলেই melodrama হয়ে যাবার ভয়, কাজেই সাধুজনের মতন cultured হব। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ-সবই জীবনকে সঠিকভাবে ধরতে গেলে প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তাতে ইতিবাচক প্রধান ব্যাপারটিকেও লাগে। শুধু এই ধরনের সংস্কৃতিবানতা আদি এবং অন্তহীন ভাবে বুজরুকি মাত্র। জোচ্চুরি।

আমাদের দেশের কথা ভাবতে গেলে, বিশেষ করে এই সব কথাগুলিই মনে হয়, জীবনের কাছে যাওয়া, তাকে কঠিন ভাবে ভালোবাসা অথবা পবিত্রভাবে ঘৃণা করা, ছবির জন্য ছবি করা নয়— প্রাণের জন্য ছবি করা এ যেন এদেশে নূ (Gnu)-র মতোই দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

প্রাথমিক চিন্তা, প্রাথমিক ভাবে জীবনে কোনো-একটা ফলবান খণ্ডের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ সৎভাবে নিজের উপলব্ধির গণ্ডির মধ্যে বিচরণ,— ছবি করার এই আদি শর্তগুলোই বড়ো দুষ্কর হয়ে পড়েছে এদেশে খুঁজে বের করা। নতুন যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যেও সেই স্ফুলিঙ্গ দেখছি না।

তাই আমার মনে হয় আমরা এখনও বহু দূরে আছি। এখনও বোধ হয় অনেকটা পথ যাবার আছে। মাঝে মাঝে মনটা অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সেই সব সময়, হঠাৎ মেঘের ঝিলিক দিয়ে আন্তোনিওনি-র মতো মহৎ শিল্পীদের উক্তিগুলো হাতের কাছে আসে।

তারা নতুন করে বল দেয়।

নিরীক্ষামূলক ছবি

এদেশে নর্মান ম্যাকলারেন নেই জন্মায় নি।

এদেশে এক্সপেরিমেন্টাল আজও হয় নি।

'আভাঁ-গার্দ', 'এক্সপেরিমেন্ট' ও 'নিও-রিয়েলিজম' কথা তিনটি খালি শুনি। তাৎপর্য বুঝি না ; আমি বোধহয় অন্য কোনো মানে করে নেই এদের। যথেচ্ছ প্রয়োগে কথাগুলো ভাবিয়ে তুলেছে। আজকাল কেমন যেন গালাগাল মনে হয়।

এক্সপেরিমেন্ট বলতে আমি যা বুঝি, আমাদের দেশের কোনো ছবিই সে পর্যায়ে পড়ে না। এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে— ফিল্ম ফর্মটির অবকাশ বাড়িয়ে নতুন আয়তনের পরিধিতে ব্যাপ্ত করে দেবার প্রচেষ্টা। স্থান ও কালের সম্পর্কে এ প্রচেষ্টা নিরীক্ষার পর্যায়ে উন্নীত হয়।

যুগস্কন্ধে স্থাপিত বলেই নীচের প্রচেষ্টাগুলি এক্সপেরিমেন্ট। সেই *গ্রেট ট্রেন রবারি*, মেলিসের *ফ্যান্টাসিগুলি*, গ্রিফিথের *ইনটলারেন্স*, তাঁর ক্লোজ-আপ, আইজেনস্টাইনের *পটেমকিন*, ফ্ল্যাহার্টির *নানুক*, গ্রিয়ারসনের *ড্রিম স্টারস*, পুদভকিনের শব্দের সম্পাদনা ও অভিনয়ের ব্যবহার— *মাদার ও ডেসার্টার*, রাটমানের *সিম্ফনি অব এ সিটি*, ইয়োরিস ইভেন্সের *দি ব্রীজ*, *কালিগরি* ও অন্যান্য, 'উফা'র ছবি, ডিজনের *ফ্যান্টাসিজ*, ফরাসি 'আভাঁ গার্দ'রা, দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ইতালীয় ছবি, বিশেষ করে ডিসিকা ও জাবাতিনির *বাইসাইকল্ থিভস*।

আজ এদের মধ্যেকার এক্সপেরিমেন্টমূলক নবতত্ত্বগুলি আন্তর্জাতিক ছবির ভিত্তিস্বরূপ। সবচাইতে সস্তা তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবিতেও তাদের যত্রতত্র প্রয়োগ।

আজ কেউ এগুলিকে বা এদের নবরূপে সৃষ্টির কাজে প্রয়োগ করলে এক্সপেরিমেন্ট বলাটা বাড়াবাড়ি হবে। 'এক্সপেরিমেন্ট' ও 'মেটিরিয়াল' নিয়ে ব্যবহারে ব্যস্ত আজকের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা।

সারা পৃথিবীর ছবি আমি দেখি নি, তবু আমার কেমন ধারণা হয়েছে, 'এক্সপেরিমেন্ট' ব্যাপারটি আকছার ঘটছে না এবং সর্বত্র ঘটছে না। আমাদের দেশে তো নয়ই।

শিল্পের যত সুষ্ঠু প্রয়োগই হোক, সম্পর্কের অভিনবত্ব প্রকাশের যত মাধুর্যময় ভঙ্গিই হোক— আঙ্গিকের অবকাশকে বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা প্রকট করে না তুললে কিছুতেই এক্সপেরিমেন্ট পর্যায়ে ফেলতে আমি রাজী নই— এদেশে নর্মান ম্যাকলারেনকে আমি আজও দেখি নি।

এতদ্দ্বারা হঠাৎ লজ্জা পেয়ে যাবার কোনো কারণ নেই। চার্লি চ্যাপলিনকে কেউ এক্সপেরিমেন্টাল বলে অপবাদ দেয় না। কিন্তু ফিল্ম শিল্পের মহত্তম স্রষ্টা বললে তাঁরই নাম করতে হয়।

এক্সপেরিমেন্টের ফলিত প্রয়োগে তিনি সার্থকতম। শিল্পের নব অবকাশ আবিষ্কার করতে তাঁর বাধা ছিল না। কিন্তু করেন নি। তাতে তিনি কিছু ছোটো হয়ে গেছেন কি?

ঝগড়া উঠতে পারে, শিল্পের মধ্যে পাণিনি পড়ে না। বৈয়াকরণের জাত আলাদা। ফিল্ম একটি শিল্প, এত কঠোর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় তার নিরীক্ষাকে ফেললে চলবে কেন? শিল্পগত নিরীক্ষা আলাদা জিনিস। তা হচ্ছে নব-সম্পর্কের সন্ধান ও প্রকাশ। বক্তব্য সব শিল্পেরই ধ্যানের বস্তু। সে-বস্তুর সন্ধান ও অনুধাবন দর্শনের অঙ্গীভূত। শুধু যে-বস্তু যেসব নব সম্পর্কের মধ্যে প্রতিভাত, যেসব নব-রসে প্রকাশিত, তার সার্থক চিন্তার উদ্দীপনই তো ফিল্মের এক্সপেরিমেন্ট।

একথা বললে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট কথাটাই নিরর্থক হয়ে পড়ে। মানবমনের ও মানবসমাজের যে নব-সম্পর্কের অনুসন্ধান, তা প্রত্যেক ভালো শিল্পেরই প্রাণবায়ুস্বরূপ। প্রত্যেক সার্থক ছবিই তা হয় এক্সপেরিমেন্ট। এ ধরনের হালকা প্রয়োগে আপত্তি থাকত না, যদি তার দ্বারা স্বার্থপরদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া না হত।

কারণ এক্সপেরিমেন্ট কথাটার মধ্যে অনিশ্চয়তার সুর বাজে। এক্সপেরিমেন্ট মানে চেনাজানা পথ ছেড়ে অজ্ঞাত বিপদসংকুল দিকে এগোনো। যাঁদের স্বার্থ আছে তাঁরা, 'গিভ দি ডেভিল এ ব্যাড নেম, অ্যান্ড কিল হিম', এই রাস্তা ধরে থাকেন এর সাহায্যে।

অবশ্য সেটা তাঁরা করবেনই। কিন্তু আমরা দিশেহারা হয়ে তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছি কেন?

আর ঐ গালভরা কথাটার দরকারই বা কী? কোনোদিনই কি আমরা গভীরভাবে বড়ো বড়ো শব্দের ঢক্কানিনাদ ছাড়া কাজে মন দিতে পারব না?

আবার প্রশ্ন উঠবে।

স্থান ও কালই যদি এক্সপেরিমেন্টের জাত ঠিক করে তা হলে আমাদের দেশে যা তাজা নতুন, তা কেন সে পর্যায়ে পড়বে না? আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে?

ফিল্ম আন্তর্জাতিক শিল্প। যেমন বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক।

'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর' আমাদের দেশে যেদিন চালু হয়, সেটা কি এক্সপেরিমেন্ট ছিল? অন্যদেশে ফল দিয়েছে, এমন এক্সপেরিমেন্টের ফল এদেশে কেউ সার্থকতমভাবে ব্যবহার করলে শ্রেষ্ঠ শিল্প হয়, এক্সপেরিমেন্ট হয় না। আমাদের দেশে সবে তাই হতে আরম্ভ করেছে।

এই-যে মহৎ শিল্প করার তাগিদ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে, এ-ই অচিরে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট করার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত শিল্পের সম্ভাবনাকে আয়ত্ত করার দিকেই আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মনোযোগী। সেটা তাদের করে উঠতে দিন। মিছিমিছি মাথা গুলিয়ে দিয়ে, ভুল মূল্য আরোপ করে, লাভ কী আছে?

'আভাঁ-গার্দ'!

প্রায়ই শুনতে হয় এদেশে নাকি আভাঁ-গার্দ ছবি তৈরি হচ্ছে। এটি একটি বিশেষ স্টাইল। বিগত মহাযুদ্ধের আগে ফরাসি চিত্রনির্মাতাদের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল অংশ এই স্টাইলের জন্মদাতা। সে স্টাইলে ছবি-করা আজ বন্ধ হয়ে গেছে। অথবা বলা চলে, ছড়িয়ে ডিফিউজড় হয়ে গেছে সবদেশের ভালোছবি করার চেষ্টাতে। আলাদা করে তার কোনো সত্তা নেই, যেমন নেই 'পিওর ফিল্ম মুভমেন্টে'র।

'আভাঁ-গার্দ'— এর একটি ব্যাপকতর অর্থ আছে। সাধারণত ওদেশের কমার্শিয়াল লোকেরা যে-কোনো দেশের প্রগতিশীল ছবিকে ঐ বলে বিজ্ঞাপিত করে থাকেন। যেমন পারীর একটি কাগজে সেদিন একটি ডিস্ট্রিবিউটরকে বিজ্ঞাপন দিতে দেখলাম পিয়েত্রো লুয়োমো দি প্যাগিলি (দি স্ট্রম্যান)কে আভাঁ-গার্দ ছবি ব'লে।

এটি প্রায় একটি স্টান্ট, একটি অপপ্রয়োগ।

এইসব ফ্যান-ম্যাগাজিনের ভাষা চিন্তাশীল জগতে ব্যবহার করাটা বাঞ্ছনীয় নয়।

রইল পড়ে 'নিও-রিয়েলিজম'।

এই কথাটি সম্বন্ধে সঠিক করে কিছুই বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, আমি ভালো করে বুঝি না ব্যাপারটা কী!

শুধু একটা কথা। এই অধম একখানি ছবি করে ফেলেছিল। যাকে নিও-রিয়েলিস্টিক আখ্যাত হতে শুনে তার নির্মাতা খুব খানিকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে কি অজ্ঞান্তে বিরাট সর্বনাশটি করে ফেললাম? নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যখন আমার ছবিটির পরে প্রকাশিত এক-আধখানি নিও-রিয়েলিস্টিক বাঙালি ছবি দেখলাম। বুঝলাম ওর মানে করা হয়,— খুব খানিকটা আউটডোর ফুটেজ। আর বোধহয় কিছু 'আনইউজুয়াল অ্যাংগেলের শট'। সঙ্গে সঙ্গে বক্স-অফিস ফাঁকা। দুর্বোধ্যও হওয়া চাই।

হালকা কথা ছেড়ে কাজের কথায় আসা যাক। নিওরিয়েলিজমের জনকতুল্য জাবাতিনির একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। যা বুঝেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, সাহিত্যে আমরা যাকে ন্যু-সুররিয়েলিজম বা ফোটোগ্রাফিক রিয়েলিজম বলি, তারই এক উগ্র সংস্করণ। কার্যকারণপরম্পরা বা দৈবসংযোগের (কোইন্সিডেন্স) ওপরে একদম জোর না দেওয়া, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার নিজস্ব নাটকীয় মূল্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ (তার মধ্যে নাটকীয়তার মাত্রা না ঢুকিয়ে) অথচ একটা সর্বাঙ্গীণ মানবকল্যাণবোধ, এই তো প্রধান সুর এর। তবে 'নিও' কথাটি কেন? বুঝি নি।

জয়েসের ভাষায় যতিবিন্যাসের বিপ্লব এবং বক্তব্যের তুচ্ছতা, কোথায় যেন একটু মিল আছে এর সঙ্গে। দার্শনিকতা থাকবে, কিন্তু চাপাভাবে।

বাইসাইক্‌ল্ থিভস যদি এর পরম দৃষ্টান্ত হয়, তা হলে গোর্কির *ওয়ান অটোমন নাইট* বা লন্ডনের, *দি ল অব লাইফ* নিও-রিয়েলিজম নয় কেন? আর স্বল্পকথনের চূড়ান্ত হলেও অনিবার্যভাবে কোইন্সিডেন্স এবং ঘটনা-পারম্পর্য এতে এসে পড়েছে। আরো বড়ো মারাত্মক, থিওরির দিক থেকে, কাব্য— মহৎকাব্য এসে পড়েছে ছবিটিতে।

ক্যানডিড ক্যামেরা? মনোটোন? এসবই ভালো রিয়েলিজমের লক্ষণ, ভালো ডকুমেন্টারিরও।

বাইসাইক্‌ল্ থিভস অবিসংবাদিতভাবে রিয়েল দ্যান লাইফ, মহৎ শিল্প। এক্সপেরিমেন্টের দিকে আমি ঢুকছি না। মানুষের সাধারণ আচরণ থেকে বিহেভিয়ারিজম। ক্যামেরার সূক্ষ্মতম অনুভূতির যে ইন্টিগ্রেটেড হবার ক্ষমতা, সমস্ত সমাজকে ইঙ্গিতে নস্যাৎ করে যে-অপূর্ব কৌশলময় এডিটিং, বহুব্যাপ্ত জীবনস্রোতকে ক্যাজুয়ালি দেখে যেতে যেতে অজান্তেই একটা গল্প আর ঘটনার পরিণতি তৈরি হয়ে যাওয়া, ফিল্ম ফর্মের সম্ভাবনাকে এক *পটেমকিন* ছাড়া বোধহয় আর কোনো একক ছবি এতদূর এগিয়ে নিয়ে যায় নি। কিন্তু এর মধ্য থেকে নিওস্কুল কী করে জন্মাল, আজও আমি বুঝি নি।

মিরাক্‌ল ইন মিলান কি নিও-ফ্যান্টাসি? আগের ছবির সঙ্গে এক পর্যায়ে কী করে পড়ে? বুঝি নি। ফেডরিকো ফেলিনির *লা স্ত্রাদা*-এর গল্প তো হার্ডি ও ডিকেন্সের ধাঁচের— অনেক বড়ো বড়ো গোটা গোটা ঘটনা ও চরিত্রের নক্‌শা।

হফম্যান যেমন আরেক যুগ-পরিবর্তনের সময় সমাজের ব্যভিচারের বিরুদ্ধে আর্ত চিৎকার করেছিলেন, আমার তো *মিরাক্‌ল্ ইন মিলান* দেখে সেই ফ্যান্টাসটিক রিয়েলিজমের কথা মনে পড়েছিল।

লা স্ত্রাদা যেন এসেনশিয়াল রিয়েলিজমের দিকে চলে গেছে। পিয়েত্রো জার্মির *ইল কোনোভার* তো একেবারে অন্য স্বাদের, ডিসিকার কাজের সঙ্গে কোনো মিল নেই।

রসেলিনির পরেকার ব্যর্থ ছবিগুলির কথা বাদ দিলাম— তাঁর *ওপর সিটি রোম* বা *পইসাতে* যে-রস সঞ্চারিত, তাতে শ্রেষ্ঠ সোবিয়েত লেখকদের রেজিসট্যান্সের ওপর সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যোগ দেখি।

এইসব ছবিগুলি একই নিও-মুভমেন্টের মধ্যে কোন্ থিওরি অনুসারে পড়তে পারে আমি আজও বুঝি নি।

ফ্ল্যাহার্টি *লুইসিয়ানা স্টোরিতে* মানবসমাজের অচেনা কোণায় খুঁজেছেন, ডি সিকা যেন সেই একই সন্ধান চালিয়েছেন শহরের মজুর এলাকায়। লুইসিয়ানার বেয়্‌-তে খোঁড়া সেই ছেলেটির সঙ্গে ডি সিকার ছেলেটির মিল দেখেছি ট্রিটমেন্টে ; ফ্ল্যাহার্টিকে কবি বলে লাভ নেই, ডি সিকাও সেন্টিমেন্টাল হব না ভেবেও আবেগময় কাব্য রচনা করেছেন। এ যেন পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষে অবতরণের যোগ।

ফ্ল্যাহার্টি থেকে ক্রাউন ফিল্ম ইউনিট— সেখান থেকে ডি সিকা, আমার কাছে পরিষ্কার যোগটা ; তফাত আছে, ধাপে ধাপেই আছে। *মোনার সঙ্গে নাইট মেল* বা *সঙ অব সিলোন,* তার সঙ্গে *বাইসাইক্‌ল্ থিভস বা লুইসিয়ানা*— আলাদা পর্যায়— উন্নতির আর-এক ধাপ।

কাজেই পরিষ্কারভাবে নিও-রিয়েলিজম এবং রিয়েলিজমের তফাত বোঝা বা 'ডকুমেন্টারি ফিল্ম অব লাইফ' এবং 'ক্যানডিড ক্যামেরা'— কোথায় শেষ— কোথায় শুরু জানি না।

তার ওপরে সূক্ষ্মতর বিভাগ আরম্ভ হয়েছে আজকাল। ডিসকন্টির নতুন ছবি *হোয়াইট নাইট* নাকি নতুন স্কুলের জন্ম দিয়েছে— নিও-রোম্যান্টিসিজম। প্রায় নাচার হবার অবস্থা। এসব নামকরণের সার্থকতা কী, বুঝি না। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের কিছু আগে থেকে ইয়োরোপে সব শিল্পেই নামকরণের একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে তা কতদূর মূলগত তফাতের পরিচায়ক জানি না, কিন্তু নব্য-বাস্তববাদ বা নব্য-শৃঙ্গারবাদ আমি খুব ধাতস্থ করতে পারি নি। জাবাতিনির লেখা পড়লে যে-সূত্রগুলি মূল মনে হয় বাইসাইক্‌ল্ থিভস যেন তার একমাত্র দৃষ্টান্ত হয়ে পড়ে। একটি দৃষ্টান্তে একটা স্কুল হয় না।

এখন, ভারতবর্ষে এ ধরনের ছবি হয়েছে কি? তেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে সমালোচনার যোগ্য তো সত্যজিৎ রায়ের দুটি ছবি। দুটিরই আবার জাত একদম আলাদা। একটা জিনিস লক্ষই করা হয়নি এদেশে। সত্যজিতের দুটি ছবির কম্পোজিশনগুলির ভ্যালুস পর্যন্ত আলাদা। দুটির চিত্রনাট্য গঠনে মিলের চেয়ে অমিল বেশি এবং একই মাপকাঠিতে দুটিকে বিচার করা চলে না। এ দুটিতে— বিশেষ করে *পথের পাঁচালীতে* যে-পরিমাণ লিরিক রয়েছে, ইডিলিক মন্টেজ বিল্ডিং রয়েছে, তা-ই নিও-রিয়েলিজমের (অর্থাৎ জাবাতিনির থিওরির) বিরোধী। রেনোয়া, ফ্ল্যাহার্টি, ডি সিকা, এঁরা সবাই অত্যন্ত প্রভাবিত করেছেন ছবিগুলিকে ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশজ অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ যেন বিশেষ করেই *অপরাজিততে* প্রকট।

সর্বোপরি শিল্পীর নিজস্ব ব্যবহার। অনবদ্যরূপে ব্যবহৃত কলাকৌশলগুলি, যারই হোক,— তাতে শিল্পীসত্তার ছাপ বর্তমান।

হয়তো অবাক ঠেকতে পারে, কিন্তু এলিয়া কাজানেরও যেন ছাপ পড়েছে *পথের পাঁচালীতে* ; দৃশ্যগঠনের প্রণালীতে, বক্তব্য বা রসে নয়। সত্যজিতের *পথের পাঁচালী* নিশ্চয়ই নিও-রিয়েলিজম নয়। রেনে ক্লেয়ার ও চ্যাপলিন বড়ো সুস্পষ্ট সেখানে। তাঁর *জলসাঘর* কাহিনীর দ্বারাই তার চরিত্র প্রমাণ করেছে— নাটকীয় এর কাহিনী।

কাজেই সত্যজিৎ হাতড়াচ্ছেন। নতুন নতুন ভঙ্গির মধ্যে নিজের সত্তা খোঁজার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে-ভঙ্গির মধ্যে নিও-রিয়েলিজম পড়ে না।

বাকিদের কথা আলোচনা করে লাভ আছে কি?

তা হলে আমরা করছিটা কী? আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছি না, পিওর ফিল্ম করছি না, আভাঁ-গার্দ করছি না, নিও-রিয়েলিজম করছি না। আমরা ছবি করছি, এতদিনে আমরা শিল্পের যে মূল মর্যাদা, সত্যের অনুসন্ধান,— তাই আরম্ভ করেছি ; বস্তুর সত্য, আঙ্গিকের সত্য। আঙ্গিকেরও সত্য আছে, তা হচ্ছে তার ধর্ম, তার অবকাশগুলির ব্যবহার। আমাদের ছবি-করা দানা বাঁধে নি। এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট গতিরেখা আবিষ্কৃত হয় নি। এতদিনকার পিছিয়ে পড়ার পরে আমরা সর্বমূল্য যাচাই করে সমস্ত ব্যাপারটা কব্জা করছি।

ভারতের একমাত্র সর্বসার্থক ছবি পথের পাঁচালীর নেতৃত্বে সেই চেষ্টারই অভিযান।

এই যাত্রাকেই খবরের কাগজের লিখিয়েরা ঐ নামে অভিহিত করছেন পর্যাপ্ত পরিমাণে। ওগুলোতে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, চাকরি রাখার পক্ষে এবং সম্মান পাবার পক্ষে ওসব ব্যবহার অপরিহার্য।

কিন্তু এদেশের চিন্তাশীল জগৎও এইসব অপপ্রয়োগে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে এবং অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার মনে দুরন্ত ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

এর থেকেই লঘুগুরু জ্ঞান এখন হারাতে শুরু করেছে। কোনো এক সুবিখ্যাত দৈনিকে সুবিখ্যাত পণ্ডিত-প্রধান-সম্পাদক সত্যজিতের *অপরাজিত*-র সঙ্গে তপন সিংহের তুলনা করে শেষোক্তকে আভাঁ-গার্দ এবং নিও-রিয়েলিজম আখ্যা অম্লান-বদনে সেদিন দিয়ে গেলেন।

ফিল্ম-লাইনের শিক্ষিত ভদ্রলোক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন শুনেছি, *পথের পাঁচালী* যেমন গ্রামবাংলার, অসিত সেনের *পঞ্চতপা* তেমন ভবিষ্যৎ ভারতের সার্থক ইঙ্গিত।

ডাক-হরকরার কর্তারা সুচিত্রা-উত্তমকে ছেড়ে এ বইতে নিওরিয়েলিজমের এক নতুন রূপ দেখিয়েছেন, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এ-কথা বলতে শুনেছি।

আমাদের ভারতীয় নিও-রিয়েলিজম *পথের পাঁচালী* এবং *দো-বিঘা জমিনে* শুরু— *কালামাটি, ডাক-হরকরা, চলাচল, অন্তরীক্ষে* এক নাগাড়ে বয়ে বয়ে জোনাকির আলোতে তার সাদর বিন্যাস।

পিণ্ডপ্রদাহকর।

সমালোচনার কথা সেইজন্যই ওঠাতে হয়। বিদেশি টার্মগুলোর অসদ্ব্যবহার না করে কাজের কাজ করার সময় এসেছে।

এদেশের ছবি-করনেওয়ালারা সমালোচকদের কাছ থেকে কোনো রকম সৃষ্টিশীল সাহায্য পাচ্ছেন না।

উচ্ছ্বাস নয়, লাফালাফি নয়, ওজন করে বিচার করার যুগ এসেছে। নইলে এগোনোর পথ ক্রমশই বন্ধ হবে।

কারণ—

এসব ছবির বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ফিল্ম-লাইনে। এসব ছবির নাম দেওয়া হয়েছে আর্ট-ফিল্ম। এদেরকে বন্ধ করার রাস্তা খোঁজা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে কেউ কেউ। প্রমাণ চান?

তবু সুবিধে লাগে না সেসব পড়ে। এঁরা অনেক শিক্ষিত, অনেক দিক জ্ঞানসম্পন্ন, রুচিবোধ পরিচ্ছন্ন, অনুভূতি এদের গভীর। কিন্তু এঁরা বড়ো সাহিত্য-ঘেঁষা। বড়ো বই-বই গন্ধ এঁদের লেখায়। একটা তরুণ শিল্পকে ওজন করতে এঁরা বড়ো পাণ্ডারস। আর ছবি তৈরি করার পদ্ধতিগুলো এঁদের ওজনের বাইরে মনে হয়। সেগুলো না জানা থাকার দরুন সমালোচনা ভয়ংকর অবাস্তব হয়ে পড়ে। ছবির অভিব্যক্তি আর ব্যঞ্জনা অনেকসময় কোনো দ্যোতনাই আনে না এঁদের কাছে।

অথচ এঁরাই অগ্রণী, এঁরাই পারতেন, এঁরাই লড়তে পারেন এবং থিয়োরি তুলে ধরতে পারেন শিল্পীদের জন্য। জনতাকে আঘাত করে ভুল দেখাতে পারেন।

শুধু যদি এঁদের মধ্যে কিছু লোক ছবি-করাব ব্যাপারটাকে হৃদয়ংগম করতেন।

খোঁজখবর রাখতেন বিদেশের এবং এদেশের প্রতিদিনকার ছবি-করার ঘটনাগুলোর। নেতৃত্বক্ষমতা এঁদেরই ছিল, বাস্তবক্ষেত্রে নিজেদের দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করতে পারলে।

এ বাদে আর-এক ধরনের সমালোচক আছেন, যাঁরা ছবি বোঝেন, ছবির জগতের ধারকাছ দিয়ে ঘোরা-ফেরা করেন, কেউ কেউ ছবি করবেন এই মতলব মনে এঁটে ঘুরছেন। এঁরা আর্টিস্ট, ফর্ম এঁদের কাছে চূড়ান্ত ব্যাপার। ফর্ম মানে এক্সপ্রেশন নয়। ফর্ম হচ্ছে স্টার্টিং পয়েন্ট। এঁরা সাধারণত বড়োলোক। হয় চাকরি করেন, না-হয় স্বাধীন আয় আছে। কোনো জার্নালে বা আর্ট-ম্যাগাজিনে সমালোচনা লিখে থাকেন। এঁরা হচ্ছেন আমাদের ট্রপিক্যাল দেশের গ্লাস-হাউসের বাসিন্দে।

ছবি করলে এঁরা কিন্তু ইউজুয়াল রাস্তাই ধরে থাকেন, অর্থাৎ কম্প্রোমাইজ ; লড়াই করার তাকতের অভাব। এইসব পরগাছা-জাতীয়দের সমালোচনার কোনো মূল্য নেই। মাথামুণ্ডুও নেই। অথচ দুঃখের বিষয় এঁরাই একমাত্র প্রচুর ছবি দেখেছেন এবং রীতি পদ্ধতি জানেন। অবশ্যম্ভাবী রকমে এঁরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ এঁরা প্রমাণ করছেন, মানবীয়চিন্তার ব্রড ধারার সঙ্গে পরিচয় না রেখে, মানুষের অভিজ্ঞতার নিরিখ না ওজন করে নিয়ে, শুধু আর্ট গড়তে গেলে কেমন করে বন্ধ্যাত্ব আসে।

এইসবের মধ্যে ছবি করা যায় কী করে? সমালোচনা করুন ; শুধু শিল্পীর নয়,— শিল্পের, গ্রাহকের, রস পরিবেশনের ও গ্রহণের।

সমালোচনা সরাসরি টাকা এনে দেয় না। সোজাসুজি ভালো ছবির জন্ম দেয় না বা তাকে চালায় না, কিন্তু শিল্পীমন এরই জন্য আকুল হয়ে থাকে। সব শিল্পী নিজের ওজন করতে চায়। পেলে, এমন-কি রূঢ়ভাবে পেলেও, খোরাক সংগ্রহ করে আরো এগোনোর। এটাই সমালোচনার গুপ্তকথা।

সিম্বল

সিম্বল। প্রতীক— যাকে বলি আমরা বাংলায়। জিনিসটি বহু ব্যাপৃত মানবের চিন্তা ধারণা ও ধ্যানের কথা। আজকাল মনে করা হয়, এর আচরণ গতিবিধি মানবেতর জীবজগতেও বিরাট একটা প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই মানুষের সমস্ত শিল্পকর্মে তার একটা বিরাট স্থান থাকবে— এটা অনস্বীকার্য। তার একটা প্রধান কারণ হল, শিল্প জিনিসটা স্বতঃই এই ধরনের প্রতীক কামনা করে।

ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলা যাক। শিল্পের জন্ম হয় কোথা থেকে? মানুষের সর্বপ্রকারের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে যে শ্রম উৎপাদিত হয়, তার থেকেই সব শিল্পের জন্ম। আদিমতম যে-সব শিল্পের সন্ধান আমরা পেয়েছি যেমন— আলতামিরা অথবা লেত্রোয়া ফ্রেয়ার ইত্যাদি সুবিখ্যাত গুহার গায়ের চিত্র থেকে। সেখানে আদিমতম মানুষ, যারা প্যালিওলিথিক যুগে ইয়োরোপে বাস করত তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ম্যামথ বলে যে প্রাণীকে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে শিকার করত এবং তার দেহের বিভিন্ন উপাদান থেকে তাদের খাদ্য, তাদের পোশাক, তাদের আলো, এমন-কি অস্ত্রশস্ত্রও তৈরি করত।

কিন্তু ম্যাজিকের বোধ সেখানে এসে পড়াতে ওদের যারা মন্ত্রদ্রষ্টা তাদের কথা অনুসারে ছবি এঁকে ম্যামথের বুকে একটা বর্শা ঢুকেছে দেখিয়ে দিলে, বাইরের বাস্তব জগতে গিয়ে সে রকম একটা ম্যামথ পেলে তারা সত্যি সত্যি ওরকম ভাবে মারতে সক্ষম হবে, এরকম একটা বিশ্বাস তারা পোষণ করত। কাজেই ছবি আঁকার উৎস ছবির জন্য নয়, পেটের জন্য।

আদিম সংগীতের উৎস খুঁজতে গেলে দেখব সেই একই কাণ্ড। প্রাথমিক মানবজীবন ছিল কৌমজীবন, অর্থাৎ গণজীবন, গোষ্ঠীজীবন। একত্রভাবে কোনো কাজ করতে গেলে, একই সঙ্গে কোনো জিনিস টানতে গেলে, ঠেলতে গেলে, ওঠাতে গেলে বা নামাতে গেলে একসাথে হাত পা মাংসপেশী যদি কাজ করে, তা হলে ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে যায়। এর থেকে আসে ছন্দ। সাধারণ রাস্তার নর্দমা খুঁড়ে পাইপ বসানোর সময় কুলিরা যে 'হেঁইয়ো— হো' করে, সেও একেবারে একই জিনিস। এবং এটা ক্রমশ উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপনাব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ বেশি কাজ আদায় করার সুবিধাজনক পন্থা হিসাবে কিছু কথা আস্তে আস্তে ঢুকতে আরম্ভ করে। আদিমতম কবিতার ও সংগীতের উৎসও এখানে পাওয়া যাবে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রথম জন্মও আমরা এভাবে খুঁজতে গেলে দেখতে পাব যে তা ওতপ্রোতভাবে মানুষের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিজড়িত। শ্রমের সঙ্গে শিল্পের একেবারে নাড়ীর যোগ।

তা হলে সব শ্রমের সমার্থক শব্দ বা আঁকা বা যা-কিছু সবই কি শিল্প হয়?— মোটেই না। একটা স্তর আসে যখন একটা বাড়তি কিছু হঠাৎ কারো— কোনো পাগলের মাথায় জেগে বসে থাকা যে চাই। ব্যাপারটা যেন ঠিক এইভাবে জমছে না। আরো একটু যেন

কিছু দিতে পারলে হত। এই আরম্ভ হল পাগল মানুষের পাগলামি। যার থেকে কর্মেতর কর্মকে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট করে তার পরে যে অবকাশ তার মধ্যে একটু ছোঁওয়া, একটু রঙ, একটু সুর, একটু বিচিত্র শব্দ টেনে আনা গেল, তাতে করে সব জিনিসটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বলা যায়। আদিম মানুষ তখন হাঁ করে নিজের শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল— বাঃ।

এই হল শিল্পের শুভযাত্রা। এইখান থেকে প্রতীক ব্যাপারটাকে মানুষ নিজের হাতে নেওয়া শুরু করল।

প্রতীক জিনিসটা কী? তার বিশেষ ব্যাখ্যা এত লোক এত রকমভাবে করেছে এবং জিনিসটা যে পরিমাণে জটিল তাতে করে এত ছোটোর মধ্যে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবুও দু-একটা গোড়ার কথা ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষের যে স্মৃতির ভাণ্ডার, সেটা জমা হয়ে যায় মস্তিষ্কের সেই অংশে যাকে আমরা বলি— কৌম অবচেতন কালেক্‌টিভ আনকন্‌শাস্‌। এই কালেক্‌টিভ্‌ আনকন্‌শাস্‌ জিনিসটা কোনো ব্যক্তিবিশেষের বাপের সম্পত্তি নয়। সমস্ত মানবসমাজই এর হকদার। এবং মানবসমাজ শুধু নয়, মানবেতর সমাজেও এর প্রচুর খেলা দেখা যায়, যে-সব নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

এই অবচেতন সমস্ত জিনিসগুলো হচ্ছে লক্ষ-কোটি বছরের সৃষ্টির ভাণ্ডার মথিত করে নির্যাসটুকু থেকে যাওয়া। সেটা কোনো বিশেষ মুহূর্তে, কোনো বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে আসে, এবং হঠাৎ মিলিয়ে যায়— সাধারণ কার্যকারণ পরম্পরায় তার হিসেব করতে গেলে কিছুই মেলে না। এটা চিন্তিত করেছে যুগে যুগে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, ধর্মনেতা, ভাবুকদের এবং কবিদেরও। এর বহুবিচিত্র প্রকাশ আজও অহরহ ঘটে চলেছে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন রকমে প্রায় আমাদের অজান্তে।

একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কতকগুলো রূপকল্প প্রায়ই আমাদের মাথায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আশেপাশের জগতে বা আমাদের জানা অতীতে সে ধরনের কোনো ছবির খবর আমরা পাই না। অথচ সর্বদেশে কোনো-না-কোনো রূপে এরকম সব জিনিস প্রকট হয়ে পড়ে এবং বহাল তবিয়তে আজও পড়ছে এবং চলছে।

যেমন ধরা যাক ত্রিনয়নী মূর্তি— থ্রী-আইড ইমেজ— তার বরাভয় মূর্তি আছে আবার ধ্বংসের রূপও আছে। যেমন ইয়োরোপিয়ান, বিশেষত স্কান্ডিনেভিয় এবং আইসল্যানডিক শিশুদের লোক-গাথার মধ্যে তিনচোখা ডাইনি এবং তিনচোখো রক্তখেকো বাদুড় অর্থাৎ ভ্যাম্পায়ার— এদের উল্লেখ প্রায়ই আছে। আর আর্যদের যে ধারা ইন্দো-ইরানীয় বলা হয় তাদের সব দেবদেবীই, বিশেষ করে বরাভয় মূর্তিতে তো বটেই. ত্রিনয়ন হয়ে বসে আছেন। অথচ চোখে আমরা কখনো কি কোনো ত্রিনয়ন দেখেছি, দেখি নি।

এখন এইসব নিয়ে গবেষণা করতে করতে জানা যাচ্ছে যে যখন অতিকায় সরীসৃপরা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে প্রায়, আর পাখিদের সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ টেরোড্যাকটিল বা ঐ-জাতীয় আরো অনেকগুলো জন্তুর তখন উদ্ভব হচ্ছে, সে সময় সব চাইতে ভীতিকর যে পাখি ছিল বা জানোয়ার ছিল মানুষের পক্ষে, সেটা ছিল এরকম একটা ত্রিনয়নী মূর্তি। এ সম্পর্কে ভালো লেখা পড়তে চান তো জর্জ টমসন-এর 'দি আইস্‌ল্যানডিক সাগা'

পড়তে পারেন। মানুষের তখন সবে জন্ম। এখন এই যে, থার্ড-আইড ক্রীচার-এ আসত মৃত্যুরূপে বটে, মানুষ তাকে মৃত্যুরূপে দেখে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠাণ্ডা করার জন্যে, তাকে ঘুষ দেবার জন্যে তার কাছ থেকে বর প্রার্থনা করা, তাকে পূজা করা, আচ্ছা করা, এ সমস্ত-কিছু করত। সে-সব জীব কবে মুছে মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। তার পর এসেছে বহু আইস্ এজ এবং বার বার হয়েছে বদল। বদল হতে হতে শেষ অব্দি মোটামুটি হোমোসেপিয়ান্স-এর জন্ম। এবং তাদের পৃথিবীর অধিকার অর্জন করা। কিন্তু কোথায় গোপনে ঐ একটা ব্যাপার চলে আসছে লুকিয়ে এবং সেটা ঝিলিক মারে এ-সব ব্যাপারে। যেমন আমরা সাপ দেখলে ভয় পাই। এটা জানা গেছে, সাপ ভীষণ বিষাক্ত প্রাণী, মানুষ খুন করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা ঠিক নয় যে সাপ দেখতে খুব খারাপ। এবং এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে-সব শীতের দেশে কোনো সাপ নেই সেখানেও যদি হঠাৎ শিশুদের সামনে সাপ ফেলে দেওয়া হয়, শিশুরা ভয়ে আঁতকে ওঠে। তার ঐ কিলবিল করা পিছল শরীর এবং তার ঐ মুখ নাক চোখ তার মধ্যে সৌন্দর্যের কিছু খুঁজে না পেয়ে মানবক যে ভয়ের কিছু পাচ্ছে এটা এজ অফ রেপ্‌টাইল্‌স্-এর থেকে মানুষের যে লড়াই করে বেরিয়ে আসা তারই একটা ক্ষীণ প্রতিধর্মী বলে পণ্ডিতেরা আজকাল মনে করেন। এরকম আরও অনেক কিছুই বলা যায়। যখন মোটামুটি মানব-সভ্যতা সমাজ-সভ্যতায় পরিণত হল এবং শ্রেণীর ভাগে বিভক্ত হতে আরম্ভ করল এক-এক শ্রেণী এক-এক সময়ে প্রাধান্য পেতে লাগল তখন সেই শ্রেণীর স্বার্থে শিল্পকেও কাজ করে যেতে হয়েছে। তার মধ্যে সব সময় কিন্তু এইগুলো এসেছে এবং গিয়েছে, এবং ক্রমশ কতকগুলো বিশেষ বিশেষ জিনিস বিশেষ বিশেষ প্রতীকের চেহারা নিয়েছে। তার মধ্যে কিছু বলা যায় সর্বজনীন, কিছু স্থানগত প্রতীক। সে-সবের ভেতর এখন না ঢুকে বলছি যে, শিল্প প্রতীক ছাড়া এইজন্যই এগুতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে শিল্প নির্যাসের দিকে যায়। অর্থাৎ অনেক কথা কত কম কথায় বলা যায় এটাই তো মোটামুটি সব শিল্পের সাধনা। একগাদি কথাকে একটা অক্ষরে প্রকাশ করাই শিল্পের সাধনা। সেটা করতে গিয়েই নির্যাসের খোঁজ করতে হয়। প্রতীক আর কিছুই নয় ; এই রকম নির্যাসগুলোই রূপ পরিগ্রহ করে প্রতীকে পরিণত হয়।

আমার এখানে বিশেষ ভাবে অন্য শিল্পের কথা বলার কিছুই নেই। কারণ সেগুলো আমার এক্তিয়ারের বাইরে। ফিল্ম তো কারবার করে ছবি নিয়ে। কবিতায়, গানে সেই ছবিকে ব্যক্ত করবার জন্য অন্য মাধ্যমের আশ্রয় নিতে হয়। ছবিতে সেটা হয় না। একেবারে সোজাসুজি সামনে এসে ব্যাপারটা খাড়া হয়। এবং অনেক সময় আমি চাই বা না চাই, বিশেষ দ্যোতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

সেইখানে ছবি করিয়েদের করণীয় কর্তব্য হচ্ছে যে, এই প্রতীকের ব্যবহারকে নিজের বক্তব্যের সঙ্গে একত্র করে, জারিয়ে নিয়ে প্রকট করা। এক ধরনের চেষ্টা আজকাল প্রায়ই হয়— যেমন প্রতীকের জন্যেই প্রতীক। অর্থাৎ, হঠাৎ উদ্ভট একটা কিছু বা আবদ্ধ একটা কিছু সামনে তুলে ধরে চলে যাওয়া, যেটা মূল বক্তব্য থেকে উৎসারিত নয়। এগুলোকে গিমিক বলা যায়, স্টান্ট বলা যায়। এগুলো দিয়ে হয়তো হাততালিও পাওয়া যায় ; আমি জানি না,— কিন্তু এগুলো সত্যিকার সিম্বল নয়। অর্থাৎ আমার মতে তো নয়-ই। আমার মতে হচ্ছে সেটাই, যেটা আমার বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে ইনেভিটেব্‌লি সামনে

এসে পড়বে।

আর কোনো উপায় আমার নেই, ঐ সময়টুকুর মধ্যে, ঐ ব্যাপ্তিটুকুর মধ্যে ঐ কথাখানি বলার— এই প্রতীক ছাড়া। এই রকম যখন নিরুপায় অবস্থায় এসে পড়ব তখনই ভীষণ কেঁদে কঁকিয়ে একটা প্রতীক ছাড়ব। অর্থাৎ খুব কৃপণ হতে হবে। তবেই সেগুলো ওজনে ভারী হয়, সেগুলোর মূল্য জন্মায় এবং ওরা সত্যিকারের খানদানি, অভিজাত প্রতীক হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। কথায় কথায় এ সমস্ত নিয়ে লাফাঝাঁপি করা অতীব বালখিল্যসুলভ। এগুলোর প্রতি আমার ঘোরতর অনীহা আছে।

আর-একরকম কাণ্ড বাধে। এতক্ষণ যা বললাম, সেটা হচ্ছে যে, ভাবনা-চিন্তা করে প্রতীক ব্যবহার বিষয়ে। কিন্তু এক-একটা সময় আসে যেখানে ভাবনা-চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে দুমদাম করে প্রতীক এসে ঘাড়ে চেপে বসে। তার কার্যকারণ পরম্পরা নিজেই বুঝতে পারে না। পরে লোকে জিজ্ঞাসা করলে তখন চাল মেরে সাজিয়ে গুছিয়ে একটা মানে বলে দাও, আসলে কিন্তু তুমি নিজেও জান না কেন ওটাকে ব্যবহার করছ। ওটা স্বতোৎসারিতভাবে এসে তোমার ঘাড়ে চেপে বসেছে, এবং তোমাকে হন্ট্ করেছে, এটা হচ্ছে সেই অবচেতনা। কাজেই শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে ঐ সেকেলে পুরোনো কথা 'অবাঙ্মানসগোচর'। ভাষা এবং মনের হিসাবের বাইরে কী মাল একটা ঘুরপাক মারছে যা দিয়ে টকাটক তোমার সারাজীবন হাতে হাতে খাতির হবে, হ্যান্ডশেক হবে, দশবার কি বারোবার, সেই দশটা-বারোটা মুহূর্তই তোমার বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। সেইটা হচ্ছে একেবারে খাঁটি প্রতীক।

এর বেশি আমার বিশেষ কিছু বলার নেই, স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে তা হলে পরে গুছিয়ে এল্যাবোরেট করে বলার চেষ্টা করব।

দুই দিক মন : দিবাস্বপ্ন

দিবাস্বপ্ন!

শিল্পের জন্ম!

তারই খতিয়ান।

নন্দনতত্ত্ব নয়, নয় গালভরা থিওরি, এটা খালি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে শিল্পকর্মের গোড়াটা বুঝতে চেষ্টা করা। আমার আশপাশের বিভিন্ন শিল্পী-ভাবুকদের দেখেও কথাটা মনে হয়, তাঁদের সবচেয়ে চরম অবদান, তার পেছনে বোধ হয় এইরকম একটা চোখে অঞ্জন লাগিয়ে দেওয়ার কল্পনাটুকুই কাজ করছে।

দর্শন বা ঐ ধরনের কোনো ঘটনার দিকে এখন আমি যাচ্ছি না। হঠাৎ—আলোর ঝলকানি যে কী চমকপ্রদ জিনিস হঠাৎ করে আমাদের সামনে অনির্বচনীয় কিছুকে দাঁড় করিয়ে দেয় তারই কিছু ইঙ্গিত এখানে দেবার চেষ্টা মাত্র।

এবং সেটা করব মূলত ছবিতে আমার অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করেই।

সব শিল্পীকেই অবাক হবার ক্ষমতা মনে চিরসবুজ-চিরজাগরূক রাখতে হয়। অবাক

না হলে কোনো বৃহৎ কর্ম সমাধা হয় না। কিছু-না-কিছুর প্রতি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা, অভিভূত হয়ে যাওয়া তাৎক্ষণিকতার মধ্যে, রসে টইটম্বুর হয়ে হারিয়ে যাওয়া, হয়তো অনেক পরে কোনো স্নিগ্ধ মুহূর্তে নিজের সেই অনুভূতিকে মনের ভাঁড়ার থেকে টেনে বের করে সাজিগুজি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা— এই হচ্ছে সৃষ্টিশীল কর্মের গূঢ় রহস্য।

সব শিল্পীই তাদের ছোট্টবেলাটাকে কেমন করে জানি ট্যাকে গুঁজে বড়ো হয়ে ওঠে, বুড়োটে মেরে গেলে আর শিল্পী থাকে না, তত্ত্ববিদ হয়। এই ছোট্টবেলাটা বড়োই ভঙ্গুর একটা মানসিক অবস্থা, বড়োই লাজুক একটা লজ্জাবতী লতার মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখা ব্যাপার। দৈনন্দিনতার পরুষ স্পর্শে সে ভেঙে খানখান হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়, নীরস হয়ে ওঠে।

এ অনুভূতি সব শিল্পীরই অভিজ্ঞতায় নিশ্চয়ই আছে।

আর এই চমকে ওঠাটার পর মন যেন অবন ঠাকুরের সেই সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চেপে জয়যাত্রায় বেরোয়।

সুবচনীর হাঁস।

— প্রথম হঠাৎ সেই অন্তরের তন্ত্রীতে ঝংকার দিয়ে ওঠা মানসিক স্পর্শসুখ।

আমার জীবনে এরকম বহুবার হয়েছে। ছবি করার কথা যখন থেকে ভাবতে আরম্ভ করেছি তারও আগে থেকে পথ চলতে বারে বারে আপাত অকারণে থমকে পড়েছি। কখনো পদ্মার ওপারে মেঘের পরে মেঘ জমা দেখে মনে হয়েছে, ওখানে যেন কত বাড়ি-ঘরদোর।... কত মানুষের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে...গায়ে মোচড় দিয়ে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে মন উধাও হয়ে যেত সেই অনুভূতির পথ বেয়ে কোনো আকাশ-গঙ্গার দেশে, যেখানে কত-কিছু ঘটছে যেখানে সুখ-দুঃখের নকশা বোনা হয়েই চলেছে, ফলে গল্পের, ছবির পর ছবির জন্ম।

গগন ঠাকুরের 'দ্বারকাপুরী' দেখে মনে হয়েছে, ওই ছাদের পর ছাদের তলায় কোন ভিনদেশের জীবনস্রোত প্রবাহিত, গল্প শুরু হয়ে গেল। ছবিরা ভিড় করে এসে ঘিরে ধরল, শব্দের অদ্ভুত সব সংমিশ্রণ মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল, অর্ধোন্মাদের মতো ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া গেল।

ওই গগনবাবুরই— 'ডেথ্, ও মাই ডেথ' (রবীন্দ্রনাথের 'মরণ, হে মোর মরণ'-এর ইলাসট্রেশন দেখে মনে হয়েছে— মা, যাঁর মুখ আবছা, অস্পষ্ট, অথচ অতীব সত্য, যেন শিশুকে দোলই দিয়ে চলেছেন— যার স্পন্দন-অনুরণন আমাকে ছুঁয়ে গেল।

বৃষ্টির দিনে টেলিগ্রাফের তার বেয়ে জলের ফোঁটারা দ্রুতধাবমান হয়ে তারের ঝোলানো-দিকে চলে যাচ্ছে, কোনোটা বা টপ করে ঝরে পড়ছে, কোনোটা বা অন্য ফোঁটার সঙ্গে মিলে খানিক টলটল করে, তার পর তারের আশ্রয়ের মায়া ছেড়ে ধরিত্রীর দিকে নেমে আসছে। এতে ছন্দ আছে, গল্প আছে, ছবি আছে, সংগীত আছে।

— জগুবাজারের রাস্তার ধারে চাষী বৌরা কলাটা-মুলোটা বেচতে আসে কিছুদূরের গ্রামাঞ্চল থেকে। সারাদিন চলে কেনাবেচা, কোলের কালোকালো ছেলেটি ল্যাংটো হয়ে কোমরে ঘুনসি পরে রাস্তার নর্দমা এবং পচা টিউবওয়েলের জলের সঙ্গে সারাদিন প্রায় বেজায় লড়াই করে, বাকি সময়টুকু কান্নাবিলাস এবং মার ওপরে দস্যুপনা সেরে রাতে

আধোঘুমন্ত ক্লান্ত অবস্থায় মায়েরই কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। মা তার সারাদিনের বেচাকেনায় ক্লান্ত। খড়কুটো দিয়ে ইঁটের সাজানো উনুনে দুটো চালে-ডালে সেদ্ধ চড়িয়ে আদুড়গায়ে কাঠ দিয়ে নাড়ছে, ছেলে কোলে পা ছুঁড়ছে আর মায়ের মাই চুষছে,— মাঝে মাঝে এক-আধটা বিষণ্ণ রিক্সার টুংটাং শব্দ, আচমকা একটা-দুটো গাড়ি হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে— এ দৃশ্য দেখতে দেখতে কল্পনাতে চলে গেছি মেয়েটার বাড়িতে। জোত-ক্ষেত-ভেড়ি— মারপিট— অভাব-লাঞ্ছনা-গঞ্জনা— ক্রোধ-স্নেহ-ভালোবাসার এক অনির্বচনীয় কিছু বিনুনি বুনতে থাকে মন। সঙ্গে সঙ্গে রাতের কলকাতার ছবিতে এই ঘটনার দৃশ্য বিশাল স্থান অধিকার করে ফেলে, একটা গোটা ছবির কাঠামো তৈরি করে চলে মন। এই খোরাক কোনোদিন কোথাও কাজে লেগে যায়।

ট্রাম-বাসের স্টপে, সারাদিনের কর্মক্লান্ত, হাতে গুচ্ছেক কাগজপত্র ব্যাগ নিয়ে একটি মেয়ে, নিতান্তই সাধারণ একটি মেয়ে, প্রায়ই আমার বাড়ির কাছে দাঁড়ায়। তার চূর্ণকুন্তল মুখ এবং মাথার চারপাশ ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল তৈরি করেছে। কিছু বা ঘামে লেপটে গেছে।— তার মুখের পাশের সূক্ষ্ম ব্যথার দাগগুলোতে ইতিহাস খুঁজে পাই, কল্পনাতে চলে যাই তার বলিষ্ঠ দৃঢ়, অনমনীয় অথচ কোমল, স্পর্শকাতর, পরমসহ্যশক্তিসম্পন্ন এক জীবনের অতি সাধারণ অথচ অবিস্মরণীয় নাটকের মধ্যে। নিজের জীবনটা, সব শিল্পীর কাছেই বোধ হয় খানিকটা সেই সিক্রেট লাইফ অফ ওয়ালটার মীটি-র মতো। যা দেখে, তাই ধাক্কা দেয়, সেই থেকেই তার মন নাড়া দিয়ে ওঠে, দিবাস্বপ্নে সে চলে যায় সেই সব জীবনে, একান্ত হয়ে ওঠে তার সঙ্গে। সে জীবনকে আত্মার আত্মীয় করে তোলে, দিগ্‌বিদিক এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে সে সেই সময়টুকুর জন্যে।

এ যেন যোগশাস্ত্রের সেই বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে যাওয়া— ধ্যান, ধারণা, সমাধি। অথবা সুফীদের সেই পরমতম আত্মিক স্তর 'ফণা'— তাতে উত্তরণ। তখন সত্যিই মনে হয়— 'সোঽহং, আনাল হক।' নিজেকে মনে হয়— 'ইন্‌সান্ উল্‌-কামিল,'— 'পরিপূর্ণ খাঁটি', পবিত্রতম মানুষ।

এ-সব সেই সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের বাঁদরামি।

সহানুভূতি, তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে, না থাকলে শিল্পী টেঁকে না। কল্পনায় কত অবস্থাতেই নিজেকে বসাতে হয়, কত দেখা-অদেখার ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়, কত বিচিত্র জীবের সান্নিধ্যে আসতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই। নিজেকে ভাবতে হয় 'এই করেছি, সেই করেছি। এরকম হলে, তার পরে কী হত আমার? আমি যদি অমুক হতাম, আর যদি এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তা হলে আমার চরিত্র কোন্ মোড় নিত?'

এক কথায়— রাজা উজির না মারলে শিল্পী হয় না। গুলই হচ্ছে শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা।

আর দম্ভ। দম্ভ না থাকলে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব না। সে দম্ভ স্রষ্টার দম্ভ, সাধারণ অর্থে নয়। আমি যা করেছি, এমনটা পৃথিবীতে আগে কেউ করে নি, এখনও কেউ করছে না, এবং ভবিষ্যতেও কেউ পারবে না— এই পেট্রল না ঢাললে কল্পনার মোটরগাড়ি চলে না, অকেজো হয়ে যায়। নিজের দাম্ভিকতা, অগাধ আত্মবিশ্বাস, অসীম স্বপ্ন দেখার কঠিন দার্ঢ্য,— এ-সব না থাকলে ছবি হয় না মশাই।

ছবি করার সময় হাজারটা যান্ত্রিক এবং নেহাতই শারীরিক পীড়নের মধ্যেও এই চুরি

করে জমিয়ে রাখা ছোটোবেলাকে পুষে রাখতে হয়, তাকে রক্ষে করা, তাকে পুষ্ট করা বড়ো কঠিন, কিন্তু সেটাই প্রাথমিক শর্ত।

ফিলিমটা তো অন্য শিল্পের মতো নয়। এটা করার ব্যাপারটা পরিপূর্ণ মিস্ত্রি-মজুরের কাজ। এখানে, করাকালীন, স্বপ্ন-বিলাসের কোনো অবকাশ নেই। একদিকে দৈহিক কাজের চাপ এবং গুচ্ছেক বিভিন্ন ধরনের লোকদের একই লক্ষ্যের দিকে তাদের জান্তে বা অজান্তে তাড়না করে ধাবিত করা, অপরদিকে পয়সাদেনেওয়ালা লোকদের বা লোকগুলির প্রতিপদে দংষ্ট্রাবিকাশ, আরো একদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাল ঘরে তুলে আনা, এ-সব মিলিয়ে জগাখিচুড়ি তো পাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। এখানে অন্য শিল্পের মতো চন্দ্রাহত হয়ে দাঁত কেলিয়ে বসে থাকার খেজালত অনেক। ছবির বারোটা বেজে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

তারমধ্যে লুকিয়ে নিজের দিব্যদৃষ্টিকে পাচার করতে হবে। দাম্ভিক না হলে পারা যায়।

এইসব কথা মাঝে মাঝে বলে থাকি বলে আমার কিছু বিদগ্ধ এবং বিশিষ্ট বন্ধুর কাছে ভালোমন্দ শুনতে হয়েছে। আমার এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তাঁরা ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাবিলাস লক্ষ করছেন, সংগ্রাম-বিমুখতা, শ্রেণীচেতনা সম্বন্ধে অবজ্ঞা— এই পাপকর্মে লিপ্ত বলে গালমন্দও দিয়েছেন।

তাঁদের কাছে আমার প্রশ্ন আছে। আছে অনেকই, তারই দুটো-একটা এই অবকাশে করে রাখি। তাঁরা প্রেম করেন না? প্রেমিকা বা স্ত্রী (স্বভাবতই প্রেমিকা নয়!) এঁদের কাছে কোনো-না-কোনো মুহূর্তে অভিভূত হয়ে আনতাবড়ি বকেন না? হঠাৎ হঠাৎ ঘুম থেকে শরতের রোদ-ঝলমল শিউলিঝরা সকালে উঠে মনে হয় না যে তরুণ স্বাস্থ্যবান জন্তুর মতো এই শরীরটা শুধু তার অস্তিত্বের গর্বেই টগবগ করছে না তুর্কি ঘোড়ার মতো? কোনো সময়ে নিজের মেয়ের শান্তশ্যামল মুখশ্রী কিংবা ছেলের দামালপনা দেখে মনে হয় না, ভারি তৃপ্তি লাগছে?

'মিছিলের মুখ' যে কবি দেখে, "আমার বাংলা'তেও জারিয়ে যায়। আর এ সবই, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, শ্রেণীসন্নিবদ্ধ সমাজে একটা বৈজ্ঞানিক নকশার মধ্যেই ঘটে চলে, এ খবরটা কি তাদের কাছে নতুন? আরো বড়ো কথা— যে রাঁধে, সে চুল বাঁধে না? মুষ্টিবদ্ধ লক্ষ হাত আকাশকে স্পর্ধিতভাবে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, আবার একগোছা ধানের শীষে তেরছা হয়ে কটি সূর্যের আলো একপাশ থেকে পড়ে ধারগুলোকে উজ্জ্বল রেখায় পরিণত করছে— ছবি এই দুই সীমান্তেরই সাংবাদিক, দুই সীমান্তেরই যোদ্ধা। মানুষের থেকে দূরে গিয়ে যাঁরা মেঘের ওপরে প্রাসাদ বানান, তাঁদের দলে আমি নই— জনতার থেকে দূরে সরে গিয়ে সে প্রগতি যতই চটকদার হোক, সে প্রগতি হচ্ছে জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার গতি। তেমন শিল্পী যতই নিজে বিভোর হয়ে সৌন্দর্য রচনা করবেন, নতুন কিছু অবদান দিয়েছি বলে আত্মশ্লাঘা অনুভব করবেন, ততই মানুষের কান্না আর তাঁদের কানে পৌঁছোবে না, বরং এমন একটা সময় আসবে যখন তাঁরা ধরা পড়ে যাবেন। আর মানুষ তাঁদের দেখলে আঁতকে উঠবে, ঘৃণা করবে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে, লেনিন সাহেবের সেই প্রিয় বাক্য— আর্ট মুভ্‌স ইন অ্যান অ্যানএনডিং লাইন।

শিল্পে বিপ্লব দড়াম করে আসে না। এক শ্রেণী-শিল্প থেকে অন্য শ্রেণী-শিল্পের জন্মগ্রহণের অঙ্কটা অন্যরকম। অতীতকে অনুধাবন করে, তার শ্রেষ্ঠ অংশকে নিজের ঐতিহ্যের সামিল করে, তার পরে 'নিজের মন্ত্রদৃষ্টি যোগ করেই ফল দাঁড়াবে, নচেৎ নয়। ও-সব আমার কাছে ছেলেমানুষি, মূর্খতা বা অসুস্থ বলে মনে হয়। এই ঘটনাটা ভুলে গিয়ে এই মনোবৃত্তি থেকেই এককালে চেঁচানো হয়েছিল— রবীন্দ্রনাথ সামন্ত-ভূস্বামী-তন্ত্র, আধা-ঔপনিবেশিক ধার্মিক-দুর্জ্ঞেয়বাদের কবি। রবি ঠাকুরটা কিছু না। এই মনোভাবই কাজ করেছিল, যখন সাহিত্য, শিল্প, মঞ্চ ও ছবিকে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের লৌহ নিগড়ে বাঁধা (শুধু মতবাদ নয়, তাৎক্ষণিক যে সুরাহাটা ভাবা হচ্ছে, তার সাক্ষাৎ লেজুড় মাত্র) হয়েছিল।

আর-এক ধরনের বোকা-বোকা চালাকিপনা!

এই প্রসঙ্গে একটা কথা এসে পড়ে। আজকাল 'মানবিক সম্পর্ক' বলে একটা কথা চালু হয়েছে ছবিতে। আমার চোখে এ-সব বালখিল্যের মাকড়শা-নৃত্য বলে প্রতিভাত হয়। এই খিঁচুনিটাও এমন একটা ভঙ্গিতে করা হয় যেন মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা নেহাতই একটা হের্মেটিকালি সীল্‌ড্‌ ব্যাপার। এমন কোনো ব্যাপার দুনিয়ায় থাকতেই পারে না। প্রতিটি ব্যক্তির গোপনতম মানসিক প্রবৃত্তিতেও, সামগ্রিক অবচেতন বা কালেকটিভ আনকনশাস-এর কথা ছেড়েই দিলাম, সাধারণ সামাজিক-রাজনৈতিক শ্রেণীচেতনার দ্যোতনা খেলা করতে থাকে। এ ধরনের স্লোগান যাঁরা দেন তাঁরা নিম্নের কোনো একটি— হয় বেশ-কিছু টাকা খেয়েছেন কোনো জায়গা থেকে এবং টিকিটি বাঁধা রেখেছেন, অথবা চারপাশের বাস্তবের আপাত-তালগোল পাকানো চেহারা দেখে হতভম্ব হয়ে ও-সব থেকে কেটে সমস্যা-টমস্যা থাকবেই, কিন্তু অবসর বিনোদনেরও প্রয়োজন আছে বলে শস্তায় কিস্তিমাত করার চেষ্টা করবেন, কিংবা অশিক্ষার কুশিক্ষার দরুন এরকম একটা দায়িত্ব জাতীয়-আন্তর্জাতিক শিল্পীদের পরম কর্তব্য, এবং প্রধানতম কর্তব্য সে সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন।

এঁদের করুণা করা উচিত। আদিখ্যেতা!

কিন্তু মজা এই, যতই চেষ্টা করা যাক, শ্রেণী সমাজের প্রতিফলন সে-সব কাজেও আসবেই। তবে মানুষের চোখকে 'সুন্দর'-এর উপাসনার নামে কিছুদিন বুজরুকি করে ঠুলি পরিয়ে রেখে কিছু টাকা এবং নাম অর্জন করা যায় বটে, কিন্তু কালের দরবার? ভাববার কথা।

সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা কথাও মনে রাখা দরকার। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যাঁরা শিল্পকে যাচাই করতে চান, তাঁদের আবার তাঁদের ঝুলি থেকে ডায়ালেকটিকাল মেটিরিয়লিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে ঘষে-মেজে ধুলো-ঝেড়ে গুছিয়ে নিতে বলি নিজের মগজে।

কিছু কিছু স্থিতধী-প্রবুদ্ধ-মগজ কথাটা একদম ভুলে বসে আছেন যে— **creation always is in a state of constant flux. Something always germinating. Something decaying.**

তাই প্রবহমান স্রোতের ঘটনাকে ধরতে হলেই শিল্পীকে ছোটো ছেলের মতো হাড়বজ্জাত হতেই হবে, লুকিয়ে-লুকিয়ে স্বপ্ন দেখতেই হবে। এখনই যা ঘটে গেল, আগে

কখনো ঘটে নি, ভবিষ্যতেও ঠিক এইটাই ঘটবে না, এই যে মুহূর্তগত ঘটনা, তাকে চেপে ধরে নজির করে রেখে দেওয়াই তো শিল্প। চোখ-কান খুলে শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে এর মধ্যেকার অনির্বচনীয়কে, এর মধ্যেকার জীবন্ত-বাড়ন্তদের এঁকে দেখাতে হবে— যাতে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ খানিকটা দেখা যায়, একটা সোনার রেখা কোথাও টেনে দেওয়া যায়।

তাই সুবচনীর খোঁড়া হাঁস। ভুঁড়ো গণেশটা কোথায় গেল, যাতে আমরা বুড়ো আংলা হতে পারি?— কিন্তু, তাই-ই তো দিবাস্বপ্ন।

চোখ : ছবিতে গতি

ছবি করার জন্যে বিভিন্ন অস্ত্র বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করতে হয়।

চিত্রগ্রহণ-যন্ত্রের থেকেই আরম্ভ করা যাক। এবং ব্যাপারটাকে মোটামুটি পরিষ্কার করতে স্থিরচিত্র থেকেই শুরু করি।

ছবির ধাঁচার মধ্যে প্রদর্শনীয় সামগ্রীগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে, যাকে ইংরেজিতে বলে কমপোজিশন, তাই তৈরি করা হয়। এর দ্বারা অনেক বক্তব্য ব্যক্ত হয়। সে বিষয়ে পরে আসছি।

প্রথমেই আসে পার্সপেক্‌টিভ্-এর কথা। অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টিকে কোন্-দিকে টেনে নেব, তার কথা। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে কোনো কমপোজিশনের মধ্যভাগের দিকেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া। সেই আকর্ষণকে নিজের খেয়ালখুশিমতো গুছিয়ে পার্সপেক্‌টিভ্ জন্মগ্রহণ করে। নানারকম ভাবে গুছিয়ে লোকের দৃষ্টি টেনে নিয়ে যায় ঈপ্সিত বস্তুটির দিকে।

কিন্তু আরো কিছু সহজাত ব্যাপার আছে মানব মনে। যেমন, আলো-আঁধারির ব্যাপার। ছবির যে অংশটি আলোকিত, নজর সেইখানেই পড়ে আরো বেশি। সেখানে পার্সপেক্‌টিভ্-এর সঙ্গে পারমিউটেশন-কমবিনেশন-এ নানা ধরনের নক্‌শা তৈরি করা যায়।

কিন্তু এ-সবকে হারিয়ে দেয় গতি। গতিচিত্রের যে মুহূর্তে একেবারে নগণ্য অল্পআলোয় আবছা অংশে সামান্য একটু নড়াচড়া হল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে চোখ ধাবিত হল। এ হচ্ছে একেবারে অবধারিত।

তাই স্থিরচিত্রের গোছানোর সমস্যা আর গতিচিত্রের গোছানোর সমস্যার মধ্যে একটা জাতিগত পার্থক্য আছে।

গতি।

গতির প্রকারভেদ আছে।

প্রথমত, দৃশ্যমান বস্তু বা জীবের ঘোরাফেরার গতি।

দ্বিতীয়ত, চিত্রগ্রহণ যন্ত্রের নিজস্ব গতি।

তৃতীয়ত, গতির স্তম্ভন।

চতুর্থত, মানসিক গতি।

এক-এক করে সেগুলো সম্বন্ধে সাধারণভাবে ওপর-ওপর আলোচনা করা যাক।

দৃশ্যমান পদার্থের গতি।

একটা ছবিতে হয়তো একটা টেবিল বা অন্য কিছু হঠাৎ নড়তে আরম্ভ করল, সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। ক্যামেরা কিন্তু নিশ্চল। নিশ্চলতার একটা সুবিধে হচ্ছে যন্ত্রটি সম্বন্ধে সচেতনতা সাধারণভাবে মনে আসতে দেয় না। দর্শকের পক্ষে দৃশ্যমান ঘটনাবলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেই ঘটনাগুলোর সাক্ষী হয়ে ওঠা সহজ হয়ে ওঠে।

মানুষের নড়াচড়াও একইভাবে আমাদের উদ্‌গ্রীব করে তোলে। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আমরা যে ভিস্টা শট, লং শট, মিড শট, ক্লোজ-আপ, ভেরি বিগ ক্লোজ শট ইত্যাদি ব্যবহার করি, প্রায় সময়েই সেগুলো প্রাথমিক একটা দূরত্বের নির্দেশ করে, কিন্তু যান্ত্রিকভাবে সেগুলো ব্যবহৃত অনেক সময়ই হয় না। মানুষের এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকা অবস্থায় তার অঙ্গুলিহেলন বা মুখ ঘোরানো একধরনের গতি, কিন্তু মানুষে বা মানুষে-মানুষে নড়েচড়ে কাছে এসে, দূরে গিয়ে পরস্পর পরস্পরকে পাশ কাটিয়ে এবং আরো নানাভাবে যখন প্যাটার্ন তৈরি করা হয়, তখন যে-কোনো ব্যক্তির চিত্রগ্রহণ যন্ত্র থেকে দূরত্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবধানে থাকে।

বিশেষ করে এই সব জায়গায় ফোকাস জিনিসটা ভীষণভাবে কাজে লাগে। লাগে সর্বত্রই। দৃষ্টি আকর্ষণ করার এও এক বড়ো হাতিয়ার, কিন্তু এই ধরনের কমপোজিট শট-এ এই ফোকাস-ই আপনার জন্যে বেছে দেয়, কোন্ পদার্থ আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একই ছবিতে পাঁচজন লোক বিভিন্ন ব্যবধানে আছে, তাদের মধ্যে একটিকে ফোকাস-এ রেখে বাকিদের আবছা করে দিয়ে কিছু কথা, কিছু কাজ করিয়ে আবার তাকে পেছনে বা সামনে পাঠিয়ে অপর কাউকে সেই ফোকাস-এর আওতায় এনে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হল। কোনো সময় সমস্ত পটভূমিকে অস্পষ্ট করে দিয়ে শুধু নায়িকার মুখটিকেই ফোকাস-এ উদ্ভাসিত করা হল, কখনো যান্ত্রিক ও বিশেষ কাঁচামালের ব্যবহারের দ্বারা সব-কিছুকেই একত্রে ফোকাস-এ রেখে অপর একটি কথা বলা হয়ে যায়। এমন জায়গায় দিগন্ত থেকে আরম্ভ করে একেবারে সামনের দোদুল্যমান ঘাস পর্যন্ত সমানে ফোকাস-এ থাকবে।

আবার একটা কথা বলার পরে, অপর কোনো চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার দরকার আছে। সে সময় হয়তো কেউ নড়ছে না, কথাও নেই বার্তাও নেই— দুম করে ফোকাস এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় চলে গেল। স্থির হয়ে থাকা একটা চিত্রগ্রহণ যন্ত্রেও গতি আনা যায় লক্ষ্যীকৃত বিষয়বস্তু এবং ফোকাস-এর সাহায্যে। এখানে জুম লেন্‌স্ (zoom lens) ব্যবহারটা এই বিভাগে আসে না। সেটা ক্যামেরা নড়ার সামিল হয়ে ওঠে।

'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে প্রায় সর্বত্র মানুষজনকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে লম্বা-লম্বা শটে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাই এ ছবিতে শটের সংখ্যা আমার অন্যান্য ছবির থেকে অনেক কম। চোখকে পীড়া না দেয়, ঝুলে যাতে না যায়, এই সব কারণে যুক্তিসহ ভাবে প্রতিটি চরিত্রকে একই শটের মধ্যে নানাভাবে ঘুরপাক খাইয়েছি। এবং বেশির ভাগ শটেই

একটি ব্যক্তি বর্তমান। কাজেই নানাপ্রকার প্যাটার্ন আমাকে চিন্তা করতে হয়েছিল। বার-বার একই শটে নানাভাবে ফোকাস ঘোরাতে হয়েছে। আবার জায়গায় জায়গায় দুটি চরিত্রের ওপর, তাদের না নড়া সত্ত্বেও, ফোকাস সরিয়েছি।

জিনিসটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। সাধারণত একজন আর-একজনের দিকে ঘুরল, বা হাত বাড়িয়ে কিছু তুলল, ইত্যাদি জাতীয় কোনো গতিশীল অবস্থান-পরিবর্তনের সুযোগ নিয়েই আমরা ফোকাস বদলে থাকি। তাতে করে ফোকাস যে বদল হল তা জনসাধারণের কাছে প্রায়ই গোচর হয় না। তারা সহজেই গল্পের গতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে। কিন্তু এক-এক জায়গায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রশ্ন আসে। সেখানে কাউকে না নড়িয়ে লোককে সচেতন করেই ফোকাস বদল করা হয়, তাড়াতাড়ি অথবা ঢিমেতালে।

'মেঘে ঢাকা তারা'-তে যেখানে নীতা জানতে পারল, তার যক্ষ্মা হয়েছে, তখন সে বাইরের ঘরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। সে ক্যামেরার একেবারে সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে কাশছে এমন সময় মা এসে পেছনের দরজায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন। নীতা চমকে উঠে রক্তভরা কাপড়টা লুকিয়ে উত্তর দিল। সমস্ত সময় ফোকাস ওঁরই ওপরে, এমন-কি যখন নীতা উত্তর দিচ্ছে তখনও। [সাধারণত যখন যে কথা বলে, ক্যামেরা তার ওপরেই থাকে, কারণ, মানুষে বক্তার মুখটাই ভালো করে দেখতে চায়। এখানে তার উলটো করা হল ইচ্ছা করে।] তখন ফোকাস টেনে এসেছিল নীতার মুখের ওপরে, যদিও মা কথা বলে চলেছেন। এইসব ব্যাপার প্যাঁচ করার জন্য করা হয় নি, একটা মন্তব্য, একটা তীব্র বেদনা-বোধ থেকে এদের জন্ম। ছবিটির মূল সুরের সঙ্গে এই ধরনের ক্যামেরার ব্যবহার আমার কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছিল।

ঠিক অন্যভাবে ব্যবহার করেছি— 'সুবর্ণরেখা'-তে। তার তীব্র আক্রোশ এবং ক্রোধপ্রকাশের জন্য ছবিটির নব্বুই ভাগ অংশে ইউনিভার্সাল ফোকাস বা দিগন্ত থেকে অতি সম্মুখে সীতার মুখ, সব প্রায়-সময় স্পষ্ট, তীক্ষ্ণভাবে দেখা গেছে। তার জন্য যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার, বিশেষ কাঁচামালে ছবি তোলা— এ সমস্তই হিসেব করে করতে হয়েছে।

যদি কেউ ছবিটি দেখে থাকেন, তাঁর মনে পড়বে সেই শালবনের মধ্যে বসে থাকা সীতা আর দাঁড়ানো অভিরামের প্রথম পরস্পরকে জানার প্রশ্নের দৃশ্যটি।

সেই যে যেখানে সীতা দুষ্টুর মতো নাক হাতের বাজুতে ডলছে, দুষ্টু দুষ্টু চোখ করে— সেখানে লক্ষ্য করলেই দেখবেন ক্যামেরা একেবারে স্থির আর সীতার গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল থেকে আরম্ভ করে শালবনের সারি, তার পেছনে উদাত্ত মাঠ, তারও পেছনে আকাশে মেঘ, সব-কিছু মিলিয়ে এই সরল, প্রথম প্রেমের অভিব্যক্তি। সমস্ত প্রকৃতি এই নবকুমার-সম্ভবের সূত্রপাতের সাক্ষী। তাদেরকেও সম্মানের আসনে বসাতে হবে বৈকি।

কাজেই এই সব ব্যবহার।

এইবার চিত্রগ্রহণ যন্ত্রের নিজস্ব গতি সম্বন্ধে কিছু বলব।

প্যান বা ক্যামেরা এক জায়গায় স্থির থেকে বাঁয়ে বা ডাইনে ঘোরা, টিল্‌ট্ বা উঁচু হয়ে ওঠা এবং নিচু হয়ে ঝোঁকা। ট্রাক বা ট্রলি অর্থাৎ ক্যামেরা ভ্রাম্যমাণ কিছুর ওপরে চড়ে এগোনো বা পেছনো, ক্রেন বা নিচু অবস্থান থেকে উপরে উঠে যাওয়া কিংবা তার উলটো—

এ-সব সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ এখন মোটামুটি একটা ধারণা করে নিয়েছেন। এ-সব যান্ত্রিক গতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু তাই বলার নেই। আসল আনন্দ হচ্ছে এদের ব্যবহারের মধ্যে। মোক্ষম জায়গায় লাগালে এ নড়া-চড়া মানুষের নজরেই আসে না, যদিও বেজায়গায় লাগানোমাত্রই লোকে, সচেতনে হোক অচেতনে হোক, অস্বস্তি অনুভব করে।

আবার ক্যামেরার শাটারব্লেড ঘোরে ক্লকওয়াইজ অর্থাৎ বাঁ থেকে ডাইনে। কাজেই ডান থেকে বাঁয়ে প্যান বা ট্রাক বিশেষ করে তাড়াতাড়ি করা হয়, কিছু বিকৃতি বা ডিস্টরশন-এর জন্ম দেয়। এইখানেই যান্ত্রিক গুণগুলোকে ভালো করে ভেবে রাখলে বেশ কাজে আসে যদি জায়গামাফিক ব্যবহার করা হয়। আরো একটা এমনি ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে জুম লেন্স-এর ব্যবহার। যেখানে ট্রাক করার সম্ভাবনা কম এবং দ্রুত দূর থেকে কাছে, কাছ থেকে দূরে যাবার দরকার পড়ে, সেই সব জায়গাতেই জুম লোকে সাধারণত ব্যবহার করে। কিন্তু জুম মোটেই ট্রাকিং-এর বদলি নয়। জুম-এর নিজস্ব কতকগুলো গুণ আছে। এটা অপটিকালি কতকগুলো ভিন্ন ধরনের আবেদন উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে। ধরুন, একজন হেঁটে আসছে, তাকেই একই ম্যাগনিফিকেশন-এ রেখে অর্থাৎ একই আপাত-দূরত্বে রেখে ক্যামেরা পিছিয়ে আসছে। এটা ট্রাক-এও করা যায়, জুম-এও করা যায়। কিন্তু পশ্চাৎভূমি যে সরে সরে যাচ্ছে, তার ব্যাপারটায় একটা অদ্ভুত পার্থক্য দেখা দেয়। হাতে-কলমে যাঁরা করেছেন, তাঁরা বুঝবেন। এর উলটো গতিতেও একই বিচিত্র ফল।

তাই বলছিলাম, আপাত বিকৃতিগুলোকে শৈল্পিক অস্ত্রে পরিণত করা যায়। অনেক সময় আমরা ক্যামেরা হাতে পেলেই যখন-তখন যেখানে-সেখানে ক্যামেরাকে গতিশীল করে তুলি, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ক্যামেরা খালি ছোটাছুটি করতে থাকে। এটা হচ্ছে আদেখলের ফলারে বসার মতো। জনমানসে তো বিরক্তি উৎপাদন করে বটেই, শিল্পমূল্যও অনেক নীচে নেমে যায়। ক্যামেরার গতিকে অঙ্ক কষে হিসাব করে মেপে ব্যবহার করতে হয়।

এখানেও আমার নিজের একটা ছবি থেকে উদাহরণ দেই। আমার 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে একটি জায়গায় মাত্র আমি ব্যবহার করেছি। এবং এ ছবি অনেক টুকরো শট দ্বারা গ্রথিত। ঠিক *'মেঘে ঢাকা তারা'*র উলটো। একমাত্র 'অযান্ত্রিক' বাদে আমার অন্য কোনো ছবিতেই এত শট নেই। সেই ব্যবহারটুকু করব বলে আমি নিজেকে সারা ছবিতে ক্রেন থেকে সরিয়ে রেখেছি। সে জায়গাটা হচ্ছে— যেখানে ঈশ্বর সীতার বাসাতে মত্ত অবস্থায় গেল, এবং সীতা আত্মহত্যা করল— ঈশ্বর বঁটিটা তুলে নিয়ে বাইরে টলতে টলতে এল, বিনু সমেত অন্যান্য সাক্ষীরা ভয়ে স্তব্ধ— ঈশ্বরের পেছনের পটভূমি অতলান্ত অন্ধকারে বিলীন। খালি ঈশ্বরের ঘর্মাক্ত মুখটা ফ্যাকাশে সাদা আলোয় উদ্ভাসিত— সে রক্তমাখা বঁটিটা তুলতে তুলতে জান্তব কতকগুলো শব্দ করে হঠাৎ মোচড় খেয়ে নীচে পড়ে যাওয়া মাত্র ক্যামেরা দ্রুত গতিতে অনেক উপরে উঠে গেল, তার পর আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়া ঈশ্বরকে ছেড়ে দিয়ে সোজা নেমে এল উদ্‌ভ্রান্ত, বিস্ফারিত-নেত্র বিনুর মুখের উপর।

সমস্ত ট্রাজেডিটার ফলশ্রুতি ঐ বিনু। সে আমার অন্বিষ্ট তখন থেকে, আর সব এই বাহ্য।

এই কথাটাই ওই ক্যামেরা-সঞ্চালনের মধ্যে ধরতে চেয়েছিলাম।

এর পর একটি ক্যামেরার স্তম্ভনের দিকে আসা যাক।

এটা বৈপরীত্য-রসের সৃষ্টির পক্ষে যেমন মোক্ষম, তেমনি আগে ঘটে যাওয়া বা পরে ঘটতে যাওয়া ক্যামেরার এবং অন্যান্য গতিকে তর্জনী তুলে নির্দেশ করতেও সুপটু।

যান্ত্রিক কারিকুরি না করেও এক-একটা শটের মধ্যে স্তম্ভন আনা সম্ভব। এটা কিন্তু গতির অঙ্কের মধ্যেই পড়ে। যখন মানসিকভাবে আমরা চাইছি গতি, সেই সময়ে আমাদের গতির দিকে বঞ্চিত করে, পরিচালক আমাদের জন্য গভীরতর ঐশ্বর্যের সন্ধান দিচ্ছেন। এমন নমুনা ভালো ছবিতে আকছার মেলে। ধরুন একটা ছেলে তার বহুদিনের সঞ্চিত কথাগুলো আজ বলেই ফেলল মেয়েটাকে, মেয়েটার উত্তরের উপরে সব-কিছু নির্ভর করছে— কিন্তু মেয়েটা নীরব-নিশ্চল, ছেলেটাও উদগ্র আগ্রহ চেপে অপেক্ষমাণ— এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর মেয়েটা একটা নিশ্বাস ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা গতিশীল হয়ে উঠল। পাত্র-পাত্রী চঞ্চল হল, পেছনে গাছের পাতা দুলে উঠল, আকাশে মেঘেরা উধাও হতে আরম্ভ করল। এখানে গতি স্তম্ভিত রেখে গতির মর্যাদা বাড়ানো হল।

এ ছাড়া যান্ত্রিক কিছু উপায়ও আছে। যেমন, ফ্রীজ-ফ্রেম বা থমকে-যাওয়া ছবি। আমরা অনেকেই (ত্রুফোর) 'ফোর হানড্রেড ব্লোজ' দেখেছেন। সেখানে জমাট বেঁধে যাওয়া সমুদ্রের ঢেউ চমক লাগিয়েছিল, নিশ্চয়ই তা মনে আছে। সত্যজিৎবাবুর *'চারুলতা'*র শেষ শটটি, বা মৃণালবাবুর ছবিতে এরকম ব্যবহারগুলো নিশ্চয়ই আপনারা ভোলেন নি।

ঠিক জায়গায় লেগে এগুলো নবদ্যোতনা সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার বক্তব্যও পেশ করে দিল।

এখানে আর-একটা কথা আপাত-অপ্রাসঙ্গিক হলেও না বলে পারছি না। কারণ ব্যাপারটা খানিকটা ক্যামেরার গতির ব্যবহারের সঙ্গেই জড়িত। যাকে বলা হয় সাবজেকটিভ ক্যামেরা ব্যবহার।

বড়ুয়া সাহেবের 'উত্তরায়ণে' এর চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। জ্বর গায়ে নায়ক হেঁটে বাড়িতে ঢুকে টলতে টলতে এগিয়ে চলে। ক্যামেরা তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে। অর্থাৎ ক্যামেরাই চরিত্রটিতে পরিণত হয়ে যায়।

ডেভিড-লীন-এর 'অলিভার টুইস্ট'-ও এমন ব্যবহারের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অলিভার যখন ফেগিন-এর পাল্লায় পড়ে প্রথম পকেট কাটতে চেষ্টা করে, তাড়া খেয়ে এক সরু গলির মধ্যে দৌড়ে ঢুকে পড়ল, দেখা গেল একটা জায়গায় লোক ঘুসি উঁচিয়ে আছে। অলিভারের তখন ঘুরে পালাবার উপায় নেই। ক্যামেরা ওকে ছেড়ে দৌড়ল সোজা সেই ঘুসির দিকে। ঘুসি সোজা এসে লেন্স্-কে মেরে তাকে চুরমার করে দিল। ফেড আউট। হাসপাতালে অলিভার শুয়ে আছে।

'অযান্ত্রিক'-এ যখন বিমল জগদ্দলকে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় ছুটছে পরের স্টেশনে ঐ পরিত্যক্তা মেয়েটির নাগাল পাবার জন্যে, তখন গাড়ি এবং বিমলকে ছেড়ে ক্যামেরা দুপাশের সরে যাওয়া গাছ-পাহাড়ের দৃশ্যাবলির মধ্যে দিয়ে বিমলের মানসিক অবস্থাটা প্রকাশ করার চেষ্টা করল।

সত্যজিৎবাবুর *'মহানগরে'*ও এমন ব্যবহার খুবই সুষ্ঠুভাবে আছে। এইসব গতি কিন্তু আসলে মানসিক গতির ব্যবহার। এই মানসিক গতি সৃষ্টি করে স্রষ্টার স্বপ্ন-ভাবনা—

বিশেষভাবেই ক্যামেরা এবং সম্পাদনার মাধ্যমে সংগীতের এবং অন্যান্য শব্দেরও অবদান বড়ো কম নয়।

আসলে সব গতিই এই এক জায়গা থেকে উদ্ভূত। ক্যামেরা নড়ে চড়ে, মানুষ নড়ে চড়ে, সব-কিছু স্থির হয়ে যায়— বা এ-সব কিছুরই বিভিন্ন অঙ্গাঙ্গীবিন্যাস একটা গোটা নক্শার সৃষ্টি করে— ঐ স্বপ্ন থেকেই তার জন্ম। যন্ত্রগুলো তখন আর যন্ত্র থাকে না, তারা শিল্পীর হাতিয়ারে পরিণত হয়, যেমন হয় সরোদীয়ার সরোদ বা ভাস্করের হাতুড়ি-বাটালি।

এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় সম্পাদনার স্থান বড়ো বেশি, কাজেই ক্যামেরার আলোচনায় এ নিয়ে বেশি কথাবার্তা তুলব না। আসল ঘটনা হচ্ছে, সব-কিছু বিভাগই এত অঙ্গাঙ্গী যে একে ছেড়ে আর-একে টান মারা যায় না। আমার 'কোমল গান্ধার'-এ পদ্মার ধারে ভৃগু-অনসূয়ার কথোপকথন, পশ্চাতে গান ইত্যাদির পরে 'বিয়োগচিহ্ন' রেললাইনের ওপর দিয়ে দ্রুত ধাবমান ক্যামেরা গিয়ে বাফার-এর ওপর আছড়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার। এটা সাবজেকটিভ ইউজ অফ ক্যামেরা হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে সব-কিছু ছিঁড়ে যাবার শব্দে না থাকলে ব্যাপারটা কি জমত, বা আমার বক্তব্য পরিষ্কার হত?

ক্যামেরার উপযুক্ত ব্যবহার বাদেও অন্যান্য অনেক দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যাপার আছে, যাদেরকে বলে স্পেশাল ইফেক্টস্। সেগুলো নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করছি না, কারণ সেগুলো আরো বেশি টেকনিকাল আলোচনায় আমাদের জড়িয়ে ফেলবে, আমি তাই সামান্যভাবে কমপোজিশন এবং বিভিন্ন লেন্স-এর বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবহার সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখব।

কমপোজিশন সম্বন্ধে সামান্য ছুঁয়ে গেছি আগে। ছবিতে এই জিনিসটি একটি অতীব শক্তিশালী জিনিস। এর ব্যবহারের সাহায্যে যে-কোনো একটি ছবির মূল টোনটিকে, মূল স্বাদটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়। যে-কোনো একটি ছবির মূল টোনটিকে, মূল স্বাদটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়। যে-কোনো চিন্তাশীল পরিচালক প্রতিটি গল্পের বা মৌল উপাদান থেকে উদ্ভূত যে-সব ছবি মাথায় জাগে, তাদের এক বিশেষরূপে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। একজন পরিচালকের একটি বিশেষ রচনাশৈলী বা স্টাইল আছে সত্যি, কিন্তু অতিসত্য সেই সাধারণ কাঠামোর মধ্যে বিশেষ ছবির বিশেষ বক্তব্য জোর করে নিজের সৌন্দর্য সুষমা আদায় করে নেয়।

সাধারণভাবে একটি কমপোজিশন-এ ভারসাম্য বজায় রাখা, পার্সপেক্টিভ্ ইত্যাদি প্রাথমিক ব্যাপারগুলো থাকেই, সেগুলো ভাঙাতেই আনন্দ বোধহয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তদূর্ধ্বে, বক্তব্য পেশ করার জন্য এক সর্বব্যাপ্ত সূত্র খুঁজে বের করতেই হয়। সেটা শিল্পীর গভীরতম সাধনা ও উপাসনার ব্যাপার।

কমপোজিশন ছাড়াও এ-কাজে সাহায্য করে সেট-আপ অর্থাৎ কোথায় ক্যামেরা কত উঁচুতে আপেক্ষিকভাবে থাকবে এবং কী লেন্স কোথায় ব্যবহৃত হবে— এই জিনিসগুলো।

সাধারণ পাঠ্যপুস্তকে লেখা থাকে ক্যামেরা নিচু থেকে বিষয়বস্তুর ছবি ওঠালে সেখানে মহনীয়তা প্রকাশ পায়, উঁচু থেকে নিলে ছোটো করা বা অবজ্ঞা করা হয়, সোজাসুজি সমান উচ্চতা থেকে নিলে যা-তাই প্রকাশ করা হয়— (যেমন পঞ্চাশ মিলিমিটার লেন্স নাকি স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ সাধারণ ভাব প্রকাশ করে)— তাব নীচে অথবা ওপরে গেলে বিশেষ করে

দ্যোতনা বোঝায়। কথাগুলো মোটাদাগের সত্যি। এবং ছবিগুলোর গোড়ার দিকের কথাগুলো। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মীর হাত পড়ে ব্যাপারটা অনেক জটিল চেহারা ধারণ করে।

সেট-আপ এবং লেন্স পছন্দ করা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কমপোজিশন-ই বলুন আর গতিই বলুন, সব-কিছু প্রকট করতে ও-দুটি অপরিহার্য।

সেট-আপ সম্বন্ধে দুটো একই কথা বলেই বর্তমানে ছেড়ে দেব। আমরা সেট-আপ ঠিক করতে অনেকগুলো জিনিসকে অঙ্কের মধ্যে আনি। প্রথমত, কমার্শিয়াল ছবিতে নায়ক-নায়িকার চেহারা কোন্ সেট-আপ এবং কেমন অ্যাংগল্ থেকে তুললে সবচেয়ে নয়ন-মনোহর হয়, এই দুশ্চিন্তার বহু পরিচালক এবং চিত্রগ্রহণকারী বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। ঠিক একই কাজ করেন পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবির পরিচালকও তাঁর বিশেষ বক্তব্য নর-নারীর মুখ দিয়ে বিকশিত করার জন্য। ফেলিনি-র 'লা দোলচে ভিতা'-তে সেই সমুদ্রতীরের কাফে-এর এক কিশোরীকে একপাশ থেকে একটা বিশিষ্ট উচ্চতা থেকে ধরেছেন বারে বারে— মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারোতা-এর 'আমব্রিয়ান এনজেল'-এর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আনার জন্য।

আমার 'কোমল গান্ধারে'র কিছু কিছু জায়গায় বত্তিচেল্লি-র কিছু কাজের আভাস আনবার চেষ্টা করেছি অনসূয়ার কিছু কিছু ক্লোজ-আপ-এ। আবার পরপর শট ব্যবহারের চিন্তাও আমাদের সেট-আপ বদল করতে পরিচালিত করে, যেমন এতটা মেয়ের প্রচণ্ড আবেগময় আলোড়নের মুহূর্তে ভেরি বিগ ক্লোজ-আপ, লো সেট-আপ থেকে ঝড়াৎ করে চলে যায় এক্সট্রীম লং টপ শট-এ। এমন এমন ব্যবহার যে-কোনো রুচিগ্রাহ্য ছবিতে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

লেন্স-এর ব্যবহার। এ সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা উচিত। কিন্তু স্থানাভাব। তবে এটুকু এখানে উল্লেখ করা চলে যে (আগেই সেটা বলা হয়েছে), পঞ্চাশ মিলিমিটারটি সাধারণত সর্বঘটের বেলপাতা। ওর ওপরে, অর্থাৎ পঁচাত্তর, একশো বা তদূর্ধ্ব লেন্সগুলি ক্রমশ শর্ট ফোকাস বা টেলিফোটো-র দিকে চলে যায়, অর্থাৎ দূরের জিনিসকে কাছে আনে। আমরা ক্লোজ আপ-এর জন্য সাধারণত পঁচাত্তর অথবা পঁচাশি ব্যবহার করি। ডেপ্‌থ্ অফ ফোকাস অর্থাৎ-এর গণ্ডি কম হবার দরুন দ্রব্যটাতে মাখন মাখানো ভাব আনা যায়। এ ছাড়াও এ-সবের অন্য মূল্য আছে। টেলিফোটো-তে সমস্ত ছবিটা চেপটে পেছনটা কেমন ওপরের দিকে ঠেলে ডিস্টরটেড করে দেয়। আপনারা ক্রিকেট বা অন্য খেলার নিউজরীল দেখবার সময় লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এই ডিস্টরশনটা। একে নাটকীয় ভাবে বহু ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর-একটা মজা। একটা বিশেষ অ্যাংগল্ থেকে এই ধরনের শট উপস্থাপিত করলে চলমান বস্তুকে দেখায় সেই সুকুমার রায়ের 'রোদে রাঙা ইটের পাঁজা/তার উপরে বসল রাজা/ঠোঙাভরা বাদাম ভাজা/খাচ্ছে, কিন্তু গিলছে না'/গোছের— অর্থাৎ হয়তো একটা ট্রামের চাকা ঘুরছে লাইনের ওপরে। লাইনের উপরে সেই ট্রাম জোরে চলেছে, কিন্তু বন্‌বন্ করে ঘোরা সত্ত্বেও একপাও যেন এগোচ্ছে না।

আমি আমার *'বাড়ি থেকে পালিয়ে'* ছবিতে এমন ধরনের ব্যবহার অনেক করেছি।

পঞ্চাশের নীচে যে-সব লেন্স— যেমন, চল্লিশ, পঁয়ত্রিশ, বত্রিশ, আঠারো বা আরো নীচের জাতের যারা তারা উত্তরোত্তর ওয়াইড্ অ্যাংগল্-এর পর্যায়ে পড়ে যায়। এদের জাত সম্পূর্ণ উলটো। যত নীচে নামা যাবে মিলিমিটারের ক্ষেত্রে ততই কাছের জিনিস দূরে সরে যাবে, একপা এগানো-পেছোনোতে পাঁচ পা পিছিয়ে যাবার মতো লাগবে, সামনের বস্তুর চেহারার ডিস্টরশন হবে যাকে বলে ফোরশর্টেনিং ; ফোকাস-এর পরিধি অনেক বেড়ে যাবে, ফ্রেম-এর দুপাশের জিনিসগুলি মাঝের দিকে হুমড়ি খেয়ে আসবে, ক্যামেরা একটু নড়াচড়া করলেই দু-পাশটা কেমন দুলে দুলে যাবে, কমপোজিশন-এ একটা বলিষ্ঠতার আভাস পাওয়া যাবে।

এর মধ্যে আঠারোটি আমার প্রিয় লেন্স বলে মনে হয়। প্রায় সব ছবিতেই আমি এটা ব্যবহার করেছি, কিন্তু 'সুবর্ণরেখা'-তে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। তার একটা কারণ হচ্ছে ঐ ইউনিভার্সাল ফোকাস পাওয়ার সুবিধে, আর হচ্ছে মালমশলাকে একটা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় আনার চেষ্টা।

আমি নিজে পুণায় থাকতে দশ-শতমিক পাঁচ লেন্স ব্যবহার করেছি কিছু। এর নীচের মিলিমিটারের কোনো লেন্স, এদেশে তো নেই-ই, ভারতবর্ষেও অন্য কোথাও এটি পাওয়া যাবে না। অতি ভয়ংকরভাবে ফোরশর্টেনিং করে এ লেন্স আর অন্যান্য গুণগুলোও সেই অনুপাতে বর্তমান। এরও নীচে জাপানে এবং ইউরোপেতে লেন্স করেছে বলে শুনেছি, চাক্ষুষ দেখি নি।

এ সবগুলো ব্যাপারই মানসিক গতি তৈরি করতে সাহায্য করে।

যদিও পরিচালকের কর্তব্য, তবু যেহেতু গতির সঙ্গে যোগ আছে, তাই এখানে উল্লেখ করব, মানুষজন ও মালপত্তর গুছিয়ে, তাদের পূর্বপরিকল্পনাগতভাবে নড়াচড়া করানো।

প্রতিটি দৃশ্যেরই একটি সেন্ট্রাল কোর থাকে। তাকেই ঘিরে শট্ কাটা এবং গতির বিভিন্ন হাতিয়াবকে ব্যবহার করতে হয়। এই সেন্ট্রাল জিনিসটা ধরতে না পারলে পরিচালক একেবারেই ডুববেন। হয়, অনেক অপ্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শটের মাধ্যমে এতগুলো ডিটেইল্-এ চলে যাবেন যে আসল কথাটি তার নিজস্ব মূল্য হারিয়ে ভিড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেবে, এবং দৃশ্যটিও যাবে ঝুলে।

আবার উলটো দিকে— আর্থিক চাপ, সময়াভাব বা অজ্ঞানতা— যে-কোনো কারণেই হোক— একটি দৃশ্যকে কাটাকুটি না করে সোজাসুজি দৃশ্যটির বারোটা বাজিয়ে দেবার ব্যবস্থাও অগুনতি ছবিতে লক্ষ্য করা যাবে। যেখানে একটা সিগ্নিফিকান্ট ডিটেইল দৃশ্যটিকে অন্যস্তরে উন্নীত করতে পারত, সেখানে সেটা একেবারে ঝুলে গেল এবং স্রষ্টার বক্তব্য অনুক্তই থেকে গেল।

তাই গতির কথা ভাবতে গিয়েও ঐ একটিকে দৃশ্যের খুঁটি খুঁজে বের করে আঁকড়ে ধরতে হবে, খুঁটির জোরেই ম্যাড়া লড়বে। তবে অবশ্য ছবির অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেই খুঁজতে হবে।

কাহিনী বিন্যাস করার দিক থেকে এবং অভিনেতাকে পরিচালিত করার সময় আমি এইসব প্রাত্যহিক ব্যবহারিক সমস্যাগুলোর সম্মুখীন। এবং বোধ হয় সবাইকেই হতে হয়।

বললে অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু এই ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি শিক্ষা পেয়েছি

কনস্তানতিন স্তানিসলাভস্কির বইগুলো ঘেঁটে।

লোকে বিশ্বাস করবে না কিন্তু কথাটা সত্যি।

ছবিতে শব্দ

ছবিকে আমরা চিত্রশিল্প অথবা visual art বলে বলে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যাতে করে মাঝে মাঝে ভয় হয় শব্দের নিজস্ব জগতের প্রাধান্যের কথাটা আমরা বোধহয় একেবারেই ভুলতে বসেছি। আসলে কিন্তু চলচ্চিত্রে শব্দের প্রাধান্য ততখানি, যতখানি ছবির। চলচ্চিত্রের মূল রসসঞ্চারে শব্দ একটি বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্তত আমার দেখা সব ছবিতে করেছে।

তাই এই নিবন্ধের অবতারণা।

আর-একটা কথা। চলচ্চিত্র বলতে নিঃশব্দ ও সশব্দ দু-ধরনের ছবিকে একই মানেতে আমরা ধরে নিই। এটা মোটেই ঠিক না। নিঃশব্দ ছবি হচ্ছে একটা একেবারে আলাদা শিল্প। তার গতি-প্রকৃতি, তার সূত্রগুলি, তার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, অন্য অঙ্কের। *'Iron Clad potemkin'* বা 'Passion of Joan of Arc",— 'পথের পাঁচালী'র পূর্বপুরুষ নয়। তার থেকেই বেড়ে উঠেছে শব্দচিত্র— কিন্তু সে তো স্থিরচিত্র থেকে চলচ্চিত্রও এসেছে। স্থিরচিত্রের সব গুণাবলীর সঙ্গে খালি গতি এসে মিশে কী বিপ্লব ঘটিয়েছে ভাবুন তো। তেমনি নিঃশব্দ চিত্রের সব গুণাবলীর সঙ্গে খালি শব্দ এসে মিশেছে। মূল সিদ্ধান্তটি পালটে গেছে।

শব্দের যে-ফিতেটা বাহিত হয়ে অহরহ বয়ে চলেছে উৎপ্রেক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে ছবির সঙ্গে সঙ্গে তার উপাদানগুলি কী কী?

পাঁচটি।

কথা বা সংলাপ, সংগীত, incidental noise অর্থাৎ যা ছবিতে দৃশ্যমান ঘটনাগুলোর পরিপূরক শব্দ, effect noise অর্থাৎ দৃশ্যোর্ধ্ব দ্যোতনাময় শব্দ এবং নীরবতা।

সংলাপ নিয়ে বিশেষ কিছু বলার নেই, ওটি সব চাইতে প্রকট। ওটি ছবির গল্পকে (অবশ্য যদি থাকে) সোজা এগিয়ে নিয়ে যায় দৃশ্যমান ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। ওটি প্রাথমিক স্তরের।

সংগীত। এটি ছবিতে একটি বিপুল অস্ত্র। সময় সময় ব্রহ্মাস্ত্র।

সংগীতের মধ্যে দিয়ে আমরা অপর একটি স্তরে সমান্তরালভাবে ছবির বক্তব্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। নানা রকম আছে। যেমন ধরুন, সমস্ত সংগীতে পুরো ছকটিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে, তবে আমরা প্রথম সুরটিকে বসাই। গোড়াতে পরিচয়-লিপিতেই সমস্ত ছবিটার একটা overture তৈরি করার চেষ্টা করি। তার পর বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন মন্তব্যের জন্যে বিশেষ বিশেষ সুর বা compositions নিয়ে আসে। নিয়ে আসি যখন, শেষ পরিণতিতে সেই বিশিষ্ট সুরটিকেই আমার বক্তব্যের দ্যোতক রূপে কী ভাবে

ব্যবহার করব, সেটা ভেবেই নিয়ে আসি।

সংগীত অত্যন্ত সংকেতবহ। সেই সংকেত আমার, কাজেই তা ব্যবহৃত হয় ; তার পেছনে একটা সচেতন নক্‌শা থাকে।

ধরুন— গোড়ায় কোনো প্রেমের দৃশ্যে আমি 'রাগ কলাবতী'র একটা বন্দিশ ব্যবহার করলাম। জিনিসটা জায়গাটার জন্যে খুব উপাদেয় বোধ হল শুধু এই ভেবেই যে করলাম তা নয়। মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে এই সংগীতের টুকরোটিকেই একেবারে চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং দুরন্ত বিচ্ছেদের দৃশ্যে বাজাব। তাতে করে একটি কথা বলা হয়ে যাবে।

আমার 'কোমল গান্ধার'-এর মূল সুর ছিল দুইবাংলার মিলনের, তাই অনবরত বেজেছে বিভিন্ন প্রাচীন বিবাহের সুর, চরম বিরহের দৃশ্যেও সেই একাত্মীকরণের সুর বেজে চলেছে।

তার পর ধরুন সত্যজিৎবাবুর 'অপরাজিত'তে আছে এক অপরূপ ইঙ্গিত। 'পথের পাঁচালী'র অপু-দুর্গা-গ্রামবাংলার দৃশ্যগুলিতে বারে বারে একটি সুর বেজে চলেছে, বলা যায় ওটিই ছবিটির মূল সুর। পথ চলতে আপনি সে সুর শুনলেও চোখের সামনে ভাসবে গ্রামবাংলার আদিগন্ত শ্যামলতা। এবং সেইটিকে নিয়ে সত্যজিৎবাবু একটি কাণ্ড করেছেন। 'অপরাজিত'তে যখন সর্বজয়া ও অপু কাশীর রেলের পুল পেরিয়ে চলে এলেন এপারে, হঠাৎ দেখা গেল বাংলা দেশের সবুজ নিসর্গ শোভা। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল আগের ছবির সেই মূল সুর। সারা ছবিতে ঐ একটিবার মাত্র। তাতেই কাজ হয়ে গেল। একটি মন্তব্য, একটি পূর্বাপরতা তার সব নিশ্চিন্দিপুর আর দুর্গা আর কাশবনকে নিয়ে এসে আপনার মনে আছড়ে পড়ল।

অনেক সময় অপরের ছবির বিশেষ সুরকে নিয়েও মন্তব্য করা হয়। আমিই করেছি। 'La Dolce Vita'-এর শেষে উন্মত্ত তাণ্ডবের দৃশ্যে, যেখানে ফেলিনি গোটা পশ্চিমী সভ্যতার মুমূর্ষুতাকে ধরে চাবকেছেন— সেখানে যে-বাজনাটি বেজেছিল তার নাম 'Patricia' আমার নিজের দেশের সম্বন্ধে, এই বুদ্ধি-উজ্জ্বল বাংলাদেশ সম্বন্ধে 'সুবর্ণরেখা'তে এ-ধরনের একটা কথা বলার ইচ্ছা হয়েছিল। তাই শুঁড়িখানার দৃশ্যের পেছনে ওটি আমি লাগিয়েছি, যাতে করে একটি ইঙ্গিত করা যায়। প্রভাবিত হয়েছি? এক্কেবারে না। ওটা একটি কথায় আমাকে অনেক কিছু বলতে সাহায্য করেছে মাত্র।

কোনো বিশেষ চরিত্রেরও মূল সুর থাকতে পারে। সে আসার আগে বা পরে বা উপস্থিতিতে বিশেষ কয়েকটি পর্দা যদি বাজে বারে বারে, তা হলে সে যখন নেই বা আসবে না— তখন ঐ পর্দা কটি বেজে উঠলে একটা মন্তব্য আসবে বই কি!

অনেক সময় পরিচালক আস্তিনের হাতায় সংগীত লুকিয়ে রেখে দেন মোক্ষম মন্তব্যটি করার জন্য। যেমন ধরুন— বুনুয়েলের Nazarin— সারা ছবিতে এক ফোঁটা সংগীত নেই। শুধু শেষের দৃশ্যে যেন হাজার হাজার দামামা বেজে উঠল। তাতে করে অবস্থাটা যা দাঁড়াল যাঁরা ছবিটি দেখেছেন, তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

সংগীতের ব্যবহার যে কী ব্যাপক দ্যোতনার জন্মদাতা সেটা ছোটো নিবন্ধে বলা সম্ভবপর নয়। কাজেই এইখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

দৃশ্যমান ঘটনার সঙ্গী হয়ে যুক্তিযুক্ত শব্দ যেগুলো বয়ে চলে, সেগুলো সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার নেই। তবে তারাও মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মানের সৃষ্টি করে। কিন্তু তখন তারা আর

শুধুই সঙ্গী শব্দ থাকে না, দ্যোতনাময় শব্দের জাতে উঠে যায়।

দ্যোতনাময় শব্দ। এটি একটি বিশাল জগৎ। শব্দ দিয়ে দ্যোতনা দু-রকম ভাবে করা যায়। এক, যা দেখা যাচ্ছে তার-ই কিছুর মধ্যে দিয়ে ; দুই, যা দেখা যাচ্ছে না এমন কিছু শব্দ এনে ফেলে।

ধরুন কোনো দৃশ্যে একটি মেয়ে প্রতি মুহূর্তে ভয় পেয়ে আছে এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে। খাটে বসে আছে। হঠাৎ খবর এল ব্যক্তিটি আসছেন। মেয়েটি ভয়ে কেঁপে উঠে দাঁড়াল। খাট 'ক্যাঁচ' করে আর্তনাদ করে উঠল, মেয়েটির বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠার দ্যোতনা হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যায়।

অথবা ধরুন, দু-জনে কথা বলছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে— সবচেয়ে জরুরি কথা বলার সময় জোরে হর্ন দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। এমন আরো কত কী!

ছবিতে যা নেই, এমন শব্দেরও সৃষ্টিশীল ব্যবহার প্রতিপদে আমরা করে থাকি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে বদ্ধ একটি ঘরে চুপ করে বসে আছে কথা না ব'লে। দূরে কোথায় যেন পাখি ডাকছে। অথবা একজন হেঁটে চলেছে দূরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে, দূরায়ত একটা রেলের ক্লান্ত বাঁশি শোনা গেল। একটা মেয়ে তার চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে, কারা যেন দূরে কর্ণার্জুনের শকুনির পার্ট মুখস্থ করছে বেজায় বেসুরে।

একেবারে আলংকারিক শব্দের ব্যবহারও এক-এক সময় ভয়ানক কাজে আসে। এক মেয়ের চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে আমি একটা ছবিতে চাবুকের আঘাতের শব্দ ব্যবহার করেছিলাম।

হিসেব কষে শব্দের ব্যবহার আর-এক রকম ভাবেও আছে, তাকে ইংরেজিতে বলে design by inference। এটি একটি বেশ তাগড়া ব্যাপার। সংক্ষেপে দুটো-একটা উদাহরণ দেবার চেষ্টা করি। একটি বৃদ্ধ বসে আছে একটি বেঞ্চিতে হঠাৎ শোনা গেল খুব কাছে একটা ট্রেন ইঞ্জিন শান্টিং করছে, সঙ্গে সঙ্গে একটি রেলস্টেশনের যাবতীয় শব্দ। আপনার মনে হবে, এটি কোনো রেলওয়ে ওয়েটিংরুম। ক্যামেরা কিন্তু বৃদ্ধের মুখ ছেড়ে কোথাও যায় নি।

বা ধরুন একটি মেয়ের মুখ। কাছে কোথায় যেন কারা হিঁচড়ে একটা লোহার ফাটক সশব্দে বন্ধ করে তালা মারল। আপনার মনে হবে মেয়েটি বন্দিনী হল, যদিও ছবিতে তার কিছুই দেখানো হয় নি।

Design by inference-এর দ্বারা একটা গোটা ছবি একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে বলা যেতে পারে, এবং বাইরের ঘটনার স্রোত সঠিক ধরা যেতে পারে।

একটি শব্দকে একটি দৃশ্যে এক দ্যোতনায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তাকেও কাল্পনিকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। আমার একটি ছবিতে এক মা তাঁর বড়ো মেয়ের প্রেম করাটা চান না। অথচ চোখের সামনে দেখছেন সে তা করছে। সে সময় তিনি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন— পেছনে থেকে ভেসে আসছিল কড়াইতে তেল পোড়ার গন্ধ। অনেক পরে ঐ একই অবস্থায় তাকে আমরা আবার দেখি। সেবার কিন্তু পেছনে রান্নাঘর নেই। তবু চড়বড় করে পোড়ার শব্দ আমি ব্যবহার করেছিলাম তাঁর মানসিক অবস্থা বোঝাবার জন্যে।

এর দৃষ্টান্ত আর বাড়িয়ে লাভ নেই।

নিঃশব্দতা। আমার মতে এইটেই সবচেয়ে সংকেতবহ উপাদান।

নিঃশব্দতাকে যে আমরা কতরকম ভাবে খেলাতে পারি তার ইয়ত্তা নেই।— যে-কোনো সংকেতপূর্ণ শব্দ নিয়ে আসার আগে নিঃশব্দতাকে সাধারণত ব্যবহার করা যায়। নিঃশব্দতা যে-কোনো আবেগের যেমন সৃষ্টি করতে পারে, তেমন দৃশ্যের লয়-গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, তেমনি আবেগহীনতাও আসতে পারে। শুধু আগে পিছনের শব্দের অবস্থিতির দ্বারা এই ঘটনাটি ঘটে।

যেমন ধরুন— আপনি একটি প্রচণ্ড শব্দ করে চমক সৃষ্টি করতে চান। তার আগে নীরবতা খানিকক্ষণ লাগবেই। অথবা উচ্ছল গতিতে যেতে যেতে এক জায়গায় স্তম্ভিত ভাব দরকার। নিস্তব্ধতা ছাড়া গতি নেই। একটি দৃশ্যে মধ্যাহ্নবেলার শ্লথমন্থর গতিকে ধরতে হবে। নিস্তব্ধতাই সেটাকে ফোটায় ভালো। কোনো দৃশ্যকে লয় ফেলে দিয়ে ঢিমে করতে হলেও যেমন নিঃশব্দতা, কোনো তীব্রতম মুহূর্তের গতিশীলতা ধরতেও তেমনি নিস্তব্ধতা।

তাই, ছবির শব্দের ফিতের কথা ভাববার সময় সর্বপ্রথম নিঃশব্দতার হিসেব ছকে নিতে হয়।

এখন আসে, এই সব উপাদানগুলিকে একত্রে মিলিয়ে যে পরিপূর্ণ রসসৃষ্টি, তার কথা।

প্রথমে, সাজানো। সে সম্পর্কে খানিকটা উপরে বলেছি। সাজানো আরম্ভ হয় প্রথম চিন্তার সূত্রপাত থেকেই। কথার সঙ্গে সংগীতের, তার সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের, তার মধ্যে নিঃশব্দতার ফাঁক সব মিলিয়ে ছকটি দাঁড়ায় মাথায়— যখন প্রথম ছবিটি কল্পনা করি। ছবি করার পথে নানা কারণে সে ছক নানাভাবে বদলায়, কিন্তু মূল ব্যাপারটি একই থাকে। শেষে যখন সব উপাদান একত্রে জড়ো হল, তখনও পালটাতে থাকে ছক, নানা অচিন্তনীয় সংঘটনের দ্বারা।

একমাত্র তখনই সংগীত, সংলাপ, বিভিন্ন শব্দ, নিঃশব্দতা তাদের নিজেদের জায়গা খুঁজে পায়।

তখন আসে শব্দ সংমিশ্রণের পালা। বিভিন্ন শব্দকে বিভিন্ন স্তরে বাজিয়ে তার সঠিক স্থানটিতে পৌঁছে দিতে হয়। কোনোটি বা খুব জোরে, কোনোটিকে বা শুধু অনুভূতির স্তরে রেখে বাজিয়ে তবেই গিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়ায়।

এখানে বিভিন্ন জোরে বাজানোর ঘটনাটা একটু পরিষ্কার করা দরকার।

একই শব্দ— সে যে-কোনো জাতেরই হোক-না-কেন, বিভিন্ন জোরে বাজালে ভিন্ন ভিন্ন আবেগের সৃষ্টি করে। অত্যন্ত দ্রুত আনন্দময় সংগীত যদি অতি মৃদু স্বরে বাজানো হয়, তা হলে যে অনুভূতির সৃষ্টি, অতিজোরে বাজালে সম্পূর্ণ অন্য অনুভূতির জন্ম। অতীব করুণ সুর যদি কান-ফাটানো জোরে বাজানো হয়, তা হলে সে আর যাই করুক, কারুণ্যের সৃষ্টি করবে না। সমস্ত সংগীতের দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা গ্রাম খুঁজে বের করাই শব্দ মিশ্রণের সময়কার সবচেয়ে বড়ো কাজ। কাবণ, একটা গ্রামের নীচে শব্দ মানুষ অন্যমনস্কভাবে গ্রহণ করে, এবং একটি গ্রামের ঊর্ধ্বে মানুষের কান সহ্য করতে পারে না কোথায় ঘরকে ভরে দেবে শব্দে, আর কোথায় অন্যমনস্ক অনুভূতির স্তরে থাকবে— এ আসে ছবি-করিয়ের নিজস্ব রুচি থেকে, কারণ, এই সময়টা হচ্ছে সবচাইতে মারাত্মক সময়— এখনই ছবিটা সম্পূর্ণ জন্মগ্রহণ কবল। বহুপূর্বে যে-চিত্রনাট্য লেখা গিয়েছিল, এই

লগ্নে তার পূর্ণ রূপায়ণ। এখন থেকে ছবি আর ঘরের নয়— বাইরের, অপরের। এখন থেকে আমার আর জবাবদিহি করার কিছু রইল না।

এই সময় সেই নকশাটাও পরিষ্কার হয়ে যায়। আপাতদৃষ্ট গল্পের তলে তলে বইছে যে অপর আর-এক স্তরের গল্প-বলা— সেটাও এখন প্রকট হয়ে উঠল। মন্তব্য দিয়ে, ফুটনোট কেটে, সংকেত করে করে শব্দের ধারা অন্য এক স্তরে ছবির বক্তব্যকেই বার বার সোচ্চার করে যাচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, অহরহ। কারণ, যে-কোনো সিরিয়াস ছবিই বিভিন্ন স্তরে একই সঙ্গে বলা হতে থাকে। তার একটি স্তর, এবং সবচাইতে শক্তিশালী একটি স্তর, এইসঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল।

তাই বলছিলাম, স্থির চিত্র মুক্তি খুঁজছে গতির মধ্যে— মূক চলচ্চিত্র প্রগল্‌ভ হতে চেয়েছে, সশব্দচিত্র সে আয়তন বাড়িয়ে দিয়েছে, মগ্ন হয়ে গেছে, অন্য একটা কিছু খোঁজার মধ্যে। চূড়ান্ত শিল্প যে সংগীত তারই নির্ব্যক্ত উদগ্র এককতায় পৌঁছবার সাধনা বোধহয় ওর।

তবে যে-কোনো শিল্পই শিল্প হয় না, যতক্ষণ না তার একটা বাতাবরণ থাকে। চলচ্চিত্র শব্দেরও একটা ধাঁচা, একটা গোটা নকশা থাকে।

সেটিকে ধরবার চেষ্টা করা যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি ছবিটিকে বুঝতে, তাকে ওজন করতে আমাদের সাহায্য করে।

ছবির ছন্দ ও গ্রন্থনা

সম্পাদনা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী খুঁটি। একটা ছবি যে দাঁড়ায় তার মূল ভিত্তিই হল সম্পাদনা। চলচ্চিত্রগত সময় এবং জায়গা সম্পাদনার সাহায্যে বাড়ানো-কমানো যায়। চলচ্চিত্রের জগৎ সম্পাদনার কাঁচির জগৎ। যে-কটি অস্ত্র আমাদের হাতে থাকে ছবি করতে গিয়ে তার মধ্যে সম্পাদনাই সবচেয়ে শক্তিশালী। আইজেনস্টাইনের কন্‌ফ্লিক্‌ট্‌ বা পুদভ্‌কিনের 'সমন্বয়', এগুলো হয়তো আজকের যুগে খানিকটা পুরোনো হয়ে গেছে।

কিন্তু এগুলোর ভিত্তিতেই আজও আমাদের সম্পাদনার কাজ চলছে। যে-কোনো ওয়েস্টার্ন ছবির ফাস্ট কাটিং বা আন্তনিওনির মন্থর গতি সবই সম্পাদনার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। যে-কোনো পরিচালক যখন ছবি করেন তখন সম্পাদনার কথা মাথায় রেখেই করেন।

সম্পাদনাকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে 'মন্তাজ'। এই 'মন্তাজ' কথাটা কিন্তু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান জগতে গিয়ে ভিন্ন মানে ধারণ করেছে। আমেরিকানরা মনে করে মন্তাজ বলতে সম্পূর্ণ একটা আলাদা জিনিস। তাদের কাছে মন্তাজ হচ্ছে একটা বিশেষ মুহূর্তে একটা চিত্রমালার সৃষ্টি যার সাহায্যে একটা অগ্রগতিকে খুব সংক্ষেপ করে দেখানো যায়। তাই আমেরিকানদের মন্তাজ একটি বিশেষ চলচ্চিত্রগত প্রয়োগ মাত্র— সম্পূর্ণ সম্পাদনাটি নয়।

ছবিতে আপনারা যে জোর দেখতে পান বা যে দুর্বলতা দেখতে পান সেগুলো সবই

সম্পাদনার দরুন। ছবি করার বিভিন্ন উপাদান আছে সত্যি, কিন্তু শেষ অবধি সব নিয়ে পর্যবসিত হয় ওই সম্পাদনায়। আমরা যখন ছবি নিয়ে ভাবি, তখন গোড়া থেকে সম্পাদনার কথা ভেবেই ভাবি। পরে হয়তো অদলবদল কিছু হয়, কিন্তু মূল সুরটি অব্যাহত থেকে যায় গোড়া থেকেই। একটা ছবির রূপ কল্পনা করতে গেলে প্রথমেই মাথায় আসে তার সম্পাদনার রূপ। সেইটাই ছবিটির রস গন্ধ এবং আকার নির্বাচন করে দেয়। কাজেই ছবি করার জগতে সম্পাদনার প্রেরণা অসীম।

চলচ্চিত্রকে শিল্পকলার অংশ বলে ভাবলে সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ভাবনা এসে পড়ে। সব শিল্পকলারই নিজস্ব ছন্দ আছে। চলচ্চিত্রেরও তা আছে। এবং সেটা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সম্পাদনার ওপরে। সম্পাদনা বলতে এখানে আমি তার ব্যাপকতম অর্থে ধরছি। যেমন ধরুন ওজু-র ছবি। তিনি তাঁর ক্যামেরা রাখার ভঙ্গি থেকে আরম্ভ করতেন সম্পাদনা। বিশেষ একটি সেট-আপ-এ ক্যামেরা রেখে তিনি পুরো ছবিটা তুলতেন। কাটতেন অত্যন্ত মন্থর গতিতে যেটা জাপানি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর দ্বারা তিনি যে ছন্দ সৃষ্টি করতেন সে ছন্দ সম্পূর্ণ জাপানি ছন্দ। ওঁর থেকে বেশি জাপানি পরিচালক কুরোসাওয়াও নন, মিজোগুচিও নন। এটা সম্পূর্ণ সম্পাদনার ব্যাপার।

আমার 'অযান্ত্রিক' 'কোমল গান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'তে আমি যে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি সেটা মূলগতভাবে একই। প্রত্যেকটি ছবির একটা নিজস্ব দাবি আছে। যার ফলে ছবির ছন্দ বদলায় কিন্তু মূলগত জোরটা একই জায়গায় থাকে। 'অযান্ত্রিক'-এ মনুষ্যসমাজের সীমান্তে বাস করে এমন একজন ব্যক্তিকে আমি ধরেছিলাম। কাজেই সেখানে অনুভূতিটা ছিল একাকী। তাই ছন্দও ছিল এলোমেলো অগোছালো ধরনের। 'কোমল গান্ধার'-এ এসে সমস্যাটা দাঁড়াল গোষ্ঠীর। গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিকে বিলোপ করে দেওয়াই আমার করণীয় কর্ম ছিল। তার সম্পাদনা-কর্মও সেই হিসেবে একটু হয়তো অবিন্যস্ত। সেটাই 'কোমল গান্ধার'-এর মূল সুর ছিল, কিন্তু 'কোমল গান্ধার'-এর পরে শুনেছিলাম আমি নাকি গল্প বলতে পারি না, তাই চটেমটে ঠিক করলাম যে এবার একটা গল্প বলতে হবে। করলাম 'সুবর্ণরেখা'। ওখানে প্যাঁচটা ছিল এই যে এবার এই ঘটনাটা ঘটতে যাচ্ছে, তোরা ঠেকা দেখি? পারলি নে তো? সঙ্গে সঙ্গে খেলি ঘা। বাঙালি দর্শক শুধু যদি গল্পের অনিবার্যতা নিয়েই চিন্তিত হয়ে থাকে তবে তাও আমি দিতে পারি। সেটা 'সুবর্ণরেখা'য় আমি চেষ্টা করেছি, পেরেছি কি না পেরেছি সেটা আপনাদের হাতে। সম্পাদনার ছন্দও সঙ্গে সঙ্গে বদলিয়েছে, তীব্রতর হয়েছে, দীর্ঘতরও হয়েছে জায়গায় জায়গায়। 'সুবর্ণরেখা'য় আমার একটি ক্লোজ-আপের ব্যবহার বোধহয় ভারতীয় চিত্রজগতে দীর্ঘতম। সেটা কিন্তু মানুষের চোখেই পড়ে নি। ভাই যখন বোনের কাছে গিয়ে পৌঁছচ্ছে উন্মাদনার পরে, সেখানে একটা বিগ ক্লোজ-আপে মাধবী তাকিয়ে থাকে, আর পেছনে চলে 'প্যাট্রিসিয়া' মিউজিকের অস্ফুট অনুরণন। সেটা প্রায় আশি ফুট দীর্ঘ ক্লোজ-আপ। আমি ইচ্ছে করেই এই ক্লোজ-আপটাকে অতখানি টেনে রেখেছিলাম এবং তাতে করে আমার মনে হয়, আমি ব্যাপারটাকে জমাতে পেরেছিলাম। এটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

সম্পাদনা যে ছবি করার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র সেটা স্বভাবতই গ্রিফিথের কাজে প্রমাণ হয় প্রথম। এবং তাকে সত্যি সত্যিই এগিয়ে নিয়ে যান তার যুক্তিপূর্ণ

পরিণতিতে কুলেশভ এবং তাঁর গোষ্ঠী। তারই যথাযথ পরিণতি পুদভ্কিনে এবং বিশেষ করে আইজেনস্টাইনে। আইজেনস্টাইনই ব্যাপারটাকে তার সম্পূর্ণ পরিণত রূপ দেন। তার পরে ব্যাপারটা আর এগোয় নি। ঐটুকু নিয়েই আমরা ধুয়ে মুছে খাচ্ছি। কাজেই আইজেনস্টাইনই আজও আমাদের জনক। সম্পাদনার সমস্ত দিকগুলোই তিনি নেড়ে চেড়ে দেখেছেন এবং তারই তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রকাশ আজও আমাদের পরিচালিত করছে।

ছবির সম্পাদনা

গ্রিফিথ-এর ক্লোজ-আপ ব্যবহার, কুলেশভের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পুদভ্কিনের ইটের পর ইটের থাকে যেমনি বাড়ি গড়ে ওঠে না, তেমনই ছবিও তৈরি হয় না, গড়া হয়— এই তত্ত্ব বা আইজেনস্টাইনের দ্বন্দ্ববাদমূলক তত্ত্ব— এ-সব আজ সুপ্রাচীন হয়ে গেছে। কিন্তু দৃঢ় ভিত্তি আজও এগুলোই ছবির সম্পাদনার ব্যাপারে।

আর, আসলে ছবি-করাটা সম্পাদনাই। বাকি সব কাঁচামাল, নকশা, খসড়া, ঠিকঠাক করে ছেঁটে বা বড়ো করে সাজিগুজি করে ছবি দাঁড় করিয়ে তোলে এই সম্পাদনা। এর আগের প্রত্যেকটি ধাপ সম্পাদনার শেষ পরিণতির কথা ভেবে তৈরি করা হয়ে থাকে। সম্পাদনাই সম্রাট।

এই বিশাল বিষয় নিয়ে ক্ষুদ্র নিবন্ধে আর কী বলব? সামান্য কিছু আভাস দিতে পারি—

সম্পাদনা শুরু হয় চিত্রনাট্য লেখার সময় থেকে। যখন চিত্রনাট্যের খসড়া তৈরি হতে থাকে, তখনই সম্পাদনায় কী চেহারা আসবে। তার দিকনির্দেশ গ্রথিত হয়ে থাকে।

ছবি তোলার সময়ও তাই একটি বিশেষ সম্পাদনা পদ্ধতির কথা মনে করেই লোকে শুটিং করে থাকে। সেখানে অভিনয়, পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, গানের ব্যবহার— সব-কিছুই এই সর্বব্যাপ্ত পরিকল্পনার অনুপন্থী।

তার পবে আসে কাটার কথা, যার মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্য যায় বহুলাংশে বদলে, অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, প্রতিটা জিনিস খাপে খাপে মিলে যায়— এমন অনেক কিছুই জন্মগ্রহণ করে সম্পাদকের টেবিলে, যা অচিন্ত্য ছিল আগে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। এর পরে আসে শব্দের ব্যবহার, বিভিন্ন শব্দের সংমিশ্রণ। এই শব্দের নানাপ্রকার ব্যবহার (যার কিছু আমি নীচে উল্লেখ করব) এবং তাদের একত্রীভূত করে ফেলার পরমুহূর্তেই ছবিটা জীবন্ত হয়ে লাফিয়ে ওঠে।

যেটা ছিল খালি শিল্পীর মনের মধ্যেকার খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা ধোঁয়াটে, খানিক ইচ্ছে, খানিক স্বপ্ন— সেটা এখন বাস্তবে জলজ্যান্ত, একটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে এসে পড়া' সামগ্রী। হয়তো। প্রথম চিন্তা নানাভাবে বদল হয়েছে ছবি-করার বাঁকে বাঁকে আর সম্পাদকের টেবিলে— নানারকম নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার জন্ম দিয়েছে— তবু মোটামুটি স্বপ্নটাকে বাস্তবে টেনে এনে নামিয়েছে।

তাই সম্পাদনাই হচ্ছে ছবি করা।

এই যে চিত্রনাট্যের সময়ে ছক তৈরি করে নেওয়া, এর কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে কর্মপ্রণালীরও বদল হয়। কিছু কিছু ছবি-করিয়ে আছেন, যাঁরা আগে থেকে মাপজোক করে একেবারে ঠিক কটি শট কতক্ষণ থাকবে, তারও হিসেব করে গেলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিটি শটের চেহারা কী হবে, তার আঁকাটুকুও পর্যন্ত করা হয়ে যায় এঁদের মনে।

এ পদ্ধতিতে বহু মহত্তম শিল্পী কাজ করেছেন এবং সফল হয়েছেন। এঁরা প্রাথমিক স্বপ্নকে পরিপূর্ণ আঁকড়ে ধরে রাখতে চান এবং বিভিন্ন ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেটুকু বদল না করলেই নয়, তাই করে ছবি বানিয়ে চলেন।

আর-এক ধরনের ছবি-করিয়ে আছেন, যাঁরা মোটানুটি গল্পের ছক, তার দার্শনিক ভিত্তি এবং মূল রসকে পাথেয় করে পাড়ি জমান। ছবি করার বাঁকে বাঁকে তাঁদের নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা নতুন সব আনন্দের সন্ধান দেয়। খোলা মনে (যতটুকু আর্থিক এবং শিল্পীর নিজস্ব মানসিক পরিস্থিতিতে করা সম্ভব) ছবি করতে নেমে ফিরে আসেন সেই মূল সুরটিতে, কিন্তু মীড় গমক মূর্ছনায় নানা অলংকার অলংকৃত করে। ফ্লাহার্টি সাহেব এমনই এক কর্মী ছিলেন।

এখন কথা হচ্ছে এই প্রধান দুই চিন্তাশীল পদ্ধতিতে ছবি করার ভালো এবং খারাপ কী কী এবং সম্পাদনা এ দুটিকে কীভাবে ঠেলে নিয়ে চলে, সেটা ওজন করে দেখা উচিত।

যাঁদের কাছে ছবিটা একটুও না তুলে অত্যন্ত স্পষ্ট (এখানে আপেক্ষিকভাবে কথাগুলো বলা হচ্ছে কারণ অঘটন ঘটার অবকাশ সর্বত্রই থেকে যায়) হয়ে প্রতিভাত তাঁদের সম্পাদনার নব্বুইভাগ চিত্রনাট্যতেই করা হয়ে গেছে। খালি কাঁচামালগুলোকে ঘরে তোলার ওয়াস্তা। এতে করে প্রায় নিখুঁত ভাবে ছবি তোলার কর্মসূচি, খরচের এবং সময়ের হিসেবের মধ্যে ব্যয়, মানসপুত্রকে জন্ম দেবার পরম পরিতৃপ্তি— এ-সবই মেলে।

মেলে না আবার অনেক কিছু। ছবিটা ভীষণ ভাবেই একটা গতিশীল ব্যাপার। এই যে চলমান জগৎ যেখানে প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু জন্মাচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে, প্রতিপদে এমন সব ঘটনা বা দৃশ্য পরম্পরায় এসে মিলিয়ে যাচ্ছে, যারা এর আগেও কখনো আসে নি এবং এমনটি করেই আর কখনো আসবে না, কিছুতেই না। এই যে বহতা জীবনধারা এই যে সতত সঞ্চরমাণ সংসার স্রোত— বাড়িতে বসে এর রূপ-রস-গন্ধ প্রায় কিছুই নিজের কল্পনায় বা চিত্রনাট্যে আঁটিয়ে তোলা যায় না। কাজেই ঘরে বসে ভাবা জিনিসের খাতিরে বাইরের উচ্ছল জীবন কলুর ঠুলি-পরা বলদের মতো দুমড়িয়ে-মুচড়িয়ে এনে দাঁড় করাতে হয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে বাস্তবকে 'স্ট্রেটজ্যাকেট' পরিয়ে হাজির করতে হয়। স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব এ-সব ক্ষেত্রে প্রকট হওয়াই স্বাভাবিক, এবং সর্বোত্তম শিল্পী তাঁর সর্বগভীর প্রেরণার মুহূর্তগুলোতেই মাত্র মহৎ শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে যান এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভর ক'রে। বাকি মাঝামাঝির দল কোনোদিনই প্রাণের আনন্দে ভরপুর হতে পারেন না।

এবার অন্য ধরনের ছবি-করিয়েদের সম্বন্ধে বলব। এঁরা একেবারে বিপরীত। এঁরা ছবির চিত্রনাট্যকে একটা গাইড টু অ্যাকশন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার শট ভাগ করা, সম্পাদনার ঢঙকে বদলানো এমন-কি নতুন নতুন যোজনা করা পর্যন্ত সব-কিছুই করার জন্য মনকে খোলা রেখে এগোনো। হয়তো একটা লোকেশন-এ গিয়ে একটি মেঘখণ্ডকে বিচিত্র

আকার ধারণ করতে দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছবি তোলা ও সম্পাদনার প্যাটার্ন বদলে গেল ঐ মেঘটিকে কেন্দ্র করে। কোথাও কোনো গাছের গুঁড়ি অদ্ভুত ব্যাঁকানো ঢঙে খাড়া, ব্যস, শুরু হয়ে গেল তাঁর মধ্যে তাঁর নিজস্ব চিত্রের বক্তব্যের দ্যোতনার আরোপ।

আমার 'সুবর্ণরেখা'-তে যে ভাঙা এরোড্রোমটি এক প্রধান স্থান অধিকার করে আছে, যার উপস্থিতির ফলে সমস্ত ছবিটার গল্প, চিত্রনাট্য, সম্পাদনা একেবারে ভোল পালটেছে, সেটা যে সেইখানে আছে সে-খবর পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। হঠাৎ মাঠে ঘাটে ঘুরতে গিয়ে সেটা আবিষ্কার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেটি আমার মাথায় নতুন নকশা বুনতে আরম্ভ করল ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে। ওটি ওতপ্রোত হয়ে জড়িয়ে গেল 'সুবর্ণরেখা'য়, যাকে ছাড়া ছবিটিকে ভাবা যায় না। বহুরূপীর ব্যাপারটাও তাই। তাৎক্ষণিক। কিন্তু পেছনে আমার মূল বক্তব্যকে সহায়তা করছে বলেই এদের আঁকড়ে ধরেছিলাম। এমন আমার এবং আরো অনেকের বহু ছবিতেই হয়েছে।

এর মারাত্মক কতকগুলো খারাপ দিক আছে। প্রথমত লোভ। লোভ সংবরণ করতে না পারলে বল্গা-ছেঁড়া এক জগাখিচুড়ি সৃষ্টি করবে। এজন্য আত্মশাসনের কড়া নিগড়ে মনকে বাঁধতে হবে। যাই দেখব ভালো, তাই তুলে এনে সাজাব, এ মনোভাব সর্বনাশের সৃষ্টি করে। সংযমের বিন্দুমাত্র অভাব হলেই পদ্ধতি সর্বনাশ ডেকে আনে। প্রবহমান জীবনস্রোতোধারা যেমন পবিত্রতম একটা বাপার, তেমনি সমস্ত ধারাটি যেন নিজের অঙ্কফলের অভিমুখীন নয়, এটাও পাহারা দিতে হবে। এটা পারে নি বলেই অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ ছবি হারিয়ে গেছে— আমারও গেছে।

দ্বিতীয় সমস্যা টাকা। এই পদ্ধতিতে উদ্দাম হয়ে গেলে সময়ের হিসেব থাকে না, জিনিসপত্র খরচের দিক থেকে মন দূরে সরে যায়, ফলে টাকাখরচ অকারণ বেড়ে চলে। লাখ লাখ ফুট ছবি তুলে তার থেকে দশহাজার ফুটের ছবিতে দাঁড় করাবার সময় সম্পাদনাগৃহে বসে মনে হয়, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। এরকম উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাবসাদারদেরকেও নারাজ করে তোলে।

কাজেই 'আর্ট' করছি বলে এই বেআইনি অপচয়-এর কোনো যুক্তি নেই। ক্ষমাও নেই। এই কথাগুলো আমরা নিজেরাই অনেক সময় ভুলে যাই।

কিন্তু মহৎশিল্পীর হাতে পড়ে এই পদ্ধতিও অতি স্বর্গীয় সুখের সন্ধান দিয়েছে। এ পদ্ধতির সচেতন শিল্পীরা তাই অনেক হিসেবি, অনেক সতর্ক। দু-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মানুষের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না, তার মধ্যে দিয়ে পথ কেটে কেটে, তাদেরই একজন হয়ে চলেছে আমার কাহিনী, ঐ পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত না হয়ে, ঐ গোটা নকশাটার অংশ দ্বারাই চলছে আমার ছবি— এ যদি সত্যি সফলভাবে আনা যায়— তবে অতি অপরূপ মানসিক তৃপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আগের কথাগুলোর মানে এই নয় যে, সে এই দুই ভিন্ন পদ্ধতি (পদ্ধতি বলছি, আপেক্ষিকভাবে, কারণ দুটো ধারাই একেবারে খাঁটি বিপরীত নয়, দুজনকেই একে অপরের পদ্ধতি কিছু-না-কিছু অবলম্বন করতে হয়, মাত্রার তফাত মাত্র) এদের মধ্যে কেউ ভালো কেউ খারাপ। বলতে যাচ্ছি, ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ, মানসিক গঠনভেদ— ফলে পদ্ধতির ভেদ— দুই পদ্ধতি থেকেই অপূর্ব সব চিত্রশিল্প জগতের লোককে সান্ত্বনা দিয়েছে, প্রগাঢ়

সান্ত্বনা দিয়েছে, তৃপ্তি দিয়েছে।

ম্যানিপিউলেশন অফ ফিল্‌মিক টাইম অ্যান্ড স্পেস, টেমপো, জাক্‌স্টাপোজিশন, পারমিউটেশন অ্যান্ড কমবিনেশন অফ শট্‌স্ অ্যান্ড সাউন্‌ডস্, ওভারল্যাপিং এবং এ দেশে কমার্শিয়াল ছবি-করিয়ে যাকে বলে মন্তাজ, এ-সব সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলার ছিল, স্বল্প পরিসরে কথাগুলো আর তুললাম না।

কারণ, তা হলে তো একটা গোটা বই-ই লিখতে হয়। আশা রইল।

চিত্রনাট্য

সম্প্রতি মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে চিত্রনাট্যের ওপরে যাকে ইংরাজিতে বলে সেমিনার সেইরকম একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেইখানে আমার বিশিষ্ট বন্ধু, সম্প্রতি যিনি প্যারিসে হঠাৎ মারা গেছেন, সেই জর্জ সাদুল, যার জন্য আমি শোকে মুহ্যমান হয়ে আছি— তিনিও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তার কয়েকটি কথা আমার মনে জাজ্বল্যমান হয়ে থাকবে।

মোটামুটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ছবি আরম্ভ হওয়ার আগে একটা গল্পের প্রয়োজন পড়ে, সেটা যে-ধরনেরই হোক। তার পর আসে চিত্রনাট্যের প্রশ্ন। চিত্রনাট্যকার সমস্ত ঘটনাকে একটা প্রবহমান গতিস্রোতে দেখবার চেষ্টা করেন। তিনি দেখেন প্রথমত মূলগুলো, তার পরে দেখেন চারপাশের জীবনস্রোত, তারপরে দেখেন সম্পূর্ণ ছবির ছন্দটা। তার ওপরেই নির্ভর করে পরিচালকের সমস্ত কাজের প্রয়াস।

এইখানে দুটো জিনিস আমি ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই। সেগুলো আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিমত। এটাকে আপনারা গ্রহণ করতেও পারেন, নাও পারেন। প্রাথমিক ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি, শিল্পীকে সমাজ-সচেতন হতেই হবে। এবং তার পরে তাকে শিল্পসচেতন হতেই হবে। আমার মতে শিল্পী যদি এই দুটো কাজকে অবহেলা করেন তা হলে এগোতে পারবেন না।

চিত্রনাট্যকারকে কবি হতে হবে। তার পর তাকে ফিল্ম-এর টেকনিক পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে হবে। কীভাবে কোন্ কথাকে ফুটিয়ে তোলা যায়, সেটা বোঝার জন্যে তাকে ক্যামেরার সমস্ত ঘটনাগুলোকে ধরে নিতে হবে। তারও পরে তাকে সাংগীতিক মূর্ছনা কী আসবে সেটাকেও ধরতে হবে। তার পরে তাকে ধরতে হবে সবচেয়ে যেটা বড়ো প্রশ্ন সেটা, ছন্দ। সর্ব শিল্পই শেষ অবধি গিয়ে দাঁড়ায় কবিতায়। চিত্রনাট্যও শেষ অবধি সেইখানে গিয়ে পৌঁছোয় যখন সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় জিনিসটা যায়।

আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে হঠাৎ পথ চলতে আকাশের মেঘের রঙ দেখে বা একটা টেলিগ্রাফের তারের লাইন দেখে মাথার মধ্যে অকস্মাৎ ছবি ভেসে ওঠে এবং আমার ধারণা এর থেকে ছন্দের জন্মগ্রহণ হয়। এই কথাগুলো ভবিষ্যৎ চিত্রনাট্যকাররা মনে রাখলে বোধহয় ভালো করবেন। আমি মনে করি, এইগুলোর

ভিত্তিতেই টেকনিকের ব্যাপারগুলো জন্মগ্রহণ করে।

এর পরে আসে সমাজ-সচেতনতার কথা। এইটি না থাকলে কোনো ভালো চিত্রনাট্য হয় এটা আমি বিশ্বাস করি না। সমাজ-সচেতন হতে হবে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের প্রেম-ভালোবাসা, তাদের আনন্দ এই সবগুলোর সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ না রাখলে চিত্রনাট্য হয়ে উঠতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

এইবার কিছু টেকনিকাল কথায় আসা যাক। অ্যারিস্টটলীর থিয়োরির যুগ এখন গেছে। এখন ব্যাপারটাকে টানতে হবে এইভাবে— গোড়ায় ঘটনাগুলোর উদ্ভাবন, মাঝখানে ইচ্ছে করেই খানিকটা দমিয়ে দেওয়া তার পরে আরেকবার অনুভূতির আঘাত এবং তার পরে ঘটনাকে চূড়ান্ততে উঠিয়ে দেওয়া। নাটকীয় ভঙ্গিতে চিত্রনাট্য লেখা আমার পাপ বলে মনে হয়। আমি চারপাশে দেখছি যে সেই ঘটনাই ঘটানো হচ্ছে। এবং কিছু কিছু অতিশিক্ষিত লোকের কাছ থেকেও এই ধরনের হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এঁরা ভাবছেন যে সস্তায় হাততালি পাবেন, তা তো পাচ্ছেনই না, উল্টে নিজেরা হাস্যাস্পদ হয়ে উঠছেন ক্রমশ। এইভাবে সস্তায় কিস্তিমাৎ করা যায় না। চিত্রনাট্যের একটা বাঁধুনির ব্যাপার আছে। কারণ সেইটেই হচ্ছে একটি ছবির প্রাণবস্তু।

চিত্রনাট্য থেকেই জন্মগ্রহণ করে ছবি। চিত্রনাট্যতেই ধরা থাকে ভবিষ্যতের ছবি তোলার সমস্ত দিকগুলি। রূপ রস গন্ধের একটা ব্যাপার আছে। সেগুলো পরিচালকের চোখে ভাসিয়ে তোলে ঐ চিত্রনাট্য। তার ভিত্তিতেই ভেসে ওঠে সমস্ত ছবিটার অঙ্গরূপ। কাজেই চিত্রনাট্য হচ্ছে ছবির জগতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। ঘটনাটাকে অনুধাবন করা দরকার। এবং সেইভাবে এটাকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে খেটে করা উচিত। এদেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গাতেই এ ঘটনাটা ঘটছে না। তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আজকের জগতে যাঁরা কাজকর্ম করছেন তাঁদের মধ্যে আমি লুই বুনুয়েলের নাম করতে পারি, যাঁর পায়ের তলায় বসে এখনও বহুদিন শেখা যায় চিত্রনাট্য কীভাবে তৈরি করতে হবে।

আসলে চিত্রনাট্য রচনার ব্যাপারটাকে বাগে আনতে হল নিজেকে বসে খেটে সেটাকে অর্জন করতে হয়, তা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই।

আমি আশা করি যাঁরা ভবিষ্যতে এই পথে এগোবেন তারা সেটাই করবেন।

ছবির ছন্দ

দিন কয়েক আগে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর তৈরি একটি ছবি দেখার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। ছবিটি দেখার পরে তিনি আমার সঙ্গে এক আলোচনাতে মগ্ন হয়ে যান। বিষয়টা ঠিক তাঁর ছবি ছিল না— ছবির মধ্যের একটা ঘটনা ছিল বিষয়ের মূল আলোচ্য।

ঘটনাটি হচ্ছে এইরকম : ছবিতে লোক আছে যাদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা দুজনেই বন্ধু। তার পরে একটি মেয়ে আসে। মেয়েটি এই দুইজন লোকের মধ্যে একজনের

প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়। তাতে অপর যে জন, তার কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না প্রথমে। একদিন এ মেয়েটি আর তার বন্ধু নৌকা-বিহারে বের হয়। যখন ফিরে আসে তখন হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটির ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। এবং ঘটনাটি কোনো প্রস্তুতি ব্যতিরেকে চরমে ওঠে। অর্থাৎ মারামারি হয়।

আমার কাছে ঘটনাটি যুক্তিহীন মনে হয়েছিল। কারণ সাধারণ মানুষ ঐ দৃশ্য দেখার পরে ধরে নেবে যে দ্বিতীয় লোকটিও মেয়েটিকে ভালোবাসত এবং এ দুজনকে একত্রে দেখে হঠাৎ তার হিংসা হয়েছিল। অর্থাৎ সেই "চিরন্তন ত্রিভুজ"-এর কথা। অথচ সাধারণ মানুষ দ্বিতীয় ব্যক্তিটির এই ব্যবহারের কোনো কারণই খুঁজে পাবে না। কারণ তার প্রস্তুতিই নেই।

আমার বন্ধুটি যিনি ছবিটা করেছিলেন, তিনি আমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ইচ্ছা করেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত দেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, যার যা ইচ্ছে মনে করে নিক। যদি কেউ ভাবে, লোকটা প্রেমে পড়ে হিংসে করেছিল, তবে তাই ভাবুক। অন্য কেউ যদি ভাবে যে বন্ধুর জন্যে সে চিন্তিত হয়েছিল, তা হলে তাই ভাবুক। যদি ভাবে যে বন্ধু ও মেয়েটির প্রতিপত্তি আশপাশের লোকের কাছে খেলো হয়ে যাচ্ছে সেইজন্য মেরেছিল, তা হলে তাই ভাবুক।

ছবির পরিচালক এই বিভিন্ন চিন্তার ধারাকে কোনো একটা খাতে বইতে দিতে রাজি হন নি, এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

এই তর্কের টানে টানে একটা মূল কথা এসে পড়ল। সেটা হচ্ছে এই যে, এরকম একটা আভাস দিয়ে ছেড়ে দেওয়া, যার দশ রকম মানে হতে পারে, সংগত কি না।

এই সুবাদে আমি তাঁকে যা বলেছিলাম তার হয়তো আরও ব্যাপক ব্যবহার থাকতে পারে তাই কথাগুলোকে লিপিবদ্ধ করলাম।

আমার মনে হয়েছিল, আমার বন্ধুটি একটা জায়গায় ভুল করেছেন। সেটা দশ রকম দ্যোতনা প্রকাশের ইচ্ছের মধ্যে দিয়ে নয়। এ ধরনের ট্রিটমেন্ট খুবই উচ্চস্তরের ছবিব জন্ম দিয়েছে অতীতে এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আরও গভীরে।

যখনই কোনো একটা ছবি (যদি অবশ্য সেটা সত্যিকারের চিন্তাশীল হয়) কোনো একটা বিশেষ রীতি বা পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরবে, তার সংকেত দিয়ে যাবে তা প্রথম কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে। অর্থাৎ ছন্দ এবং সুর গোড়াতেই বিন্যস্ত করবে।

কথাটাকে অন্য কিছু শিল্পের উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন সংগীতে। আপনি কোন্ রাগ গাইবেন, সেটা একান্ত আপনারই বিবেচ্য। কিন্তু প্রথমেই বিস্তারের মধ্য দিয়ে রাগ-রূপটি আপনাকে তৈরি করে নিতে হবে। তখন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। তখন যদি কোনো বিবাদী পর্দা লাগে তা হলে সুরও কেটে যায় এবং সমস্ত আবহাওয়াটা এলোমেলো হয়ে যায়। সংগীতরসিক মাত্রেই কথাটা বুঝতে পারবেন। যেখানে রাগ মিশ্র করা হয়, সেখানেও অপরাধী পর্দাকে চুরি করে করে ছুঁয়ে শ্রোতার কানকে কীভাবে তৈরি করতে হয়– সেটা আমার বন্ধু আলী আকবর বা রবিশঙ্করকে জিজ্ঞেসা করলেই জানা যাবে।

পাশ্চাত্য সংগীতে Scale, যেমন Bethoven-এর Violin in D. Major বাজাতে

বাজাতে যদি Bach-এর কোনো একটা অনবদ্য FUGUE in F লাগে (তেমন বাতুল যদি কেউ থাকে তা হলে অবশ্য), সে ক্ষেত্রে ঘটনাটা যা দাঁড়াবে— আমাদের ভারতীয় মার্গসংগীতে রাগের অর্বাচীন মিশ্রণ তারই সঙ্গে তুলনীয় হবে। বা ধরুন চিত্রাঙ্কনের কথা। Leonardo da Vinci-র কোনো ক্যানভাসের এক অংশে যদি Picasso-র Sur-realist period-এর কোনো ছবির একটা অংশ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায় ;— অথবা Brenghal-এর সেই perspective প্রধান কোনো অনবদ্য সৃষ্টির ঠিক মধ্যখানটিতে Vangogh-এর pastel-এর সেই SOWER-কে যদি দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়— তা হলে ঘটনাটা যেমন দাঁড়াবে সেই রকম।

আসল কথা হচ্ছে— Style। বাংলায় কথাটাকে আমরা শৈলী বলি। শব্দটা অত্যন্ত খোঁড়া। Style-এর যে সম্পূর্ণ মানে বা দ্যোতনা, তার কোনো প্রতিশব্দ বাংলায় নেই।

আমার বন্ধুকে আমি এই কথাই বলেছিলাম যে-Style-ই আপনি ব্যবহার করুন-না-কেন, তার মধ্যে একটা consistency থাকা চাই। একটা একপত্ন ভাব চাই। এমন-কি যেখানে আপনি পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে বিভিন্ন Style বদলাবেন ঠিক করেছেন সেখানেও। আপনার Scale কোন্ note-এ হবে সেটা বড়ো নয়, কিন্তু আপনার Scale-এতেই আপনাকে স্থির থাকতে হবে। সেখান কোনো বাচালতা চলবে না। একটা শিল্পীর কাছে আর-একজন শিল্পীর এর বেশি চাহিদা নেই।

ঐ ভদ্রলোকের ছবির গোড়াতেই যদি আমি তেমন কোনো একটা চিত্রকলা দেখতাম, যাতে করে আমার মনে তার দ্যোতনা সম্পর্কে পাঁচ-দশ রকম মানে এসে দাঁড়াত এবং আমি যদি মনস্থির করতে না পারতাম, তা হলে হয়তো পরেরকার ঐ বিশেষ ঘটনাটি আমার কাছে খুব সহজভাবেই আসত এবং তার ব্যাখ্যা পরিপূর্ণভাবে আমার সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম।

কিন্তু বিচলিত হয়েছিলাম ঐ confusion of style ব্যাপারটিতে (শৈলীতে বিপর্যয়ে)। আমার মনে হয়, ওটা একটা রসের ব্যাপার, অর্থাৎ আস্বাদনের, অর্থাৎ রুচিবোধের। ওটা বোধ হয় ভিতর থেকে আসে।

মন্তাজ

D. W. Griffith প্রথম ক্লোজ-আপ এর আবিষ্কার করেন। তাঁর দ্বারা তিনি একটি নূতন জগতের পথ নির্দেশ করে দেন, একটি নূতন শিল্পের পথ নির্দেশ করে দেন। যাঁরা লিলিয়ান গ্রীসের সাদা পাঁচটা আঙুল দেখেছেন প্রথম পর্দায়, তাঁরা চমকিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে ব্যাপারটা কী! সেই প্রথম ক্লোজ-আপের জন্ম। এবং তার পরে D. W. Griffith দুটি ছবি করেছিলেন যথা Birth of a Nation এবং Intolerance— এই দুটি ছবিতে উনি একদিকে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে গ্রহণ করে কত গভীরে প্রবেশ করা যায়, তার প্রমাণ রেখেছিলেন— অপরটিকে মানবজাতির ইতিহাসে বিভিন্নস্তরে যে

একই ঘটনা ঘটে, এ কথাটাও প্রমাণ করেছিলেন।

কী করে জানি না, বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার এই ছবি দুটির কিছু print পৌঁছে গেল। এবং সেই দুটিকে দেখলেন প্রধানত কুলেশভ এবং তাঁর ছাত্র হিসাবে পুদভ্কিন্। সেগেঁই আইজেনস্টাইন তখন একজন ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ছিলেন।

কুলেশভ তাঁর workshop-এ টানাটানি করতে করতে দেখলেন যে একটা অদ্ভুত জিনিস জন্মাচ্ছে। একটা shot-এর সাথে কেটে আর-একটা shot লাগিয়ে দিলে এই দুটোর যোগফলের বাইরে একটা কিছু ঘটছে— তৃতীয় একটা কিছু। পুডোভ্কিন্ ঘটনাটাকে গ্রহণ করে নিলেন। এবং নিজের ছবি তোলার ব্যাপারে সেটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা করলেন।

অপরদিকে আইজেনস্টাইন সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলেন এবং সেটাকে কতখানি সফল করা যায়, তার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলেন।

এর ফলেই আমরা পাই যাকে বলে মন্তাজ, অথবা সম্পাদনা। মন্তাজ কথাটা হচ্ছে ফরাসি, মানে একত্র করা, ব্রিটিশ এবং আমেরিকানরা একে বলত editing, কিন্তু এটার মধ্যে যে একটা নিজস্ব বেগ আছে সেটা বোঝার ক্ষমতা তাদের ছিল না। এই দুজন Russian directorই প্রথম দেখিয়ে দেন মন্তাজ শুধু তাই নয়, তার থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। মন্তাজ করতে হলে হলিউডের লোকরা ভাবে— উদাহরণ দিয়ে বলছি, কোনো একটি গল্পে একটি মেয়ে শিশু ছিল, সে কয়েকটা শটের মধ্য দিয়ে বড়ো হয়ে গেল অথবা, আপনাকে দেখাতে হবে যে অনেকগুলো দেশ আপনি ঘুরে এসেছেন, সেটা খুব কম সময়ের মধ্যে দেখাতে হবে, সেইখানে হলিউড যাকে মন্তাজ বলে তাই দেখানো হয়। মন্তাজ কিন্তু তা নয়। সময় এবং জায়গা (space) সংক্ষেপে করার জন্য এরা যে deviceগুলো ব্যবহার করেন, সেইগুলোকে এঁরা মন্তাজ বলেন।

পুদভ্কিন বলতেন একটা আর একটা shot-এর মিলন হচ্ছে মন্তাজ। আইজেনস্টাইন্ বলতেন, একটা আর একটা shot-এর সংঘাতই হচ্ছে মন্তাজ। প্রথম shotটা দ্বিতীয় shotকে ধাক্কা মারবে, তবেই না তৃতীয় একটা কথা উঠে দাঁড়াবে।

আমি আইজেন্স্টাইনের মতে বিশ্বাসী। তিনি এখনও আমার গুরু। ধরুন— একটা শ্মশানঘাট দেখছেন সেখানে একটি মহিলা একটি চিতার সামনে হাউ-হাউ করে কাঁদছেন, তাঁর হাতের বালাগুলো ভেঙে দিচ্ছেন। তার পরই দেখছি, একটি চিতা জ্বলছে, এই দুটি থেকে তৃতীয় একটা মানে তৈরি হচ্ছে যে যিনি কাঁদছেন, তাঁরই স্বামী বোধহয় মারা গেছেন। এমনও তো হতে পারে যে ওঁর পিতা মারা গেছেন এবং এতদিন মেয়েকে পরম আদরে রেখেছিলেন, আজ সেই পিতা নেই কাজেই তিনি তাঁর নিজের হাতের চুড়িগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙছেন।

আমার নিজের ছবি থেকে মন্তাজের অনেক উদাহরণ দিতে পারি— যেখানে বক্তব্যটা সম্পূর্ণ মার্ক্সিস্ট অ্যান্টিথিসিস্ এবং সিন্থেসিস্।

ফিল্মটা অত্যন্ত মার্ক্সিটি ব্যাপার। আর মন্তাজ হচ্ছে ফিল্মের প্রাণ। এর tension যে ধরতে না পারে, সে যাই করুক, আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে না। পুডোভ্কিন্ যে ভাবে plans বলতেন, আইজেন্স্টাইন সেখানে cross বলতেন— একটু গভীরে তলিয়ে দেখুন দুটোই এক। আজকের যুগে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে যার মধ্যে অনেকগুলিই

আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে, কিন্তু গোড়ার কথাটা এই বুড়ো লোকদের কথার পরে আর কোথাও বেরোইনি।

আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন যদি কোনো বাচালতা দেখিয়ে থাকি।

ছবি বোঝা

চলচ্চিত্র একটি সামাজিক ব্যাপার। এর বিভিন্ন অংশ আছে। কাজেই বুঝতে হলে খানিকটা শিক্ষিত হতেই হবে।

যেমন ধরুন সংগীতের ব্যাপারটা। ভারতীয় মার্গ সংগীত বুঝতে হলে খানিকটা শিক্ষা লাগে, এও তাই। ভালো ছবি বুঝতে হলেও শিক্ষা লাগে। হট করে কোনো একটা জিনিসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেই হয় না, অনুশীলন লাগে। আমাদের প্রাচীনরা একটা কথা বলতেন— দাসদের এবং নারীদের বেদে অধিকার নেই। অধিকারের প্রশ্নটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কথা। যে-কোনো ব্যাপারেই অনুপ্রবিষ্ট হতে গেলে সর্বাগ্রে দরকার অধিকার অর্জন করা। কাজেই যাঁদের অভিমান ছবি বুঝতে পারেন, তাঁদের আগে অধিকার অর্জন করা উচিত।

এই মুখবন্ধ দিয়ে এবার আমার বক্তব্য পেশ করছি।

ছবি একটা দুর্দান্ত ব্যাপার। এতে যে কত কী এসে মিলেছে তার ইয়ত্তা নেই। কমপোজিশন ধরুন, মানুষের সাধারণ ব্যবহার ধরুন, সংগীত ধরুন, যন্ত্রের সীমারেখাটাকে ধরুন— এই সবকটাকেই আপনাকে বুঝতে হবে। কারণ চলচ্চিত্র হচ্ছে এমন একটা শিল্প যেখানে সর্বশিল্পের সমন্বয় হয়েছে।

ফেলিনি যখন একটা মেয়ের প্রোফাইল দেখান, তখন আপনাকে জানতে হবে যে মিকেলাঞ্জেলো কে ছিলেন— তাঁর Umbrian Angel বলতে কী বোঝায়? সেটা না জানলে আপনি তো দোলচে ভিতা-র অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন না।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। মোদ্দা কথা আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে ছবি ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল। কাজেই আমাদের দেশে যেমন সহজভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করা হয় ঘটনাটা কিন্তু অত সোজা নয়। সাধারণ দর্শকের কথা আমি বলছি না, কিন্তু দায়িত্বশীল দর্শক যাঁরা, তাঁদেরকে একটু অবহিত হতেই হবে সর্ব ব্যাপারে।

এখানে মানুষের অবচেতন নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না, কারণ সেটা হবে এ ক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু সর্বশিল্পে যেমন, তেমনি চলচ্চিত্রও মানুষের অবচেতন নিয়ে কারবার করে। কাজেই ছবির শেষ যে মোক্ষ, সেটা অবচেতনে গিয়েই বিলীন হয়। অনিকেত যে সংকেত, সেটা ঐখানে গিয়েই নিজস্ব পরমতা প্রাপ্ত হয়।

এর থেকে বেশি গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে কঠিন। দরদী মন যাঁদের আছে তাঁরা হয়তো এইটুকু থেকেই বুঝতে পারবেন। কথা বাড়িয়ে লাভ কী?

চলচ্চিত্রে নৃত্য

আমাদের দেশে ছায়াছবিতে প্রায়ই নাচের ব্যবহার দেখা যায় বিশেষ করে বোম্বাই ও দক্ষিণের ছবিগুলিতে। বাংলার পৌরাণিক ছবিগুলিতে এর প্রাধান্য দেখা যায়।

এ-সব নাচে বেশির ভাগই এমন ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন প্রক্রিয়া যে এগুলোকে নাচ বললে নাচ কথাটার অপমান করা হয়। নারীদেহের কতখানি অংশ কত রকমভাবে বেঁকিয়ে চুরিয়ে সেন্সর বাঁচিয়ে দেখানো যেতে পারে তারই অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন এই সব ছবি নির্মাতারা।

সব দেশে সম্ভব এবং অসম্ভব নাচকে এঁরা কুক্ষিগত করেছেন বলা যায়। এঁদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা দিককে এমন ভাবে মানুষের চোখের সামনে ধরা হয় যে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আসে। বলিষ্ঠ এবং সৎভাবে নৃত্যের প্রয়োগ আমাদের ছবিতে হয়ই না।

অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। উদয়শঙ্করের 'কল্পনা'র কথা এ প্রসঙ্গে তুলব না। কারণ এটা ভারতীয় ছবির জগতে একটি পরিপূর্ণ ব্যতিক্রম। "কল্পনা" এখন classical-এর পর্যায়ে পৌঁচেছে। সারা ভারতে classical নৃত্যরীতি, তার সঙ্গে দেশের প্রতি প্রত্যন্তের লোকনৃত্য এবং তার সঙ্গে উদয়শঙ্করের নিজস্ব প্রতিভা— সব মিলিয়ে এক অনবদ্য শিল্প গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও গণনাট্য সংঘের "ধরতীকে লাল" ছবিটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও উপলব্ধি করেছেন যে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নৃত্যকে কী বলিষ্ঠ ভাবেই না উপস্থাপিত করা যায়। এরকম আরো দুটো-একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে।

কিন্তু শোকাবহ ঘটনা হচ্ছে যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল এবং আধুনিক কালে এ ধরনের প্রচেষ্টা একেবারেই হচ্ছে না। আমরা যারা আজকাল নতুন ছবি করছি তারা নৃত্যকে একেবারে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছি। নৃত্য যে মানুষের চিন্তা ও আবেগের একটি রুচিসম্পন্ন বাহক হিসাবে ব্যবহৃত হত, এ কথাটা আমরা ভুলতে বসেছি।

নবীন চিত্রকারদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন অনুভব করি। আশা করি আমাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হবে।

ডকুমেন্টারি ফিল্ম

ডকুমেন্টারি ফিল্ম সম্পর্কে আমাকে আপনারা কিছু লিখতে বলেছেন। (ডকুমেন্টারি ফিল্মের বাংলা হিসেবে তথ্যচিত্র বা দলিলচিত্র আমার পছন্দ নয়।) ও-ধরনের ছবি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কাজেই আমার কথাগুলোকে আপনারা দয়া করে প্রামাণ্য বলে ধরে নেবেন না।

এককালে বিহার সরকারের হয়ে উপজাতিদের বিষয়ে কিছু ছবি করা গিয়েছিল, মাঝে পুনার বিপর্যয় ঘটে, সেখানেও কিছু কিছু কাজকর্ম করতে হয়েছে এবং হালে ভারত সরকারের হয়ে একটি ডকুমেন্টারি আমি শেষ করেছি। মোটামুটি এই আমার অভিজ্ঞতার পুঁজি।

ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ডকুমেন্টারি ফিল্ম করার অবস্থা অত্যন্ত সীমিত বলেই মনে হয়। এদেশে প্রধানত ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার এ-ধরনের ছবি করিয়ে থাকেন। তার মধ্যে রাজ্যসরকারগুলোর কথা না তোলাই ভালো। তাঁরা যা কাণ্ড করেন, সেগুলো ছবি বললে ছবি কথাটারই অপমান করা হয়। ভারত সরকার বরং কিছু পরিমাণে সত্যিকারের গুণী শিল্পীদের রেখেছেন, যাঁরা ছবি ব্যাপারটা বোঝেন। তাঁদের সচরাচর সুযোগ পাওয়া হয়ে ওঠে না, কারণ একটা সরকারি ব্যাপারের মধ্যে থাকলে কতকগুলো দিনগত পাপক্ষয় করতেই হয়। তবুও তারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা কিছু কাজ করেছেন, যেগুলোর জন্য গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ বোধ করা চলে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ভারত সরকার বাইরের প্রযোজকদের যে-সমস্ত ছবি চুক্তি করে দেন, সেগুলো প্রায় সবসময়ই অতি অখাদ্য বলে যে-কোনো ভদ্রলোকের কাছে পরিগণিত হবে। ওগুলোতে কল্পনার অবকাশ প্রায় থাকেই না। কোনো সৃষ্টিশীল শিল্পী তার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার অবকাশ খুঁজে পান না।

তবুও ভরসা ছিল যে, ভারত সরকার এক ভদ্রলোককে ইউনেস্কো থেকে ধার করে এনেছিলেন, ভদ্রলোকটির নাম জঁা ভাবনাগরি— ইনি যে-সমস্ত ছবি প্রযোজনা করেছেন ভারতের বাইরে গিয়ে, তার কিছু কিছু দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ওঁর রুচি অপূর্ব, ছবি সম্বন্ধে ধারণা তীক্ষ্ণ এবং উনি সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের মতো ফাইলে আবদ্ধ থাকেন না। ওঁর মেজাজ সত্যিকারের শিল্পীর। কিন্তু খবর পেয়ে দুঃখিত হলাম যে ওঁকে প্যারিসে ফিরে যেতে হচ্ছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। উনি থাকলে হয়তো কিছু একটা স্থায়ী কাজ হতে পারত।

এই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া আর একমাত্র এদেশে ডকুমেন্টারি ফিল্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন বিভিন্ন বড়ো বড়ো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাঁরা সকলেই বিদেশী, তাঁদের ঝোঁকটা সব সময়েই গিয়ে পড়ে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশা আর মানুষের শোচনীয় জীবনযাপন, এগুলোর ওপরে। তাঁরা পয়সা দিয়ে, ভালো পয়সা দিয়ে, ভালো লোককে দিয়েও এই-সমস্ত ছবি তোলান এবং এগুলোকে পাচার করেন সারা পৃথিবীতে, যার ফলে আমাদের দেশের একটা ভয়াবহ চিত্র বিদেশের লোকের সামনে ফুটে ওঠে।

এ ছাড়া ভারতবর্ষে ডকুমেন্টারি ফিল্ম করার আর কোনো রাস্তা নেই। ভালো ডকুমেন্টারি ভারতবর্ষে প্রচুর হতে পারে, কিন্তু চিরকালের যে ঘটনাটা দুঃখজনক, তা হচ্ছে, যাঁরা ছবি করবেন, তাঁরা সবাই গরিব। কাজেই পয়সাওয়ালা একটা লোকের প্রয়োজন সব সময়ই থেকে যায়। সেজন্য আমার নিজের যেটুকু সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে মনে হয়, ভালো ডকুমেন্টারি ফিল্ম হওয়া এদেশে ভীষণ কঠিন। আর যে-ই করবে, সে-ই একটা প্রচারের ব্যাপার ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে— যার ফলে ছবিগুলোতে শেষ অব্দি উৎরোবার সুযোগ খুব কমই থাকে। অবশ্য একজন ফ্লাহার্টি যদি জন্মাতেন এদেশে, তা হলে ব্যাপারটাকে ঘুরপাক মেরে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারতেন। যেমন 'লুইসিয়ানা স্টোরি'তে ওঁকে শেল অয়েল কোম্পানি একটা তেল খুঁড়ে বের করার ওপরে ছবি করতে দিয়েছিল। উনি সেটাকে লক্ষ ফুট expose করে একটা পাঁচ হাজার ফুটের ছবি দাঁড়

করালেন। এবং কোম্পানির লোকেরা ছবি দেখে কাঁই। তাতে আর সব কথাই আছে, তেলের কথাটাই নেই, এবং আজও পর্যন্ত এই ফিল্মের ফিতের ওপরে যতগুলো মহাকাব্য রচনা হয়েছে, তার মধ্যে এটি একটি সর্বশ্রেষ্ঠ। তা এইরকম জেদ কজনের থাকে, কজন পারে পৃষ্ঠপোষকদের এইভাবে আঘাত করতে, এবং করেও টিকে থাকা! সেটা আমাদের দেশে আশা করা কঠিন। আমরা সকলেই অনেক বেশি ভীতু।

মোটামুটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার নেই, তবে ভারতবর্ষে এখন যা চেহারা, ডকুমেন্টারির কপাল পুড়েছে। এদেশে এখনো পর্যন্ত আমি অন্তত কোনো আশার চিহ্ন দেখছি না। অপরের মত অন্যরকম হতে পারে, সে বিষয়ে তর্কে অনুপ্রবিষ্ট হতে চাইব না, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই।

কিন্তু মজা কী জানেন, এ দেশটায় একটা ফাটাফাটি কাণ্ড করা যেত মশাই, করা গেল না। যদি হত!

('আমাদের এই বিরাট দেশে কত বিষয় নিয়ে ডকুমেন্টারি করার সুযোগ ছিল। ভারতে কত উপজাতি, তারা এখনও তো সব নিঃশেষ হয়ে যায় নি, 'সভ্যতা' এসে কীরকম তাদের বদলে দিচ্ছে ; ভারতের নতুন শ্রমিকশ্রেণী, তাদের দৈনন্দিন আচরণের প্যাটার্ন ; কলকাতার পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলের চোঙা-প্যান্ট যুবক কিংবা হাতাকাটা ব্লাউজ যুবতী, আমাদেরই ছেলেমেয়ে তারা— এই সব কত বিষয় আছে। দুটো বিদেশী ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেখেছিলাম, মনে আছে। নিস্তব্ধ, সুন্দর প্রকৃতি, পাখির ডাক, একটা ব্রিজ আছে, হঠাৎ অনেকক্ষণ ধরে প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে একটা ট্রেন চলে গেল— ব্যাস, আর কিছু নেই! আরেকটা দেখেছিলাম ; কর্মব্যস্ত শহরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল, কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল— এই অল্প সময়টুকুর ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের কত বিচিত্র প্রকাশ, বিরহ মিলন বন্ধুত্ব শত্রুতা সব ঘটে যাচ্ছে। এই হচ্ছে ডকুমেন্টারি কাজ। একটা ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশের চেহারাকে দেখিয়ে দেওয়া।')

৫

সারি সারি পাঁচিল

একটি করে ছবি করার জন্য আমাদের যে কতগুলো পাঁচিল টপকাতে হয়, তা যদি আপনারা জানতেন— তা হলে আর একটু হয়তো আমাদের ক্ষমা করতেন।

ধরুন, আমাদের নিজেদের মনের দিকটাই। আমরা সব সুন্দর ধারণা নিয়ে বসে আছি, এ কথা ভুল। আমরা খুব করে হাতড়াচ্ছি। আমাদের নিজেদের মনের মধ্যে যে কত কী আছে, স্বয়ম্বৃত এই ফিল্মমাধ্যমটির যে কত অবকাশ আছে, সব কি আর ভেবে উঠতে পেরেছি? তার ওপরে এই ছবি করার ব্যাপারটা কত শ্রমসাধ্য, যে সত্যি সত্যি যখন খাটতে আরম্ভ করি, তখন অনেক কল্পনাই কেমন মাথা থেকে উবে যায়। শান্ত নিথর পরিবেশটি তখন আর থাকে না, মহা যজ্ঞশালা, যেখানে শতেক কর্মী আর শতেক কর্মের মহামহোৎসব।

কাজেই যেটুকু যা ভাবা গিয়েছিল, তারও এক স্বল্প কর্মশেষে প্রকাশিত হয়।

এই তো গেল নিজের অক্ষমতা। বাস্তবের চাপে পড়ে কল্পনা সব সময়ই এরকম মার খেয়ে থাকে। তার ওপর আমাদের নিরন্তর আকুল চেষ্টা, লোকের নাড়ী টিপে তার স্পন্দন রক্ষা করা। এই নাড়ীর গতি অনুভব করার ক্ষমতা আমাদের বড়ো সীমাবদ্ধ। ভুল হবার ফলে যা হবার তা তো হয়ই। কিন্তু ছবি তোলার সময় শেষ ফল কী হবে সে চিন্তা, সে অনিশ্চয়তা সব দৃঢ়তাকেই দোলাতে থাকে। এর প্রতিফলন শিল্পকর্মে পড়ে, এবং আর-একটি যোগফল তৈরি করে।

মানুষে নেবে কি নেবে না, এ যন্ত্রণা যে কী বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

এই তো গেল মনের এক সার পাঁচিল। তার পর ধরুন, সমালোচনার কথা। এদেশে ব্যক্তিগত সমালোচনা, বা মুখেমুখে সমালোচনা, অথবা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সমালোচনা, এ ভালোভাবে সবে শুরু হয়েছে। প্রভাব বিস্তার করে যে সমালোচনা, তা এক এই খবরের কাগজগুলোরই লেখা। এগুলো থেকে শিল্পী ঠিক ততখানি সহায়তা পায় না, যতটা পাওয়া উচিত। এ ব্যাপারটির প্রধান কারণ হচ্ছে, যে-কোনো ছবিই সমালোচনা করা হয়ে থাকে সাধারণত সময়-পাত্র-নিরপেক্ষ নিরালম্বভাবে। পরিপ্রেক্ষিত যে আছে, একটা দেশজ কর্মকাণ্ডের পটভূমি যে আছে, সে উপলব্ধির বড়োই অভাব মনে হয়। এই উপলব্ধি নেই বলেই ব্যাধিগ্রস্ত রাস্তা বার বার নিচ্ছি।

যে-কোনো ছবির পেছনে কিছু লোক আছে, যারা এর আগে কিছু করেছিল, এবং ভবিষ্যতে কিছু করবে তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। গতবারের কোনো কোনো গুণ এবং দোষ এবার বর্জিত হয়েছে, এবং তার থেকে সংকেত কী আসছে, এটা না বললে সেই লোকগুলির গতি-পরিণতির পথ নির্ণীত করার চেষ্টা সফল হয় না। সেই যে ছবি, এটা দেশের ছবির জগতে কোন্ জোয়ারের মুখে এসে কোন্ ধারাকে শক্তিশালী করছে, এ কথাটি না বললে

যে আসল কথাটিই অনুক্ত থেকে গেল। এই যে ছবির জগৎ, যার স্রোতের একটি ঢেউ এই আলোচ্য ছবি, সেটা দেশে বর্তমান পটভূমিতে কোন্ শক্তিকে জোরদার করছে, তাই বা না বলা হবে কেন? এই যে ছবি করা, যেটা বর্তমানে একটু একটু করে শিল্পের আওতায় এসে পড়ছে, অন্য শিল্পগুলির কৃতিত্বের আলোতে এ কী স্থান অধিকারে করছে, এ কথা ভাবা যে নিতান্ত প্রয়োজন।

এই সব জড়িয়ে, এই দেশময় লোকের সুখদুঃখের কথাটি ভেবে, এই ছবির এবং নানা অপূর্ব শিল্পের কত কিছু করার ভিত্তিতে, এই এখনকার ছবি করার সামাজিক মূল্যটি বিচার করে— তবে না ছবিটির শিল্পগত আর আবেদনগত বিচার হবে, তবে না শিল্পীর সত্যিকারের দোষত্রুটি আর দিব্যদৃষ্টি এবং অন্ধত্বের পরিমাপ হবে।

এবং এই হলে শিল্পী সমালোচনা থেকে শিখবে। তা কিন্তু হয় না। তাই সমালোচনা আত্মম্ভরিতার পাঁচিল তৈরি করে বোকার মতো গোঁ এনে দেয়, এক কথায় শিল্পীকে ঠেলে দেয় আবার সেই আঁধারে ঢিল ছোঁড়ার অঙ্কের হিসেবে।

এবার আর-একটা দিক ধরুন। ব্যাবসার দিক।

কিছু লোক পয়সা ছাড়ে, আমরা তবে ছবি করি। তারা সেই পয়সাটি লাভের সঙ্গে ফেরত চাইবেই, কাজেই সেইখানেই তারা পয়সা ঢালবে যেখানে তাদেরকে বোঝানো সম্ভবপর হবে যে লাভটি সুনিশ্চিত। এ বড়ো কঠিন পাঁচিল।

প্রযোজকদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ, তাঁরা এই পয়সা-ঢালার ব্যাপারে সাধারণত মূল লোকটি নন।— প্রধানত পরিবেশক ও প্রদর্শকরাই হচ্ছেন সেইসব দেবদুর্লভ ব্যক্তি।

পরিবেশক এবং প্রদর্শকদের বহু বক্তব্য নিয়েই বহু লেখা হয়েছে, এবং হাসা হয়েছে। তাতে কিন্তু সে-সব মারা যায় নি। পরিপূর্ণ এবং বলিষ্ঠভাবেই সে-সব চিন্তাধারা বেঁচে আছে। তার কারণ, টাকা-আনা-পাইএর হিসেবে তারাই আজও জিতে চলেছে।

কথাটা মারাত্মক। কিন্তু কথাটা সত্যি। কাজেই ঠাট্টা করে উড়িয়ে কোনো সুবিধেই হয় না। অনুধাবন করার ব্যাপার আছে। এবং তা করেই একমাত্র তীব্র প্রতিবাদের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু সে প্রতিবাদ ওদের যুক্তি দিয়েই ওদেরকে বশ করার উপযোগী হওয়া চাই। এবং যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে ততক্ষণ তাদেরকে কথাটা বোঝানোর এবং তাদের বোধগম্য করে কাজ করার প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। তার একমাত্র পরিবর্ত হচ্ছে, কাজ না করা। সেটা যখন কাজের নয়, তখন এই গোটা ব্যাপারটার পাঁচিল টপকানোর কথাটা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। এখানে আমাদেরকে প্রায়ই অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ— নীতিবাক্যের দ্বারবর্তী হতে হচ্ছে এইজন্যেই। আক্রমণ এর ওপর হবেই, কিন্তু তাতে কোনো ফলও ফলবে না উত্তরোত্তর, কারণ অর্থনীতি এর পক্ষে।

এটা কোনো অজুহাত নয়। কারণ অজুহাত ঘৃণার এবং এর মধ্যেও মানুষে মানুষে, রকমফের আছে। হাতটাই বড়ো করে ধরা মানেই সংগ্রামশীল মনোভাবের অভাব। সেটাও ইতরামো। শুধু পাঁচিল যে আছে এই মনে রাখলেই আমরা ছবি-করিয়ের দল কৃতার্থ হব।

অনেক সময় এও হয় যে, যে ছবি একটু উৎসাহ নিয়ে খাটা-খাটনি করলে চলতে পারত, যেহেতু সেটা কিম্ভূতরকমের নতুন ধরনের ছবি, অতএব এটি অচল, অতএব দাও এটাকে যমঘরে, এমন ভাব সে ছবিকে ঠেলে দিলে আঁস্তাকুড়ে। এই একটি লাইন, যেখানে ক্ষতি

বললে বোঝায় সবচেয়ে বেশিরকম লাভ না হওয়া এবং সেটি আজকেই। কাল বলে কোনো বোধও এখানে স্থান পায় না। এই কাগুজে মনোবৃত্তির লীলাভূমিতে শাশ্বত শিল্পে স্বপ্ন-দেখিয়েদের ভারি মুশকিল।

এই সব রেসের ঘোড়া হয়ে যাঁরা দৌড়াচ্ছেন, তাঁদের অবস্থা যে কী, সে কথা আলোচনা করতেই মন ওঠে না।

ছবির জগতের ব্যাবসাদারি ব্যবস্থার কথা নিয়ে বলতে গেলে বিরাট পুঁথি হয়ে পড়বে, যে পুঁথি বেশ বড়ো হবে— রোমাঞ্চ সিরিজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে, সেটা হয়তো কালান্তরে করার ইচ্ছে রইল।

এবার ধরুন আপনাদের দর্শকদের কথা। এইসব ব্যবসাদারদের গোড়া, মানে যাকে বলে খুঁটি তা হচ্ছেন আপনারা। খুঁটির জোরেই ম্যাড়া লড়ে। আপনারা ভালোবাসেন, তাই পান। আপনারা নতুন ধরনের ছবি ভালোবাসেন না। আপনারা ভালোবাসেন একেবারে পরিপূর্ণ শিল্পকর্ম, 'পথের পাঁচালী' যেমন, তেমন শিল্পকর্ম এক যুগে একটিই দেখা দিতে পারে। তা নইলে আপনারা একমাত্র সন্তুষ্ট যে-সবে, সে-সব তুলে আর লাভটা কী হবে। আপনারা 'অপরাজিত'কে গ্রহণ করতে পারেন নি, ক্ষতি শিল্পীর থেকে তো বেশি আপনাদের। দর্শকদের মধ্যে যাঁরা আজ চেতনাসম্পন্ন তাঁরা যদি 'ফিল্ম ক্লাব' করার মাধ্যমেই হোক, আর অন্য যে-কোনো উপায়েই হোক, সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে না পারেন, তা হলে বটতলাই আপনাদের ভালো, রবি ঠাকুর নেই বলে চেঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি আমার সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, ক্ষতি আপনাদের। যারা ছবি করছে, তাদের নয়। তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিবারগত জীবনকে বিপন্ন করছে, তার দ্বারা একটি তীব্র আনন্দ পাচ্ছে, উগ্র তপস্যার আনন্দ। আপনারা সামান্যই পেলেন এবং অচিরে একদম পাবেন না।

অথচ আপনাদের হাতেই সব। আপনারাই সব। আপনাদের রায়ই সব। আপনারা আক্রমণ করুন, আঘাত করুন, কিন্তু বাঁচতে দিন, যদি অবশ্য বাঁচানোর কোনো কারণ আপনারা দেখতে পান। না পেলে তাও চিৎকার করে বলুন। কাগজে চিঠি দেন। পাড়ার মোড়ে জটলা করুন, ক্লাবে গিয়ে চিৎকার করুন। বাংলার মরে যাওয়া সংস্কৃতি আজ এই নতুন মাধ্যমকে প্রাণপণে মরণাপন্নের মতো আঁকড়ে ধরেছে, আপনার প্রমাণ করুন যে এ আপনারা আর চান না মিটে যাক। চুকে যাক। নিশ্চিন্তমনে আমরা সেটা ছবি করি। আর আদুড় গায়ে বসে থেলো হুকোয় তামাক টানি। আজ দিন এসেছে দল বেছে নেবার। আপনারাও একটি বড়ো পাঁচিল। বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো পাঁচিল।

এর পরে আর ধরুন— ধরুন বলে লাভ নেই। আমাদের দেশ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। আমাদের দেশের চাষী দর্শনের কথা বলে, তা মিলবে না বহু দেশেই। আমরা আপনাদের দুঃখকে বড়ো ভালোবাসি। আপনাদের আনন্দকেও। তবু আমরা নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের ছাড়ব না। কিছু একটা জন্মাবেই, থর্‌থর্ করছে আজ ছবির দুনিয়া।

আপনারা আমাদের অনুভব করুন। বুঝুন, আমরা একটি বহতা নদীর মাঝ দিয়ে বইছি। আজ এই মুহূর্তে আমরা যা, তাই আমাদের শেষ পরিণতি নয়। আমরা বাড়ব, আমরা অনেক বড়ো হয়ে অনেকটা ছায়া দেব, শুধু জলসিঞ্চনের অপেক্ষা।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের সামান্যতম ধারণা হয়েছে, আমরা হচ্ছি পেশাদারি ছবি-করিয়ের দল, যাদের ব্যাবসার একটা কঠোর কাঠামোর মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হয়, কমার্শিয়াল ছবি তুলতে হয়।

ফলস্টাফ বলে একটি মহত্তম চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন শেক্‌স্‌পিয়ার, আমরা তারই প্রতিভূ। এই ফলস্টাফ সম্বন্ধে জন পামার নামে এক সমালোচক বড়ো একটি ভালো কথা বলে গেছেন, ফলস্টাফ হচ্ছেন— "The most vital expression in literature of man's determination to triumph over the vile body. He is the image of all mankind as a creation of divine intelligence tied to a belly that has to be fed."

আমাদেরও পেট ভরানোর সমস্যাই মূল সমস্যা। যার জন্যে এত ক্লেদ, এত পাপ।

অথচ মানুষের পেট ভরানো হচ্ছে তার জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে যেদিন আদিম সাম্যের স্তর সে অতিক্রম করেছে। সেই অবস্থায় সে ফিরে যাবে যেদিন আধুনিকতম সাম্য তার জীবন বেষ্টন করবে। মাঝখানেরটা বাস্তবময় দুঃস্বপ্ন।

এই যে একটা ঢাকনার মতো মানুষের সব শুভকে ঢেকে রেখেছে শুধু প্রাণধারণের গ্লানি, সেটা হঠাৎ যেদিন উঠে যাবে, সেদিন হাইড্রোজেন শক্তির পরিব্যাপনের মতো মানুষের ইচ্ছা আর ক্ষমতা ব্যাপ্ত হবে, সেদিন আমরা আর কাঁদুনি গাইতে আসব না। সেদিন যে আসবেই, তার প্রমাণ যে আদিম সাম্যেই রয়ে গেছে। সেদিন সবাই খেতে পেত। তবু এত খেটে নতুনতার নতুন জন্ম হল, তাই না সভ্যতা জন্মাল, তাই না আজ চাঁদের পিঠের আগ্নেয় ধূলিতে মানুষের গুল্‌তির গুলি গিয়ে ঠেকতে পারল!

সেইদিন রাস্তায় এত গুলিও চলবে না, এত মাও কাঁদবে না। আর আমরা চুটিয়ে ছবি করবই। কারণ, বহু পাঁচিল সেদিন ধসে যাবে।

'কোমল গান্ধার' প্রসঙ্গে

'কোমল গান্ধার' নির্মাণকালে কোনো সুনির্দিষ্ট তত্ত্বকে অনুসরণ করা হয় নি। সমস্ত অবরোহী তত্ত্বগুলি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের সুসংবদ্ধ মূল্যায়নের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সে কারণেই সব তত্ত্বই বাস্তবের তুলনায় কম নির্ভরযোগ্য। কোনো পূর্বনির্ধারিত তত্ত্বের আক্ষরিক অনুসরণ সৃষ্টিশীলতার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়। তা ছাড়া বিশিষ্ট শৈল্পিক সমস্যার সম্মুখীন হলে সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভঙ্গি বেছে নেওয়া আদৌ অযৌক্তিক নয়। আর সমস্ত শিল্পরীতিই কার্যকরী, যদি তার সঙ্গে জীবনের যোগ হয় নিবিড়।

একটি বিশেষ বক্তব্যের উপস্থাপন এই ছবির অন্বিষ্ট ; সে বক্তব্যের অবলম্বন, অনেক উপাদানের একত্র সমাবেশ। বক্তব্যের খাতিরে ঘটনাপরম্পরায় সুসজ্জিত কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীবিন্যাসের প্রয়োজন আদৌ অনুভূত হয় নি। কেবল একটি সুপরিচিত ত্রিকোণ কাঠামো অবলম্বিত হয়েছে— রূপকের সাহায্যে বিষয়বস্তুর গভীরে অভিনিবেশের

উদ্দেশ্যে।

'বক্তব্য' কথাটিই সাহিত্যগন্ধী। 'রূপক'ও তাই। আধুনিক কাব্যে এমন-কি নাট্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট ধারাতেও তাদের প্রয়োগ তার উদাহরণস্বরূপ। চলচ্চিত্রশিল্প তথাকথিত 'সাহিত্যিক' উপায় অবলম্বনে নিঃসংকোচ, সে উপায় তির্যক কিংবা সরল যাই হোক।

সমসাময়িক বঙ্গদেশ দেশবিভাগের দায়ভাগে ক্ষতবিক্ষত, অনিশ্চিত স্বাধীনতায় দ্বন্দ্বসংকুল, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শ বিনা বিবেচনায় চাপিয়ে দেবার ফলে অবদমিতচিত্ত (স্বভাবতই ঐক্যাদর্শ বাস্তব জগতের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির পরিপন্থী) আর সেই অবদমনের ফলস্বরূপ পশ্চিমী সভ্যতার রসে পরিপুষ্টচিত্ত জাতীয় নেতাদের চিন্তারাজ্যের দেউলেপনা— ইত্যাকার দেশজ ও আন্তর্জাতিক কারণের ফলশ্রুতিতে দেশের চরম দুর্গতি। এ ছবির লক্ষ্য সেই অধোগমনের, সেই মূলহীনতা ও আশ্রয়হীনতার চিত্রায়ণ। এই বক্তব্যে নির্ভর করে ছবিটি ভাবাবেগের একটি স্তরে উন্নীত। তাতে একটি বিশেষ মনোভঙ্গি প্রতিফলিত।

বিভিন্ন স্তরে জীবনের এই অনিকেত রূপটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলাকে তার বহু পরিচিত জগৎ ঐ আজন্ম বাসভূমি আশ্রম থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিতে হয়েছিল।

বাংলাদেশের শকুন্তলার প্রতিমূর্তি এ ছবির নায়িকা আর একালের যুবচিত্তে যে বিক্ষোভের প্রদাহ, তারই প্রকাশ নায়কের চরিত্রে। সে সম্পূর্ণ সুস্থও নয়, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থও নয়, অবদমিত, কিছুটা বিকারগ্রস্ত।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, দীনমলিন নাট্য আন্দোলন ও দলাদলির প্রায় বাস্তবানুগ চিত্রায়ণ ও তৎসমান্তরাল কৌতুকাবহ প্রেমাখ্যান, এ সমস্তই পরিকল্পিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে মূল পরিকল্পনা অনুসারে— রূপকগুলিকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। একটি বাস্তবধৃত বহুবিষয়সমন্বিত জটিল নকশা (pattern) প্রস্তুত করাই ছিল অভিপ্রেত।

শব্দযোজনার, বিশেষ করে শত শত বছরের পুরোনো লোকগাথা ও আনুষ্ঠানিক সংগীত প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল বাস্তবে নিহিত কোনো সুপ্ত প্রেরণার প্রতি অবিরাম দিগ্‌দর্শন। তা ছাড়া সে-সব গান এদেশের অতীত ও বর্তমান জীবনের মাঝে সেতুস্বরূপ। উপরন্তু এরা ছবিটির ত্রয়ীরূপকের ভাষণও বটে।

প্রথার (convention) জন্মের কারণ সম্ভবত সামাজিক অবদমন। সমষ্টিগত অবচেতনের আদিম তাগিদ ও আর্কিটাইপাল অনুভূতির সঙ্গে তার যোগ নিবিড়। পুরাণের অলৌকিকতা ও প্রতীক প্রথাকে খাদ্য জোগায়। সময় বিশেষে তারা অমার্জিত হতে পারে, কিন্তু প্রতিপাদ্য বক্তব্যকে ধারালো করে তুলবার কাজে তাদের দান অপরিমেয়। তা ছাড়া প্রথা নিকট ভবিতব্য সম্পর্কে আমাদের মনকে সুস্থির রাখে— কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার লোভে মনকে অস্থির করে না। শিল্পভাষার অতিব্যবহৃত কৌশলের স্থান এতে নেই।

এ ছবি উপভোগ করতে হলে মনে হয় সর্বাগ্রে মস্তিষ্কের উত্তেজনা পরিত্যাজ্য এবং কোনো পূর্বনির্দিষ্ট আশা পোষণ না করে মুক্তচিত্ত থাকলে দর্শক এ ছবি দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন। তাই এ ছবির দর্শকদের কাছ থেকে একটি এপিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রার্থনীয়— যে দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে এখনও একটি প্রাণবন্ত ঐতিহ্যরূপে বিরাজমান।

চলচ্চিত্র চিন্তা

[এই নিবন্ধে নিরুপায় ভাবেই কিছু বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ ওদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা এবং অর্থবহতা আছে। তাদের বাংলা পারিভাষিক আনুবাদিক প্রতিশব্দ থাকতে পারে। কিন্তু আমার সেগুলি জানা নেই। বিদেশী শব্দ ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে রাখছি।— লেখক]

চলচ্চিত্রে Archetype বা মৌল প্রতীকের প্রয়োগ কেন এবং কীভাবে— এই সম্পর্কে অনেকে অনেক সময়ে আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন।

এই সম্বন্ধে বিস্তৃত অথবা সম্পূর্ণ আলোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। কিন্তু সেইসঙ্গে কিছু আলোচনার সূত্রপাত করাটা আমি উত্তরোত্তর জরুরি মনে করছি। এই আলোচনা হবে নিতান্তই আমার চিন্তা, অভিজ্ঞতা এবং কর্মভিত্তিক। কারণ, এই যে বহু ব্যাপক বিষয়, এই

নিয়ে দিনের পর দিন নতুনতর গবেষণা এগিয়ে চলেছে। আধুনিকতম চিন্তাধারার সঙ্গে আমার পক্ষে সব সময় যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। আমি চেষ্টা করব আমার নিজের কাজের মধ্যে যেটুকু ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছি তারই একটা খতিয়ান দিতে।

Comparative Mythology বা "তুলনামূলক পুরাণতত্ত্ব" বলে বিজ্ঞানটি ক্রমশই একটি বিচিত্র ঘটনাকে উদ্ভাসিত করে তুলছে। বিশেষ করে C. G. Jung সাহেব যখন কতকগুলো সূত্র তুলে ধরলেন, এক নতুন আলোকপাত হল মানুষের এবং প্রাণের ইতিহাস ও প্রাক্ ইতিহাসের ওপর Collective unconscious, যৌথ অবচেতনা ব্যাপারটি প্রকাশ করল এই কথা যে আমরা আমাদের মাথার মধ্যে বহন করে চলেছি বিচিত্র সব চিত্র যাদের জড় শুধু মানুষের মানুষ হবার পর থেকেই নয়, তারও আগেকার কালে বিধৃত। এই কথা জানা গেল যে, বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে কতকগুলো মূলতম archetype পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। বিভিন্ন মানব সভ্যতার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখি সেই একই complex, জীবনচিত্র, কী ভাবে Archetypal image বা মৌলপ্রতিমার মধ্যে দিয়ে Symbol অর্থাৎ প্রতীকে পরিণত হতে থাকে।

মানুষের গভীরতম এবং সবচেয়ে মৌলিক যা কিছু অনুভূতি তাদের সকলেরই উৎস সেইখানে। Symbol-এর প্রকাশের পার্থক্যের মধ্যে দিয়েও বৈজ্ঞানিক ধরে ফেলতে পারেন সেই সূত্র বা এই সমস্ত পার্থক্যকে পর্যবসিত করে এক একীকরণে। প্রাচীন এবং মৃত সুমেরীয় সভ্যতার যে Gilgamesh epic আর ১৯৩০ সালের পরেকার জার্মান যৌবশক্তির সামনে যে হিটলার image— দুটোই কিন্তু সেই একই power complex-এর projection শক্তিপূজার প্রকাশ— যদিও বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন ভঙ্গির।

Great Mother image (অবশ্য এই শব্দটির জন্যে আমরা কবি ইয়েট্সের কাছে কৃতজ্ঞ ; তিনি এটিকে ব্যবহার করেছিলেন সর্বপ্রথম, সেই ১৮৯০ সালের কাছাকাছি), "মহীয়সী মাতা" প্রতিমার যে ব্যাপকতা তা আমরা এখন জানতে পারি Erich Neumann-এর মহামূল্যবান বইটি পড়ে। অথচ এই "মহীয়সী মাতা", তার যে দুই রূপ,

বরাভয় এবং ভয়ংকরী (the benevolent and the terrible aspects) এদের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সেই আদিকাল থেকে। এবং আমাদের পুরাণ, আমাদের মহাকাব্য, আমাদের শাস্ত্র ও আমাদের লোককথা, তার প্রতি স্তরে স্তরে এই মৌল প্রতীকটি আমাদের জড়িয়ে রেখেছে।

এই যে যৌথ অবচেতনার সর্বব্যাপী শাসন, আমাদের আচারে ব্যবহারে চিন্তায় বাক্যে, ধর্মে কর্মে এবং ভালোলাগা এবং না ভালো লাগায়— অবাধে রাজত্ব চালিয়ে চলেছে। এই কথাটি আজকে নব মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল। মানুষের শেষ পুঁজি যা, তাই হচ্ছে গোটা মানুষের অস্তিত্বের নির্যাস। এবং সে পুঁজি সব সভ্যতার সব জাতির পক্ষে একই।

এখন কথা আসে, চলচ্চিত্রে এই কথাগুলো গভীর ভাবে ভাবার কী প্রয়োজন ছিল।

এটা চলচ্চিত্রের কথা নয়, কথা সর্বশিল্পের। আজ পর্যন্ত যত মহৎ শিল্প রচনা হয়েছে তারা সবাই অনির্বচনীয়কে, অবাঙ্‌মানসগোচরকে উপলব্ধি করেছে, অর্জন করেছে যখনই এই সমীকরণে পৌঁছতে পেরেছে। এর ভূরি ভূরি প্রমাণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট নাই বা হলাম। জানতে হোক, অজান্তে হোক মানুষের সমস্ত শিল্পসৃষ্টির যে উপাসনা, তার শেষ এইখানে।

চলচ্চিত্রের এই সমস্যার মোকাবিলা করা এবং আত্মীকরণ করা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। এবং আজ পর্যন্ত যা-কিছু কালের ঘরে জমার মতো মাল ছবি থেকে বেরিয়েছে, এই পথ দিয়েই তারা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ভূরি ভূরি প্রমাণ— কিন্তু বোধহয় এখানে তা স্বতঃপ্রকাশ এবং তার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র হবে।

আমার ছবিতে আমি বুঁদ হয়ে এ ধরনের ঐতিহ্যের মধ্যে হারিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। আত্মসচেতন ভাবে কোনো image-কে, প্রতিমাকে, তার যুক্তিযুক্ত শেষ পরিণতি পর্যন্ত নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মৌলপ্রতীক হয় না— বড়জোর একটা Allegory বা রূপকে পর্যবসিত হয়, তাই সেখানেই শিল্পী তাঁর প্রয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন সেখানেই তিনি ব্যর্থ। যেখানে অনুষঙ্গের ধারায় কতকগুলি প্রতিমা অনিবার্যভাবে ভেসে আসতে থাকে এবং প্রতীকে পরিণত হতে হতে কখন inconsequential হয়ে অনুচ্চার প্রচ্ছন্নতায় চারিয়ে যায়— সেখানেই Archetypal force, মৌল প্রতীকের প্রবল শক্তি জন্মগ্রহণ করে। সব জিনিস যেখানে কার্যকারণের বাঁধা ছকে ফেলা সেখানে primordial images, আদিম প্রতিমা খেলা করতে পারে না। এইখানে স্বপ্নের সঙ্গে ব্যাপারটির বেজায় মিল। আর স্বপ্ন ব্যাপারটি নিজেই archetypal image-এর একেবারে খাস লীলাভূমি।

ওপরের কথা কয়টি মনে রেখে আমি ভাববার চেষ্টা করব কীভাবে আমার নিজের ছবিগুলোর মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা আমাকে নিয়ে গেছে। এখন ঘটনাগুলো অতীত, হয়তো তাই খানিকটা স্পষ্টভাবে ব্যাপারটাকে কাটা-ছেঁড়া করতে পারি। জানি না কত দূর সত্যে উপনীত হতে পারব।

ধরা যাক 'অযান্ত্রিক'। আমাকে অনেক গাল খেতে হয়েছে আদিবাসী ওরাওঁদের নাচের দৃশ্য অসংযতভাবে বড়ো হয়ে গিয়েছিল বলে। কিন্তু জানেন, আমার কাছে কখনো লাগে নি।

আমার যে protagonist, বিমল, তাকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পারেন, আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ এক জায়গাতে এই তিনই এক। সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রাণ আবেগ করার প্রবণতা। এবং এটি একটি Archetypal reaction, আদিম প্রতিক্রিয়া। শিশুর যে-কোনো অসাড় বস্তু দেখে জুজু কল্পনা করা, পাগলের মেঘ দেখে খেপে ওঠা এবং অনাহত আদিবাসীর প্রথম রেলগাড়ি দেখে তাকে দেবতা কল্পনা করা— একেবারে একই প্রক্রিয়া।

যে নৃত্যগীতাদির অনুষ্ঠান আমি অযান্ত্রিকে দেখিয়েছি তাতে— 'কোহা বেঙ্গা', 'খাতুরা', 'চালি বেচনা', 'ঝুমের', 'লুঝরি' ইত্যাদি বহু সাংকেতিক নৃত্যের সমাবেশে মহাযাত্রা দৃশ্য সন্নিবিষ্ট জন্ম, শিকারে যাওয়া, বিবাহ, মৃত্যু, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা এবং নবজন্ম— এই সমস্ত cycleটা।

অযান্ত্রিকের main theme মৌল উপজীব্য ছিল এইটাই ; যাকে আমরা the law of life, জীবনের নিয়ম বলতে পারি। পাগলের নতুন গামলা পেয়ে পুরোনোটিকে ভুলে যাওয়ার সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য এবং সর্বশেষে এক শিশুর হাতে জগদ্দলের ক্রেংকার ধ্বনি, যাতে বিমলকে উপলব্ধির হাসিতে ভুলিয়ে দিয়েছিল— এগুলোতে সেই কথাই প্রকাশ করছে। এ যেন variation on a minor scale of the main theme, a sort of echo, যা যে-কোনো symphonic structure-এর প্রাণবস্তু।

আমার ভুল হয়েছিল, সর্বজনগ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে দিয়ে ব্যাপারটিকে টেনে আনতে পারি নি। কিন্তু উপায়ও ছিল না— বিষয়বস্তু এবং পটভূমিকার জন্যে। কাজেই esoteric হয়ে থাকতে হল, সাধারণ-গ্রাহ্য হওয়া গেল না।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে'তে তাই আমি এ সবের ধার কাছ দিয়েও যাই নি।

তার পরে আসে 'মেঘে ঢাকা তারা', এখানে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক। কারণ একটা universal theme নিয়ে আমি কাজ করছি এবং নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলার চেষ্টা করছি আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে।

গত সাত-আটশো বছরের বাংলা দেশে একটা বড়ো মজার ব্যাপার গড়ে উঠেছিল যা একেবারেই বাঙালি। স্মার্ত প্রভাবপুষ্ট বাঙালি সমাজ গৌরীদানেতে পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই অষ্টম বর্ষীয়া শিশু খেলার আঙিনা ছেড়ে অজানা গাঁয়ের অজানা বাড়িতে গিয়ে চারিপাশের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখগুলো দেখে বাড়তি ভয় পেত, বড়োই তার নিজের বাড়ির জন্যে মন-কেমন করত।

এই ব্যথা আমাদের লোক-কথায় শাশ্বত কালের জন্যে বিধৃত হয়ে আছে। এই কান্না ঝরছে আমাদের আগমনী বিজয়াতে। তাই দুর্গা আমাদের মেয়ে, তাই আমাদের শরৎকাল বড়ো মন-কেমন-করা।

Great Mother archetype-এর এই বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ।

এই ছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'-র মূলতম প্রয়োজন। আরও বহু কথা হয়তো এসে গেছে ; হয়তো আধুনিক জীবনের বহু পাপের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ আছে। কিন্তু ছবিটির সমৃদ্ধি ঐখানে।

তাই আমার নীতার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর দিন। তাই যক্ষ্মার আবিষ্কারের সময়

মেনকার বিজয়ার বিলাপোক্তি শোনা যায় 'আয় গো উমা কোলে লই'। নীতা মহাকাল পাহাড়কে জীবনভোর দেখতে চায়, দেখে তখনই যখন মহামিলন ঘনিয়ে আসে, মহাকালরূপী সংহারদেব তাকে আলিঙ্গন দেন সেই পরম অবলুপ্তিতে।

এ নিয়ে আমার থেকে ভালোভাবে বলবার লোক আছেন। আমি খালি অস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু দিলাম।

'কোমল গান্ধার'। এখানে আমার সমস্যা কাহিনীর তিন স্তরে বিচরণ। আমি অনসূয়ার দ্বিধাবিভক্ত মন, বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং দ্বিধা-বিভক্ত বাংলা দেশের মর্মবেদনা, তিনটিকেই একত্রে টানতে চেয়েছিলাম। শব্দের দিক থেকে বহুশত শতাব্দীর সুর কথাকে মিলিয়ে ছবির ওপরে নতুন দ্যোতনা অভিনিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলাম।

Archetypally, এদের বিরোধী হচ্ছে বিবাহ, মিলন।

"আমের তলায় ঝামুরঝুমুর কলাতলায় বিয়া। / আইলেনগো সোন্দরীর জামাই মটুক মাথায় দিয়া। / মিস্ত্রী বাজাইছে পীড়ি চাইর কোনা তুলিয়া। / ব্রাহ্মণে চিত্রাইছে পীড়ি মধ্যে সোনা দিয়া। / আইজ হইবো সীতার বিয়া।" এই গানগুলির ব্যবহারের পিছনে একটি চিন্তার্থ ছিল তা হচ্ছে মিলনের ভাবখানি, যা অবশ্যম্ভাবী। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে' রবি ঠাকুর বলে গেছেন। বিষ্ণু দে তাকে নিয়ে এগিয়ে গেছেন বাংলা দেশেতে। আমি সেইখান থেকে শুরু করেছিলাম।

এই ছবিতে আমি বত্তিচেলি থেকে দেগাস্ পর্যন্ত আমার সেই মুখটাকে খুঁজে ফিরেছি। সেই 'flushed at same time warm' মুখটি।

Achetypal image অনেক সময় শুধু একটি ছবির একক অস্তিত্বেই ব্যাপারটিকে জানান দিয়ে দিতে পারে।

এর পর যে ছবিটি আমি করেছি সেটি এখনও জনসাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি। পরে দেখবেন, একটি শিশু মেয়ের, তার দ্যোতনাময় নাম হচ্ছে সীতা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক প্রলয় ক্ষেত্রের মধ্যে পরমানন্দে হাততালি দিয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল, কালীমূর্তি,— the terrible mother। মেয়েটি গেল ভয় খেয়ে। এবং পরে প্রকাশ পেল ওটি ছিল একটি বহুরূপী। যে ওকে মোটেই ভয় দেখাতে চায় ন। শুধু ছোট্ট দিদিমণিটি সামনে পড়ে গিয়েছিল! আমার কেমন যেন মনে হয়, আমরাও সামনে পড়ে গিয়েছি। সুদুর অতীত থেকে যে archetypal imge আমাদের haunt করছে সে আজকে দৃঢ় পায়ে সারা জগতে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, তার নাম Hydrogen bomb, তার নাম Strategic Air Command, তার নাম হয়তো বা De Galle হয়তো বা Adeneur হয়তো বা উল্লেখ করা চলে না এমন কোনো নাম। পরম বিধ্বংসী এই যে সংহার শক্তি, আমরা ঐ ছোট্ট সীতার মতন হয়তো তার সামনেই পড়ে গেছি। ছবিটা তোলার সময় আমার মাথায় বোধহয় এ-সব কিছুই আসে নি। তখন হয়তো খালি মনে হয়েছিল যে এক মহাপ্রলয় পর্বের মূক সাক্ষীর ওপর দাঁড়িয়ে এত আনন্দ ভালো না। এত সরলতা ভালো না। ধাক্কা দরকার।

এখন হয়তো নানা মানে আরোপ করছি।

কিন্তু archetypal propounding ভীষণ ভাবেই দরকার মনে করি বলেই এই

image-গুলো আসে। হয়তো তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা অথবা তার শিল্পগত উৎকর্ষে উন্নীত হওয়া সব সময় হয়ে ওঠে না। তবু চেষ্টা করি।

মানবসমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, ছবি-করা ও আমার প্রচেষ্টা

সব শিল্পকর্মেই বিভিন্ন স্তরে রস সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অধিকারী ভেদে বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষ রস গ্রহণ করে থাকে।

যেমন ধরুন ছবিতে। প্রাথমিক স্তরে একটা টানা গল্প হয়তো থাকে— হাসিকান্না, সুখদুঃখ দিয়ে বিচিত্র জীবনের নকশা আঁকা থাকে। একটু গভীর স্তরে প্রবেশ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক, সামাজিক দ্যোতনাগুলি খেলা করছে। আরও গভীরে প্রবেশ করে যাঁর মন তিনি দেখেন দর্শনগত ও শিল্পীর আত্মচেতনা অনুসারে দিঙ্‌নির্দেশগত সংকেতগুলি। তারও গভীরে তলিয়ে যিনি যান, তিনি যে মুহূর্তগত অনুভূতির আস্বাদন লাভ করেন, তাকে কথা দিয়ে ধরা যায় না। সেই মুহূর্তগুলিতে তিনি অজ্ঞেয় কিছু-একটার দোরগোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হন।

এই সবকটি স্তরের রস আস্বাদন করা সকলের পক্ষে সমানভাবে সম্ভবপর নয়, এবং সেটা আশাও করা যায় না। যার যে স্তরে বিচরণ, তিনি সেই স্তরেই আনন্দ পাবেন, এটাই কাম্য। কিন্তু সত্যিকারের মহৎ শিল্প এর সবকটা স্তরকেই ছুঁয়ে যায়, এটা হচ্ছে মহৎ শিল্পের প্রাথমিক শর্ত।

এইখানটিতে পুজো-আর্চার সঙ্গে ব্যাপারটির বেজায় মিল। এর প্রাথমিক স্তরে আছে দেবতার সঙ্গে সাংসারিকের লেনদেনের কারবার ; একেবারে গভীরে গিয়ে সেই অনির্বচনীয়।

এই গভীরতম দিকটি, এর স্বরূপ বুঝতে comparative mythology আমাদের প্রচুর সাহায্য করে। শুধু সিনেমার নয়, সর্বকালের সব শিল্পেই।

আমরা নব মনস্তাত্ত্বিকদের পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গবেষণা থেকে শিল্প বিচারের কতকগুলো মূলসূত্র পাই, যাকেই Comparative mythology আমাদের সামনে illustrate করে।

যেমন ধরুন archetype ব্যাপারটি। মানুষের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার আগের থেকেই বিধৃত হয়ে আছে social collective unconscious অর্থাৎ মানবজাতির যৌথ অবচেতন স্মৃতির ভাণ্ডার। মানুষের যা-কিছু গভীরতম অনুভূতি, সবেরই উৎস এইখানে। এবং কিছু কিছু মৌল প্রতীক (archetype), বিভিন্ন ঘটনার প্রতি মানুষের যে-প্রতিক্রিয়া, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের যে প্রতিক্রিয়া তার বেশির ভাগেরই মূল এইখানে। এবং এই archetype সব সময়েই image-এর মধ্যে দিয়ে symbol হয়ে দেখা

দেয়। কথাটা খুবই জটিল এবং এর ব্যাখ্যা আমার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, বিশেষত এত ছোটো নিবন্ধে।

তবে কিছু উদাহরণ দিলে হয়তো ব্যাপারটা খানিকটা পরিষ্কার হবে। মানুষের যে-কোনো সমাজের যে-কোনো মূল্য আরোপকেই দেখানো যায় শেষ অবধি এই mythical values-এর প্রকাশরূপে। যেমন ধরুন, পোলিনেশিয়ার কোনো কোনো দ্বীপের অধিবাসীদের barter হচ্ছে (অর্থাৎ টাকার বদলে যা ব্যবহৃত হয়) শুয়োর। তার কারণ, তাদের সমস্ত পৌরাণিক উপকথাতেই শুয়োর হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র জন্তু। কারণ, পৌরাণিক উপকথাগত বিচিত্র কার্যকারণ পরম্পরা অনুসারে ওদের কাছে শুয়োর হচ্ছে পৃথিবীতে চন্দ্রের প্রতীক। এবং চাঁদ হচ্ছে ওদের সমস্ত জীবনযাত্রার খুঁটি।

এটা শুনতে যতটা আজগুবি লাগছে, ব্যাপারটা কিন্তু ততটা আজগুবি নয়। শুয়োর থেকে সোনার কি কোনো বেশি মূল্য আছে? সোনা ধাতু হিসেবে বিশেষ কোনো কাজেরই নয়। একমাত্র তার টেঁকবার ক্ষমতা খুব বেশি। কিন্তু ওর থেকেও durable এবং সহজপ্রাপ্য ধাতু আছে।

কিন্তু সোনা যে ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতাতে এই স্থান অধিকার করেছে তার কারণ পৌরাণিক উপকথাগতভাবে সোনা পৃথিবীতে সূর্যের প্রতীক। এবং সূর্য সভ্যতাগুলির প্রাণকেন্দ্ররূপ।

Mythology সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা এই সুযোগে করে রাখছি।

Myth, and therefore civilisation is a poetic, supranormal image, conceived, like all poetry, in depth, but susceptible of interpretation on various levels. The shallowest minds see in it the local scenery, the deepest, the foreground of the void...

—Joseph Campbell : *The Masks of God*

এবং এই mythology দেখায় যে, সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস দুই রকম মানবচেতনার সংঘর্ষের ইতিহাস। এক হচ্ছে কর্মযোগীদের চেতনা, আর এক ভাবুকদের চেতনা। এই ভাবুকই কবি, শিল্পী, Shaman, medicine man, ঋষি এবং মন্ত্রদ্রষ্টা।

The two types of minds, thus, are complementary, the tough-minded, representing the inert-reactionary and the tender-minded, the living progressive impulse—respectively, attachment to the local and timely and the impulse to the timeless universal. In human history the two have faced each other in dialogue since the beginning, and the effect has been that actual progress and process from lesser to greater horizons, simple to complex organisation, slight to rich patterns of the artwork which is civilisation in its flowering in time. -*Ibid.*

এই tender-minded-রাই অশান্ত, চঞ্চল এবং এদের মধ্যেই archetype দ্যুতিময়ভাবে খেলা করতে থাকে। অর্থাৎ প্রকাশমান হয়। যেমন ধরুন-না— এই archetypeটি : প্রথম মানুষের যে-শিল্পকলার নিদর্শন আমরা পাই, তা হচ্ছে প্যালিওলিথিক যুগের, স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী পিরেনিজ পর্বতমালার গভীর গুহাগুলিতে, নগ্ন মাতৃকামূর্তি। এবং এই Great mother সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির চেতনায় আজও haunt করছে। এর দুই রূপ— এক হচ্ছে বরাভয়, Sophia, আর এক হচ্ছে ত্রাসদাত্রী

কালী, চণ্ডীর রূপ। আমাদের পুরাণে এই দেবীকে একত্রে দুই রূপে কল্পনা করা হয়েছে, 'দেবীসূক্ত'। এবং আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে এই মাতৃভাবরূপী archetypeটি।

বাংলাদেশের সমস্ত আগমনী বিজয়ার গান, লোককথার সমস্ত গভীর দিকগুলো এই সাক্ষ্যই বহন করছে।

এই ভূমিকাটুকুর দরকার ছিল এইজন্যে যে, ছবি করার পদ্ধতিতে এই গোটা ব্যাপারটা ভীষণভাবে এসে পড়ে। এবং এটা হচ্ছে ছবির সর্বভারতীয় স্তর, [illegible]নসিক নিক্তিতে কোনো ছবির চূড়ান্ত বিচার করতে হবে। সব শিল্পেই অতীতে এ-বিচার জ্ঞাতসারে হয়ে গেছে এবং কালের ঘরে সেই শিল্পকর্মই টিকে গেছে যা এই বিচারে পার পেয়েছে। Shakespeare সাহেবকে নিয়ে ওদেশের পণ্ডিতেরা এখন দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, সভ্যতার যে-কোনো স্তরের মহৎ শিল্পীর কাজের মধ্যে কত বড়ো স্থান এই অনির্বচনীয় ব্যাপারটি অধিকার করে আছে।

Dolce Vita-র চূড়ান্ত সাফল্য কোথায়? Roman Catholic culture complex-এর জড় ধরে নাড়া দিতে গিয়ে Fellini বারে বারেই Primordial archetype-এর সম্মুখীন হয়েছেন। তারা যেমন সহজে এসেছে, তেমনি গেছে, কিন্তু মনের গভীরকে একবার নাড়া দিয়ে গেছে। এবং তার রেশের অনুরণন চলেছে অনেককাল ধবে মনের মধ্যে। 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ সিকোয়েন্সে দু-একটি জায়গায় বুড়ি গ্রামবাংলার আত্মারূপে প্রতিভাত হতে পেরেছিল, কারণ, তার image-এর মধ্যে সেই force জন্মগ্রহণ করেছিল। এইজন্যেই ইন্দির ঠাকরুণকে কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয়। নাজারিনে ওই archetypal Itinerant priest এক-একটা জায়গায় এমন stature গ্রহণ করেছিল যেখানে তাকে আর-এক যীশুখৃস্ট বলে মনে হয়েছিল।

এরকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। যেমন, চ্যাপলিন সাহেব। তিনি মূর্তিমান mythology। তিনি কোনো দেশের নাগরিক নন। তাঁর দুর্বল নিষ্পেষিত অসহায় চেহারার মধ্যে সমস্ত জীবনের নির্যাসটুকু ভরে রয়েছে। মানুষের সভ্যতা যেদিন সভ্যতা হল, অর্থাৎ যেদিন শ্রেণীর জন্ম হল, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেণীসমাজের সমস্ত ব্যথার, সমস্ত বঞ্চনার প্রতিভূ হচ্ছে ঐ ছোট্টখাট্ট লোকটি।

আমার ছবিতেও আমি এই কথাগুলি মনে রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের জাতীয় culture complex যেভাবে constellate করেছে তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার চেষ্টা আমার সব ছবিতেই করেছি ; যার ফলে হয়তো সব সময় সহজবোধ্য থাকতে পারি নি, শুধু ওদেশে নয়, এদেশেও ; তার কারণ আমার অক্ষমতা ছাড়াও আর-একটা আছে। সেটা হচ্ছে— আমাদের দেশ, বিশেষ করে তার মুখর অংশ, খুব সহজেই এই যুগে শেকড় হারিয়েছে। এটা একটা অত্যন্ত তিক্ত বাস্তব ঘটনা। এই শেকড়হীন ভদ্রশ্রেণী কোনো অবলম্বনই এখনও ধরে উঠতে পারে নি। আর. অনেক মারাত্মক ঘটনাই ঘটছে, তার মধ্যে আমার ব্যর্থতা অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা মাত্র।

আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আমাদের ঐতিহ্যের মধ্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমরা যদি আবার অনুপ্রবেশ না করি তা হলে কোনো জাতীয় শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে

না। ছবি তো নয়ই। ছবি নিয়ে ছেলেখেলা করা আর বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ, ছবির একটা বিরাট সৃষ্টিশীল ভূমিকা এদেশে অচিরেই আসতে পারে।

উপরোক্ত ঘটনাটি সম্পর্কে তীব্রভাবে অবহিত আছি বলে আমার ছবি করার মধ্যে একটা ঝোঁক গোড়া থেকেই আছে।

ধরুন, 'অযান্ত্রিক'। বিমল চরিত্রটি archetypal। বুলাকি পাগল তার absurd extension এবং নৃত্যপরায়ণ আদিবাসী ওরাওঁরা তার sublime extreme। পিয়ারা সিং হচ্ছে toughminded as opposed to tender-mindeness of বিমল। কাদা-ছোঁড়া বাচ্চার দল বিমলের আর-একটা রূপক এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি-জীবনের নিষ্ঠুরতার প্রতীক।

তাই তাদের সবার সিকোয়েন্সগুলি আমি বেশি বেশি করে রেখেছি, সমস্ত নকশাটাকে গোটাভাবে ধরার জন্যে। আদিবাসী গানগুলো হিসেব করে ব্যবহৃত, যদিও তাদের মানে এখানে বোধগম্য হল না। এইজন্যে আমার বহু গাল খেতে হয়েছে।

'মেঘে ঢাকা তারা'। উমার symbologyটা এখানে খুবই পরিষ্কার। নীতা আজ পর্যন্ত আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়। তাকে আমি কল্পনা করেছি শত শত বছরের বাঙালি ঘরের গৌরীদান-দেওয়া মেয়ের প্রতীকরূপে। তার জন্মদিন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোতে। তার পাহাড় অর্থাৎ মহাকালের সঙ্গে মিলন হয় মৃত্যুতে। যখন বিদায়ের প্রথম ইঙ্গিত আসে যক্ষ্মার প্রথম আভাসে, তখন কারা যেন বিনিয়ে বিনিয়ে মেনকার বিজয়ার বিলাপ গাইতে থাকে। অবলুপ্তির আগের মুহূর্তের যে আলোকময় পারিপার্শ্বিক তার স্বপ্ন দেখে নীতা, ছোটোবেলায় পাহাড়ে চড়ে সূর্যোদয় দেখার স্মৃতির মধ্য দিয়ে।

এবং বিবেকরূপী বংশীমুদি তাই বলে : শান্ত মেয়ে, ওর কি অত চাপ সাজে?

'কোমল গান্ধার'। শকুন্তলা বাংলাদেশে পরিণত হয় আমাব কাছে। রবিঠাকুরের সেই আশ্চর্যসুন্দর প্রবন্ধটি— শকুন্তলা এবং মিরান্ডার অপূর্ব তুলনা যেখানে রয়েছে, সেটি আমাকে প্রভাবিত করে। চারপাশের যে দ্বিধা, যে-ভাঙন, আমি জানি— তার মূল হচ্ছে ভাঙা বাংলা। পূর্ববাংলার লোক বলে এ কথা মনে করি না। গোটা বাংলার ঐতিহ্যটা আয়ত্ত করার চেষ্টা করি বলেই এ কথা জানি যে, দুই বাংলায় মিলন অবশ্যম্ভাবী। তার রাজনৈতিক তাৎপর্য আমার হিসেব করার কথা নয় ; কিন্তু সাংস্কৃতিক মূল্য আমার কাছে অবধারিত।

তাই কোমল গান্ধারের মূল সুর হচ্ছে মিলনের। স্তরের ওপর স্তর দিয়ে, রূপকের ওপর রূপক চাপিয়ে, বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যদি কোথাও সেই জীবনসত্যটিকে ছুঁতে পারি, সেই চেষ্টাই করেছিলাম।

এর পরে যে ছবিটি করেছি সেটি আজও লোকের সামনে আসে নি, এলে আলোচনার সার্থকতা থাকত। তাই ছবিটির মূল বক্তব্যের মধ্যে যাচ্ছি না। তবে আলোচনার সূত্র টেনে একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছি।

আমাদের নায়িকা যখন ছোট্টটি, তখন সে একদিন সুবর্ণরেখা নদীর ধারে ঘন শালবনের মধ্যে এক বিরাট ভাঙা airport আবিষ্কার করে। ওর ভারি মজা লাগে। ভাঙা এরোপ্লেনগুলো দেখে ওর শোনা কথা মনে পড়ে, যে ঐগুলোতে চেপে মার্কিন-সাহেবেরা রাত্তির বেলাতে উড়ে গিয়ে সেই কোথায় এক বর্মাদেশ, তার ঘুমিয়ে-থাকা শহরগুলোর ওপর বোমা ফেলে আসত। আর এই যে নীরব ক্লাবঘর, এখানে কত হৈ-চৈই না হত,

সাহেবগুলো বোমা ফেলে এসে এইখানে হৈ-হুল্লোড় করত।

ভারি খুশি হয়ে যাওয়া মেয়েটি হাততালি দিয়ে নেচে নেচে সেই ফাটল-ধরে-যাওয়া সুবিশাল অ্যাসফাল্টের শ্মশানের ওপরে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াল এক বীভৎস কালীমূর্তি। আঁতকে উঠে মেয়েটি আশ্রয় নিলে পথচারী অপর এক চরিত্রের কোলে। তখন জানল কালীমূর্তিওয়ালাটি আসলে এক বহুরূপী, যে শুধু পেটের ভাতের পয়সার জন্যে এইরকম সাজে। সে ছোট্ট দিদিমণিটিকে ভয় দেখাতে চায় নি, শুধু সামনে পড়ে গিয়েছিল।

আমার কেমন মনে হয়, গোটা মানবসভ্যতা ঐ terrible mother-এর archetypal image-এর সামনে পড়ে গেছে। আজ সব সভ্যতার জীবন-মরণ-সমস্যা ঐ confrontation-এর ওপরে।

এর বিশদ ব্যাখ্যা আমার পক্ষে অসম্ভব।

'সুবর্ণরেখা' প্রসঙ্গে

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার 'সুবর্ণরেখা' সম্পর্কে নানারকম মতামত পড়ে আমার নিজের পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করার প্রয়োজন বোধ করছি। যদিও জানি একটি ছবির মধ্যেই নিহিত থাকে পরিচালকের সমস্ত বক্তব্য, তবু দু-একটা কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করছি।

আমার ছবিটি দেখে এবং আমার আগেকার কিছু লেখা পড়ে কোনো কোনো বিদগ্ধ দর্শকের মনে হয়েছে যে, এই ছবিটিতে আমি 'নৈরাশ্যবাদ' প্রচারের চেষ্টা করেছি। 'নৈরাশ্যবাদ' এবং 'অবক্ষয়'।

অবক্ষয় ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। 'অবক্ষয়'-এর শিল্পী হবার কোনো স্পৃহাও আমার নেই। নৈরাশ্যবাদ প্রচারের কোনো অপচেষ্টা মনের মধ্যে আসেই নি আমার। আমার যেটা মনে হয়েছে এবং যা আমি ছবিটির মধ্যে দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, তা হচ্ছে, আজকের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক সংকটের কথা। যে বিশাল সংকট আস্তে আস্তে একটা দানবের রূপ পরিগ্রহ করেছে, '৪৮ সাল থেকে '৬২ সালের পরিধির মধ্যে, সেটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই সংকটের প্রথম বলি হচ্ছে আমাদের বোধশক্তি। সেই শক্তি ক্রমশ অসাড় হয়ে এসেছে আমাদের মধ্যে, আমি সেটাকেই ঘা দিতে চেয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে। বেশ-কিছু সুবিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে আমার নাম একত্র করে জড়িয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হতে দেখি। অন্যান্য পরিচালক যাঁদের নাম আমার সঙ্গে করা হয়ে থাকে তাঁদের কাজ যেটুকু আমি দেখেছি তাতে, আমার মনে হয়েছে, এমনভাবে নাম জড়ানোটা শুধু ভুলই নয়, তাঁদের প্রতি এবং আমার প্রতি অবিচার করাও বটে। তাঁরা ছবি করেন নিশ্চয়ই কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে,

আমি করি আমার বক্তব্য নিয়ে, যেটা একেবারেই আলাদা। ভালো বা খারাপের প্রশ্ন নয়— পার্থক্যের প্রশ্ন। আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার কোনো শিল্পকর্ম করার অধিকার আছে, যদি না আমার দেশের এই সংকটকে কোনো-না-কোনো দিক থেকে উদ্‌ঘাটিত করে তুলতে পারি। আমার বেশিরভাগ ছবিই সেই সংকটকে ধরবার চেষ্টা মাত্র। 'সুবর্ণরেখা' তার ব্যতিক্রম নয়। আমি যেমন উত্তালভাবে স্লোগানপিয়াসী নই, তেমনি আমি শুধুই 'মানবিক সম্পর্কবোধ'-এর প্রকাশের জন্য ছবি করাও ঘৃণ্য বলে মনে করি। আমি মনে করি ওটা চালাকি, আসলে ফাঁকি। আমার সমস্ত ছবি করার মধ্যেই এই চিন্তাধারা প্রবহমান।

প্রত্যক্ষ স্তরে 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে উপস্থাপিত সংকট উদ্বাস্তু সমস্যাকে অবলম্বন করে আছে। কিন্তু 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা' বলতে এ-ছবিতে কেবল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদেরই বোঝাচ্ছে না— ঐ কথাটির সাহায্যে আমি অন্যতর ব্যঞ্জনা দিতে চেয়েছি। আমাদের দিনে আমরা সকলেই জীবনের মূল হারিয়ে বাস্তুহারা হয়ে আছি— এটাও আমার বক্তব্য। 'বাস্তুহারা' কথাটিকে এইভাবে বিশেষ ভৌগোলিক স্তর থেকে সামান্য স্তরে উন্নীত করাই আমার অন্বিষ্ট। ছবিতে হরপ্রসাদের মুখের সংলাপে (আমরা 'বায়ুভূত, নিরালম্ব') কিংবা ছবির প্রথমেই প্রেসে একজন কর্মচারীর মুখে, 'উদ্বাস্তু! কে উদ্বাস্তু নয়?' এই কথায় সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে।

এই যে আমাদের দেশের সংকট, যেটা আমাদের মধ্যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে, তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা আমার পবিত্র কর্তব্য বলে আমার ধারণা। সেই নির্দেশ করতে গিয়ে গল্পের একটা কাঠামো লাগে। এবং সে-কাঠামো আমার কাছে শুধুই কাঠামো, তার থেকে বেশি উত্তেজনাকর কিছু নয়। সেই কাঠামোর অসংগতি নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। তার বেশির ভাগই সত্যি। এবং আমার কোনো অজুহাত নেই সে-সবের প্রতিবাদ করার। তবে একটা কথা শুধু ইঙ্গিতে রেখে যাই— সেটা নিয়ে চিন্তাশীল পাঠক ভেবে দেখতে পারেন। ব্রেশটের 'থ্রিপেনি অপেরা'য় লন্ডন শহরের ছাপ এককোঁটাও পড়ে নি। লন্ডন শহর কীরকম সেটা জানতে ব্রেশট সাহেবের অসুবিধে না হবারই কথা। কিন্তু যান্ত্রিক স্তরে লন্ডন শহর কেমন, তার সুসংগত রূপ কীরকম হবে ইত্যাদি ব্রেশট সাহেব জানার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন নি, এবং তাতে তাঁর বক্তব্য একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে, অনেক সময় যান্ত্রিক স্তরের ঘটনাগুলিকে উপেক্ষা করতে হয়। এবং তাতে মাঝে মাঝে ফলও মেলে।

'সুবর্ণরেখা'য় প্রচুর পরিমাণে coincidence ব্যবহার করা হয়েছে— এ কথা আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়েছে। সত্যিই ছবিটিতে coincidence-এর সংখ্যা ভয়ংকর বেশি। কিন্তু ছবির যেটা প্রধান ঘটনা— ভাই একদিন বেশ্যাবাড়ি যাবে বলে বোনের ঘরে গিয়ে উঠল— সেটাই এত বড়ো coincidence যে, আমি coincidence-টাকেই একটা ফর্ম হিসাবে এ-ছবিতে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছি। গোড়া থেকেই coincidence কোথায় কোথায় আসছে, সেটা দর্শককে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। এরকম করেই একটা formal coincidence-গুলোর মধ্যে অন্য দ্যোতনা ঢুকিয়ে তাদেরকে গর্ভবতী করবার চেষ্টা করেছি।

যেমন ধরুন, ভায়ের বোনের ঘরে যাওয়া, গল্পে যেটা প্রতিপাদ্য বিষয় সেটাকে মনে

রাখলে বুঝতে হবে যে, ঐ ভাই যে-কোনো মেয়ের ঘরেই যেত, সেও কিন্তু ওর বোনই হত। এখানে খালি সেটা যান্ত্রিক স্তরে টেনে এনে দেখানো হয়েছে। এখানেও বিশেষের মধ্যে সামান্যের ব্যঞ্জনা দেওয়াই অন্বিষ্ট।

'সুবর্ণরেখা'-কে আমি ক্রনিক্‌ল্ প্লের ভঙ্গিতে ধরার চেষ্টা করেছি। পরিচয়লিপি থেকেই তার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। এ-ধরনের ক্রনিকলের যা রীতিনীতি হওয়া উচিত সেগুলোকে বজায় রেখে মাঝে মাঝে লেখা এনেছি।

'সুবর্ণরেখা'র সমস্ত স্তর সম্পর্কে সব-কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, কাঠামোটিকে খাড়া করে নিয়ে তার পরে তার মধ্যে আমি ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এর পর অনেক কিছুই এসেছে যা স্বতঃস্ফূর্ত এবং মনের একেবারে গভীর থেকে উৎসারিত। সেখানে আর যাই থাক, নিরাশা নেই। সমস্তক্ষণ সীতার মুখ এবং বিনুর মুখের ব্যবহার, এবং কিছু কিছু ল্যান্ডস্কেপের ব্যবহার, সেদিকেরই ইঙ্গিত দেয় বলে আশা করি। এবং অবক্ষয়ের কথা শুনলে আমার সমস্ত সত্তা প্রতিবাদ করে ওঠে। ঐ মুখগুলো অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি নয়।

এ-ছবি করতে গিয়ে একটা স্তরে রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেটা শুধু শেষে গিয়ে দুটো লাইন জুড়ে দেবার ব্যাপার নয়। গোটা ছবিময় গোড়া থেকে টুকরো টুকরো সংলাপে, কিছু কিছু সংগীতের ব্যবহারে, কিছু কিছু ঘটনার সংস্থাপনে 'শিশুতীর্থ' অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছে। এবং সেইজন্যেই শেষের তিনটি লাইনও অনিবার্য। ওটা নিরাশার নয়, অবক্ষয়েরও নয়।

আর, ভালো করে অনুধাবন করতে বলি ছবিতে ব্যবহৃত বেদ ও উপনিষদের শ্লোকগুলি। অনেক ভেবে, অনেক বাছাই করে ঐ কটিকে আমি গ্রহণ করেছিলাম। তাদের প্রত্যেকটির বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে এবং আমার অর্থ প্রকাশের পক্ষে তারা খুবই সাহায্য করেছে।

'সুবর্ণরেখা' নিয়ে বলা যেতে পারে আরও অনেক কথাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে ওপরের কথা কয়টি একটু মন দিয়ে ভাবলে আর-কিছু বলবার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে।

আমার ছবি

আমরা এক বিড়ম্বিত কালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে সময়ে কাটে সে-সময়ে দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করছেন, কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলা সাহিত্য নববিকশিত, স্কুল-কলেজ ও যুবসমাজে জাতীয়-আন্দোলন পূর্ণ প্রসারী। রূপকথা, পাঁচালি আর বারো মাসের তেরো পার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময় এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, মুসলিম লিগ আর কংগ্রেসরা দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে দিয়ে আদায় করল ভগ্ন স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটল চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারি আর অসৎ রাজনীতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি!

আমি যে-কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারি নি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা : সেই বিভক্ত বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালিকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসেবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারই বলবে।

'মেঘে ঢাকা তারা' আর 'কোমল গান্ধার' করার পর 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে হাত দিই। যত অনায়াসে ঘটনাটিকে ব্যক্ত করলাম, বাস্তবে তা মোটেই ঘটে নি। প্রতিটি ছবি করার পর প্রচণ্ড মানসিক দুশ্চিন্তা, কাঠখড় পোড়ানো আর শরীর ক্ষয়। বাংলাদেশে দিনে দিনে নিরীক্ষামূলক ছবি করার ক্ষেত্র যে, কী-পরিমাণ দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে তা ছবি যাঁরা না করছেন তাঁদের বাইরের থেকে কিছুতে বোঝানো যাবে না। এখন তো অবস্থা আরও সংকটাপন্ন। ছবি করার দাম প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। যে-প্রযোজক এই বাজারে কাউকে দিয়ে তিন-চার-লাখ-টাকা খরচ করে ছবি করাবেন, তিনি, যদি ব্যবসায়িক হিসেবে, ছবি থেকে তাঁর নিয়োজিত অর্থও ফিরে না পান, তবে কদিন আর তাঁর ক্ষতি স্বীকার করে Experimental Film করাতে উৎসাহ থাকবে!

যাই হোক, এ-সব সত্ত্বেও 'কোমল গান্ধার'-এর পর 'সুবর্ণরেখা' ছবি করতে নামি। যে-কটি পাঁচিল অতিক্রম করে এই ছবি করতে হল সে প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যাক।

একদিনের ঘটনার কথা বলি, শুটিং তখন হয়ে গেছে। সুবর্ণরেখা নদীর কাছে আমরা তাঁবু পত্তন করেছি। ছবির ঘটনার ধারাবাহিকতা খুব পরিকল্পিতভাবে মাথায় নেই, বিচ্ছিন্নভাবে আউটডোর-শুটিং করে চলেছি। হঠাৎ একদিন সকালে আমার ছোটোমেয়ে দৌড়ে এসে বললে সে ভীষণ ভয় পেয়েছে, মাঠের পথে একা ছিল, হঠাৎ একজন বহুরূপী এসে উপস্থিত, কালী সেজে তাকে যেন ভয় দেখিয়ে তাড়া করেছে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল ছবির সীতার কথা, আজকের দিনের একটি শিশুর কথা। সেও হয়তো, যেন

ঐভাবেই ; মহাকালের সামনে পড়ে গিয়ে ভয়ে আর্তনাদ করে উঠছে।

আমি খোঁজ করলাম বহুরূপীর। কীভাবে ব্যবহার করব, তার তখনও কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নেই, কিন্তু শুটিং করে নিলাম। পরে, ছবিতে ঘটনাটা দর্শকের কাছে কতটা বুদ্ধিগ্রাহ্য মনে হয়েছে জানি না, তবে আমার কাছে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। মহাকালের প্রসঙ্গকে নানাভাবে ছবিতে টেনে এনে একটি পৌরাণিক ধারা-বিচ্যুত আধুনিক জীবনের শূন্যগর্ভ মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি।

পুরাণকে এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা আমার আগের ছবিতেও আছে। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'য় বা 'কোমল গান্ধার'-এ। উমার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় যে প্রচলিত গীত বাংলাদেশে মুখে মুখে আবৃত্তি হয়, তাকে সংগীতাংশে 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে ব্যবহার করেছি, আর 'কোমল গান্ধার'-এ ছিল বিবাহের গানের প্রাচুর্য। দুই বাংলার মিলন আমার কাম্য তাই মিলনোৎসবের গানে ছবিটি ভরপুর। রেলওয়ে ট্রাকিং-এর ওপর এসে যেখানে ক্যামেরা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, পূর্ববঙ্গে যাওয়ার জন্য যেটা পথ ছিল তা এখন বিচ্ছিন্ন, তা যেন কোন্ এক মুহূর্তে (ছবির শেষদিকে) অনসূয়ার বুকেও আর্তনাদের সুর তোলে।

মহাকালকে এভাবে ব্যবহার করলে কতকগুলো সুবিধা থেকে যায় ; যে-সুবিধাগুলির জন্য শিল্পে mythology-র প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। সুবর্ণরেখার ধারে দেখেছি বিস্তৃত পটভূমি জুড়ে পড়ে আছে এরোড্রোম। সেই এরোড্রোমের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশেহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালক-বালিকা তাদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ প্রাণী দুটি। তারা জানে না, তাদের জীবনে যে-সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ঐরকম আরও কতকগুলো ভগ্ন বিমানপোত। চতুর্দিকের ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ।

'সুবর্ণরেখা' ত্রুটিমুক্ত ছবি নয়। এতে যে কাহিনী নির্বাচন করা হয়েছে তা খুব চড়া সুরের মেলোড্রামা। একটা পর্বের সঙ্গে আর-একটা পর্বকে মিলিয়ে মিলিয়ে এই ছবির কাহিনীটি বিস্তার করেছি, a story of fateful coincidences। এভাবে কাহিনীকে গ্রন্থনা করার উপমা আগের অনেক উপন্যাসে পাওয়া যাবে। যেমন রবিঠাকুরের গোরা বা নৌকাডুবি, কি শেষের কবিতা। যেখানে কাহিনীকে বলে যাওয়াই লেখকের একমাত্র বক্তব্য নয়, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের প্রতিই তাঁর প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ. যেখানে এরূপ মিল, মাঝে মাঝে যা অসম্ভবও মনে হতে পারে, তাও দৃষ্টিকটু মনে হবে না, তবে সব-কিছুর মধ্যে যেন বাস্তবতাটি বজায় থাকে।

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে যদি অভিরাম আর সীতা, হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের সমস্যাকে যথাযথ মূর্ত করে থাকতে পারি তবে অভিরামের মায়ের মৃত্যু, পতিতালয়ে ঈশ্বরের সীতাকে আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনাকে খুব অসম্ভব বলে ঠেকবে না।

বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতোই দশা। আর আমরা অবিভক্তবঙ্গের বাসিন্দেরা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছি।

'সুবর্ণরেখা' নিয়ে এত বক্তৃতামালা এত আলোচনা হয়েছে যে, এর বেশি আর বলার কিছুই নেই। অথচ আশ্চর্য 'কোমল গান্ধার', যেটা আমার মতে আমার সবচেয়ে

ইন্‌টেলেকচুয়াল ছবি সেটা দর্শকেরা খুব স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারল না। আমার মনে হয়, আর বিশ-পঁচিশ বছর পরে হয়তো ঐ ছবির কদর ফিরে আসবে। হয়তো বাঙালির কাছে ঐ সমস্যা এখনও তীব্রমুখী হয়ে তাদের অস্তিত্বকে খুব সংকটাপন্ন করে তোলে নি।

যাই হোক, আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাজ করে যেতে হবে। সাময়িকভাবে কোনো সংকট আচ্ছন্ন করে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপসের পথে টেনে না নিয়ে যায়, অর্থাৎ সংকটের কাছে যেন আমরা বিবেক বুদ্ধি সব-কিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ না করি।

পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক চিত্র এবং আমি

ভারতে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র অধিক নির্মিত হয় নি, যে-কটিই বা হয়েছে, তার অধিকাংশই বাংলায়। কদাচিৎ দু-একটা প্রচেষ্টা হয়েছে অন্য ভাষায়, যেমন কিছুদিন আগে, এবং সেটিই সর্বশেষ, হুসেনের 'শিল্পীর দৃষ্টিতে জগৎ'। কিন্তু এগুলো কি সত্যসত্যই প্রামাণিক চলচ্চিত্রের (যার এখনও কোনো সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি) পর্যায়ে পড়ে?

একমাত্র বাংলা ভাষাতেই কতকগুলো কাহিনীচিত্র প্রস্তুত হয়েছে, যেগুলোকে 'পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অপরাপর ব্যক্তিদের কৃতকর্মের প্রতি মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না, সুতরাং আমি তার থেকে নিবৃত্ত রইলাম। শুধুমাত্র নিজের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলব।

আমার প্রথম চলচ্চিত্র, 'অযান্ত্রিক'কে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র বলা হয়। এটা যে কত দূর সত্য, তা আমি জানি না, তবে আমাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমি কাদের জন্য এই বিশেষ চিত্রটি নির্মাণ করেছি এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমার জবাব ছিল একটাই, আমি নিজের জন্যই করেছি এবং আর কারো কথাই আমার মাথায় ছিল না।

তা বলে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিরা যেন আবার মনে করবেন না, যে আমার শিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাই একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক। আমার মতে কোনো কিছু সৃষ্টির সময়ে, সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, এবং তা যেন সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে থেকে মানুষের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। আমি রজাব ভাদিমকে কখনোই সমর্থন করি না, কারণ তিনি নেপোলিয়নের জীবনী তোলার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাতে তাঁর ইতিহাসের ভূমিকাটি না দেখিয়ে তিনি যে পালঙ্কে নারী উপভোগ করতেন, তার কারুকার্যটিকে কত ভালোভাবে দেখানো যাবে, এইটিই তাঁর মুখ্য আকর্ষণের কারণ। আলাঁ রেনে এবং আলাঁ রব-গ্রিয়ে সম্পর্কেও আমার মত একই। এঁরা পশ্চিমী সভ্যতার অবক্ষয়ী শক্তির প্রতিভূ-স্বরূপ। আমার মতে পরীক্ষামূলক চিত্র নির্মাণে এঁরা অসমর্থ হয়েছেন। 'হিরোসিমা মনামুর' ও 'লাস্ট ইয়ার ইন মারিয়েনবাদ' চিত্র দুটিকে আমি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি নি, আমার কাছে এই দুটিকে অত্যন্ত অন্তঃসারশূন্য,

আড়ম্বরপূর্ণ এক হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছে। পরীক্ষামূলক চিত্র বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে আমি চিত্র দুটিকে গ্রহণ করতে পারি নি।

'পরীক্ষা' বলতে কী বোঝায়— এই বিতর্কিত প্রশ্নটি এই থেকেই উত্থিত হচ্ছে এবং মূল সমস্যাটিও এইখানেই। আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই আপেক্ষিক, তা হলে চলচ্চিত্রের মধ্যে যে পরীক্ষা বা গবেষণা হয় তার সঙ্গে কীসের আপেক্ষিক সম্বন্ধ বিরাজমান?

এই সম্পর্কটি হচ্ছে মানুষ ও তার সমাজের সঙ্গে। শূন্যেতে কোনো পরীক্ষা ঝুলতে পারে না, সুতরাং কারো-না-কারো সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতেই হবে, এবং এই সংশ্লিষ্টতা হচ্ছে— মানুষের সঙ্গে।

ফেলিনির মতো কয়েকজন পশ্চিমী পরিচালকের চলচ্চিত্র আমি দেখেছি। গেরাসিমভ এঁর 'লা দলচে ভিতা' চিত্রটির তীব্র নিন্দাবাদ করেন, কারণ ছবিটি নাকি একজন পয়ঃপ্রণালী-পরিদর্শকের বিবরণী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ফেলিনি যে-সমস্ত মানুষকে তাঁর চারিদিকে যেভাবে দেখেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই সেগুলিকে চিত্রে রূপদান করেছিলেন। আসলে এই চিত্রটি পশ্চিমী মুমূর্ষ সভ্যতার দলিলপত্র।

আমার ছবিগুলিতে আমি যত দূর পেরেছি চেষ্টা করেছি আমার দেশ ও আমার দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনকে চিত্রিত করতে। আমার সাফল্য যত দূরই হোক-না-কেন আমার আন্তরিকতায় কোনো অভাব এতটুকুও ছিল না বলে মনে হয়। কিন্তু শুধু আন্তরিকতা দিয়ে আর কতটুকুই বা এগোনো সম্ভব। আমার প্রচেষ্টাও তো সীমিত, সুতরাং তার বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

আমার 'কোমলগান্ধার' ছবিটি, আমার মনে হয়, এদেশের চলচ্চিত্রে যে-সমস্ত বাধাবিপত্তি আছে, সেগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পেরেছিল। এই ছবিটির যে মূল বক্তব্য এবং সেটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে যেভাবে— সেগুলি বিচার করলে এটিকে একটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে হয়তো।

'সুবর্ণরেখা'— এই চিত্রটির দ্বারা আমি প্রচলিত ধারার উপর সরাসরি আঘাত হানতে চেয়েছিলাম।

এই ছবিটিকে 'মেলোড্রামা' বলা হয়েছে এবং তাতে কিছু ভুল হয় নি। সমালোচকদেব স্মরণে থাকা উচিত ব্রেশ্‌টের কথা। তিনি কিন্তু মূলত বিচিত্র-পরম্পরার উপরে নির্ভর করেছেন, এবং 'বিচ্ছিন্ন অনুভূতি'র একটা ব্যাপার তৈরি করেছিলেন, কথাটা মনে রাখা ভালো।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসাবতা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি আমার পেশার কয়েকজন আহাম্মুকের সঙ্গে ঐ ধরনের কিছু সৃষ্টি করার জন্য ক্ষুদ্র প্রয়াস নিয়েছিলাম। আমার কাছে এটা পরীক্ষামূলক, তবে হয়তো যথার্থভাবে এটি তা না হতেও পারে। আমার এ-বিষয় নিয়ে কোনো কলহে অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা নেই। আজকে আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করব।

'প্রত্যেক শিল্প একমাত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। শুধুমাত্র সত্য দ্বারা শিল্প সৃষ্টি সম্ভব নয় এ কথা সত্যি ; কিন্তু সত্য ব্যতীত শিল্প সম্পূর্ণ হয় না।'— আমরা এটুকু মনে রাখলে ভালো করব।

ভিয়েতনাম নিয়ে যে ছবি করতে চাই

ভিয়েতনাম সম্পর্কে কোনো ছবি করার কথা ভাবা বর্তমান পৃথিবীতে যে-কোনো চলচ্চিত্রকারের পক্ষে চরম দুরূহ ও পরম পবিত্র একটি চিন্তা। হালকাভাবে বা বেশি গভীরে প্রবেশ না করে, অথবা ভিয়েতনাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য না ঘেঁটে, এ-বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়া বাতুলতা অথবা পাপ। এখন সেই পাপটিই আমাকে করতে হচ্ছে।

ভিয়েতনাম সম্পর্কে আমার জ্ঞানের দৌড় খবরের কাগজ, কিছু ছবি এবং কয়েকটি তথ্যপত্রিকার সংবাদ-আলোচনা পর্যন্ত। ভিয়েতনাম কেন, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোথাও আমি কোনো দিন যাই নি। কাজেই ভিয়েতনামের প্রচুব প্রাণশক্তির উৎস কোথায়, সেটা নিয়ে টেবিল-চেয়ারে বসে আলোচনাই করতে পারি, নাড়িটাকে ধরতে পারি না।

তবু এটা কোথায় যেন কীভাবে একটা আভাস পেয়ে গেছি যে, ঘটনাটা ইতিহাসের একটা পাতা ওলটানোর ঘটনা। কেমন করে জানি মনে হচ্ছে, ভিয়েতনাম পৃথিবীটাকে একটা মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

আর-একটা কথা। ছবি করতে গেলে আমাকে তো কলকাতা বা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ থেকেই করতে হবে। এটা আমার কাছে অসুবিধেজনক মনে তো হচ্ছেই না, বরঞ্চ সৃষ্টিশীল শিল্প-রচনার একটা প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ব্যাপারটা সম্ভাবনায় উজ্জ্বল বলেই মনে হচ্ছে। কারণ ভিয়েতনামকে আমি যেটুকু উপলব্ধি করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছে ভিয়েতনামের লড়াই এখানকারও লড়াই। সে লড়াই এখানেও চলছে। আজকের জগতে যেখানে যত কিছু শোষণ, ভিয়েতনাম তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক। প্রতীক বললেও ভুল বলা হবে, তারই ব্যাপকতম ব্যাপ্তি। আমাদের দেশের দুঃখ-কান্নাগুলো ভিয়েতনামের যুদ্ধের সম্প্রসারণ। এই কথাটা মার্কিন শাসকগুলো বোঝে নি, তাই ভিয়েতনাম ওদেরকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

বরঞ্চ বলা চলে, খ্যাপা কুকুর করে দিয়েছে।

শুনেছি সাগরপারের দেশে কিছু কিছু ছবি-করিয়ে ভিয়েতনামের ওপরে ছবি করার পরিকল্পনা করছেন এবং কেউ কেউ করেওছেন। আমি অবশ্য এখানে সেইসব চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের কথা বলছি না, যাঁরা ভিয়েতনামের প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আমি বলছি তাঁদেরই কথা, যাঁরা বহু দূর বিদেশে বসে থেকে নিছক মস্তিষ্ক দিয়ে ভিয়েতনামের সামিল হওয়ার চেষ্টা করছেন। তাঁরা, আমার মতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই ধরনের গোষ্ঠীর দ্বারা হিরোশিমার ওপর তৈরি-একটা ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কথাটা আমার তার থেকেই মনে হয়েছে। এ-ছাড়াও আর-একটা কথা মনে পড়ছে। কোনো এক বিখ্যাত ফরাসি পরিচালক ভিয়েতনামের ওপরে ছবি করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। বেশ কয়েক বছরর আগে এঁকে নেপোলিয়নের জীবনী নিয়ে একটি ছবি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ভদ্রলোক বলেছিলেন— যুদ্ধক্ষেত্রের নেপোলিয়ন নয়, যুদ্ধক্ষেত্রও নয়, যে-কাউচে শুয়ে নেপোলিয়ন নারীসম্ভোগ করতেন— সেইটেই তাঁর কাছে বেশি অর্থবহ এবং শিল্পসম্মত দ্যোতনা হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাঁর ছবি তিনি সেই খাটটি থেকেই শুরু করবেন। এঁদের হাতে ভিয়েতনাম পড়লে কী হবে ভাবতেও আমি শিউরে

উঠেছি।

কারণ ভিয়েতনাম আজকে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে একটা মারাত্মক ব্যাপারও হয়ে উঠেছে— সেটি হচ্ছে ফ্যাশান। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল এখন ভিয়েতনাম নিয়ে নাচানাচি আরম্ভ করেছেন। ভিয়েতনামের রক্তঝরা বুকের কান্না এবং আগুনপোড়া তীব্র প্রতিজ্ঞা তাঁরা ধরতেই পারবেন না। কারণ ঠিক ঐ মার্কিন শাসকগুলোর মতোই ওঁরাও ভিয়েতনামের নাড়ি টিপতে পারবেন না। ইকেবানা বা বিষ্টুপুরের ঘোড়ার মতোই ভিয়েতনাম চর্চা এঁদের 'সর্বাধুনিক' থাকতে সাহায্য করে। এর মধ্যেও তাঁরা তথাকথিত মানবিক সম্পর্কবোধ নিয়ে মেতে ওঠার ভয়ংকর ঝোঁক প্রকট করে তুলতে পারেন। ভগবান এঁদের মঙ্গল করুন।

এইবার আমার ছবি করলে কী ভঙ্গিতে এগোব ; সেটা একটু ভাবা যাক। এটা অবিশ্যি হবে সম্পূর্ণই বিশৃঙ্খল ভাবনা।

কলকাতার বস্তি।

একটা হতকুচ্ছিত ঘর।

একটা মা, রুগ্ণ শিশুর পাশে। বাইরে থেকে একটা গলা। মা-টি উঠে কোণের এক পাত্র থেকে খানিকটা চোলাই মদ নিয়ে বাইরে গেল।

রুগ্ণ শিশুটি কেঁদে উঠল।

বাইরে একটা সদ্যোজ্বালানো উনুনের ধোঁয়া। মদের পাত্র মা একটি লোকের দিকে এগিয়ে দিল।

বাচ্চার কান্না ছাপিয়ে পুলিশের হুইসিল বেজে উঠল। চারপাশ থেকে অনেকগুলো লোক দৌড়ে এসে ঘিরে ফেলল।

পুলিশের হুইসিল...বাচ্চার কান্না...

একটা রকেটের তীব্র স্বরে উঠে যাওয়ার শব্দ।

একটা মার্কিন বোমারু বিমান। শূন্যপথে মাঝখানে দু-ভাগ হয়ে গেছে। এক্ষুনি পড়বে। (অবশ্য স্থিরচিত্রে, কারণ ভিয়েতনামের সত্যিকারের যুদ্ধ আমার সবসময়ই স্থিরচিত্রে আনার ইচ্ছে আছে। তার সঙ্গে ছন্দে ছন্দে দোলায়িত করব জীবন্ত চলন্ত দেশের ছবি।)

এইভাবে আরম্ভ করে আমি দেখিয়ে যেতে চাই আমাদের দেশের সাধারণ দরিদ্রতম মানুষের নিরুপায় অপরাধ, সাধারণত যেগুলোকে চোখ এড়িয়ে গিয়ে আমরা খালি জনসাধারণের সংগ্রামী চেহারাটাকেই কেতাদুরস্ত করে লোকের সামনে উপস্থিত করি। বাস্তবতার সমগ্র চেহারা তা আমি দেখাব— এই সেইসব তথাকথিত অপরাধ, তার নিম্নতম অভিব্যক্তিগুলো আমাদের সংগ্রামী জনতার কঠোর বাস্তব দিক, দেখাব তার কার্য-কারণ সম্পর্ক। ভিয়েতনামের ছবিগুলো তার সঙ্গে ব্যাখ্যা হিসেবে আসবে।

তার পরে চলে যাব একটি অধ্যায়ে, যেখানে পদদলিত মানুষের স্বপ্নকে আমি স্বপ্ন হিসেবেই দেখাব। সেই অধ্যায়টা হবে সম্পূর্ণ সংগীতধর্মী এবং কিছুটা পরিমাণে নৃত্যধর্মীও বটে। সেখানে আমি শুধু বাস্তবতাবাদের কথাই রাখব না। এর সঙ্গে জ্যোতি হিসেবে আসবে ভিয়েতনাম এবং জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের বীর ছেলে-মেয়েদের একটার পর একটা আক্রমণের দৃশ্য। যেন এই স্বপ্নগুলোকেই ওরা মূর্ত করে তুলতে বদ্ধপরিকর। এবং সমস্ত অধ্যায়টা

আমি শেষ করব একটা সাংগীতিক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দৃশ্য দিয়ে যেখানে হাজার হাজার কচি ছেলেমেয়েরা নাচবে। ওদের নাচ আর ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের লাফিয়ে লাফিয়ে এগোনো একই ছন্দে বাঁধা হবে।

এবার আসছি শেষ অধ্যায়ে। এখানে আমি জোর দেব জনতার সংগ্রামী রূপকে তুলে ধরতে। হো-চি মিনের কবিতার অনুবাদ উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকবে, আর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে সংগ্রামী মেহনতি মানুষের উচ্ছল কর্মকাণ্ডের দৃশ্যাবলী বয়ে যাবে। এই উচ্ছলতা আগের অধ্যায়ের স্বপ্ন সম্ভব করার উচ্ছলতা। এইখানে আমি সেই প্রাণস্পন্দনকে ধরতে চেষ্টা করব, যা কিনা শোষকদের কাছে রহস্য। সেই যে জীবনীশক্তি, যা মাটিতে শেকড় গেড়ে রস আহরণ করে ; সেই যে জীবনীশক্তি, যা কঠিন ইস্পাত আর গায়ের ঘামে জন্মগ্রহণ করে ; সেই যে জীবনীশক্তি, যা কিনা ধ্যানের গভীরতায় বিরাজ করে— যেখানে রয়েছে প্রগাঢ় শান্তি— আমি চাইব তাকে ছবিতে মূর্ত করতে।

জানি না ব্যাপারটা ধরতে পারব কি না, তবু চেষ্টা করব।

আমার ছবি শেষ করব এইভাবে :

একটি গুলিবিদ্ধ তরুণ ছেলে। সে ছাত্র হতে পারে, কৃষক হতে পারে। তার আর্তনাদমিশ্রিত উল্লাসের চিৎকার ভেসে আসবে, আর ছেলেটি আছড়ে পড়বে জমির উপরে। মরণের মুখেও সে দুই হাত দিয়ে জমিকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরবে। হাত দুটো পেরিয়ে আমার ক্যামেরা চলে যাবে ওর চাপ চাপ রক্তের ওপরে— ধরণী যা শুষে নিচ্ছে।

ওইখানে জন্মাচ্ছে আর-একটা ভিয়েতনাম। যে ভিয়েতনাম অমর।

আমার ভাবনা

লিয়নটিয়েভ-এর নব্য সাম্রাজ্যবাদের লেখাটা পড়ার আগে আমি সত্যিই কীরকম দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। ঢাকাতে তাঁর লেখা কটা বই পড়ে আমি মোটামুটি একটা ধারণায় আসতে পেরেছি। ব্রহ্মাণ্ড ভাবনা কোনোরকমভাবে আমাকে সংযত করেছে।

এগুলো আমার হাতে আসার আগে আমার শেষ দুটি ছবি মোটামুটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। শিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা যে রাস্তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত প্রচণ্ড দুঃখকর মানসিক ঘটনা ঘটে।

আমার এত বছরের নাটক, লেখা, ছবি ইত্যাদি করতে গিয়ে আমি নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কিছুদিন মাস্টারিও করেছি। এর মধ্যে বহু ছেলেমেয়ের সংস্পর্শে এসেছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ব-স্ব স্থানে আজ প্রতিষ্ঠিত। যার জন্যে আমি গর্বিত। আমি দেখেছি ছবির ক্ষেত্রে ক্লেদাক্ত বিষণ্ণতা। মানুষ যে নামতে নামতে কোথায় পৌঁছয়, এ আমার অভিজ্ঞতার জমা হয়ে আছে। আবার মানুষ যে কত বড়ো হয়, সেও আমার চোখের সামনে দেখা আছে। এখন আমি মোটামুটিভাবে এ-সবগুলোতে খুব দুঃখিত বোধ করি না। কারণ, মানবিক যে জাগ্রত বোধ সেটা সব সময় নিজেকে জাহির করবেই। ফিল্ম তৈরি কিংবা

নাটক কিংবা সাহিত্য সৃষ্টি এই সবগুলোই নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে মানবিক বোধের উপরে।

আমরা ছোটো ছেলে অ আ ক খ শিখি। তখন খুব কষ্ট করে বুঝতে হয় যে অ-টা কীরকম। তারপরে যখন বড়ো হয়ে প্রেমে পড়ি, তখন প্রেমিকাকে চিঠি লেখার সময় অ-আ কি মনে থাকে?

সর্ব শিল্পও তাই। সমস্ত শিল্পে টেকনিক ভালো করে জানতে হবে, কিন্তু সেটা শেখার সময়। তার পরে ভুলে যেতে হবে। শেখাটা খালি ভোলার জন্য। ওটা রক্তের মধ্যে ঢুকে যাবে। সচেতন হয়ে শিল্প করলে শিল্প হয় না। আমি মনে করি শিল্পের, সর্ব শিল্পের এইটাই হচ্ছে গোপন রহস্য।

আমি আমার ছবিতে কী করতে পেরেছি ঠিক জানি না। কিন্তু এই মানসিকতাই আমাকে সব সময় পরিচালিত করেছে। কাজ যেদিন আরম্ভ করেছিলাম, সেদিন আমার প্রথম শিক্ষার উন্মেষ, তখন খালি অ আ ক খ নিয়েই পড়েছিলাম। তার পরে ও-সব ভুলে গেছি। এখন যা আসে, ভেতর থেকে আসে। ভেবেচিন্তে শিল্প হয় না। ওটা প্রাণের থেকে উৎসারিত একটা ব্যাপার। যদি সেটা সত্যি হয়। পৃথিবীতে শাশ্বত সত্য বলে কোনো পদার্থ নেই, যা আছে সেটা হচ্ছে নিজের উপার্জন করা সত্য। তার বিকাশের জন্য প্রতিটি শিল্পী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে কথা বলবেন, এটাই কাম্য।

আমি নাটক করেছি, গল্প-উপন্যাসও লিখেছি। ফিল্ম-টিলিমও করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এই চিন্তা সব সময় মাথায় রেখে। আমি মানুষের চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। সব সময়েই আমার মতে আর-একজনকে মত দিতে হবে, এটা দাসত্ব বলে মনে করি। মতের ফারাক থাকবেই, এবং সেটাই প্রয়োজনীয়।

আমার ফিল্মগুলো সম্পর্কে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই, কারণ আপনারা সেগুলো দেখে নিজেদের মতামত নিজেরাই ঠিক করবেন। বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। আর, এই হচ্ছে মোটামুটি জীবন ও শিল্প সম্পর্কে অভিমত।

অলমতি বিস্তরেণ।

দুই বাংলায় আমার দেখা মানুষ

পূর্ব বাংলায় আমি সম্প্রতি একটা ছবি করেছি। 'তিতাস একটি নদীর নাম'। সেটা করতে গিয়ে— ঢাকা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে আড়িচাঘাট বলে একটা জায়গা আছে— সেখান থেকে লঞ্চ নিয়ে পদ্মা-যমুনার সংগমস্থল পেরিয়ে প্রায় বারো মাইল দূরে আমায় কাজ করতে যেতে হত। তীরেই একটি মুসলমান পল্লী, তার পরে একটি হিন্দু মালো পল্লী। দু-গ্রামেই আমি কাজ করেছি। করেছি প্রায় দশ দিন। যেদিন আমার কাজ শেষ হয়েছে, সেদিন দুপুরবেলায় ঐ হিন্দু গ্রামের মাতব্বর আমায় বলে, "তোকে খেয়ে যেতে হবে।" যদিও লঞ্চে আমার যথেষ্ট খাবার ছিল, তবুও আমি আমার দলের ছেলেমেয়েদের বললাম, "তোরা লঞ্চে যা, আমি খেয়ে আসছি।"

তার পরে ঐ মাতব্বর পিঁড়ি পেতে উঠোনে আমায় খেতে বসাল। ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাঁট আর এইটুকু ছোটো ছোটো কই মাছের বাচ্চা। তার পরে ঘরে পাতা দই। সার্ভ করল তার মেয়ে, ভীষণ ভালো বেসে বেসে। আমি অনেক বড়ো বড়ো হোটেলে খেয়েছি, কিন্তু এমন তৃপ্তি সহকারে খাওয়া ভোলা যায় না। তার পরে আমি জিগ্যেস করলাম, "পদ্মা-যমুনার মোহনায় তোমরা বসে আছ, যেখানে আমারও দেশ যেখানে অঢেল মাছ। সেখানে এইটুকু-টুকু কই, ব্যাপারটা কী?"

সে বলল, "বাবু, তুই বুঝিস না যা মাছ তুলি, সেগুলো গঞ্জে গিয়া বেচি, তবে কেরাসিন পাই, নুন কিনি, তবে ঘর-সংসার চলে। তোরা কি বুঝবি যে আমাদের গাঙ, দুঃখের গাঙ কত গহীন। সেদিন আর নাই, সাড়ে তিন ট্যাহা দিয়া খরিদ করতে হইছে এই কইয়ের বাচ্চা। এই তো আমাগো স্বাধীনতা।"

তার পরে কোনো কথা বলার ক্ষমতা আমার ছিল না। হেঁটে চলে আসছি একা, মুসলমান গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসছি। মাতব্বর তালেব মিএঞা আমাকে ধরেছে, "তুই ওখানে খেলি আজকে, আমার এখানে তোকে কালকে খেতে হবে।" আমি বললাম, "আজকে তো আমি জাহাজ নিয়ে চলে যাব, কারণ আমার কাজ তো এখানে শেষ।" সে বলল, "তুই হালায় যাইতে পারবি না। দ্যাখ, তরে কাউলকা থাকতে হইবো গিয়া।"

তার পর আড়িচাঘাটে ইনস্‌পেকশন বাঙলোতে গিয়ে আমি তখন থাকলাম। ততক্ষণে আমার ক্যামেরাম্যান ঢাকা ঘুরে এসে আমায় বলল, "দাদা, তিনটে শট্ নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের কালকে থাকতেই হবে।" ফলে, আমাকে যেতেই হল এই গ্রামে। এবং সেই মুসলমান মাতব্বর গাণ্ডেপিণ্ডে আমাকে গেলাল।

আমার জীবনের কাজ করতে গিয়ে এই যে মানবিক ব্যাপারটা পেয়েছি, এটা কোনো দাম দিয়ে হয় না। এই যে বিভিন্ন প্রত্যন্তে মানুষের ভালোবাসা, এর কোনো তুলনা আছে বলে আমার মনে হয় না।

আবার বলি, 'যুক্তি, তক্ক, গপ্‌পো' কাজ করার সময় আমি উত্তর ভাগে কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক কৃষক পরিবারের চূড়ান্ত ভাঙা-বাড়ি, তাতে কাজ করেছি। স্বামী-স্ত্রী, আর কেউ নেই। পাশে একটা খাল, একটা ছোট্ট ফালি জমি, সেখানে ওরা ঢেঁড়স উৎপাদন করে। যখন খালে জল আসে তখন কিছু মাছ আসে। ভাগচাষী, প্রায় কাজই পায়

না। এরা সারাদিন কিছুছু খায় না, সন্ধে বেলায় চালের মুখ তো দেখেই না। ভুট্টাও না, মকাইও না, যবারের ছাতু— ঐ একবেলা খেয়ে থাকে। ঐ মাছ যখন ধরে, সেগুলো নিয়ে গিয়ে সোনারপুরে বেচে। তবে কিছু কেরাসিন মেলে, নুনের দামও প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। ঐ টেঁড়স বেচে যখন দুপয়সা বেশি পায়, তখন একটু আচার খরিদ করে আনে। এই যবারের ছাতুর সঙ্গে একটু আচার ও একটু নুন এই যোগ করলে ওদের জীবনের পরম খাদ্য। তবু তারা আদর করে আমাকে তাদের খাবার খাওয়াল।

আমি অন্যদের খাবার খাওয়াতে পাঠালেম, কারণ তারা ফিল্মের লোকজন, আহ্লাদ না হলে তাদের চলবে না। আমি ওদের সঙ্গে পরমানন্দে বসে বসে খেলাম। আমি জানি না আজকে তাদের এটুকুও জুটছে কি না। অবস্থা বীভৎস থেকে বীভৎস হয়ে আসছে।

এদের ওপরে ছবি করা একটি প্রাথমিক আয়োজন। সেটা করার জন্যে কোন্ শিল্পী আছেন আমার জানা নেই। এরাই আমার দেশ। ন্যাকামি আর বীভৎসতাপূর্ণ যে-সব ছবির খবর আমি পাই, কীভাবে এগুলো বেঁচে আছে আমার জানা নেই। দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে, দুর্ভিক্ষ এসে পড়েছে, সেই বিষয়ে বলার কেউ নেই? রাগ করবার কেউ নেই? তা হলে শিল্প কেন? বাকতেল্লাবাজি করে, আর বড়ো বড়ো কথা বলে, আর শিল্প-সংস্কৃতির কথা বলে আমাদের বাঁচার কী কোনো অধিকার আছে?

এর উত্তরটা ভীষণভাবে দরকার। এবং কেউ যদি না দেয়, তা হলে ইতিহাস তার বারোটা বাজাবে।

চলচ্চিত্র সাহিত্য ও আমার ছবি

বাংলা ছবির ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্যকারী জিনিস বলে মনে করা উচিত হবে না। বাংলা সাহিত্যের অসীম প্রভাবে ছবিটা "বই"-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আমাদের ছবি-করিয়েদের প্রথম এবং প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে বইটাকে ছবিতে কতখানি বিশ্বস্তভাবে রূপান্তরিত করা যায়। এবং সে কাজ আজও সমানে চলেছে। স্বাধীনভাবে ছবির জন্য লেখা এখনও মারাত্মকভাবে কম হচ্ছে।

সাহিত্যকে আশ্রয় যখন করতেই হবে, না করে যখন উপায় নেই বলে মনে হচ্ছে সেখানে সাহিত্যের প্রতি একজন ছবি-করিয়ের কী দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সেটা নিয়ে আমাদের খানিকটা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। এখানে আইজেন্‌স্টাইন্ সাহেবের কিছু মূল্যবান লেখার কথা মনে পড়ছে।

আইজেন্‌স্টাইন্ সাহেবের মতে যে-কোনো উপন্যাসকে ছবি করতে গেলে তিন রকম ভাবে এগনো যায় : ১. সম্পূর্ণ গ্রহণ, ২. আংশিক গ্রহণ, ৩. পয়সার জন্য করে যাওয়া। পয়সার জন্য যে গল্পকে ছবি করতে হয়— সেটা নিয়ে গভীর চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। সেটা পরিষ্কার।

সম্পূর্ণ গ্রহণ। সেখানেও চিত্রশিল্পের নিজস্ব বক্তব্য কিছু আছে, একটা মাধ্যম থেকে

আর-একটা মাধ্যমে যেতে গেলে খানিকটা রদ-বদলের প্রয়োজন হবেই। সম্পূর্ণ গল্পটি যেমন আছে ছবিতে তেমনভাবে রূপান্তরিত করা যায় না। সেখানে লেখকের মূল বক্তব্যের প্রতি ধর্মনিষ্ঠ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছবির প্রয়োজন অনুসারে গুছিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। যেমন ধরুন পুডভ্কিনের 'মাদার'। 'পাভেল' যেখানে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, উপন্যাসে আছে সেটা মায়ের বাড়ি, কিন্তু পুদভ্কিন অনুভব করলেন মাধ্যম অনুসারে এটা একটা ঘরের মধ্যে হলে আবেগের বিশালতা দেখানো যাবে না। তাই তিনি ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাকে নিয়ে এলেন— দুপাশে যেখানে মাথা-উঁচু গম হাওয়ায় দুলছে আর পাভেল আসছে ছুটে আলোর পথ বেয়ে— দুজনের মিলন এই উন্মুক্ত আকাশের তলায় হল। এটা কিন্তু গোর্কির লেখায় ছিল না। কিন্তু আন্তরিক দিক থেকে এটাই সমস্ত ঘটনার প্রতীকরূপে প্রকটমান হয়ে দাঁড়াল।

এ ছাড়াও, সাহিত্যের চিত্ররূপ দিতে গেলে অনেক সময় ইংরাজিতে যাকে বলে 'telescope' করা অথবা বাড়ানো— এই দুটোরই প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু লেখকের বক্তব্যের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে হয়।

এই গেল প্রথম দিককার কথা। এর পরে আসে আংশিক গ্রহণের পর্যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ আইজেন্স্টাইন্ সাহেবের 'An American Tragedy'-র কথা মনে পড়ে। ছবিটি উনি করতে পারেন নি। হলিউডের প্যারামাউন্ট ওঁকে ছবিটি করতে দেয়নি। উপন্যাসটি থিয়োডোর ড্রেজার-র লেখা। এখানে একটি ছেলে বড়ো হওয়ার জন্যে একটা বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিল। সে নিজে ছিল একটা মজদুর। এবং তার একটি মজদুর প্রেনিকা ছিল। ও যখন বুঝল যে ওর প্রথম মজদুর প্রেমিকা ওর উচ্চাশার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকে খুন করবে ঠিক করল। সমুদ্দুরে নৌকো নিয়ে মেয়েটিকে ও বেড়াতে যেতে বলল। ওরা দুজনেই গেল। উপন্যাসে আছে যে হঠাৎ দৈবদুর্বিপাকে নৌকোটা উলটে গেল এবং মেয়েটি মারা গেল। আইজেন্স্টাইন সাহেব এই বিখ্যাত ঘটনাটিকে 'পাতি-বুর্জোয়া' Reading বলে মনে করলেন। তিনি তাই তাঁর ফিল্মের যে Script করেছিলেন তাতে দেখালেন যে accident নয়, ছেলেটি নিজের স্বার্থে ইচ্ছে করেই নৌকো উলটে দিয়েছিল। ড্রেজার সাহেব তখন বুড়ো। তিনি সেটাকে সমর্থন করেছিলেন। এইটে হচ্ছে আংশিক গ্রহণ। যার ফলে সমস্ত উপন্যাসের ব্যাখ্যা বদলে যায়।

তৃতীয় ধরনের উপন্যাস নিয়ে আমাদের আলোচনা করার কিছুই নেই কেননা সেটা সম্পূর্ণ আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে লেখা, সেগুলো শিল্পের আওতায় আসে না।

আমাদের বাংলা দেশে কোনো শিল্পীই এ-সব ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত আছেন বলে মনে হয় না। তাঁরা অন্ধের মতো খালি ছবি করে যাচ্ছেন বই ধরে ধরে। কিন্তু এর বক্তব্যের ভেতরে অনুপ্রবিষ্ট হতে পেরেছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। নাম করে মানুষকে চটাব না। কিন্তু এই-ই হচ্ছে বাংলা দেশের সাধারণ চেহারা। এর থেকে মুক্তি কবে আমরা পাব জানি না— কিন্তু পেতেই হবে।

আমার নিজের ছবি— 'অযান্ত্রিক'। সুবোধ ঘোষের একটি বহুখ্যাত গল্পের ভিত্তিতে তৈরি। সে গল্প আপনারা নিশ্চয়ই সকলে পড়েছেন। ঐ এগারো পাতার গল্পটিকে একটি সম্পূর্ণ ছবিতে পরিণত করতে আমাকে নিশ্চয়ই ভাবতে হয়েছিল। কতখানি সার্থক হয়েছি

সেটা আপনারা বলবেন— তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। সুবোধবাবুর মূল বক্তব্যের প্রতি আমি চেষ্টা করেছি বিশ্বস্ত থাকতে। জানি না কতখানি কৃতকার্য হয়েছি।

এর পর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। শিবরাম চক্রবর্তীর যুদ্ধ-পূর্বোত্তর বাংলা একটা ছবিকে আমি টেনে আনার চেষ্টা করেছি— যুদ্ধ-উত্তর বাংলাদেশে। ওতে নানারকম চেষ্টাচরিত্তির করা গিয়েছিল। আমি জানি না কতখানি সফল হয়েছি। তবে মূল বক্তব্যটাকে আমি নিশ্চয়ই বদলে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কী হয়েছে সেটা আপনারা জানেন।

'মেঘে ঢাকা তারা'। এর নামটাও আমার দেওয়া। 'চেনামুখ' নামে কোনো এক জনপ্রিয় কাগজে এ গল্পটা বেরিয়েছিল। এর মধ্যে কোনো একটা জিনিস আমাকে আঘাত করেছিল। তাই Bill শেক্সপিয়রের "The Cloud Clapped Star" এইটে আমার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং সম্পূর্ণভাবে ভেঙে আমি এই ছবির Script করি। এটা খানিকটা Sentimental হতে পারে ; কিন্তু এর মধ্যে থেকেই আমার ছবিতে overtones throw করার ব্যাপারটা আসতে আরম্ভ করে। এইখানে আমি ভারতীয় Mythology-কে ব্যবহার করা শুরু করি— যেটা আমার জীবনের একটা অঙ্গ। 'মেঘে ঢাকা তারা' নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। শুধু এইটুকু বলব যে 'মেঘে ঢাকা তারা' আমার চিন্তাশক্তিকে প্রকাশ করছে— এখানে লেখকের কোনো ভূমিকা নেই। কথাটা কষ্টকর হলেও সত্যি।

'কোমল গান্ধার'— 'কোমল গান্ধার' এই প্রথম ছবি যেখানে আমি আমার নাম পরিষ্কার ভাবে দিয়েছিলাম। এটাকে বুঝতে হলে তদানীন্তনকালের নাট্য আন্দোলনের সামিল হতে হয়। তা নইলে এর সম্পর্কে বেশি কিছু বোঝানো যাবে না। কাজেই 'কোমল গান্ধার' ছবি ভালো কি খারাপ এ আলোচনায় আমি প্রবেশ করতে রাজী নই। এটা আপনারা নিজেদের যুক্তি-বিবেচনা অনুসারে বিচার করে দেখবেন।

'সুবর্ণরেখা'— 'কোমল গান্ধারে' গল্প নেই শুনে একটা আমার রাগ হয়েছিল। তাই 'সুবর্ণরেখা'তে চুটিয়ে গল্প দিলাম, বক্তব্য একই। খালি প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন। 'সুবর্ণরেখা' মানুষকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছে সেটা আমি জানি না। তবে চেষ্টা আমার পরিপূর্ণই ছিল। জানি না, কতখানি সফল হতে পেরেছি। কিন্তু এর পেছনে যেটা বক্তব্য সেটা খুব সহজ নয়। এটা বুঝতে হলে খানিকটা পরিমাণে উপনিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। আমি যে শেষ করেছি 'চরৈবেতি' মন্ত্রের ওপরে এটাকে বুঝতে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগ রাখা দরকার। আমার পক্ষে এর বেশি পরিষ্কার করে বলা সম্ভবপর নয়। বাকিটুকু যাঁরা ছবি দেখবেন তাঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যাক।

আজ এই পর্যন্ত। নমস্কার।

আমার কথা

আমাদের দেশে বর্তমানে যে-সব ছবি হচ্ছে, তার মধ্যে কিছু কিছু প্রশংসনীয় ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। তাঁরা মোটামুটি ছবির মাধ্যমটাকে ধরতে পেরেছেন। কিন্তু তাই বলে এই নয় যে পৃথিবীর চলচ্চিত্র প্রগতির সঙ্গে এঁরা হাত মেলাতে পেরেছেন। বিশেষ করে সমাজ চেতনার দিকটা।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের শিল্পীরা সমাজ সচেতন নয়। মানুষের সাধারণ দুঃখ-ভালোবাসার মধ্যে এঁরা প্রবেশ করেন না। ফলে এঁদের শিল্পসৃষ্টি একটা পরিমিতির মধ্যে থেকে যায়। সেইজন্যে সর্বাঙ্গীণ আনন্দ পাবার অবস্থা ঘটে ওঠে না। এঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত নানারকম থাকতে পারে, সেগুলো তুলে আমি জল ঘোলাতে চাই না। কিন্তু মানুষকে ভালোবাসার একটা ব্যাপার আছে। এবং সেইখানে কাউকে ক্ষমা করার কোনো ব্যাপার নেই।

এ দেশে দু-একজন শিল্পী কিছু কাজকর্ম করেছিলেন, তাঁরাও আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছেন দেখছি। আমাব ভয় ঠিক না হলেই খুশি হব, কিন্তু এঁদের ব্যবহারে মনে হচ্ছে যে এঁরা নিজেদেরকে বিক্রি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। ভগবান করুন এঁরা যেন সত্যি বিক্রীত না হয়ে যান। এই দেশে এখন দরকার প্রচণ্ড ভাবে ছবি করা। এবং দরকার কিছু উৎসাহী যুবকের যারা জান দিয়ে দেবে কাজের জন্যে। এদেশে এখন চলচ্চিত্র সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ জেগেছে। তারা বিভিন্ন শিল্প সোসাইটি করেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায়। এদের উৎসাহ এবং অকৃত্রিম আগ্রহ ভালোবাসার জন্য। কিন্তু এরা জানে না যে ফিল্মিজগৎটা কী অভদ্র এবং ইতর। এর মাঝখান থেকেই লোককে কাজ করতে হয়, এবং তার ফাঁক দিয়ে কতকগুলো কথা বলবাব চেষ্টা করা হয়। এ যে কতখানি দুরূহ, তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না, বোঝানো সম্ভবপর নয়। বাংলা ছবি সম্পর্কে আমার পক্ষে বেশি কিছু বলা মুশকিল, এই কারণে যে, যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই আমার ঘনিষ্ঠ এবং নিকট সহযোগী। এঁদের সম্পর্কে এইজন্যে নামধাম ধরে কিছু বলতে পারলাম না। সেটা মনুষ্যত্বে বাধে। তবে এইটুকু বলতে পারি, এখনকার বাংলা ছবি দেখে আমি খুবই হতাশ। যখন সারা পৃথিবী একটা দারুণ দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যখন বিপ্লবের আহ্বান এর চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে— তখন আমরা এদেশে বসে এইসব বাজে ক্লাসের ব্যাপার করছি অসহ্য।

আমার পক্ষে আধুনিক বাংলা ছবি সম্পর্কে বলা খুব কঠিন। আমি বাংলা ছবি প্রায় দেখি না। দেখলেই কষ্ট হয়। আমাদের মতো একটা দেশ, যার কোনো তুলনা নেই, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাণকারীরা সে দেশ সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর রাখেন বলে মনে হয় না।

এইজন্যে আমি যেটুকু দেখি, সেগুলো বিদেশী ছবি। তারা নিজের দেশকে ভালোবাসতে জানে। এই জিনিসটাই আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকাররা পরিপূর্ণ হারিয়েছে। মানুষকে ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসা, মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গী হওয়া— এটা হচ্ছে সর্বশিল্পের শেষ কথা। এইটে যখন হারিয়ে যায়, তখন মানুষ সব হারায়। এর ঊর্ধ্বে

কোনো কথা নেই। পয়সার জন্যে উল্টোপাল্টা কাজ যে-কোনো লোক করতে পারে, কিন্তু তাতে কোনো জায়গায় ব্যাপারটা পৌঁছায় না। লড়াই করাই সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। এবং সেটা করার জন্যে যত রকমের দুঃখ আসুক, আঘাত আসুক ভয় করলে চলবে না।

আগামী দিনের ছেলেদের কাছে আমি আশা করব যে এরা সেই মনোভাব নিয়েই কাজে এগোবে। আমরা ইংরেজিতে যাকে বলে এই generation মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে নতুন ছেলেদের যুগ। ওরা কিছু করুক। ওদের মধ্যে দিয়েই আমরা প্রাণ পাব।

ওদের জন্যই আমরা বসে আছি।

কিছু খণ্ড চিন্তা : কিংবা কিছু উপলব্ধি

আচ্ছা, নিজের জমির উপর না দাঁড়াইয়া কিছু করা যায় কি? কিছু সত্যিকারের গভীরকে ছোঁয়া সম্ভব?

আমি জানি না, হয়তো শেষ বয়সে বহু পোড় খাইয়া, বহু মারের মধ্য দিয়া উত্তরণ হয়তো সম্ভব। কিন্তু আমার তো সে স্তর আসে নাই ; সে স্তরে পৌঁছানো কোনোদিন হইয়া উঠিবে কি না, সে বিষয়েই আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।... কিন্তু সৃষ্টিকর্মের গোড়ার ধাপে, কাজ করিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের খোরাক যাহার দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, সে কী করিবে? আমি বলিতেছি দেশভাগের কথা। আমি পূর্ববাংলার ছেলে। খুব সামান্য কিছু লোকের আমার কাজ ভালো লাগে। তবু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ঋত্বিক ঘটকের বর্তমানের বা অল্পকাল অতীতের সঙ্গে বুঝিবা সামান্যভাবে ভবিষ্যতের সঙ্গে , একটা যোগগোছের [আছে] বলিয়া মধ্যে মধ্যে মনে হয়। কিন্তু সত্যকারের অতীত নাই, ঐতিহ্য নাই।

কথাটা বড়ো লাগে। অতীতবিহীন নিরালম্ব বায়ুভূত কাজ কাজই নহে। কিন্তু আমার অতীত আমাকে কে আনিয়া দিবে?

আছে, যোগ আছে। ছোঁয়া আছে, গল্প আছে, টুকবা টুকরা ছবি আছে। তাহার অনেকটাই হয়তো ভুল, আমার মনগড়া। কিন্তু মন গড়িয়াই তো আমার শিল্প। ফোটোগ্রাফির সত্য তো আমার ঠিকাদারির মধ্যে পড়ে না।

আমার দিন কাটিয়াছে পদ্মার ধারে, একটি দুঁদে ছেলের দিন। গহনার নৌকার মানুষদের দেখিয়াছি, যেন অন্য গ্রহের বাসিন্দা। মহাজনী হাজার-দু'হাজার মণী ভাড়া করিয়া পাটনা-বাঁকিপুর-মুঙ্গের অঞ্চলের মাল্লারা পার হইয়া যাইত, একজাতীয় ভাঙা দেহাতি আর পদ্মাপারী বাংলার টান মাখানো কথা বলিয়া। জেলেদের দেখিয়াছি, ইলশাগুঁড়ির প্রথম বর্ষায় বেজায় খুশি হইয়া বেসুরা টান মারিত, জলমাখানো হাওয়াতে দমকায় দমকায় ভাসিয়া আসিত কেমন অস্পষ্ট মন-কেমন-করা পাগল সুর। স্টিমারে শুইয়া রাত্রে দোল খাইয়াছি মাতাল নদীর দাপটে, আর শুনিয়াছি এঞ্জিনের ধস্ ধস্, সারেঙের ঘণ্টি, খালাসির বাঁও-না-মেলা আর্তনাদ।

পদ্মায় শরতে নৌকা লইয়া পালাইতে গিয়া একবার ঢুকিয়া আর বাহির হইতে পারি না— তিনমাথা সমান উঁচু কাশবন হইয়াছে কাতলামারির চরটার কাছে, ভীষণ সাপ থাকে ওখানে। নৌকা দুলাইয়া দুলাইয়া চেষ্টা করিতে যাইয়া সেই ডাকাতিয়া কাশের ঝোপের সাদা রেণু উড়িয়া উড়িয়া দেহমন আচ্ছন্ন করিয়া নিশ্বাস প্রায় আটকাইয়া দিয়াছিল। কাশগুলি পাকা ছিল। একবার 'সিন্ধু-গৌরবের' রাজা জাহিরের পাটের জন্য হায়ার (hired)

হইয়া গিয়া ট্রেন ফেল করিয়া সন্ধেবেলা পৌঁছিয়াছি অপরিচিত রেলস্টেশনের লাইনের লাল আলোয় রহস্যময় পাড়াগাঁয়ে। সামনের হাওড়বিল ডাকসাইটে ভূতের জায়গা, কোজাগরীর আগের রাত্রে সেই আবছা বিলে দুই বন্ধু মিলিয়া সারারাত লগি ঠেলিয়াছি, দিগন্তলীন বিলে মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে দ্বীপের মতো গ্রাম। নীহাব পড়িতেছে, কাঁপিতেছি, শেষে বোঝা গেল, আমাদের ধন্দ লাগিয়াছে। দুঘণ্টার পথ সাবারাত্রে পার হইতে পারিতেছি না, পাক খাইতেছি। সেই শেষ রাত্রে দাঁতে দাঁত লাগা হিমে সে এক অদ্ভুত হতাশার অনুভূতি।...

মা-বাবা-দাদা-দিদি, অনেক মানুষ। হৈ হৈ করিয়া বহুজনা মিলিয়া ভাতখাওয়া, দুগ্‌গাপূজা, মুসলমান চাষিদের সেই বাঁ-পায়ে পিতলের মল পরিয়া শারী গান, ডানপিটা সব বন্ধু। মারপিট। আম-লিচু-ডাব চুরি। পড়িয়া পা ভাঙিয়া যাওয়া, ধরা পড়িয়া মার খাওয়া। বাড়ির দেওয়ালে নোনা ধরিয়া কত দাগ। কত শব্দ, ছবি, কত মন।

একটা জীবনপ্রণালী, মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ। আর নাই। যদি থাকিত। ...দাঁড়াইতে পারিতাম তাহার উপরে, বলিতে পারিতাম কিছু। এমনভাবে সব-কিছুকে বিকৃত মন লইয়া দেখিতাম না। ভবিষ্যৎকে এত ভয় করিতাম না, দেশের এবং মানুষের ভবিষ্যৎকে।

এগুলা প্রাণময়, এগুলা উদ্দাম। কিন্তু এই তো আমার আছে। আমি যদি লিখিতে পারিতাম, কবি হইতাম, চিত্রকর হইতাম, হয়তো এগুলা হইতে জারাইয়া লইয়া বাড়িতে পারিতাম। কিন্তু আমি যে ছবি তুলি। আমার মতো আর কেউ হারায় নাই। যাহা দেখিয়াছি, তাহা দেখাইতে পারিতেছি না।

কে চায় দুঃখ? জীবন দুঃখ নহে। জীবন বীরত্ব। এপারে কী নাই? আছে, দেখিয়াছি, পূজা করিয়াছি। কিন্তু আমি ছোটোবেলার সেই রূপকথা— চোখে দেখিতে পাইতেছি না; সেটি হারাইয়াছি। সেটি না থাকিলে তো বাস্তব হইতে নূতন রূপকথা তৈরি করিতে পারা আমার সাধ্য নাই। এখন যুক্তি হইবে, ট্র্যাজেডি হইবে, কমেডি হবে, বয়ঃপ্রাপ্তদের খণ্ডাংশ শিল্প হইবে। যদি অবশ্য অত অবধিও পৌঁছাইতে পারি।

কিন্তু রূপকথা, সরল রূপকথা, যাহা দেখিলে যুক্তি চুপ, বড়ো বড়ো থিয়োরি মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করে, ছোটো ছোটো ডানপিটের দল রুদ্ধশ্বাস গল্পের জন্য চাগাড় দিয়া উঠিয়া বসে— তাহা কোথায়? আমার চৌহদ্দির মধ্যে নাই।

আমার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এইটাই। কাজ আরম্ভ করার পূর্বেই আমি সীমিত হইয়া গিয়াছি।

কারণ, সেই নিসর্গ এখানে পাইব না। ও মুখের আদল, ও কথা বলার ঢঙটি, এখানে নাই। দুনিয়ার লোকের কাছে ঐ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়, এমন কিছু হয়তো সাজাইয়া গুছাইয়া দাঁড় করানো যায়। কিন্তু বায়োস্কোপ বড়ো সত্যবাদী। উহাতে চিড়া ভিজিবে না। যাহার জন্য করা, সেই রূপকথাটিই হারাইব।

আমার এই কথাগুলি হইতে কেহ যদি মনে করেন, বীরভূমের হু-হু উধাও খোয়াই, মেদিনীপুরের ছোটো ছোটো নদী আর গঞ্জ, কি চব্বিশ পরগনার ক্ষয়িষ্ণু ভাঙাভাঙা ইমারতওয়ালা গ্রাম, ইহাদের বক্তব্য পৌঁছায় নাই আমার কাছে, তাহা হইলে অবিচার হয়। আমার শুধু নিবেদন এই, ইহারা আমার আদি যুগের অংশ নহে। আমার অতীতে মগ্ন হওয়া

হইয়া উঠিতেছে না কতকগুলি নিষ্ঠুর কারণে। এপারে যাহার শৈশব কাটিয়াছে, সে আমার দেশে যাইলে কোথায় পাইবে সেই মায়ার জাদু, যাহাতে কলি ফুটিবে?

তাই বলি, আমার উত্তরপুরুষের চোখ দিয়া যখন দেখিতে পাইব, তখন নতুন সংযোগ ঘটিবে, নতুন উত্তরণ।

আমার ছবি করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা এইটাই। কারণ, আমার মনের মধ্যে বায়োস্কোপের একটি মান ঠিক হইয়া আছে, যাহাতে এই মসলাটাই লাগে বেশি।

আমি অনুভব করি, এই প্রথম ধাপটি পাইলে ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া গিয়া দেশবিদেশ মহাদেশকে আলিঙ্গন করার সূত্রটি পাইতাম। এমন অসুস্থভাবে প্রাথমিক চেতনাটি ভূতের বোঝা হইত না আমার ঘাড়ে।

আমি সত্যই নিরালম্ব।

দুই

আর-এক মুশকিল আমার বলার ভঙ্গিটি লইয়া। আমার বিদ্যাসাগরের ভঙ্গি বড়ো ভালো লাগে। এব্রাহাম লিঙ্কনের লেখা আমার সামনে আদর্শ খাড়া করিয়া ধরে। বাইবেলের ইংরাজি আমাকে ধ্যানস্থ করে। উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টার তীব্রতা আচ্ছন্ন করিয়া উত্তীর্ণ করে এক আনন্দময় জগতে। যাহার জন্য হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান্ অ্যান্ড দা সী' বহু আপত্তি সত্ত্বেও নাড়া দেয় গভীরে।

ছবিতে করেন ফ্ল্যাহার্টি। করেন বেসিল রাইট্ তাঁহার 'সং অফ সীলন'-এ। আইজেনস্টাইন আশ্চর্যভাবে জায়গায় জায়গায় 'জেনেরাল লাইন'-এ তাহাই করেন।

বেশি ছবি আমি দেখি নাই। এ দেশে বসিয়া তেমন বায়োস্কোপ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বেশি যে পড়িয়াছি, তাহাও নহে। তবু এই একটা আদর্শ কেমন করিয়া জানি না আমার সম্মুখে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ যেমন।

একটি ভাষা, যাহা কম বলিবে। যাহা স্বয়ং দ্যোতনাময়। যাহার অ্যালিউশন-এর ভার নাই, পরিপূর্ণ ধার আছ। যাহা রেফারেন্স-এ ভারাক্রান্ত করে না, অথচ মনে পড়াইয়া দেয়— কারণ ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যে অনুভূতি আর যে চিত্রকল্প, তাহারা আর্কিটাইপাল। যে ভাষা সমস্ত মুড-কে একটি পেট্রিয়ার্কাল ভঙ্গিতে ধরাইয়া দিবে। আপাত শুষ্ক, ভিতরে মালদহের কালাচাঁদ ভোগ আমটি একেবারে টইটুম্বুর।

তেমন ভাষাটি কিন্তু আছে। খুঁজিয়া পাইতেছি না, কী সব আজেবাজে করিতেছি। ...বায়োস্কোপে ঐ ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। ইয়োরোপ পারিবে না, এ যুগে। আমরা পারিব, যদি খুঁজি।

...এটুকু বুঝি, এ ভাষা জন্মাইতে পারে শুভ্র উত্তাপময় প্রেরণা হইতে। সে প্রেরণা, মনে হয়, পেশাদার বায়োস্কোপের লোকেদের দ্বারা হইবে না। অর্থাৎ আমরা যাহারা একটির পর একটি ছবি করিয়া যাইতেছি। এ ভাষা বোধ হয় জন্মায়, যে রোজ করে না, তাহার চেতনায়। জীবনে খুব প্রয়োজন না হইলে সে মুখ খুলে না। যে মুখ খুলে একমাত্র জীবনমরণ সমস্যার চাপে পড়িয়া। খুব খানিকটা না রাগিলে, খুব ভালো না বাসিলে, খুব খুশি না হইলে,

খুব না কাঁদিলে, এ আদিম ভাষা কোথা হইতে উঠিবে? ভাবে থাকা চাই।

আমি সেই একটা দুরাশা করিয়াছি। সেই ভাষাটিকে ধরিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া যাইব, এ দেহ দিব। কিন্তু বাধা। ঐ যে নিজের জমির উপর পা নাই আমার। অন্যত্র জমি হাসিল করিব কী করিয়া এবং কবে?

কারণ আমাকে যে ফিরিয়া যাইতে হইবে আমার মায়ের গর্ভে। এ ভাষার উৎস সন্ধানে।

তিন

তার পরে যে চিন্তা আমাকে উদ্‌বিগ্ন করে, তা হচ্ছে ছবির সর্বজনীন হবার ক্ষমতা নিয়ে। সর্বজনীন মানে, সর্বদেশে একই দ্যোতনায় প্রতিভাত হবার ক্ষমতা বলছি এখানে।

আমি ধরে নিয়েছি, সর্বদেশে কিছু ক'রে লোক আছে যারা সত্যি চায় ; সত্যি রূপে অবগাহন করতে চায়।

(1) Universality of National nuances... whether they are intelligible to other examples. Basic problem of making people understand you. By which nuisance. Despair, what is to be done?

(2) Political Situation... you are not liked by Lt. [Left] or Rt. (Right] nor by country or international cultural level of film enthusiasts.

(3) My Conviction, My Conclusion.

চলচ্চিত্রে পরিচালকের বক্তব্য

বক্তব্য আমার কিছু নেই, কারণ আমার পক্ষে ব্যবহারিকভাবে ছবি করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কিন্তু একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে বলব— জনজীবন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে করে ভাবতে ভয় লাগে যে আজ থেকে পঁচিশ বছর পর আমরা কোথায় থাকব?

আপনারা মশাই ছবি করেন, দেখেন, ভালোবাসেন। কাজেই আপনাদের কাছে আমার কিছু বলবার অধিকার আছে। একটা কথা, যেটা আমার জীবন দিয়ে আমি বুঝেছি ; সেটা বুঝতে গেলে আপনাদের খানিকটা পরিষ্কার হতে হবে। আপনারা সত্যিই ঘটনাটাকে ধরতে পারবেন না যখন আমি বলব যে ছবি করতে হলে সর্বপ্রথম ছবির জগৎটাকেই বাদ দিতে হয়। ছবি করার প্রথম শর্ত হচ্ছে মানবিকবোধ এবং বাস্তব জগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান। জীবনকে উপলব্ধি করতে না পারলে শিল্পী হওয়া যায় না এবং শিল্পী না হলে আপনার কোনো অধিকার নেই মানুষকে প্রবঞ্চিত করার। এই দাঁড়াচ্ছে আজকে— যেটা বলতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগছে— যে এইগুলোকে লুকিয়েচুরিয়ে বড়ো বড়ো কথায় সাজিয়ে মানুষের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং মানুষ তাতে প্রতারিত হচ্ছে। এ যে কতদিন চলবে আমি জানি না।

কিন্তু আমি যেটা বলে যাব সেটা হচ্ছে এই কথা যে ছবি বলে কোনো বিশেষ কিছু

নেই— সব শিল্পের যে শর্ত তাই এখানেও খাটে। যে-কোনো শিল্প রচনা করতে গেলে কতগুলো প্রাথমিক ব্যাপার মানুষকে করতে হয়। এখানেও তাই।

আমি এখন শহরে দেখছি যে মিথ্যাচরণ অপরিসীমভাবে চলেছে। আমার পক্ষে এগুলো সহ্য করা সম্ভব নয়। যতদিন আমি থাকব পরিষ্কার এ-কথা বলে যাব। আপনারা ছবি ভালোবাসেন যার জন্য আপনাদের কাছে মুখ ফুটে দুটো কথা বলতে পারছি ; যা হয়তো অন্য জায়গায় পরিষ্কার করে বলাও যায় না। আপনাদের ধন্যবাদ যে আপনারা আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন। এইটুকু কে করে আজকে। আমি তো মুছে গেছি। এইটুকুর জন্য আপনাদের আমার মনে থাকবে।

প্রথম যে ছবি আমি আরম্ভ করি তার নাম হচ্ছে 'নাগরিক'। সেটা ছিল অন্য যুগ। তখন আপনাদের ছবি দেখার আন্দোলন কিছুই ছিল না। সেটা ছিল ১৯৫২ সাল, আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে। তখন লড়াই করা গিয়েছিল এবং মোটামুটি ছবিটা খুব খারাপ হয় নি। আমরা তখন সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে যেতাম এবং শিল্পীরা পরম আনন্দে সহ্য করতেন সেইসব দুঃখ, যা আজকে কেউ সহ্য করবে না। আমি যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, সে যুগের সঙ্গে এ যুগের তফাত। শিশির ভাদুড়ী বা প্রভাবতী দেবী আপনাদের চোখে কিছুই নয়, কারণ আপনারা দেখেনই নি যে মহত্তম শিল্পী কাকে বলে। রবি ঠাকুর বলে গেছলেন যে ওঁদের যে পরম ক্ষমতা আছে তা রাস্তা-ঘাটে পাওয়া যায় না। আমার 'নাগরিক' ছবিতে একটি দৃশ্য ছিল এক মা সমস্ত হারিয়ে কেবল এক শিশুপুত্রের জন্য চিন্তা করছে এবং সে নিজে ফিরে গেছে তার শৈশবে। সেইখানে আমি যখন ঘাটের ধারে গিয়ে প্রভাবতী দেবীকে এই দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলাম তখন ওঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল এবং আমাকে একবারও সে দৃশ্যের সংলাপ পুনরাবৃত্তি করতে হয় নি। উনি যে কী মহৎ ছিলেন সেটা আমি বুঝি কারণ এইসব মানুষগুলোর সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমি তো এ কথা স্বীকার করে যাব যে এতবড়ো শিল্পী আমি আর দেখি নি। এমন প্রাণ বহু কষ্টে পাওয়া যায়— তার গভীরতা, তার উত্তাপ যারা সহ্য করেছে তারা বুঝবে, আর কেউ বুঝবে না। 'নাগরিক' ছবি করার মধ্যে এইটিই আমার সবচেয়ে বড়ো অভিজ্ঞতা বা সঞ্চয় বা পরমার্থ লাভ।

তার পর বহু বছর গেছে। ছবি করতে আর সুযোগ পাই নি বেশ-কিছুদিন। তার পর করলাম 'অযান্ত্রিক'। ওখানে খাটতে হয়েছে একেবারে অন্যভাবে। ওখানের কষ্ট অন্য ধরনের ছিল, তবুও মোটামুটি বোধহয় ও ছবিটাকে সেরে ফেলতে পেরেছি। যখন আমার ছবির পরিবেশক আমাকে বলল যে এক সপ্তাহের মধ্যে ছবি মুক্তিপ্রাপ্ত করতে হবে— তখন আমি যে কদিন দিনরাত্রি একা জেগে বসেছিলাম তার যন্ত্রণা এবং আনন্দ কাউকে কখনো বোঝাতে পারব না।

'অযান্ত্রিক'কে অনুধাবন করার যে ভঙ্গি হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি সেটুকু বলছি। ইংরাজি ভাষায় absurd বলে একটা কথা আছে যার একটা সাহিত্যিক সংজ্ঞাও আছে। আমাদের বাংলায় ওটাকে উদ্ভট কাব্যও বলা চলে। যারা সীতা ও শান্তা দেবীর 'হিন্দুস্থানী উপকথা' পড়েছেন কিংবা 'নিরেট গুরুর কাহিনী' পড়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন এর রসের স্বাদ।

যার সবচেয়ে বেশি অগ্রসরণ হয়েছে আমাদের সুকুমার রায়ের লেখায়।

অযান্ত্রিককেও সেইভাবে দেখতে হবে। ফাজিল মন নিয়ে। গুরুগম্ভীর ভঙ্গি করে এ-ধরনের জিনিসের স্বাদ পাওয়া যায় না। হতে হবে শিশু, হতে হবে এক আদিবাসী ওরাওঁ, হতে হবে বিমল। আমার ছবিতেও এই তিনটি স্তরই আছে। গোটা ছবিটাই হচ্ছে কিংবদন্তি। স্বল্প পরিসরে এর থেকে বেশি করে বোঝানো যাবে না।

তার পর এল 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'। করা গেল ছবিটা। ওটা মোটেই আমার সিরিয়স ছবি নয়, কাজেই ওর সম্পর্কে বলবার বিশেষ কিছুই নেই।

এর পর করলাম 'মেঘে ঢাকা তারা'। মূল লেখাটা পড়ে আমার জঘন্য লেগেছিল। তার পর কাটতে কাটতে গিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম যেখানটাতে আমি বুঝতে পারলাম যে এর মধ্য দিয়েও কিছু প্রকাশ করা যায়। আমি মনে করি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম এই 'মেঘে ঢাকা তারা'। যেটা অন্য লোকেরা শুনে খুব আপত্তি করবেন। আমার কিছুই বলার নেই। আমার মত আমার কাছে, অন্যের মত অন্যের কাছে।

এর পর একটা ছবি করেছিলাম 'কোমল গান্ধার'। সেখানে খেটে কিছু কাজ করা গিয়েছিল। এবং তাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ হতে আমি নিজের চোখে দেখেছি এই বাংলাদেশে। 'কোমল গান্ধার'-এর মূল সুর হচ্ছে মিলনের। দুই বাংলা খণ্ড হয়ে যাওয়ার যে অপরিসীম ব্যথা আমি পেয়েছিলাম তাকেই আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলাম এই 'কোমল গান্ধার'-এ। আমি রাজনীতিক নই। আমার কারবার হচ্ছে মানুষের মন নিয়ে। কাজেই দুই বাংলা কী করে এক হবে তার হদিশ দেওয়া আমার কর্ম নয়। আমি শুধুই ভালোবাসতে পারি।

'কোমল গান্ধার'-এর ভৃগু ও অনসূয়ার ব্যক্তিগত ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে একটা স্থির মতে বিশ্বাসী অভিনেতৃ সংঘের মধ্য দিয়ে গোটা বাংলাদেশ তার সমস্ত ভালো-খারাপ নিয়ে আমার কাছে বিধৃত হয়েছিল যেভাবে, তাকেই আমি এ ছবিতে প্রকট করার চেষ্টা করেছি।

রবি ঠাকুর একটা কবিতা লিখে গেছলেন— 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে'। বিষ্ণু দে মশাইকে রবীন্দ্রনাথ ব্যারাকপুরেতে একবার তাঁর চোখ দুটো দেখে বলেছিলেন যে তুমি তো কোমল গান্ধার হয়ে বসে আছ। বিষ্ণু দে তার বহু বছর পরে এক কবিতার বই ছাপলেন যার নাম 'কোমল গান্ধার'। রবীন্দ্রনাথের সেই যে একটি বর্ণনা, এক বিষাদাচ্ছন্ন যোড়শী জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে— বিষ্ণুবাবু তাকে equate করলেন সমগ্র বাংলাদেশের সঙ্গে। কিন্তু আমার বাংলা ভাঙা বাংলা। কাজেই আমাকে আর-এক ধাপ এগিয়ে যেতে হয়েছে। গিয়ে কিছু বলতেও হল। জানি না মানুষ কেন তাকে গ্রহণ করে নি— কিন্তু ওর মধ্যে অনেক ভালোবাসার কথা বলা ছিল।

আবার গোড়ার কথাটি বলে শেষ করছি। গোড়ার কথা হচ্ছে— মিলন। যতদিন দুই বাংলা না মিলবে ততদিন ভাঙা বাংলার কপাল ভাঙাই থাকবে। এটুকুই কোমল গান্ধার-এর মূল বক্তব্য। ছবির সূক্ষ্ম ঘটনাগুলি নিয়ে আমি আলোচনা করব না। কারণ আমার পক্ষে বলা উচিত নয়। এইটুকু বলতে পারি কিছু কিছু ভালোই কাজকর্ম করা হয়েছিল।

তার পর আসে 'সুবর্ণরেখা'। ছবিটা এখনও মুক্তি পায় নি, কাজেই বললে শোনাবে

ধৃষ্টতা। নিজেরা আপনারা দেখুন, নিজেরাই ঠিক করবেন কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা।
আমার বক্তব্য আর বিশেষ কিছুই নেই। আপনাদের কাছে আছি। হয়তো আবার কিছু করব।— হয়তো করব না। তবে আপনাদের ছেড়ে আমি নেই। আমি আপনাদেরই দাস।

সমাজে চলচ্চিত্রের স্থান

পৃথিবীর সব শিল্পই সামাজিক শিল্প। কোনো শিল্পই শুধু নিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। চলচ্চিত্রকে একটা শিল্প বলা হয়। কাজেই, আমি যদি চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করি, তা হলে আমাদেরকে ধরে নিতেই হবে যে ছবির একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে।
সে দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি আছে। আমি বিশেষভাবে কোনো রাজনৈতিক মতবাদের কথা বলছি না। কিন্তু ফরাসি ভাষায় যাকে বলে Engag'e, সেটা শিল্পীকে হতেই হবে। দেখুন, ঐ ফরাসি দেশেই একদল ছোকরা ছবি করে যাচ্ছে, তারা নিজেদের বলে ন্যুভেল ভাগ।
এরা সমাজের অবক্ষয়ের কথা ছবিতে নাকি বলার চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে একটি প্রাণী এক জায়গাতে ঘোষণা করেছিল সেটা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে নেপোলিওঁ-এর জীবনে সে খুব আগ্রহী শুধু তিনি তাঁব রক্ষিতাদের সাথে কী ভাবে ঘুমতেন সেটা দেখাবার জন্যে। এরা সমাজকে কেটে বাদ দিতে চায়। আর্ল্যা রেনে-জাতীয় লোক হচ্ছে এদের মাথা। এরা এবং Polland-এর সবচেয়ে নতুন ছবি-করিয়েরা— Sartre-এর Existentialismকে আগে বাড়িয়ে একটা Neo-ব্যাপার করে তোলার চেষ্টা করছে। এরা টিকবে না। মানুষ একটা fashion হিসেবে এদেরকে দুদিন গ্রহণ করবে, তার পরে এরা মিলিয়ে যাবে কালের অতল জলে। শিল্পের ক্ষেত্রে এধরনের ঘটনা এসেছে এবং গেছে, কিন্তু কোনোদিন স্থায়ী হয় নি।
গোর্কি এই বিষয়ে যা বলেছেন, তাই বোধহয় শেষ কথা। মানুষেব সঙ্গে যোগ, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের মধ্যে অনন্তকে প্রত্যক্ষ করা— এই হচ্ছে শিল্পীর সারাজীবনের কাম্য এবং সাধনা।
বুনুয়েল-কে আমরা ধরতে পারি একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে। তাঁর ছবি যৎসামান্যই আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে, তবু যেটুকু দেখেছি তার থেকে বলা যায়, যে ওঁর জীবনবোধ এবং সমাজবোধ প্রচণ্ড। Robinson Crusoe-র মতো ছবিতে উনি এক জায়গায় মেয়েদের Petticoat শুকোতে দেওয়ার দৃশ্য দেখিয়েছেন। হাওয়ায় সে Petticoatটা যে ফুলে ফুলে উঠেছে, ওঁর ক্যামেরার ব্যবহারের দ্বারা একটা নারীর অস্তিত্ব সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। নিঃসঙ্গ Robinson-এর জীবনে এটা একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পরে Friday যখন আসে, তখন তার মধ্য দিয়ে আদিম বন্য জীবনকে যেভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন, চূড়ান্ত সামাজিক বোধ না থাকলে এ ঘটনা বোঝানো যায় না।

বুনুয়েল-এর নাজারিন-এও এ রকম প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। রাত্রিবেলায় ভাঙা গির্জার মধ্যে চাষি মেয়েটি এবং বেশ্যাটি বসে আছে, তাদের মাঝখানে বসে আছে আমাদের নায়ক। হাতে তার একটা মাটির পোকা। সে সেটাকে আদর করছে। চাষি মেয়েটি এসে ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বেশ্যাটি কাঁদতে আরম্ভ করল। যাজকটি প্রশ্ন করল 'কাঁদছ কেন'। বেশ্যাটি বলল, তুমি ওকে বেশি ভালোবাস। যাজকটি বলল, তুই কাছে আয়, আমার কোলে শুয়ে পড়— আমি পৃথিবীকে ভালোবাসি, সমস্ত মানবজাতিকে ভালোবাসি, তোদের নয়। আমার কাছে তোরা সবাই পৃথিবীর প্রতিভূ।

শেষ দৃশ্যে নাজারিন-এ একটি বৃদ্ধা ছেলেটিকে একটা আনারস দিচ্ছে, সেটার একটা সাংকেতিক মানে আছে। এবং সেইখানে ছবির প্রথমবার বাজনা বেজে ওঠে। এবং সে বাজনা হচ্ছে Halleluja'র। এবং এইখান দিয়ে Bunnuel মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। এবং সেটা সাধারণ মানুষের প্রতি, যারা খেটে খায়।

মিজোগুচি অথবা ওজু, এঁরাও যে-সমস্ত ছবি করেছেন, তার মধ্যেও সেই মানুষের প্রতি আকুলতার প্রকাশ। এঁরা বেশির ভাগই ছবি করেছেন জাপানের অতীত নিয়ে কিন্তু আজকের সমস্যাকে অসম্ভবভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস।

কুরুসাওয়া-কে নিয়ে আমরা বেশি নাচানাচি করি বটে কিন্তু এঁরা তার থেকে অনেক বেশি গভীরতর শিল্পী ; এঁদের ছবি বেশি এদেশের লোক দেখতে সুযোগ পায় না তাই বুঝতে পারে না যে এঁরা কত মানব-দরদী।

আমার কথা হচ্ছে, আজকাল কতগুলো ফাঁকা বুলি আমাদের দেশে শোনা যাচ্ছে। মানবিক সম্পর্কবোধ, ইত্যাদি ইত্যাদি বড়ে বড়ো কথার আড়ালে বদমাইশি চালু করা হচ্ছে। এদের পুঁজি বড়ো কম। এরা টিকবে না। এরা হয়ে এসেছে। এরা লোকজনদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে মানবিক সম্পর্ক, ইত্যাকার ব্যাপারটাই হচ্ছে শিল্পের শেষ কথা। এটা রবিবাবুর মতো লোক, যিনি অনেক বাজে লেখার মধ্যেও কিছু কিছু ভালো লেখা লিখেছিলেন তিনিও চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে, শিল্পকে শিল্প হতে হলে প্রথমে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়। তার পরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। শিল্পকে সুন্দর হতেই হবে, কিন্তু সত্যকে বর্জন করে নয়। সে সত্য সামাজিক সত্য। মানুষের অভাব, প্রয়োজন, অনটন-এর উপরে দাঁড়াতে হবে শিল্পীকে।

তাই বলি, ফাঁকা বুলিতে ভুলবেন না। আক্রমণ করতে শিখুন। লড়াই করুন। মারতে জানুন। আপনার শিল্পী আপনার চাকর, আপনি আছেন বলেই তাঁরাও আছেন। তাঁদেরকে মেরে মেরে সোজা পথে নিয়ে আসুন। ভুয়ো আর সস্তা কথায় হারিয়ে যাবেন না। সমাজকে ছেড়ে কোনো শিল্পী পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিন বাঁচতে পারে নি, বাঁচতে পারবে না।

আপনারা সেই দায়িত্ব পালন করবেন কি?

বাংলা ছবি ও বাংলা সাহিত্য

আমার মতে, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস বন্ধ্যা।

গত বিশ বছরে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে; পাঁচটা কি ছটার বেশি মনে করতে পারি না, যা উল্লেখযোগ্য। বাকিগুলি চলচ্চিত্রের দিকে চোখ রেখে লেখা; আন্তরিকতার অভাব এবং স্থূলতা তাদের সর্বাঙ্গে।

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের সম্বন্ধ এখন দ্বিপাক্ষিক। চলচ্চিত্রের যাবতীয় ছক ও মারপ্যাঁচ উপন্যাসে জড়ো করে লেখক ভাবছেন চিত্র-প্রযোজক তাঁদের লুফে নেবেন। আবার, এইসব ভুষিমাল নিয়ে চলচ্চিত্র কারবারও চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, এ ধরনের লেখার মরশুম এসে গেছে।

ফল : চলচ্চিত্র ও সাহিত্যে স্থূলতা ও অশ্লীলতার শ্রীবৃদ্ধি; দুইই বিরক্তিকর, ঢিমে এবং সস্তা আবেগে ভরাভর্তি। যত সব অবাস্তব পারিবারিক সম্বন্ধ ও জটিলতা নিয়ে পল্লবগ্রাহিতা, তথাকথিত নীতির দোহাই। এরা এমন ভঙ্গি করে, যা মূলত মিথ্যে এবং এমন কি বুদ্ধিজীবিতার পক্ষে অপমানজনক!

উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে কিন্তু সাহিত্যের এমন দুরবস্থা ছিল না। আন্তর ভাবনাকে সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করার জন্যেই তখন লেখকরা সৃষ্টি-কাজে নেমেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সে এক সমৃদ্ধির যুগ। গত বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই ঐতিহ্য বজায় ছিল। আজকের ফেরিওয়ালারা সেদিন ছিলেন অজ্ঞাত। সেদিন ছিল আত্মোৎসর্গ, সত্য ও সৌন্দর্যের জন্যে প্যাশন এবং দায়িত্ববোধ।

স্বাভাবিকভাবে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্র এই উন্নত শিল্পের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। প্রথম থেকেই মহৎ উপন্যাস থেকে সে উপকরণ সংগ্রহ করতে লাগল। তখন এটা সম্মানের বিষয় ছিল। এবং এই যোগাযোগ বাংলা চলচ্চিত্রকে সেদিন এগিয়েই দিয়েছিল অনেকখানি। লক্ষ্যের নিশানাও দিয়েছিল।

তার পর থেকে, বাংলা সাহিত্যের নিরন্তর অধোগতি। তবু আমরা তাকে আঁকড়ে রইলাম। সিরিয়াস যাঁরা, তাঁরা অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেললেন ভালো চিত্রবস্তু পাবার আশায়। ভালো উপন্যাসে যে বাঙালিকে পাওয়া যায়, তা চল্লিশ বছর আগের। ফলে, আমরা সমসাময়িক বাংলার সংস্পর্শ থেকে বিচ্যুত হলাম। চার পাশের স্পন্দিত বাস্তব আমাদের ছুঁতে পারল না। শরৎ চ্যাটার্জির মতো লেখক হলেন আমাদের পথ-প্রদর্শক। সেই ধারা আজও চলছে।

এখানে, আর-একটা দিকও বিবেচনা করা দরকার— দর্শক।

জন্মক্ষণ থেকে বাংলা চলচ্চিত্র মধ্যবিত্তদের আশ্রমে লালিত। বাঙালি শ্রমিকদের শ্রেণী হিসেবে অভ্যুত্থান সাম্প্রতিক। এবং আজও বাংলা ছবির দর্শক মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

এই শ্রেণী স্বভাবতই তাদের নিজস্ব দর্শন ও রুচি চাপিয়ে দিয়েছে ছবির ওপর। যেমন, এরা কান্না ভালোবাসে, কাঁদতে এবং কান্না দেখে সুখ পেতে ভালোবাসে। এই ফর্মুলার রহস্য শরৎ চ্যাটার্জির চেয়ে ভালো করে কেউ জানতেন না। এই শ্রেণীর লোকরা

হিম্মতদার শব্দ পছন্দ করে, কিন্তু যে-কোনো বলিষ্ঠ সামাজিক সংস্কারে এরা ভয় পায়। পারিবারিক জটিলতা, সতী সাধ্বী নারীর দুঃখবরণ ও শেষে জয় এদের কাছে সাংঘাতিক আকর্ষণীয়। কাজেই আমাদের চলচ্চিত্র-স্রষ্টারাও এই ধরনের গল্প খোঁজে ও তাই দিয়ে ছবি করে।

এই মধ্যবিত্তসুলভ চিন্তা আমাদের চলচ্চিত্র-স্রষ্টাদের আজও বেঁধে রেখেছে। এঁদের হাতে চলচ্চিত্র 'ফোটোগ্রাফের মাধ্যমে গল্প বলা'। কলাকৌশল স্থূলতম। মাধ্যমের যে-সব শিল্পগুণ, তা সম্পূর্ণ অবহেলিত।

অবশ্য, বিগত কালেও ছকবাঁধা চলচ্চিত্রায়নের ব্যতিক্রম ছিল। প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার নাম মনে আসছে। তিরিশের দশকের শেষ দিকে আবির্ভূত এই একটি লোক, যিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমেই শিল্প-সম্ভাবনা নিয়ে কিছু কিছু কাজ করেছিলেন। তাঁর 'গৃহদাহ' এইদিক থেকে প্রথমেই উল্লেখ্য। 'উত্তরায়ণ'-এ তিনি সুন্দরভাবে মন্ময় ক্যামেরার ব্যবহার করেছিলেন। মাঝারিয়ানার মধ্যে থেকেও তাঁর সৃষ্টিতে বিশুদ্ধ চলচ্চিত্রের স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে ঝলসে উঠেছে। তবু, শেষ পর্যন্ত তিনিও জনতার ফসল থেকে গেছেন।

চলচ্চিত্রের দারিদ্র্যের মূল কারণ— বিভিন্ন স্তরের উপন্যাসের ওপর নিঃসীম নির্ভরতা। আমার ধারণা, এইজন্যেই বাংলা ছবিতে সাহিত্যের প্রভাব কুফলবতী হয়েছে। এই প্রভাব ছবিকে বয়স্ক হতে দেয় না। কিন্তু আমাদের অজ্ঞ ও আত্মসন্তুষ্ট দর্শকসমাজ তাতেই সুখবোধ করেছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই অবস্থা ছিল। নতুন বাঁক এল পঞ্চাশের গোড়ার দিকে। নতুন বুদ্ধিজীবীদের কয়েকটি দল চলচ্চিত্রকে সিরিয়াস শিল্প-মাধ্যম হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করলেন। ক্রমে, এই ভাবনা দানা বাঁধতে বাঁধতে এসে পৌঁছল 'পথের পাঁচালী'তে, এবং সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবে। অবশ্য এ ছবিও একটি বিখ্যাত উপন্যাস-আশ্রিত। কিন্তু এই প্রথম, গল্প বিবৃত হল চলচ্চিত্রের নিজস্ব বলিষ্ঠ ভাষায়। শিল্পসত্য প্রতিষ্ঠিত হল। দুটি শিল্পমাধ্যমের মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠল।

অতঃপর বাংলা ছবিতে এই নতুন ধারার প্রবহমানতা। পুরোনো ধারাও সমভাবে বহমান। দুর্ভাগ্যবশত, দুটি ধারাই সাহিত্যের কাঁধে ভর করে আছে।

কেন দুর্ভাগ্যবশত? কারণ, মহৎ সাহিত্যকর্মের সন্ধানে চলচ্চিত্র-শিল্পীরা পেছনের দিকে ফিরে চললেন। তাঁদের কাজের মধ্যে থেকেও সমসাময়িকতা নির্বাসিত হল। সমকালীনতা থেকে চোখ ফিরিয়ে চলচ্চিত্র কি স্বগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে? পারে না, কোনোদিনই পারে নি।

ছবি সাজিয়ে যাঁরা গল্প বলেন, তাঁদের কথা থাক্; তাঁরা 'চলচ্চিত্রের লোক' নন। যাঁরা জাত চলচ্চিত্র-শিল্পী, তাঁরা আজ পথ-ভ্রান্ত। সৎ উপাদানের জন্যে তাঁরা ফিরে যাচ্ছেন বিগত যুগে, যে যুগ অস্তিত্বহীন। ফলে, তাঁদের ছবি সমকালীন জীবন থেকে বহুদূরবর্তী। অন্যদিকে এঁরা সাহিত্যের দাস হয়ে পড়ছেন, যা মোটেই চলচ্চিত্রিক নয়। দুনিয়ার কটা মহৎ ছবির উপাদান ভিন্নতর শিল্পমাধ্যম থেকে নেওয়া? চাই : মৌলিক দৃষ্টি ও অভিব্যক্তি। এবং আমাদের সৃষ্টির খুব কমই এই কোঠারিতে পড়ে।

আন্তর্জাতিক জগতে, আধুনিক চলচ্চিত্র মৌলিক উপাদান থেকে প্রজাত। অন্য মাধ্যমে

বলা যায় না, এমন বিষয়ও চলচ্চিত্রে ব্যক্ত হতে পারে, এ-বিষয়ে এর আত্মসচেতনতা ক্রমেই জেগে উঠছে। অন্যদিকে, সাহিত্যে দেখা দিচ্ছে অবক্ষয়।

এইসব যখন ভাবি, তখন বাংলা ছবি সম্পর্কে হতাশাই জাগে, তবু আমাদের চলচ্চিত্রের উত্তমর্ণ অহংকারও কম নয়, আসলে যা মিথ্যে এবং অন্যায্য।

চলচ্চিত্র উদ্দেশ্যহীন নিরাদর্শ হতে পারে না। আমাদের চলচ্চিত্রে ঠিক এইটেই ঘটছে। এতে আমাদের চারপাশের জ্বলন্ত বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নেই। চলচ্চিত্রের আদর্শ কী? বাংলা এবং অন্যত্র জীর্ণ ছকবাঁধা ছবির গায়ে যে-সব বড়ো বড়ো গালভরা বুলি লটকানো থাকে, তাদের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি, সচেতনতা ও দায়িত্বজ্ঞানের কথা, জীবনের ছোটো ছোটো বিষয়ের সংশ্লেষে সৎ শিল্পীর প্রতিক্রিয়ার কথা। সাহিত্য আজ ঐ পথ ত্যাগ করেছে, এবং মনে হয়, ফিরে আর আসবে না। আমাদের চলচ্চিত্র তার পদাঙ্ক অনুসারিকা।

এ থেকে যেন না মনে হয়, যাবতীয় আধুনিক ছবি ও সাহিত্যকে আমি বাতিল করে দিচ্ছি। আজও আমাদের সাহিত্য সম্পূর্ণ মৃত নয়, এবং সাহিত্য-নির্ভর সৎ চলচ্চিত্রেরও অভাব নেই। প্রশ্নটা অনুপাত নিয়ে। এবং সেই অনুপাত আমার কাছে 'ভয়ংকর' মনে হয়। চলচ্চিত্রে সাহিত্যের প্রভাবের অনেক ইতিমূলক দিক আছে ; কিন্তু অবান্তর উপাদানের ভিড়ে সে সমস্তই নেতিবাচক হয়ে উঠেছে।

হতে পারে, ভারতের অন্যান্য অংশের চলচ্চিত্রের তুলনায় বাংলা ছবি অনেক যুক্তিসম্মত যথাযথ। কিন্তু সেটাই সব নয়। চলচ্চিত্র একটা আন্তর্জাতিক শিল্প, এবং সেদিক থেকে বাংলা ছবির ত্রুটিগুলি বড়ো হয়ে চোখে পড়ে। বিশ্বচলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সমকক্ষ আমাদের হতে হবে।

বাংলাদেশ জুড়ে এক নতুন জাগরণ এসেছে। বাঙালি দর্শকের একটা বড়ো অংশ সচেতন হয়ে উঠছে। তারা চলচ্চিত্রে বাস্তবতার দাবি জানাচ্ছে। চারিদিকে ফিল্ম সোসাইটি গড়ে উঠছে। তারা চিন্তাশীল দর্শক সৃষ্টি করছে, বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা দিচ্ছে চলচ্চিত্রের স্বাদগ্রহণে। দেখে শুনে, আমার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছে। তখন কলেজ-ছাত্ররা সাহিত্যসভার সভ্য হত আর কবিতা লিখত ; আজ তারা ফিল্ম-সোসাইটির সভ্য হয়।

তার কারণ, বাংলাদেশে, সাহিত্যকে সরিয়ে চলচ্চিত্র সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠছে। যুবক, ছাত্র, কর্মী, সকলেই আজ চলচ্চিত্রীদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করছেন সৎ, উদ্দেশ্যমূলক নির্ভেজাল চলচ্চিত্র। অতীত দিনের কথায় মুখর জোলো গল্প আর উপন্যাস তারা চায় না। তাদের প্রত্যাশা অযথার্থ নয়।

বাংলার সমাজচিত্র ও বাংলার চলচ্চিত্র

আমাদের দেশে যে-সব ছবি হচ্ছে, তার মধ্যে অনেকগুলিই হয়তো ভালো ছবি হচ্ছে— আমি সে-বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করতে চাই না।

একটা কথা আমার মনে হয়, সমাজ-সচেতন শিল্পীর বড়োই দুর্ভিক্ষ দেখা দিচ্ছে এদেশে। মানুষেরা এই ধরনের ন্যাকান্যাকা ছবি দেখে আনন্দিত বোধ করছেন এটা আমার কাছে অসম্ভব কষ্টকর লাগে। শ্রেণীচেতনা মানুষের মধ্যে বড়ো কমে গেছে বলে মনে হয়।

যেমন ধরুন, মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন বড়ো বড়ো শহরে। এঁদের কথা কি আমরা কেউ বলতে পেরেছি? এঁদের প্রতিদিনের চালের দাম বাড়া এবং বাজারে ঢুকলে মাথা ঘোরা ; এগুলি কি ভাষায় সাথি করতে পেরেছি? অথচ এঁরাই হচ্ছেন তথাকথিত বাংলা ছবির প্রধান দর্শকগোষ্ঠী। এঁদের মর্মবেদনা আমরা ছবিতে তুলে উঠতে পারি নি বা এড়িয়ে গেছি।

আমরা এখনও ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের বাংলাদেশকে আঁকড়ে ধরে আছি ; যে দেশ আর কোনোদিন ফিরবে না। বাঙালিরা কাঁদতে বড়ো ভালোবাসে, তাই কাঁদাতে পারলেই দুটো পয়সা পাওয়া যায়।

শ্রমিক শ্রেণী বলে বাংলাদেশে আগে কোনো পদার্থ ছিল না। গত দশ বছরে বাঙালিদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণী জন্মগ্রহণ করেছে। এদের সম্পর্কে উৎপল দত্ত 'ঘুম ভাঙার গান' বলে একটা ছবি করেছিল। সেটা আমি যেহেতু বিদেশে ছিলাম, সেজন্য আমার পক্ষে দেখা হয়ে ওঠেনি। আশা করি সেটা হয়তো মানুষের জীবনযন্ত্রণাকে উচ্চকিত করতে পেরেছে অবশ্য আমার নিজের ব্যাপারটা দেখা নেই। কাজেই মতামত দেওয়ার কোনো অবকাশ আমার নেই।

শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ে আরো বহু আলোচনা হতে পারে, কিন্তু সে অবকাশ আমাদের বর্তমানে নেই। এঁদের সমস্যা, এঁদের প্রয়োজন— তার কতটুকু আমরা ভাবি বা জানি?

কিন্তু বাংলা ছবি করতে গেলে এঁদের কথা আমাদের তুলতেই হবে এবং এঁদের মুখে ভাষা দিতে হবে, এ না হলে আমরা নিজেদের শিল্পী হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করব। অন্তত করা উচিত।

কৃষক শ্রেণী। এঁদের উপরে কোনো ছবি আমরা কেউ কোনোদিন করি নি, আমরা প্রত্যেকেই একই দোষে দোষী। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষ হচ্ছেন কৃষক, অথচ তাঁদের সম্পর্কে কোনো ছবি আজ পর্যন্ত ভদ্রভাবে হয় নি। যতদিন না পর্যন্ত আমরা তাঁদের কাছে পৌঁছব ততদিন পর্যন্ত বোম্বাই-এর অত্যন্ত সস্তা এবং কুশ্রী ধরনের ইতর ছবিগুলি এঁদের মনোরঞ্জন করবে।

এদের জীবন, আপনারা যদি গভীরে প্রকাশ করে দেখেন, অত্যন্ত একঘেয়ে। তার মাঝখানে মেক-আপে এইসব সাজিয়ে গুজিয়ে গড়া মেয়ে আর কতকগুলো কাল্পনিক চরিত্রের ছেলেগুলো এবং তাদের ভিত্তিতে এরা একটা স্বপ্নরাজ্য করে তুলল। তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগাযোগ নেই। অথচ আমাদের চাষিদের জীবন গভীরভাবে দেখেছেন?

কী অপূর্ব জীবন-যন্ত্রণার পরিচয় এবং মানুষের ভালোবাসার প্রকাশ ; কী সুন্দভাবে ছবিতে ধরা যায়, তার তুলনা হয় না। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি প্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবন সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার। সবচেয়ে বেশি স্নেহ-পরায়ণ। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

শিল্পকে সৌন্দর্যনিষ্ঠ হতে হবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎপূর্বে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। সত্য সামাজিক প্রয়োজননিষ্ঠ না হলে কোনো শিল্পই শিল্প পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয় না। কথাটা যেন আমরা মনে রাখি।

বাংলা চলচ্চিত্রের তথাকথিত সংকট

ছবির জগতে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে আমাদের ভারতবর্ষে। বোম্বাইতে এই সেদিন তুলকালাম হয়ে গেল, দিল্লির গণ্ডগোল আজও মেটে নি, কলকাতায় ডামাডোল তো লেগেই আছে। ঘটনাটি সাধারণ লোকের কাছে প্রকট হয়ে উঠেছে ছবিঘরগুলোতে ধর্মঘট হওয়ার জন্য। এ লেখা যখন আমরা লিখছি, তখনও সে ধর্মঘট মেটার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ছাপার অক্ষরে বেরোতে বেরোতে এর একটা সমাধান বেরিয়ে পডবে। কিন্তু বাংলা ছবির যে মূল সমস্যা ; সেটা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তার সমাধানের পথ বুদ্ধিবিবেচনাপ্রসূত সংগ্রামের পথ।

এত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ঠিক ভাবেই হোক বা ভুল ভাবেই হোক, আমার মতে ভুল ভাবেই, বাঙালি জনসাধারণ ছবিটাকে ধরে নিয়েছে সংস্কৃতির একটা বাহন হিসেবে। এই নিয়ে তারা গর্ব করে থাকে। আমাব তো চোখে পড়ে না, বিশেষ কিছু গর্ব করার মতো বস্তুর। বেশির ভাগই বস্তাপচা, সেকেলে। তবু 'আমার সোনার বাংলা'— এটা মাথা থেকে আমাদের এখনও ঘোচে নি।

বাংলা ছবির সমস্যা বর্তমানে চতুর্বিধ। যে-সমস্ত চেষ্টা-চরিত্র করা হচ্ছে পশ্চিম বাংলা চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির পক্ষ থেকে তাতে হয়তো সমস্যার আশু কিছু লাঘব হবে। কিন্তু এখনও হয়নি। তারই ভিত্তিতে দুটো কথা বলতে চাই।

প্রাথমিক স্তর হচ্ছে, ছবিঘরগুলোর মালিকের সঙ্গে শ্রমিক-কর্মচারীর বিরোধ। ধর্মঘট হয়তো একদিন অবসান হবে, কিন্তু এ গণ্ডগোলটা থেকেই যাবে। ভাবতে পারেন আপনি, পৃথিবীতে মাত্র দুটো ব্যাবসা আছে, যারা ছয়শো শতাংশ লাভের স্বপ্ন দেখতে পারে? এমনকি যে ইস্পাত শিল্প, তারাও যদি তাদের অংশীদারকে চার শতাংশ বছরে লভ্যাংশ তুলে দিতে পারে, নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু যারা যুদ্ধের মারণাস্ত্র তৈরি করে, তারাও কমসে কম ছয়শো শতাংশ লাভ না হলে নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে মনে করে। সারা পৃথিবীর যত অশান্তি, মায় ভিয়েৎনামের যুদ্ধ, এরাই চাগাড় দিয়ে রেখেছে, ওদের মাল কাট্‌তি হবে বলে। আর দেখলাম বাংলাদেশের ছবিঘরের মালিকরা। এরা ১০ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা মুনাফা না এলে মনে করে এদের প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। সাধারণ শ্রমিকদের

৮ টাকা মজুরি বাড়াতে এদের ঘোরতর আপত্তি ; অথচ এরা এমন একটা ব্যাবসা করে যেখানে লাভের গুড় সংরক্ষিত। মানে, এঁরা চুক্তি করে নেন প্রযোজক-পরিবেশকদের সঙ্গে যে আমার এই ন্যূনতম মুনাফা স্বীকার করে নিয়ে তবে তোমাদের ছবি বাজারে দেখানো হবে।

শ্রমিকদের এই আন্দোলন সার্থক হোক, কারণ আঘাতটা হানতে হবে এই প্রদর্শকদের ওপরই। এঁরা বড্ড লাই পেয়ে গেছেন, ফুলতে ফুলতে এঁরা এক-একজন 'তিমিঙ্গিলে' পরিণত হয়েছেন। 'এঁরা' বলতে আমি সমস্ত প্রদর্শকদের কথা বলছি না, যে ৪/৫টি নাটের গুরু তাঁদের কথাই বলছি। বাকি যে শত শত সাধারণ প্রদর্শক তাঁরা আপনার-আমারই মতো মধ্যবিত্ত ব্যক্তি। তাঁদের দুঃখদুর্দশা আপনার-আমার মতোই, কিন্তু ঐ বড়োগুলোর ভয়ে এঁরা মুখ খুলতে পারছেন না।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা। এখানে আসে স্টুডিও এবং সাধারণ ভাবে প্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মানুষের বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার কথা। এখানে মানুষ খাটে, ভালোমন্দ যা-কিছু একটা প্রাণ দিয়ে করার চেষ্টা করে, তার জন্যে ব্যক্তিগত আত্মোৎসর্গের প্রচুর নমুনা রেখে যায়— এবং শেষে দেখে যে সে কেউ নয়, প্রদর্শকরাই সব।

এরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে আজকে বাংলা দেশে চলচ্চিত্রের শ্রমিক, কলাকুশলী, প্রযোজক এবং পরিবেশকরা একত্রে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নেমেছেন। এখানেও নাটের গুরু সেই প্রদর্শক। তারা ছবির আয়ের ৭০ ভাগের বেশি নিয়ে চলে যায়, এক পয়সাও ছবির জন্য খরচ না ক'রে। যে সামান্য ৩০ ভাগ প্রযোজনা বিভাগের হাতে আসে, তাও নানা টালবাহানা করে আসে। ফলে মানুষদেরকে সময়মতো মাইনে দেওয়া যায় না, বিভিন্ন ইতর কালোবাজারি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং শেষ বাংলা ছবি সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা হয়ে যায়।

বেশ কয়েক বছর আগে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, আমাকে একটা সুরাহা করার পথের নিশানা খুঁজতে বলেছিলেন ; আমি বলেছিলাম, সারা দেশের ছবিঘরকে জাতীয়করণ করার কথা। এই একটা ধাক্কাতেই চিত্রশিল্পের সব সমস্যার এক মুহূর্তে সমাধান হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের চিত্রশিল্পটি হচ্ছে একটি ফুটো চৌবাচ্চা, ওপর থেকে যতই জল ঢালুন, ঐ তলের ছ্যাঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে যায়। কোনো জল দাঁড়াতে পারে না। বাইরে থেকে লোক আসে টাকা নিয়ে, ছবিতে সে টাকা ঢালে, লাভের গুড় প্রদর্শকরা খেয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু জন্মেও এক পয়সা তারা ছবি করার জন্য ঢালে না। ফলে, এ ব্যাবসায় যে পয়সা আসে সেগুলো হাতফেরত হয়ে এ ব্যাবসাতেই আর ফিরে আসে না। কাজেই মার খেতে খেতে এ ব্যাবসার এখন নাভিশ্বাস উঠছে। কর্মচারী, শ্রমিক ও শিল্পীদের চূড়ান্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এর একটা প্রতিকার চাই।

তৃতীয় দিকটাতে আসা যাক। বাংলা ছবি নাকি সংস্কৃতি ও শিল্পের ধারক ও বাহক, কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, একটা ভালো ছবি করার চেষ্টা করে দেখুন তো। বারোটা বাজিয়ে দেবে। আমি এখানে ভালো ছবি বলতে সাধারণ, সৎ এবং সুন্দর ছবির কথাই বলছি। যে চিত্রশিল্পকে আমি মনে প্রাণে ভালোবাসি তার কথা বলছি না। এই তো

ক'দিন আগে আমাকে এক প্রদর্শক বললেন, 'মশায়, একটা 'কলিতীর্থ কালীঘাট' জাতীয় ছবি করুন তো, যাতে দর্শকরা এসে রুপোলি পর্দায় মুঠো মুঠো পয়সা ছুঁড়ে দেয়। ঐগুলো বেচে আমরা দুপয়সা পাই।'

এই সব কথাও আমাদের আজ শুনতে হয়। এ-ঘটনার সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের আর্থিক অবস্থাটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঠিক হিসেব বলতে পারব না, তবে আন্দাজে একটা পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ পর্যন্তর মধ্যে বছরে গড়ে ৬০ খানা করে বাংলা ছবি হয়েছে। সেখানে তখন হিসেব করলে দেখবেন, আপনারা যাদেরকে প্রগতিশীল বলেন সেই-সমস্ত পরিচালক ছবি করার সুযোগ পেয়েছেন, ভালো বা মন্দ যাই হোক। সেখানে ১৯৬৭-তে মাত্র ২৪টা ছবি হয়েছে, এবং এ বছরে ১৫টার বেশি ছবি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এই দুর্ভিক্ষের বলি কারা? যাঁরা গতানুগতিক ছবি করে যান তাঁরা কেউ নন, ঐ নতুন ধরনের ছবি-করিয়েরা। তাঁদের মধ্যে কেউ ২ বছর, কেউ ৫ বছর বেকার বসে আছেন। এবং ঘটনাটা ঘটছে ঐ প্রদর্শকদের অঙ্গুলি হেলনে।

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

এইবার কথা আসে চতুর্থ স্তরের, সেটা উত্তুঙ্গ শিখরের কথা। যেখানে মানুষের ধ্যান-ধারণার প্রশ্ন, সমাহিত হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশ্ন। সেখানে মানুষ সম্পূর্ণ একলা, কারণ সর্বজগতের সঙ্গে সে লীন হয়ে গেছে। সেই স্বপ্নকে টেনে নিয়ে এসে ছবিতে গাঁথা বড়ো দুরূহ কাজ। সারা পৃথিবীতে ছবির কতরকমই না রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। এদেশে সেগুলো করার কোনো উপায় নেই। বড়ো করে ভাবনা আমাদের ভাবতে দেয় না, এই প্রদর্শকরা। আমরা তাদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য, কারণ আমরা মানুষের সামিল হতে চাই, নিজের একাকিত্বের মধ্যে দিয়ে। অথচ এ ডাক যে শুনেছে তার রক্তে আর কিছু খেলে না। তাকে ঘরছাড়া হয়ে বেরুতেই হবে। এ নিয়ে কোনো আন্দোলন চলে না, এখানে যা হবার তা হবেই, যার করবার সে করবেই। কিন্তু সামনে অচলায়তন হচ্ছে ঐ বড়ো বড়ো প্রদর্শকগুলো, তাদের বোকা বোকা কাঠ রসিকতা এবং খুনে প্রবৃত্তিগুলো।

কিন্তু শেষ কথা হচ্ছে, দর্শক। আপনারা কী করছেন? আপনাদের কি কোনো দায়িত্ববোধ নেই? বর্তমানে বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রধানত দুটি ধারায় বইছে— সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র। তার একটাকে আপনারা এইভাবে পঙ্গু করে রাখবেন? আমাদের বিকৃত রুচিকে আরও বিকৃত করার জন্য আপনারাই তো দায়ী। ঘৃণ্য জিনিসকে বর্জন করুন। ভদ্র যা তাকে গ্রহণ করুন। এই-সমস্ত সমস্যা এক ফুঁয়ে— 'মিলি মিলি যাওব সাগর লহরী সমানা।'

আপনাদের হাতেই তো চাবিকাঠি।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আমি এখানে কিছু বহু বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করব। ছবিটা এদেশে হয়ে চলেছে, এবং মাথামুণ্ডু কিছু বেরোচ্ছেও, লোকে দেখছেও সেগুলো, কিছু পয়সা ও পসার কারো কারো ঘরে জমাও পড়েছে। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন আধ-খেঁচড়া। এ ঘটনাগুলির নকশা হয়তো আছে, কিন্তু স্থির কোনো পরিপ্রেক্ষিত ভেবে পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগোনোর কোনো দিক্‌নির্দেশ নেই। নেহাতই স্রোতে ভাসমান ঘটনাবলী।

ছবিকে আমরা শিল্প বলি। কথাটা বাংলার শিল্প কিন্তু ইংরাজি Art এবং Industry, দু-মানেতেই বাংলাতে শিল্প কথাটা বলা হয়ে থাকে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভুয়ো। কোনো অর্থেই আমাদের দেশে, সাধারণভাবে ছবি শিল্প নয়। শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ছবি দেখলেই ভুক্তভোগীর কাছে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। রসতত্ত্ব বা সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো প্রকার আকর্ষণ কোনো ছবি-করিয়েদের নিয়ন্ত্রণ করে না, ব্যাবসা-বাণিজ্যের নিম্নতম মানটুকু ঘোড়দৌড়ের জুয়োর মতো বেহিসাবিভাবে তলিয়ে যায়। যদিচ অতি বড়ো ঠোঁট-কাটা লোকের পক্ষেও এইসব পাপকার্য করার দোষারোপ করা সম্ভব নয়। এ-সব খবর কেমন করে জানি না সাধারণ্যে প্রচার হয়ে গেছে। আমি কিন্তু শুধু বাংলা ছবির কথা ভেবেই এ-সব বলছি না। বলছি সারা উত্তর ভারতের কথা ভাবেই। সামগ্রিকভাবে এদিকে তাকালে দেখা যায় যে, ভাবখানা এইরকম— 'এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই।'

অপূর্ব পরিবেশ! এমনটা ঘটছে কেন?

—সমাজ ব্যবস্থা। মূলগত ভাবে।

এ নিয়ে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে লাভ নেই। যুগ বদলে যারা তপস্বী, তাঁরা সেই সাধনায় মগ্ন, যাতে করে সব-কিছু জীর্ণ করে বিদীর্ণ করে কেটে বেরিয়ে আসে সেই অনাগত শিল্প যার স্বপ্ন যুগ যুগ ধবে মন্ত্রদ্রষ্টারা দেখে এসেছেন। আপাততর জন্যে বানরদের নাচ সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। তাবই মধ্যে গুঁতোগুতি করে কনুই-এর কান্নিক মেরে একটু জায়গা করে নেবার প্রশ্ন। এখন কীভাবে সেটা করা যায়, সেই নিয়ে চিন্তা বিভিন্ন মহলে আরম্ভ হয়ে গেছে। নানারকম চেষ্টাও শুরু হয়েছে, যাদের গুরুত্ব মোটেই কম নয়। আমারও কিছু প্রস্তাব ছিল। সেটা আমি বার বার গত কয়েক বছর ধরে মেলে ধরার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু কিষ্কিন্ধ্যাবাসীর কানেও তুলেছি, যখন সরকারি চাকরির বিড়ম্বনায় ব্যাপৃত ছিলাম, এবং তৎপূর্বে ও পরে। কাজ হয় নি। আমি যা বলতে চাইব, সেটাই বর্তমান সামাজিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব কি না বা উচিত কি না সুধীজন ভেবে দেখতে পারেন।

জাতীয়করণ। সোজাসুজি দেশের সবকটা চিত্রগৃহ রাতারাতি সরকারি সম্পত্তি করে ফেলা এবং সেই সম্পত্তি স্বয়ংচালিত একটা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যেমন হয়েছে আমাদের জীবনবীমার সংস্থার ব্যাপার। শুধু ছবিগুলোকেই কেন? তার প্রধান দুটো কারণ প্রথমত ছবিতে পয়সা আসে এই ছবির গড়গুলোর মাধ্যমে, অথচ এর মালিকরা খুবই কম মামলায় এঁদের অর্জিত অর্থ আবার ছবি করার ব্যাপারে, প্রযোজক হিসেবে লগ্নী করেন। দাদন দেন ঠিকই। ছবি করার বিভিন্ন অধ্যায় তাঁদের বেশ-কিছু লোন দিয়ে থাকেন। তাও

আবার সুদে আসলে নানা প্যাঁচের মধ্যে ঘরে তুলে ফেলেন। এবং আবার ছবি করার উৎসাহ দিতে প্রযোজক হিসেবে এঁরা নারাজ। এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো শহরে মালিকদের সম্পর্কে।

আমাদের দেশে ছবি করার ব্যাপারটা এমনই যে তাকে একটা ফুটো চৌবাচ্চার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাতে যতই জল ঢালা যায়, ফুটো দিয়ে সব বেরিয়ে যাবেই, জল দাঁড়াবে না। ছবিঘরের মালিক তিসির ব্যাবসা করবেন, চালকল করবেন, ছেলের সুবিধের জন্যে সুইজারল্যান্ডে বাড়ি করে দেবেন, কিন্তু ফিল্মে? নৈব নৈব চ। ও বড়ো ঘোঁটালো ব্যাপার, পয়সা চোট খেয়ে যেতে কতক্ষণ? যদিও পয়সাটা আসছে ঐ চোট খাওয়ার জায়গা থেকেই। তার ওপরে এমন লাভ তো কোনো ব্যাবসায় নেই। বড়ো কোনো শহরে একটা ছবিঘর তৈরি করতে পারলে আর মারে কে? একমাত্র গোলাগুলির কারখানা আর ছবিঘরে শতকরা ছয়শো-সাতশো শতাংশ লাভ। ভাবা যায়? তার ওপরে এই একটা ব্যাবসা, যেখানে নিম্নতম লাভের অঙ্ক বাঁধা— সেই লাভটুকু বজায় না থাকলেই চলন্ত ছবিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায়। আর বেশি লাভ হলে তো কথাই নেই। আবার এই ছবিঘরগুলোর অন্যান্য আয়ও আছে যেগুলো শুল্কের আওতায় পড়ে না। যেমন Slide দেখানো. বিজ্ঞাপনের ছবি দেখানো, বাইরে রেস্তোরাঁ করার জন্য ইজারা দেওয়া— আমদানি এ-সবেও মন্দ হয় না। এরাই প্রধানত ছবি তৈরির রুচি তৈরি করে দেন। আর এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেন এই ব্যাবসার কুসীদজীবীর দল। অত্যন্ত চড়া সুদে এবং একটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ সময়ের জন্যই এই টাকাটুকু ঠিক ফেরত দিতে হয়। সাধারণত প্রযোজক এবং পরিবেশক হচ্ছেন ঠুটো জগন্নাথের দল— ফালতু ফড়ে। এঁরা সাহেবদের স্যান্ডউইচের মতো দুপাশেতে দুই (একটা ছবি করার গোড়ার দিকে, অপরটি একেবারে শেষে) শোষণের বস্তু বা চিনির গাধা হয়ে আছেন। তবে স্যান্ডউইচের মধ্য ভাগে সার পদার্থ থাকে, এরা সে হিসেবে তার থেকেও নিকৃষ্ট।

খবরের কাগজকে আহ্লাদ করে ইংরেজিতে বলা হয় The Fourth Estate বা সাধারণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। সে হিসেবে ভারতের মতো অশিক্ষার দেশে ছবি হচ্ছে Fifth Estate এবং অনেক বেশি শক্তিশালী জনমত তৈরি করার মাধ্যম। সারাদেশের অগুনতি মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ঐতিহ্যগত মূল্যায়ন, ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং সর্ববিধ মনুষ্যকর্মের রুচি তৈরি করে এই ছবি। মানুষের স্বপ্নবিহারের গতি-প্রকৃতিও নির্দেশ করে এই ছবি। 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'-গোছের ব্যাবসারও উত্তুঙ্গ চূড়ায় এই ছবি। এখানে ধার-টারের কারবার চলে না, সব নগদ দিলেই পর নয়। এবং এই-জাতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে এদেশে শ্রীবিষ্ণুর কোনো এক অবতার দল। ভাবা যায়?

মিছিমিছি জনতাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই ; লাভ নেই ছবি-করিয়েদের দোষ দিয়ে। সব দিক থেকে বুভুক্ষু জাতি এবং মরণোন্মুখ ছবির দালাল, যথা প্রযোজক, পরিবেশকগোষ্ঠী— এরা যা করতে বা হজম করতে চায়, তাই পায় বলে একটা বেশ-কিছু লোকের ঠোঁটের আগায় লেগে আছে। কথাটা প্রধানত মিথ্যা। যৌন ক্ষুধা এবং বাস্তব সমস্যা থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি যে কাজ করছে না, এ-সব নয়। কিন্তু সেটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। সমাজের একটা অংশ নিয়ত নানা প্রকার মানসিক ব্যাধিতে ভুগে মরা খেটে খাওয়া জাতির

একটা অংশ। কিন্তু অসুখ প্রধানত স্বাস্থ্যের অস্তিত্ব হিসেবেই বর্তমান এ কথা ভুললে চলবে না। ভেবে দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়— কত কোটি কোটি টাকা ঢালা হয়েছে এবং হচ্ছে অসুস্থ ছবি করা এবং তাকে বিজ্ঞাপিত করার পেছনে। এবং সেটা চলে আসছে প্রায় অর্ধ শতাব্দীর মতো সময় ধরে। সেখানে ভালো ছবি করতে বা দেখতে উৎসাহ দেবার জন্যে ক-পয়সা খরচ করা হয়েছে? সেটা চিন্তা করলেও স্তম্ভিত হতে হয় যে তবুও কিছু হয়েছে বা হচ্ছে। মানুষের 'মাথা ধোলাই' নিয়ে যে উৎকট প্রচার সর্বত্র বিকট মুখব্যাদান করে হুংকার দিচ্ছে, তাদেরকে বলা যায় যে, এই দেখো, এদেশ সব চাইতে ভালো মগজ ধোলাই করার কল আমদানি করা হয়েছে, মার্কিন মুলুকের হলিউডি ধাঁচের ঔরসজাত, ঔপনিবেশিক— মধ্যযুগীয় সামাজিক, ধার্মিক কাঠামোর ছবিগুলো।

উপযুক্ত তিনটি দল— অর্থাৎ পরিবেশক, প্রযোজক ও পরিচালক, এদের সবার মধ্যেই মাননীয় ব্যতিক্রম আছে, একটা কথা ভালো করে মনে রেখেই আমার আগের মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা মোটেই দলে ভারী নন। কাজেই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে— জাতীয়করণ। সব ছবির প্রদর্শনীর জাতীয়করণ।

এবং আর-একটা কথা। এমনভাবে চোট খেয়ে প্রযোজকের দল যদি শুধু পালাতেই থাকে, তা হলে ছবি অনবরত তৈরি করে যাবার ব্যাপারটা ঘটছে কী করে এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগরূক হতে পারে। কারণ অতি তুচ্ছ এবং জলের মতো পরিষ্কার। রেসের মাঠে, গণিকালয়ে যে কারণে ভিড় জমে, ঠিক তারই কাছাকাছি কারণ। নতুন কচি পাঁঠার অভাব কোনোদিন হয় নি, হবেও না। তাঁরা পরার্থে অর্থ, রমণী এবং খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নাম এবং ছবি দেখা— নিঃস্বার্থ ভাবে এইসব সাধনায় নিমগ্ন। রমণী কথাটা তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সংগ্রাম চললে চলতেই থাকবে, তবে অন্যস্তরে এবং বোধ হয় একটু উন্নত স্তরে। এতে সম্ভাব্য ভালো এবং খারাপ কী হতে পারে, তার একটু পর্যালোচনা করা যাক। আর যদি কোনো প্রতিরোধক (সরকারি 'নিরোধ' নয়।) থাকে কোনো অনিষ্টকারী ঝোঁকের, সে কথাও ভাবা যাক। ভালোগুলোই আগে ভাবি। যদিও এতে রাতারাতি রাজি হওয়ার স্বপ্ন না-দেখাই ভালো।

প্রথমত সরকারের ঘরে প্রচুর টাকা আসবে। এখন হিসেব করলে দেখা যায়, প্রদর্শকরা ছবির আয়ের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নিয়ে যায়। লাভের বেশ-কিছু অংশ সুদ হিসেবেও বেরিয়ে যায়। সরকার নিশ্চয়ই অতখানি খুলেভেবে টাকা লুটবেন না। ফলে লগ্নী টাকার লাভের প্রায় পঞ্চম ভাগ অংশ তার থাকবে এবং সাধারণ প্রযোজক বেশি আয় করার দরুন আবারও ছবি করতে উৎসাহিত বোধ করবেন। ফলে এ-শিল্পে সংশ্লিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলীর, চাকরির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। দ্বিতীয়ত, কালো টাকার (সেটা শিল্পী বা প্রদর্শক বা র্ফাণ্ডওলার— যারই হোক) বাজারে টিকেথাকা কঠিন হয়ে পড়বে। ছবি, সে যে-ছবিই হোক-না-কেন, তারকা-খচিত নামাবলী গায়ে জড়িত থাক্ না থাক্, সেটা বহুমূল্যে তৈরি বা অল্পে শেষ করা হোক— পৃথিবীর আলো ন্যায্য ভাবে দেখতে পাবে। এই কথাটা এখানে মনে রাখা দরকার যে ছবি সেন্সরের তারিখ অনুসারে বাজারে বেরোনোর গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে হবে, তা হলে প্রযোজকরা আর মিছিমিছি কালো টাকা দেবার জন্য এর-ওর দোরে ছুটোছুটিও করবেন না আর কাউকে তেল মাখাতেও যাবেন না। অথবা বিনিদ্ররজনী

কাটাবেন না হিসেব কারচুপি করে সরকারি শুল্ক বা কর ফাঁকি দেবার চেষ্টায়। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে আয়করের জন্য খাতা মেলাতে ওস্তাদ হওয়াটাও এক মহাপ্রতিভার পরিচায়ক।

তৃতীয়ত, এই সব Film Finance Corporation বা Children Film Society -জাতীয় পরিপুষ্ট করে রাখা কেচ্ছাগুলো করে দেশের করদাতাদের গুচ্ছের টাকা ফুঁকে দেবারও দরকার পড়বে না। কারণ, সরকার তখন ইচ্ছে করলে ছবিঘর থেকে আয়ের একটা অংশ ভালো সাধারণ ছবি বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য লগ্নী করার অবস্থায় থাকবেন। এখানে সরকারি অর্থনৈতিক মন্ত্রকের হাত ঢোকানো বন্ধও করা যেতে পারে, যদি একটি স্বয়ংশাসিত কর্পোরেশনের হাতে সমস্ত ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া যায়। এমন একটি কর্পোরেশনে ছবির জগতের সমস্ত রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠন থেকেই সমানসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে এবং তার সঙ্গে সরকার আর বিদগ্ধ সমাজের কিছু ব্যক্তিকে জড়িত করে তৈরি করলে মোটামুটি কাজ-চালানো-গোছের ব্যাপার দাঁড় করিয়ে ফেলা যায়।

চতুর্থত, যেটা অত্যন্ত জরুরি, সেই রুচির প্রশ্নে আসা যায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে-সব বুকনি দিয়ে বাজার গরম করে, তারই একটির ভিত্তিতে রাজনৈতিক বা অন্যান্য নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ঘটনাগুলোর ওপরে চাপ না দিয়ে ছবিকে ছবি হিসেবে দেখে অভদ্র ইতর ঝোঁকগুলোকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টার একটা বিরাট রাজপথ বেরিয়ে যাবে। এই ধরনের কর্পোরেশনের জন্মের পরে আজকালকার প্রচলিত সেন্সর বোর্ডের কাজ অনেক লাঘব হয়ে যাবে। ছবি-করিয়েরা ঘাবড়ে চলতে বাধ্য হবে। কারণ একে মেনে না চললে ছবির মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

পঞ্চমত, এইভাবে আয় করা টাকার অংশবিশেষ দিয়ে এদেশে এই শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করার কারখানা ইচ্ছে করলেই করা যায়। আমাদের দেশে চেষ্টাচরিত্তির করে কাঁচা মাল (সাদা-কালো) তৈরির একটা কারখানা হয়েছে। এবং এইসঙ্গে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি গোছের কর্তারা রঙিন কাঁচামালের কারখানা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছেন এখনই। অথচ ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় আরো বেশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলোর কথা ভাবাই হচ্ছে না। আমাদের দেশে রঙিন ছবি বেশি তৈরি হয় না। কিন্তু এ-সব যন্ত্রপাতি না থাকলে ছবি করতে এক পাও এগোনো সম্ভব নয়। বেশি কথা কী, একটা সাধারণ ভালো filter কিনতেও বিদেশী মুদ্রা অন্য দেশকে ঢেলে দিতে হবে। সে বিদেশী মুদ্রা বাঁচে এবং দেশের দশটা অন্যান্য কাজে লাগে। যদি আমাদের কর্মীদের এইসব যন্ত্রপাতিব কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়। হাতের সামনে জাপানকে দেখেও আমাদের শিক্ষা হয় নি। একটু খাটলেই আমাদের শিল্পী মিস্ত্রি-রা এ-সব কাটুম-কুটুমের কায়দাই রপ্ত করে নিতে পারে।

ষষ্ঠত, এমনটি করলে ছবির জগতের সমস্ত কর্মী শ্রমিকদের চাকরি পাকা এবং উত্তরোত্তর উন্নত হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে অর্থাৎ এই ডামাডোলের বাজার থেকে বেরিয়ে আসার পথের হদিশ মিলবে, সরকার বীমা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেমন করেছিলেন তেমনি বর্তমানে কর্মরত কর্মীদের দিয়েই সব কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন।

শেষত, মহৎ শিল্প সৃষ্টি করার একটা আবহাওয়া গড়ে উঠবে। বিদেশে ভারতের নাম

উজ্জ্বল করার একটা প্রশ্ন আছে। আছে দেশের অন্তরাত্মার স্ফুরণের প্রশ্ন। ছবিটা আন্তর্জাতিক বটে, জাতীয় শিল্পও বটে। সমাজের সরোবরে যে কেমন তরঙ্গভঙ্গের আন্দোলিত ঢেউগুলো এঁকে সর্বদিক দিয়ে নাড়া দেবে এবং যথাযথভাবে স্ফূর্তি লাভ করবে। ভালো ছবি ওঠার অর্থনৈতিক সম্ভাবনাটা এখানে আমাদের ভুললে চলবে না। যে মুহূর্তে কালো টাকা সর্বস্তরে এবং মারাত্মক সুদখোরের লীলা সাঙ্গ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছবি করার খরচ অনেক কমে যাবে, ফলে অনেক বেশি ছবি উঠবেই। তার সঙ্গে মহৎ শিল্পকর্মের জন্মের পথ প্রশস্ত হবে।

ছবিগুলোকে জোর করে চালাতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি দেবার ব্যাপার নেই। ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম— যে ছবির মুরোদ আছে, সে চলবে— যার নেই, সে অন্তত একটা ভদ্র পরীক্ষার অবকাশ পাবে তার মান যাচাই করে নেবার। ছবির জগতের মহাপাপ যে Minimum Guarantee ন্যূনতম লাভের অংশ বেঁধে দেওয়া, সেটি চলবে না। কিন্তু Hold over figure, অর্থাৎ হপ্তায় একটা ন্যূনতম বিক্রির আশ্বাস নিশ্চয়ই থাকবে, যাতে করে কোন্ ছবির কীরকম কদর, তা বুঝে নেওয়া যাবে। এ ছাড়াও বহু ছোটোখাটো ব্যাপারে এই ধরনের ঘটনায় লাভ হতে পারে। সর্বোপরি, সমস্ত কর্মকাণ্ডটা একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে, একটা সুপরিকল্পিত ছকের মধ্যে ধরা পড়বে। পয়সা ছয়লাপ করে 'হরে রমা, হরে রমা' করে ছুটে বেড়াতে হবে না কাউকেই— না সরকারকে, না অর্থ-আদায়কারীকে। এইভাবে ভাবতে আরম্ভ করলে আরো অনেক দিক তুলে ধরা যায়। সেটা দয়া করে ভাবলেই হয়।

তা হলে কী ধরনের সুবিধাগুলো আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে?

২

জাতীয়করণ করলে কী ধরনের সুবিধাগুলো আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে?

বিভিন্ন স্তরের দেশের মানুষের কাছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা এনে দিচ্ছে। যেমন জনসাধারণ। তাঁরা পাচ্ছেন আরো অনেক বেশি ছবি। কারণ তখন ছবি করার দামটা কৃত্রিমভাবে ফাঁপিয়ে মারাত্মক খুনে একটা চেহারা করার পথে প্রচুর প্রতিবন্ধক খাড়া হয়ে দাঁড়াবে। আর বেশি ছবি মানেই আনুপাতিক ভাবে ভালো ছবির বাড়তির দিকে মোড় ঘোরা।

প্রযোজক।— টাকা লাগাতে হচ্ছে কম। এর-ওর-তার পায়ে ধরে বহু পরিচর্যা করে ছবি চালু করে এমন ভাবে সশঙ্ক দৃষ্টিতে বানের জলে বাঁধে ফাটল ধরছে কি না, তারই প্রহর গুণতে হবে না। নিজের পছন্দমতো, কোনো তারকা বা পাওনাদারের রুচির হিসেব রাখতে হচ্ছে না। আর ঘরেতে টাকাটা ন্যায্য লাভ সমেত ফিরে আসার সমূহ অবকাশ দেখা দিচ্ছে।

স্টুডিও ল্যাবরেটরি।— বেশি কাজ মানেই বেশি আয় হওয়া। কাজেই ব্যাবসার দিক থেকে এইসব কারখানার মালিকের সামনে বিরাট বাধা সরিয়ে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথের জঞ্জাল দূর করে দিচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন যন্ত্রপাতি আনার জন্য ন্যায্য শর্তে ধার পাবারও একটা উৎস তাঁদের সামনে খুলে যাচ্ছে। পরিবেশকও প্রযোজকের মতোই লাভবান হচ্ছেন। তাঁরা যেমন ধার-দেনেওয়ালাদের কাছ থেকে আর Print, Publicity,

Advance, Loan পাচ্ছেন না, তেমনি চিত্রগৃহের কর্পোরেশনের কাছে ছবি বাঁধা রেখে সেই টাকাটুকুই তুলতে পারছেন। গোড়ায় অসুবিধে যে হবে সে তো জানা কথা। একটা নক্‌শা থেকে অপর একটা ধাঁচে ফেলতে গেলেই সাধারণ মানুষের প্রথাগত মন সায় দেবে না। হাতে-কলমে কিন্তু একবার দেখাতে পারলে ব্যাপারটা জমে যাবে। এই প্রসঙ্গে বোম্বাই-এর একটা ঘটনা উল্লেখ করলে আমি যা বলতে চাই, তা প্রাঞ্জলই হবে মনে হয়। প্রথমে যখন মাদ্রাজ থেকে হিন্দি ছবি করা আরম্ভ হল, তখন বোম্বের কোনো শিল্পী ওখানে যেতে চাইত না। কিন্তু মাদ্রাজের প্রযোজকদের দৃঢ় ব্যাবসাবুদ্ধি এবং পরিষ্কার সোজা ব্যবহার এখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে, মাদ্রাজের কাজ পেলে শিল্পীরা বোম্বাই-এর বহু প্রযোজকতে ফিরিয়ে ঐখানে কাজ নেয়। কারণ তারা দেখেছে, দক্ষিণের মানুষ এককথার মানুষ, টাকা অনেক বেশি দেবে, ঠিক সময়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে, আতিথেয়তার কার্পণ্য করবে না, আর সম্মান দেবে।

এবার কলা-কুশলী, শ্রমিক-কর্মচারীর কথা— এঁরা ভীষণ ভাবেই অবস্থার উন্নতি করার সুযোগ পাবেন। সংঘবদ্ধ সংগ্রাম করার একটা অদম্য উৎসাহ পাবেন। ন্যূনতম মজুরির ডাক ছেড়ে ন্যায্য মজুরির শ্লোগানে তাঁরা পৌঁছতে পারবেন। যে কর্পোরেশন কোটি কোটি টাকা লাভ করবে, যে কর্পোরেশন জনগণের নির্ধারিত সরকারের সঙ্গে সম্পর্কিত, তার পক্ষে এ দাবি এড়ানো একরকম অসম্ভব। এইসঙ্গে সঙ্গে নতুন যন্ত্রপাতি নাড়াঘাঁটা করে নতুন নতুন যন্ত্রকৌশল মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করে কলাকুশলীরা পৃথিবীর যে-কোনো শ্রেষ্ঠ দেশের কর্মীদের মতো উন্নত হতে পারবেন। আর এই জাতির আস্তাবলের মতো স্টুডিও Floor আর মান্ধাতাব চোদ্দপুরুষের আমলের প্রায় অকেজো খারিজ হয়ে যাওয়া যন্ত্রে ভেল্কি দেখাবার ধ্যানে সমাহিত হয়ে থাকতে হবে না। অর্থাৎ পেটের ও চিত্তের দুই-এর সুরাহা হবার পথ দেখা দেবে।

সরকার— লভ্যাংশ ন্যায্যভাবে প্রযোজক-পরিবেশকদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেও সিংহভাগ সরকারেরই বর্তাবে। আমি প্রমোদকরের কথা তুলছি না। সেটা যা আছে থাকুক। কিন্তু প্রবেশমূল্য একই রেখে এগোলেও দর্শকের ঘাটতি হবে না। একটু নড়েচড়ে বসে খাটলে সেটা অনেকগুণ বাড়তে পারে। জনসাধারণ ছবি দেখবেই, এর থেকে সস্তা কোনো স্নায়ুস্নিগ্ধকর পদার্থ বর্তমানে বাজারে আর নেই। আর যা যায়, সব নগদ, ধারের কারবার নেই। তার ওপরে বহুদিকে ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। এতদিন কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীচক্রান্ত ভারতের বহু শহরেই নতুন চিত্রগৃহ খোলার সরকারি অনুমোদন দেবার পথ বন্ধ করে রেখেছে। সংখ্যাতত্ত্বতাত্ত্বিকরা খতিয়ে দেখুন গে যান, কিন্তু এটা অবধারিত সত্য যে মাথা-পিছু ছবিঘরের আসন সংখ্যা এদেশে অন্যদেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে, একেবারে তালিকার শেষের দিকে তার নাম পাওয়া যাবে। এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী ছবি উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে। এই যে বিশাল বিসদৃশ অগোছালো অবস্থা সেটাকে জনসংখ্যানুপাতে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করে ছবিঘরের সংখ্যা যদি উত্তরোত্তর বাড়ানো যায়, তা হলে সর্বদিক থেকে মঙ্গল। পয়সা তো আজকের থেকে অনেক বেশি আসবেই।

F.F.C বা C.F.S.-জাতীয় ব্যাপারগুলোকে হটিয়ে এই শিল্প থেকেই অর্জিত টাকার

একটা অংশ দিয়ে নতুন ছবি তৈরির ধার, রসায়নাগার কারখানাগুলোকে নব সাজে সাজানোর জন্যে ধার, যন্ত্রপাতি তৈরি করার প্রকল্প, জনমত সংহত করার হাতিয়ার হিসেবে বিজ্ঞাপনের ব্যবহার করতে গিয়ে খরচ, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা খাতে ব্যয় করতে হবে তেমন কোনো কর্পোরেশনকে। কিন্তু সেটা হবে সম্পূর্ণ আয়লব্ধ টাকার একটা মোটা অংশ, বাকি অংশটুকু যাবে দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য। অর্থাৎ নিত্য নতুন কোনো ট্যাক্সো বসিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন পাত করে সরকারি ভাঁড়ারের ঘাটতি পূরণ করতে আর-একটু কম দরকার পড়বে। Documentaryগুলো সরকারিভাবে এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে করলে আরো অনেক লাভ। এবার ধরুন ছবিতে বলিষ্ঠ নতুন ভাষা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। অর্থাৎ আমাদের পরিচালকদের কথা। এমন কর্পোরেশন হলে ঘাম দিয়ে অনেকেরই জ্বর ছাড়বে। এই কর্পোরেশনের আয়ের ক্ষুদ্রতম এক চিল্‌তে টাকা যদি প্রতি বছর ফেলে দেওয়া হয় নতুন পথের পথিকদের সামনে তার বেশির ভাগই ছয়লাপ হবে এও যেমন সত্য, তেমনি ঝিলিক মেরে উঠতে পারে নতুন নতুন প্রতিভা। যেমন ঘটেছিল দভজেঙ্কোর প্রথম জীবনে।

এই কর্পোরেশন তৈরি হবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকটি রেজিস্ট্রিকৃত সংগঠনের প্রতিনিধি, কবি, সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষক, শিল্পী এবং সেইসঙ্গে সরকারের মনোনীত কিছু লোককে নিয়ে। এবং প্রতিটি ছবিকেই সম্মানের সঙ্গে দেখে পর্যালোচনা করে চিত্রনির্মাতার সঙ্গে আলাপ করে ছবিটির মূল্য যাচাই করতে হবে। বিদেশেও এভাবে একমাত্র মুখরক্ষা করা যায়।

কিন্তু খারাপ দিকগুলো?

—প্রচুর আছে। একেবারে গোড়ায়। অবধারিত ধরে নেওয়া যায়, সব মূলধন মাটির তলায় চলে যাবে। লগ্নী করবার কোনো উৎসাহই বাজারে দেখা যাবে না। এমন-কি এও হতে পারে যে, যন্ত্রপাতিগুলোকেও অচল করে দেওয়া, কাজকর্মে নানাভাবে ব্যাগড়া দেওয়া, চুক্তিবদ্ধ শিল্পীদের একাংশের ঈষৎ জ্বর ইত্যাদি হওয়া পেটখারাপ হওয়া— এক কথায় নাশকতামূলক কার্যে প্রবণতা, খুব জোরে মাথা তুলে দাঁড়াবে গোড়ায়। Kino বইতে অক্টোবর বিপ্লবের যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তারই একটি চুনীমুনী সংস্করণ দেখা দিতে পারে। এতে ঘাবড়ালে তো চলবে না। এইখানেই আসে সৎ প্রচেষ্টার প্রশ্ন— সরকারি ও বেসরকারি দিক থেকে প্রথম ধাক্কাটা সামাল দিতে পারলে এটা বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে না ওঠাই সম্ভব।

সরকারি প্রকল্পের সূত্রপাত মানেই বিদেশী সাহেবদের ডেকে এনে অনুসন্ধান কমিটি, প্ল্যানিং কমিটি, আরো ছাইভস্ম করে বেশ কয়েক বছর গুবলেট করে রেখে দেওয়া। ফাইলের পর ফাইলের স্তূপ জমে উঠবে। প্রত্যেক ফাইলেই একটি কাগজের চিল্‌তেতে 'Immediate', 'Urgent' ইত্যাদি কথাগুলো লাল অক্ষরে ছাপা থাকবে। সেগুলো কর্তাব্যক্তিদের টেবিলের বাঁ পাশে জড়ো হয়ে থাকবে মাসের পর মাস এবং একসময়ে কর্তার প্রশ্ন চিহ্ন সমেত কর্তার শ্রীহস্ত লেখা মন্তব্য সগর্বে বুকে ধারণ করে ফাইলগুলো টেবিলের ডানপাশে রাখা বাস্কেটে গিয়ে জমবে— পরবর্তী কর্তার শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করার দিন গোনার জন্যে। যা হচ্ছে সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার, অতীব সাধারণ এবং সহজবোধ্য,

সেগুলো ধোঁয়াটে করে তোলার মতো প্রতিভার এদেশ অভাব নেই। কারণও আছে, যতদিন প্রকল্পটি চালু করার কাজে ব্যয় করা যাচ্ছে, ততদিন প্রায় কাজ না করেই মোটা টাকার মাইনে, লোকের তেলমাখানো, আর নানা রকম conference বাবদ দেশবিদেশ ঘোরার সুবর্ণ সুযোগটি দীর্ঘান্বিত হচ্ছে। মানে সরকারি ব্যাপারটাই ভীতিপ্রদ এদেশে। একমাত্র জীবনবীমা কর্পোরেশন বাদে আর যা-কিছুতেই সরকার বাহাদুর হতে দিয়েছেন আজ পর্যন্ত, প্রত্যেকটিতেই প্রায় ধেড়িয়েছেন। পরিকল্পনা করেছেন প্রচুর পয়সা ঢেলে। কিন্তু সময়-মাফিক কিছুই করে উঠতে পারেন নি। আর প্রতিনিয়ত যে-সমস্ত কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির খবর আসে, তাতে ভরসার কোনো চিহ্নও কোথাও দেখা যায় না। মানে, একদল শকুনের হাত থেকে বেরিয়ে একপাল নেকড়ের খপ্পরে পড়ার সম্ভাবনা প্রচুর। ইংরেজ এদেশ ছেড়ে যাবার আগে Steel frame বলে যে মালটি ছেড়ে গেছেন ; তার এণ্ডা-বাচ্চারাই এখন তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন। যে-কোনো মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে যে, আসলে কলকাঠি নাড়ে এই আমলাগুলোই। এদের মনের মধ্যে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক আসনে সমাসীন ব্যক্তিবর্গের প্রতি অনুকম্পানিশ্রিত অবজ্ঞা সর্বসময় কাজ করে। তাদের দৃঢ় ধারণা, এরা বাজার গরম করা, খবরের কাগজে ছবি ছাপানো, উদ্‌বোধন করা— এই সবের জন্যে পুষে রাখা কিছু গৃহপালিত জীব। আসল কাজ করছে আমলারাই। কথাটা ঘৃণ্য হলেও অনেকাংশে কিন্তু সত্যি। আমাদের গণতন্ত্রটা কথার কথা। এরাই চালায়, তবে আমরা চলি। বহু কর্তাব্যক্তিকে এর জন্যে বিছানায় কেঁদে বালিশ ভিজোতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। মুষ্টিযোগ ছাড়া এদের সত্যিই শেষ পর্যন্ত কোনো দাওয়াই নেই।

ছবিঘর জাতীয়করণ করলেই এরা হয়ে উঠবে এক বিরাট সমস্যা। বজ্র আঁটুনির তলায় ফস্কা গেরো থাকবেই। সেন্সরের তারিখ মাফিক ছবি বাছা, বাজারে ছাড়ার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কোন্ কোন্ শহরের কোন্ কোন্ ছবিঘরে? সব শহর এবং সব চিত্রগৃহ তো একই পর্যায়ের ব্যাবসার অঙ্কে পড়ে না, সেখানে? হাতেনাতে কাজে নামলে এই ধরনের নানা প্রকার গণ্ডগোল দেখা দেবেই। একই সঙ্গে একাধিক ছবিও তো বেরোবে— কোথায় কোন্‌টা যাবে এবং কেন? আমলাদের টাকা চুরি, পেটোয়া তোষণ এবং অন্যান্য দুষ্টুমি করার বিরাট অবকাশ থেকে যাচ্ছে। আর কিছু না হোক, পায়ে কিছু তেল খাবার তো কোনো অসুবিধে নেই।

স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন গড়লেও ঘুষের কারবার একেবারে বন্ধ হবে, এমন কথাটা কঠিন জাতের লোক ছাড়া কেউ ভাবতে পারবে না। বালী-সুগ্রীবের অনুচরদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে ব্যাপারটা পর্যবসিত হবার সমূহ সম্ভাবনা বর্তমান।

তার পর আসে মতবাদের কথা, যে দলই গদি আঁকড়ে ধরুক, তার বেলেল্লাপনা যে ছবির মতো চরমতম শক্তিশালী মাধ্যমকে ছেড়ে কথা বলবে, এমন তো মনে হয় না। এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী, যতদিন না এ দেশে টেলিভিশন কায়েম হচ্ছে। এই যে রাজনীতিকদের লেজুড় হয়ে থাকা, স্বেচ্ছায় প্রায়শই, অনিচ্ছায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে— এ ঝোঁক ছবি করার সমস্ত চেষ্টাকেই বারোটা বাজিয়ে দেবে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো খুব সোজা কথা নয়। কাজেই, এখন যেমন একদল লোকের চাপে বহু শিল্পীর কণ্ঠ রুদ্ধ তখন তেমনি ভাবেই আরেক ধরনের চাপে পরে অনেক মহৎ সম্ভাবনাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে পারে। খুব দুঃখদায়ক

হলেও এর থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। ভাবতে বসলে, কল্পনায় আরো নানারকম বিপদের কথা মাথায় ভেসে ওঠে। কিন্তু প্রধানত আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক চালবাজি— এদুটোই সুস্থ ছবির শৈল্পিক গঠনের পথে বাধার কণ্টকস্বরূপ।

গোড়া থেকেই আমি বলে আসছি, এই সমাধান একটা আংশিক সমাধান। সর্বস্তরের মানুষকে যখন একই স্তরে একই স্বার্থের দিকে ধাবমান করানো যাবে, একমাত্র তখনই সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে। কিন্তু সে অবস্থায় উন্নীত হবার পথে আরো অনেকরকম অবস্থার মোকাবিলা করতেই হবে। এবং তার পথে এই জাতীয়করণই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপাততকার শ্লোগান। অর্থাৎ জেনে, বুঝে, না ঘাবড়ে— একদল অত্যাচারীর বদলে আর-একদল অত্যাচারীর হাতে গিয়ে পড়ার শ্লোগান কিন্তু সেটা জেনে বুঝে, হিসেব কষে। আর যাই হোক, আমলাদের শায়েস্তা করার পথ বহু আছে। কিন্তু পায়রার জান নিয়ে তা করা যায় না। রাজনীতিবিদদের শেষ অবধি জনতার মুখোমুখি করে ছেড়ে দেওয়া যায়। তার পর সমস্ত কাণ্ডটা আজ যেমন ঘটছে, তেমন ঘটবে না।

এখন সব-কিছু চুপিসাড়ে। জনতার এবং সরকারের অজ্ঞাতে। কাকপক্ষীও টের পায় না কোথা দিয়ে কী হয়ে যাচ্ছে এবং কেন। সেটা নতুন পর্যায়ে গিয়ে আর তখন হবে না, ধুলোর দরবারে তখন কুর্নিশ করতেই হবে। গোড়া ধরে নাড়া দিতে হবে।

—সেইটুকুই রক্ষাকবচ।

—জনতাই রক্ষাকবচ।

বাংলা ছবির দৈন্য

আজকাল প্রায়ই বন্ধুমহলে আলোচনা ও প্রশ্ন শুনতে পাই— ভালো ছবি করা ক্রমশই বাংলাদেশে বিরল হয়ে আসছে কেন।

কথাটা সত্যি ভাববার মতো। এবং যে সমস্যাগুলো থেকে এই অবস্থার উদ্ভব, সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার এবং পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আজ সমধিক।

বাংলা ছবি করার আর্থিক অন্তরায় নিয়ে বিভিন্ন কাগজে-পত্রে আজকাল আলোচনা হয়, দেখতে পাই। সত্যি সত্যিই আর্থিক বাধাগুলোকে সরানোর রাস্তা আছে এবং জনমত জাগ্রত হলে ও সরকার সচেতন হলে কলকাতার চিত্র-প্রদর্শন-ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিরই সংশোধন করা সম্ভবপর হয়। এটা আজকে জানা কথা— প্রদর্শন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারলে সাধারণভাবে বাংলা ছবির আয় অনেক বেড়ে যাবে ও সরকারের তহবিলে আরও বেশি টাকা আসবে। এর সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকটি সমাধানের পথও সরকারের হাতেই রয়েছে। যেমন কলকাতায় আরও 'রিলিজ চেন'-এর ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশে আরও বাংলা ছবির প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করার অনুমতি দেওয়া। এ ছাড়াও অনেকেই ভাবছেন অন্য প্রদেশে এবং বিদেশে বাংলা ছবির প্রদর্শন চালু করার কথা।

এ-সব কার্যে পরিণত করতে পারলে সত্যিই বাংলা ছবির দুর্দশা ঘুচবে। এবং অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে ভালো বাংলা ছবি তৈরি করার পথও খানিকটা সুগম হবে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা ছবির সাধারণ সংকটের জন্য মানুষের চিন্তা ভালো বাংলা ছবি হবার পথে এক বিরাট সহায়।

কিন্তু এই-ই কি সব? অর্থাৎ শুধু এই কাজগুলো করে গেলেই কি চিত্রভাষা-সম্মত ও মহান বক্তব্য-সংবলিত চলচ্চিত্র জন্মগ্রহণ করবেই করবে? তেমন কোনো প্রতিশ্রুতি এই ঘটনার মধ্যে নেই।

কারণ ভালো ছবি হতে গেলে আর্থিক দিকটা যেমন মূলভিত্তির একটা অংশ তেমনি আর-একটা অংশ হচ্ছে সৎ ও রুচিবান শক্তিশালী শিল্পীর দল।

কয়েক বছর আগে সেরকম একদল শিল্পীর উপস্থিতি লক্ষ করে আশান্বিত হওয়া গিয়েছিল। পরপর বিভিন্ন শিল্পী উঠছিলেন যাঁদের ওপর শ্রদ্ধা ভরসা রাখা যায়। কিন্তু তার পর থেকে যত নতুন পরিচালকই আসতে থাক-না-কেন, উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁরা যেন আর তেমন আসছেন না। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত যাঁদের মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষ করা গিয়েছিল, তাঁদের কেমন ক্রমশ ঝিমিয়ে যেতে দেখছি।

এ ঘটনাটির কারণ কী— এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আজকে আলোড়ন তুলছে। বাংলার সংস্কৃতির একটা বলিষ্ঠতম দিক হচ্ছে আজকের চলচ্চিত্র, তার অবক্ষয় মানুষের মনকে ব্যথিত করছে।

শিল্পীর ব্যক্তিগত ইতিহাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটির এক বিরাট দায়ভাগ জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন শিল্পীর নিজস্ব সর্বপ্রকার সমস্যা এবং সুযোগসুবিধা এ-রকমটি ঘটার একটা কারণ। কিন্তু আমার মনে হয় এর উপরও একটা সমষ্টিগত ত্রুটি ব্যাপারটার গভীরে কাজ করছে এবং বোধহয় সেইটিই হচ্ছে এই ক্ষয়িষ্ণুতার মূলতম কারণ।

এখন যাঁরা বাংলা চলচ্চিত্রের পুরোভাগে, তাঁরা যখন প্রথম ছবি করতে আরম্ভ করেছিলেন, ছবির প্রতি একটা উদগ্র ভালোবাসা তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সংগ্রামী রূপ এনে দিয়েছিল। লাভ-ক্ষতির বিচারে তাঁরা বোধ হয় বড়ো বেশি যান নি।

অথচ আজ যে নতুন পরিচালক ছবি করতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে ঋণাত্মক ছাড়া আর কোনো গুণ দেখি না।

আমার মনে হয় তার কারণ তাঁদের চারপাশের আবহাওয়া। কয়েক বছর আগে শিল্পীদের আশপাশের আবহাওয়া ছিল একটা চ্যালেঞ্জে ভর্তি। একটা বুদ্ধিগত আন্দোলনের প্রথম আভাস তখন হাওয়ায় বইত। আজ সেটি একেবারে মুছে গেছে। আজ তার বদলে এসেছে নিরাপত্তার প্রশ্ন ও চমক দেবার চেষ্টা।

অথচ সেদিনের থেকে আজকের দর্শক অনেক বেশি তৈরি এবং দর্শকদের ক্রমবর্ধমান অগ্রণী অংশটির কথা বাদ দিলেও বলা যায়— সাধারণভাবে কিছু কিছু ভালো ছবির ব্যবসায়িক সাফল্য এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভালো ছবি মানেই মার খাওয়া ছবি নয়।

অর্থাৎ এই ক-বছরের কিছু মানুষের প্রাণপাত চেষ্টার ফলে যখন কিছুটা সুফল ফলতে আরম্ভ করেছে তখনই আমরা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি।

এ রকম ঘটনা ঘটার মূলতম কারণ হচ্ছে— বাংলাদেশে ছবি করাটা একটা আন্দোলনে পরিণত হতে গিয়েও হল না। কিছু ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা ও কর্মে পর্যবসিত থেকে গেল।

যদি আন্দোলনের আবহাওয়া তৈরি করা যেত, তা হলে কিন্তু সত্যিই বাংলা ছবির সুদিন আসত। এটা যে হয় নি তার জন্য প্রধানত দায়ী আমরা যারা ছবি করি। এত চেষ্টা করেও এতদিনে আমরা একটা মুখপত্র অথবা platform খাড়া করতে পারলাম না। পৃথিবীর সব দেশের ছবির ইতিহাসেই দেখা যায় এ-রকম একটা খুঁটির জোরেই খাড়া থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবি করার নবীন আন্দোলন।

এইসঙ্গে এই অভাবও অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে যে সমালোচনা ভঙ্গিতে স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রকাশ হতে পারছে না। এখানে আমি শুধু পেশাদার সমালোচকদের কথাই বলছি না। যে-সব চিন্তাশীল চলচ্চিত্র পত্রিকা বেরোয়, তাদের কথাও বলছি।

দর্শক তৈরি করার ভার দুজনেরই— ছবি যাঁরা করছেন এবং সেই ছবি যাঁরা সাধারণ দর্শককে বুঝিয়ে দেবেন।

বহু ব্যথায় ব্যথিত বাংলাদেশের এই সময়ে একটা যুগের দাবি ছিল— যে দাবির স্বরূপ উপলব্ধি করা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। যে সময়ে আমাদের সর্বশক্তি সংহত করে অবিশ্বাস এবং অর্থমোহের অচলায়তনে নাড়া দেবার দরকার পড়েছিল— সেই সময়ে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ক্ষুদ্র গণ্ডির ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক নকশাটাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি।

জানি না এখনও সময় আছে কি না।

রিপোর্টাজ

বক্স-অফিসের চাহিদায় সায় দেওয়া সম্ভব নয়

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বি-এফ-জে-এ'র) সভ্যবৃন্দ কৃতী পরিচালক ও কলাকুশলীদের সর্বাধুনিক চিত্র এবং চলচ্চিত্র-চিন্তা সম্পর্কে পরিচয় লাভের অভিপ্রায়ে সম্প্রতি যে আলোচনাচক্রের প্রবর্তন করেছেন, তার দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত পয়লা আগস্ট, '৬৫, ৩/১, ম্যাডান স্ট্রীটে। এইদিন প্রয়োগশিল্পী শ্রীঋত্বিক কুমার ঘটককে তাঁর 'সুবর্ণরেখা' চিত্র এবং সাধারণভাবে চিত্রজগৎ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই আলোচনা সভায় স্পষ্টবাদী শ্রীঘটক সাংবাদিকদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরদানে যে অন্তরঙ্গ পরিবেশটি গড়ে তোলেন তা দীর্ঘদিন স্মরণে রাখার মতোই।

আলোচনা শুরু হয় 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি নিয়ে। এই ছবিটি সম্পর্কে বি-এফ-জে-এ'র সহ-সভাপতি শ্রীনির্মল কুমার ঘোষ চলচ্চিত্রকার শ্রীঘটকের বক্তব্য প্রকাশের অনুরোধ জানান।

শ্রীঘটক প্রথমেই বলেন, সুবর্ণরেখা কথাটির অর্থ সোনালি চিক্কন টান, আশার আলো। কিন্তু আমাদের বর্তমান জীবনে কি এই বস্তুটির বিন্দুমাত্র আভাসও চোখে পড়ে? অন্তত

আমার চোখে নয়। আমি চতুর্দিকে ভাঙন আর হতাশারই চিত্র দেখছি অহরহ। 'সুবর্ণরেখা'র মধ্য দিয়ে তারই একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস করেছি।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন : তা হলে তো আপনি নৈরাশ্যবাদী? কেন, জীবনে কি আশার কোনো আলোকই দেখতে পান না আপনি? এর উত্তরে শ্রীঘটক বলেন, না, নৈরাশ্যবাদী আমি নই। আশার আলোক আমিও দেখতে চাই। কিন্তু পথ কোথায়? সেই পথের সন্ধান করছি আমি। 'সুবর্ণরেখা'র মধ্যে ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেখাতে চেয়েছি— এই পৃথিবীর বাইরে একটি দিগন্ত আছে। সেইদিকেই চোখ ফেরাতে বলেছি আমি তাদের। 'সুবর্ণরেখা'র বক্তব্য বলতে এইটুকুই।

'সুবর্ণরেখা' নিঃসন্দেহে একটি ভালো ছবি। কিন্তু সবার চোখে হয়তো নয়। সাধারণ দর্শক, বিশেষ করে মফস্সলের দর্শক আপনার ছবি থেকে ভিন্ন এক পরিচিত ছকের ছবি দেখতে অভ্যস্ত। তাদের দিকটাও ভাবা উচিত নয় আপনার? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঘটক বলেন, নিশ্চয় ভাবা উচিত। কিন্তু না ভেবেই ছবি করি এ-কথাও ঠিক নয়। দর্শক আমার ছবি নেবে না এমন কথাও কখনো মনে করি না। কিন্তু তা বলে বক্স-অফিসের চাহিদায় সায় দিয়ে ছবি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আনন্দের কথা, আজ দর্শকদেরও রুচি বদলেছে। অথচ ১৯৫৫ সালের পূর্বে, এখন যা দেখছি, সেই চিত্রটি ছিল না। এটাই যা আশার কথা।

আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীঘটক জানান যে, 'সুবর্ণরেখা' ছবিতে কোথাও কোথাও নাটকীয়তার আতিশয্য আছে— তবে চিরাচরিত পন্থায় নয়। এখানে নাটক এসেছে আচমকা— যেমনটি জীবনে, বাস্তবে ঘটে। সেই জীবনসত্যটুকুই আমি ফোটাতে চেয়েছি। জানি না, তা পেরেছি কি না।

এই আলোচনা বৈঠকে জনৈক সাংবাদিক শ্রীঘটককে জানান, এক বিশেষ প্রদর্শনীতে 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি তিনি দেখেছেন এবং তাঁর খুবই ভালো লেগেছে। ছবিটির অপূর্ব বহির্দৃশ্যগুলি কোথায় তোলা হয়েছে তা জানতে চাওয়ায় শ্রীঘটক জানান, ঘাটশিলার কাছাকাছি ওই বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

হিন্দী ছবির স্টার সিস্‌টেম বা তারকা পদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা সভায় কথা ওঠে। এ-সম্পর্কে শ্রীঘটক তাঁর অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এই পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন ঠেকানো যায় না। আর্থিক বিচারেও এর নাভিশ্বাস উঠেছে ইতিমধ্যে।

সাংবাদিক-সভায় শ্রীঘটক ফিল্ম ইনস্টিট্যুট সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেন এবং জানান, ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের ভাইস প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করলেও চিত্রপরিচালনার কাজ থেকে তিনি বিদায় নেবেন না। বস্তুতপক্ষে তাঁর 'বগলার বঙ্গদর্শন' ছবির কাজ শুরু হচ্ছে আগামী মাস থেকে।

আলোচনান্তে সাংবাদিকদের তরফ থেকে শ্রীঘটককে ধন্যবাদ দেন শ্রীবাগীশ্বর ঝা।

বাংলাদেশের কলাকুশলীদের সম্পর্কে

International নয়, দেশের সম্মান নয়, Festival Film নয়, State award-winners নয়— সৎ ছবি করা দরকার। শিল্পীর সত্যিকারের অনুভূতি— যার মধ্যে মিথ্যে কথা বলা নেই, এমন ছবি চাই। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে করলেই সততার এই তীব্রতা হারিয়ে যেতে বাধ্য। বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে এই সত্য অনুভূতিও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। মাথা পরিষ্কার না থাকলে চিন্তার এলোমেলো প্রতিফলন হবেই, বিষয় নির্বাচনে এবং তার রূপায়ণে। দেশের লোকের খুব ভালো লাগল, মানুষের মধ্যে যেতে পারলাম— এ-সব দুর্বল এবং নিম্নস্তরের চিন্তার পরিচায়ক। তীব্রতা দরকার এবং তীক্ষ্ণ গোঁ থাকা দরকার— এটা ঠিক কি না তাও বুঝি না। হয়তো অন্যটাই ঠিক। এ ধরনের চিন্তাই গণ্ডিবদ্ধতার নিদর্শন এবং এখানকার যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের পথ। কাণ্ডজেয়ানা এবং চমকদার চটক— খবর তৈরি করার মনোভাবই বোধ হয় জয়ের রাস্তা। তবু আমার মতো করে চিন্তা করার লোকও দুটো-একটা আছে— এবং দুরকম প্রচেষ্টাই চলছে— দেখা যাক, কোন্ দল জেতে।

Paul Rotha-র Allusion ছবির গভীরতর, ব্যাপকতর এবং অনেক পরে পর্যন্ত যার প্রভাব— আজ দেখে কাল ভুলে যাওয়া নয়, এ কথাটা এখানকার কেউ বুঝল না। ব্যাবসাদাররা তো বুঝবেই না, কিন্তু শিল্পী এবং যোদ্ধারা?

Economic basis ব্যাখ্যা করা দরকার। রাজনৈতিক ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যাখ্যা করা দরকার।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের কলাকুশলীদের কথাটি বলার ভার আমার ওপর পড়েছে। জানি না, আমার কোন্ উপযুক্ততা আপনারা দেখেছেন। সে যাই হোক, আমার দুঃখীভাইদের হয়ে দুকথা বলার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমায় কৃতজ্ঞ করলেন।

বাংলাদেশের কলাকুশলীদের অবস্থা যে ঠিক কতখানি পরিমাণে, কত চরমভাবে খারাপ, তা দেশের লোক জানেন না। আমাদের গ্ল্যামারের পাশেই যে হতাশা আর অবসাদের বাসা তার একমাত্র তুলনা হতে পারে উজ্জ্বল প্রদীপের তলার নিকষ কালো আঁধারের সঙ্গেই। কলকাতা শহরের মতো জায়গায় ষোলো বছর একনাগাড়ে চাকরি করার পরেও একজন সুদক্ষ কলাকুশলী মাসে আজও পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করে হাড়ভাঙা খাটুনি করতে বাধ্য হন। কর্মরত অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বিবেচনার দোষে মারা পড়েন যে কলাকুশলী, তাঁর পরিবার না পায় তার কোনো ক্ষতিপূরণ, না হয় এই দুর্ঘটনার ন্যায্য বিচার। কত কলাকুশলীদের যে কত হকের টাকা মারা পড়ে তার ইয়ত্তা নেই। এ-সব কথা লিখতে বসলে হাজার হাজার সত্য ঘটনা আমারই অভিজ্ঞতা থেকে আমি পাতার পর পাতা ভরে লিখে যেতে পারি। এবং তার প্রমাণ দরকার হলে উপস্থিত করতেও আমি দ্বিধা করব না।

—এবং এই যে আমাদের অবস্থা, তা দিনেব পর দিন খারাপই হয়ে চলেছে। অবস্থা এমনই হয়েছে, যে ভাবতে গেলে দম আটকে আসে। আমাদের চোখের সামনে আশার আলোও আজ নেই। এবং এটা তখনই ঘটছে, যখন বাংলা ছবি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করছে, সংস্কৃতির উন্নতি করছে, দেশ-বিদেশের মানুষকে তৃপ্ত করছে।

এ অবস্থা থাকতে পারে না। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা থাকবেও না, দেশের মানুষের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরবেই।

আমাদের বলা হয়, চিত্রশিল্পের সংকট ঘনীভূত হচ্ছে এবং তার ফল হিসেবেই এসব-কিছু ঘটছে।

আমি বলব, এটা ডাহা মিথ্যে কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। পশ্চিম বাংলা সরকারের হিসেবেই তার প্রমাণ রয়েছে। এই শিল্প থেকে সরকার আমোদকর হিসেবে বার্ষিক আয় করেন চারকোটি টাকা (আজকাল আবার আমোদকর বাড়ানো হয়েছে)। সমস্ত মালিকরা মিলে লাভ করেন পাঁচকোটি টাকা। যে শিল্প বছরে আয় দেয় নয় কোটি টাকা, এবং যার আয় বছর বছর বেড়েই চলেছে, তার কী ধরনের সংকট হতে পারে, সেটা সহজেই অনুমান করা চলে। সে সংকট হচ্ছে মানুষের তৈরি, সত্যিকারের সংকট সেটা নয়।

কোন্ মানুষ? চিত্রপ্রদর্শক।—

যে যাই বলুন, আমি পরিষ্কার বলব, ছবিঘরগুলোর মালিকরাই হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু, যাঁরা এই সংকটের জন্ম দিয়েছেন। এবং সর্বপ্রকার অজুহাত দিয়ে সেটিকে টিকিয়ে রেখেছেন। দেখুন— একটি ছবির শতকরা ষাটভাগেরও বেশি আয় কেড়ে নিয়ে যান প্রদর্শকরা। অথচ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর একপয়সাও ব্যয় করেন না ছবি তৈরি করার জন্য। এমন-কি তাঁদের ছবিঘরগুলোও সাজিয়ে দেন প্রযোজকরা। 'হোল্ড ওভার' আর 'হাউস প্রোটেকশান্' বলে দুটি মোক্ষম কথার তাঁরা জন্ম দিয়েছেন, যার বাংলা মানে হচ্ছে— heads I win, tails you lose, তাঁদের সাপ্তাহিক লাভের গায়ে (তাঁদের খরচের নয়, তাঁদের ন্যূনতম hundred per cent লাভের গায়ে) তাঁরা আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতে দেবেন না।

এই যে কোটি কোটি টাকা তাঁরা নিয়ে যাচ্ছেন এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে, তার এক কণাও তাঁরা ইন্ডাস্ট্রি-তে ফেরত পাঠাবেন না। এখানে টাকা লগ্নী করবেন না। তাতে নাকি ভীষণ ঝুঁকি! তার বদলে তাঁরা সেই টাকায় সুইজারল্যান্ড-এ হাওয়া বদলাতে যাবেন, মোজেক করা প্রাসাদ তুলবেন, মিল কারখানা করবেন।

একটা ইন্ডাস্ট্রি-র যেটা আয় হয়, তার একটা বড়ো অংশ যদি নিয়মিত ফিরে এই ইন্ডাস্ট্রি-তেই লগ্নী না হয়, যদি সেটা (অর্থাৎ এই ক্রিমটা) চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যায় একটা ছ্যাদা কুঁজোর জলের মতো, তা হলে যে রক্তশূন্যতা দেখা দেবে এটা যে-কোনো অর্থনীতিবিদ অতি সহজেই বুঝতে পারবেন।

আজকাল আবার এঁরা সব ছবিঘরেই প্যানারোমিক স্ক্রিন করে তাঁদের রুচির পরিমাপ দেখাচ্ছেন, আচ্ছা বলুন তো, আমাদের কাজ করতে হয় সেই মান্ধাতার আমলের ভাঙা ক্যামেরা দিয়ে, এরকম বিষণ্ণ রসিকতা তাঁরা করছেন কেন?

এরকম যুক্তিহীন ফ্যাসাদ খুব কমই আছে। হপ্তায় একটা মর্নিং শো এঁদের থাকে এবং তার মধ্যে হয়তো দশটার পাঁচটা ছবি ওয়াইড স্ক্রিন-এর হয়, তার জন্যে তাঁরা অতশত ঘটা করে ছবির পর্দাকে ছড়িয়ে দিলেন বেঢপ ভাবে। আর যেটা রেগুলার ছবি, এই অধমদের কাজগুলো, যেটাকে প্রতি হপ্তায় দেখতে হয় একুশটিবার করে, আর তার প্রত্যেকবার হয় ছবির মাথা কেটে যায়, নইলে তলা দেখা যায় না। কারণ ওপরে নীচে নর্মাল স্ক্রিন-এর যে পরিমাপ, তার সঙ্গে ওয়াইড স্ক্রিন-এর বেজায় গরমিল। আপনি

নায়কের চোখের তলা থেকে মুখটা দেখছেন, তার পরেই কটাস্ করে অপারেটার ফ্রেমটা নামিয়ে ঠোঁট দুটো কেটে চুল পর্যন্ত দেখিয়ে দিল— আর সর্বক্ষণ সংলাপ চলছে, এ ঘটনা হামেশাই ঘটছে।

এই হচ্ছে এঁদের সমস্ত ব্যবহারের একটা প্রতীকী ব্যাপার।

—আর এইসঙ্গে আমার মনে পড়ে যায়, আজকালকার প্রায় বীভৎস স্টার সিস্টেম-এর কথা। বাংলাদেশে তেমন জুটি একটাই আছেন। এঁরা সমস্ত কলাকুশলীদের বিশটা ছবির পারিশ্রমিক এক ছবিতেই নিয়ে যান। এঁদের ছাড়া নাকি ছবি চলে না। এই আর-একটা ডাহা মিথ্যে কথা। এটারও জন্ম দিয়েছেন কিছু সুবিধাবাদী লোক। এবং তাঁরা আজও উচ্চকণ্ঠে সেকথা ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না। কিন্তু এই কথা যদি সত্যি হয়, তা হলে এক নিশ্বাসে আমি এত ছবির নাম করে যেতে পারি, যার একটাতেও এই কামধেনু দুটি নেই। আপনারা কখনো হিসেব করে দেখেছেন, যতগুলি গোল্ডেন জুবিলি ছবি গত কয় বছরে হয়েছে (যেমন 'রানী রাসমণি', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'শেষ পর্যন্ত', 'মায়ামৃগ' এবং আরো) তার কয়টিতে এই জুটিকে দেখা গেছে?

অথচ এঁদের গ্ল্যামার তৈরি করি আমরাই। আমার ঐ আধপেটা খাওয়া ইলেকট্রিশিয়ান যদি ঠিকমতো আলোটা না দিত, আর আমার পরিচালক যদি ঠিকমতো তাঁকে ব্যবহার না করতেন, এবং আমি যদি ঠিকভাবে তাঁর মুখখানা না তুলতাম— তবে তাঁর মুখখানিতে যে ঐ গ্ল্যামার-এর এক কণাও থাকত না।

আমি বিশ্বাস করি, পরিচালকই হচ্ছেন সব। তিনিই আমাদের বল, তিনিই আমাদের তৈরি করেন, তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেন, ঠিক তেমনি আমাদের সমস্ত কলাকুশলীকেও তাঁরা সুযোগ দেন, তৈরি করে নেন। ছবির স্রষ্টা হচ্ছেন পরিচালক। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার বদলে কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিয়ে নাচানাচি শুধু অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, রীতিমতো পীড়াদায়ক।

সবশেষে আমি একটা অনুযোগ করব। আমি সে অনুযোগ করব আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে।

— তাঁদের জানা দরকার যে, যে-সব ছবি আজ বাইরে ভারতের মুখোজ্জ্বল করছে সেগুলো তৈরি হচ্ছে কেমনভাবে। তাঁদের অনুরোধ করব, আমাদের স্টুডিও ল্যাবরেটরিগুলো তাঁরা এসে দেখে যান।

দেখে যান দুটো কারণে, দেখুন আমরা কী ভোজবাজি করছি কী জিনিস দিয়ে, যে-সব লক্কড় যন্ত্রপাতি দিয়ে আমরা সোনা ফলাচ্ছি— বিদেশের কথা দূরস্থান, বোম্বে-মাদ্রাজের কলাকুশলীরাও এগুলো দেখলে আঁতকে উঠত। ছুঁতেই সাহস পেত না।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, তাঁরা দেখুন কাকে বলে প্রদীপের তলায় অন্ধকার, তাঁরা ছবিঘরগুলোর ঝকঝকে তকতকে চেহারা দেখেছেন— একবার এসে পরিদর্শন করে যান আমাদের বাংলা স্টুডিওগুলোর ছেঁড়া চট, অস্বাস্থ্যকর ফ্লোর আর দারিদ্র্যপূর্ণ আমাদের কুশ্রী চেহারাগুলো।

তখন বুঝবেন, বাংলাব ছেলেরা অসাধ্যসাধন আজও করছে।

তাঁরা যে চারকোটি টাকা শুধু তুলে নিয়ে যাচ্ছেন, তার একটা অংশও কি তাঁরা

আমাদের, আমাদের ইন্ডাস্ট্রি-র এবং আমাদের আর্টের উন্নতির জন্যে লাগাতে পারেন না?

তাঁদের অনেক জ্ঞানগম্যি আছে। আমার তা নেই। তাঁরা কি পারেন না নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করে আমাদের প্রযোজক-স্টুডিও মালিকদের হাতে তুলে দিতে (অবশ্য ধার হিসেবে)। তাঁরা কী এইসব কলাকুশলীদের কো-অপারেটিভ করে টাকা দিতে পারেন না প্রামাণ্য বা তথ্য চিত্র করার জন্য, এমন-কি ফিচার ফিল্ম করার জন্য? তাঁরা কি আমাদের ওয়েলফেয়ারের জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন না, হাসপাতালের বেড দেওয়া থেকে আরম্ভ করে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দেওয়ার মধ্যে দিয়ে?

আমার মনে হয় তাঁরা সবই পারেন. তাঁরা এই ছবিঘরের মালিকদের অন্যায় শোষণ থেকে আমাদের ছবিকে মুক্তি দিতে পারেন। তাঁরা এইসব রাঘববোয়ালদের কালো টাকা নেওয়া বন্ধ করতে পারেন। তাঁরা চাকরির সুযোগ আমাদের বাড়িয়ে দিতে পারেন।

আমি বিশ্বাস করি তাঁরা ঐগুলো করবেন, এবং তার মধ্যে দিয়ে দেশের মানুষের কল্যাণকর ছবি দেখার সুযোগ আরো বাড়িয়ে দেবেন এবং বিদেশে আমাদের মাথা আরো উঁচু করে দেবেন।

আমরা মরে আছি। তাঁরা আমাদের বাঁচাবেন।

নগ্নতা এবং চলচ্চিত্র

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র জগতে 'চুম্বনের' ব্যাপারটা একটি বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়ে নানান ধরনের আলোড়ন-আলোচনা ইত্যাদি চলেছে। যারাই এই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেছে তাদের বিরুদ্ধে যেভাবে একদল বিশেষ ধরনের চিত্রনির্মাতা দল বেঁধেছে, সেভাবেই দেশের নৈতিক চরিত্রের অভিভাবকরাও আমাদের সমাজকে কলুষমুক্ত এবং বিশুদ্ধ করতে গিয়ে কোমর বেঁধে লেগেছে।

এই প্রসঙ্গ অবতারণা করার উদ্দেশ্য হল এই যে এইসব লেখালেখি এবং চেঁচামেচির মধ্য দিয়ে আমাদের সাধারণ সমাজের নৈতিক অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সেইসঙ্গে কর্দমতা এবং উত্তেজক রসেরও আমদানি হয়েছে তলে তলে। নীতির দোহাই দেয় যারা তাদের চোখের সামনেই দেখতে পাই কুৎসিততম কদর্য দৃশ্যাবলী-জড়িত চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিষক্রিয়া ছড়াচ্ছে।

আসল কথা হল, যতটাই গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা হয়, যতটাই ঢেকে রাখার চেষ্টা হয়, এই বিষক্রিয়া ততটাই প্রকট হয়ে উঠে। পৃথিবীতে এমন বহু দেশ আছে যেখানে সেন্সরের কাঁচির কোনো বালাই নেই। সেইসব দেশে যা-ইচ্ছে নির্বিবাদে দেখানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই নগ্ন নারীমূর্তির বিভিন্ন রূপ মুখ্য ধর্ম হিসেবে সেইসব দেশের চিত্রনির্মাতারা প্রাথমিক স্তরে গ্রহণ করে নিয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে এইসব চিত্রনির্মাতাদের কাছে নগ্ন পুরুষদেহ কোনো দিন পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয় নি। এই রীতি অনুসরণ করে তারা কী পেয়েছে?

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, সুইডেনের কথা। সুইডেনে সেন্সর শাসনের কোনো নামগন্ধ নেই। প্রথমে তারা নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হিসেব করে দেখা যায় যে ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সের লোকরাই এইসব ছবি দেখতে ভালোবাসে। তথাকথিত যুবকদেরকে এইসব ছবি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হল না। এ থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রথমত, যে নবীন তরুণ সমাজের নৈতিক শক্তি অটুট রাখার জন্য আমাদের অভিভাবকরা উঠে পড়ে লেগেছিল সেই নবীন তরুণ সমাজের চরিত্রের মধ্যে এমন একটি বিল্ট ইন মেকানিজম আছে যা তাদের এই ধরনের যৌন উত্তেজক ছবি থেকে দূরে রাখে। আর যারা অর্থ উপার্জনের জন্যে এই ধরনের ছবি নির্মাণের শক্তি ক্ষয় করে তাদের তা বিফলে যায়। কারণ চলচ্চিত্র দর্শকদের মধ্যে নবীনদেরই ভিড় বেশি। অবশ্য দু-একদিন ভিড় হয়তো হবে, কিন্তু সেটা সাময়িক, কেননা যৌন বিষয়ক ব্যাপারটা আর নিষিদ্ধ রইল না। তখন অন্য কিছুর জন্যে মানুষের মন উন্মুখ হয়ে পড়ে।

এই রীতি গ্রহণ করার ফলে হয়তো সাময়িকভাবে একটি বিকৃতিই দেখা দেবে। কিন্তু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলে তা বর্তমানের কদর্য বিকৃতি থেকে অনেক কমই হবে। কিছু শর্তাধীন এ-ধরনের উদারনীতির ফলে, আমার ধারণা ভবিষ্যৎ ফলাফল বোধ হয় ভালো হবে।

কিন্তু বিচার্য বিষয় হল : কোন্‌টা শ্লীল, কোন্‌টা অশ্লীল, সেই বিষয়ে বিচার করা এবং বিচার করে একটি স্বচ্ছ ধারণায় উপনীত হওয়া।

পৃথিবীতে কোনো জিনিস স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ হতে পারে না। সব জিনিসেরই একটা বাতাবরণ আছে। দেশে দেশে যুগে যুগে শ্লীলতার ধারণা বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। যে দেশে খাজুরাহো কোনারকের ফ্রিজ-গুলো মন্দিরের রূপ বৃদ্ধি করেছে সে দেশে মাত্র চুম্বনের প্রসঙ্গেই ঝড় উঠেছে।

শ্লীলতার প্রশ্নের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের প্রশ্ন জড়িত একদিক থেকে।

দেখতে গেলে যা সৎ, যা মানুষের অগ্রগতির সহায়ক এবং বা যা জীবনীশক্তি স্ফুরণে আকাশী— সেটাই হচ্ছে শ্লীল। চুম্বন, নগ্ন নারীদেহের প্রদর্শনী অথবা সংগমরত নারী-পুরুষের দৃশ্য সংবলিত ছবি দেখানোব চেয়েও অনেক বেশি অশ্লীল হচ্ছে যেখানে আংশিক আব্রু রেখে বিকৃত মনের কুৎসিত প্রকাশের আভাস দেওয়া হয়। শিল্পে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পে এই শেষোক্ত দলের মানুষেয় ভিড় বড়ো বেশি।

শ্লীলতা আর অশ্লীলতাকে স্কেল দিয়ে মাপা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের ঘটনাকে ধরাটা বুদ্ধিমান এবং সংবেদনশীল দর্শকের পক্ষে মোটেই জটিল নয়। পয়সা কামানোর জন্যে বা নিজের অবরুদ্ধ যৌন কামনার প্রকাশের ইচ্ছেয় যখন একজন শিল্পী নিজেকে পরিচালিত করে, তখনই ধরা পড়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে, অশ্লীল হচ্ছে সেটাই যা মিথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে। শিল্পের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ না করে যখন অশিল্পী-সুলভ কোনো প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সৃষ্টি পরিচালিত হয়— তখন অশ্লীলতা ঘটে।

সেইহেতু আমার কাছে অশ্লীলতার প্রশ্নটা ব্যাপক। যা যৌন-সম্পর্কিত হবে সেটাই অশ্লীল হবে—তার কোনো অর্থ নেই। জীবনের অন্যান্য দিকগুলোকেও যখন বিকৃতভাবে

দেখানোর প্রয়াস করা হয় তখনও সেটা আমার কাছে অশ্লীল হয়ে ওঠে।

এবং আমি অশ্লীলতাকে ঘৃণা করি।

শিল্প, ছবি ও ভবিষ্যৎ

আজকাল যখন-তখন লোকে বলে, শুনতে পাই, বাংলা তথা ভারতীয় ছবি গোল্লায় যাচ্ছে।

কথাটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যে। আমি ইদানীং কিছু কিছু ছবি দেখার অবকাশ পেয়েছি। সেগুলি আমার মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। যেমন ধরুন, একটি মারাঠী ছবি সম্প্রতি আমার দেখার অবকাশ হয়েছিল। ছবিটির নির্মাতা এবং চিত্রকার আমার বহুপরিচিত এবং শিষ্যস্থানীয় ; ছবিটির নাম 'শান্ততা, কোরট্ চালু আহে'— সায়লেন্‌স, দ্য কোর্ট ইজ অন।

অন্তত গত দশ বছরে ভারতবর্ষের কোনো ছবি এর থেকে উন্নততর হয় নি। সব প্রদেশের সব ছবির কথা ভেবেই এ কথা বলছি। আমার গোটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে না ভুলেই এ কথা বলছি।

কলকাতাতেও কিছু কিছু ছেলেদের আমি দেখছি, যারা বড়ো ভাবে ভাবছে। এবং বড়ো কিছু করার চেষ্টা করছে, এদের ভোলা যায়?

আমরা, যারা শৈল্পিক দিক থেকে গত হয়েছি, এবং বড়ো বড়ো বকুনির পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করছি, তাদের নিয়ে নাচানাচি করে আর লাভ নেই। আমরা ক্রমশই কী করে বসছি, সে মালগুলো (বস্তির ভাষা হয়ে গেল, না?) দেখলেই বোঝা যায়।

সমসাময়িক ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে আমার সত্যিই কিন্তু কিছু বলার কোনো অধিকার নেই। কারণ, আমি ব্যক্তিগত দুর্বলতা এবং অন্য কিছু কারণে যাকে লোকে ফিচার ফিল্ম বলে, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে গত দশবছর জড়িত নই। তার সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখার স্পৃহাও আমার কমে গেছে। বিশেষ করে, এদেশে দেবতুল্য ব্যক্তিদের শেষের দিকের প্রায় কোনো কাজই দেখি নি। তাই যখন এদের ব্যাপারে সমালোচকের ভূমিকা নেবার কথা কোথাও ওঠে, আমার লজ্জা করে। নিজেকে চোর বা তারও কিছু অধম মনে হয়।

তেমনি লজ্জা করে যখন নতুনের দল আমার কাছে এসে আমার নিজের যৎসামান্য ছবিগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করে।

এ-সব কথার কী জবাব দেব মশায়?

আমার কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি? কী করে এদের বোঝাব, আমার কোন্‌টি ছবিই না। অবস্থা বিপাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল একদিন। আজও কিছু কিছু করতে হয়। তার ফলে, এখন যখন ভারতের কোনো প্রান্তে যাই, আমার প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়। দেখি, তারা লড়ে যাচ্ছে। নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী।

তাদের মধ্যে এলোমেলো ভাবে যাদের নাম এই মুহূর্তে মাথায় আসছে, তাদের কথা বলি।

জয় বলে একটি ছেলে। কেরালার। অসম্ভব সংবেদনশীল। শুনেছি, একটা ছবি করেছে। চলে নি।

কুমার সাহানী। পাঞ্জাব-কাশ্মীরের ছেলে। পায়ে 'পোলিও' আছে। দেহে খানিকটা অক্ষম। পরিচালক হিসাবে কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষমতাবান। ছবি আরম্ভ করেছে। ও পুনা ফিল্ম ইনস্‌টিটিউটের প্রথম পুরস্কার, স্বর্ণপদক পেয়েছিল (তখন আমি ওই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত)। ওর উপরে আমার অগাধ ভরসা।

শুক্লা। লখনউয়ের ছেলে। তথ্যচিত্র করেছে, শীঘ্রই বেরোবে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি করার কথা ভাবছে। ওর ভাবনা সফল হোক।

দুলাল সাইকিয়া। গৌহাটির ছেলে। একটা তথ্যচিত্র করেছে। লোকে ভালো বলেছে। এবার বড়ো ছবির কাজে হাত দেবে।

মণি কাউল। পাঞ্জাবের। "উস্‌কী রোটী" করেছে। দেখি নি, এখনও। কাজ কিছু 'স্টিলটেড', 'পোজ' করবার প্রবণতা বেশি। কিন্তু বুদ্ধিমান। বয়স বাড়লে মনে হয় ওই গোলমালগুলো কেটে যাবে।

চন্দ্রশেখর নায়ার। অন্ধ্রের ছেলে। ফিলমস ডিভিশনে পেটের দায়ে কাজ নিয়েছে। ভেতরে আগুন।

এ-রকম আরও কত ছাত্রের কথা বলতে পারি। এখনও যারা শিখছে, তাদের মধ্যেও স্পার্ক দেখতে পেয়েছি। আরও পাব।

ডিরেকশন-এর কথা এখন থাক্। ক্ষমতাবান নতুন টেকনিশিয়ানদের প্রসঙ্গে আসি। যাদের কাজের জোরে বহু বাজে ছবিও ভদ্র হয়ে যাচ্ছে। অনেক নিচু ক্লাসের ছবি যেমন কে কে মহাজনের ফোটোগ্রাফির জন্য উৎরে গেছে। গুরহা, অমরজিৎ, ধ্রুবজ্যোতি, কাউল, সাহানী— এ-রকম কত নতুন ক্যামেরাম্যানের নাম করা যায়।

আশা করি, আমার পয়েন্টটা এতে পরিষ্কার হয়েছে। সাউন্ড, এডিটিং, আর্ট-ডিরেকশন— প্রত্যেক বিভাগে এমন সব ছেলে এগিয়ে এসেছে, আসছে। সংগীতে কলকাতার এক সুরকারের নাম মনে পড়ছে। হৃদয় কুশারী। এক সময়ে যখন 'বগলার বঙ্গদর্শন' করছিলাম, যা বেশি দূর এগোয় নি, তখন এই তরুণ সুরকার আমার সঙ্গে কাজ করেন। এঁর প্রতিভা আছে।

অভিনয়ের দিকটাও বাদ দেবার নয়। হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে রেহানা, শত্রুঘ্ন, নবীন নিশ্চল, অমিতাভ প্রভৃতি অনেক নতুন ছেলেমেয়ে কাজ করছে। ওরা একটি নতুন আবহাওয়াও সৃষ্টি করছে।

এখানেই শেষ নয়। অবশ্যই না। ইনস্‌টিটিউটের ছাত্ররা ছাড়াও আছে প্রতিভাবান চিত্রকার। বাসু ভট্টাচার্য, বাসু চট্টোপাধ্যায়, বাবুরাম ইসারা— এরা কিছু করতে চায়, করবে বলেই বেরিয়েছে।

কলকাতাতেও এই লক্ষণ আছে। কিন্তু কলকাতায় আমি এখন বিদেশী। মাঝে মাঝে শুনি, মনে লাগে।

আমাকে ভীষণ 'পার্ট অব দ্য এস্‌টাবলিশমেন্ট' মনে হচ্ছে, না? ঘটনাটা ঠিক তা নয়। আমি যা, তা-ই। আমার সাধ্যমতো কাজ করে যাব, বাঁচি আর মরি। সে যাক। যা বলছিলাম।

যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের সকলের ক্ষমতা একরকম নয়। হওয়ার কথাও না। সবাই সফলও হয়তো হবে না। কিন্তু এই ডামাডোলের মধ্য দিয়েই কিছু একটা বেরোবে। বড়ো কিছু।

এ-ব্যাপারের অর্থনৈতিক পটভূমিকা সম্পর্কে আমার প্রচুর বক্তব্য ছিল। জমা রইল। যদি কখনো পরে হুকুম হয়, হাজির হব।

এবার শিল্পের তত্ত্বগত দিক নিয়ে দুই-এক কথা। এ-ব্যাপারে ভাবালুতা (যা সোজাসুজি ন্যাকামি মনে হয় আমার কাছে) পছন্দ করি না।

জন গ্রেজিন্‌জার কোথাও কোনো কাগজে বলেছিলেন যে, শিল্প শুধু শিল্পই। এইটা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আপত্তির একটা অবকাশ আছে। এই লোকটি কী কী ছবি করেছেন সব আমার জানা নেই, কারণ আমি ছবি সম্পর্কে ঐতিহাসিক হতে পারি নি। কিন্তু তথাকথিত ব্রিটিশ নিউ ওয়েভকে পুরোপুরি ঘেঁটে দেখেছি। লিনডসে অ্যানডারসন প্রমুখ পরিচালকরা আমাকে অভিভূত করেন নি। একমাত্র 'এ কাইন্ড অব লাভিং' আমাকে পাগল করেছিল। বিশেষ করে ওই ছবির শেষ দৃশ্যে মেয়েটির কাজ ভোলা যায় না। ওখানে মানবিকতার একটা চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

সিনেমা ভেরিতে, আন্ডার গ্রাউন্ড সিনেমা, Pseudo-existentialism— এই সব বাড়তে বাড়তে কথার মোহে কিছু ব্যক্তি পড়ে গেছেন। এঁদেরকে কৃপা করা উচিত। এঁরা শিক্ষিত নন।

যা বলছিলাম। জন গ্রেজিন্‌জার একটি নিরালম্ব-বায়ুভূত দর্শনের কথা বলেছেন যেটা বাচ্চাদের মুখ দিয়ে সাবানের ফেনা দিয়ে বুদ্‌বুদ ওঠানোর মতোই ক্ষণস্থায়ী। অবশ্য কোনো শিল্পই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু কিছু শিল্প মানুষকে কিছুদিনের জন্য এগিয়ে দেয়। কিন্তু এরা হচ্ছে যমের দূত। আজকের কাগজে এদের চটকদারি কথা শোনা যাবে, কাল এদের কেউ মনে রাখবে না।

করুণা করার ক্ষমতা আমার যদি থাকত, তবে এদেরকে অল্প-অল্প ক্ষমা করতাম।

পারব না।

লড়াইয়ের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যোদ্ধা কাউকে ক্ষমা করে না।

এইখানেই তবে প্রশ্ন তুলছি : শিল্পী কমিটেড কি না, শিল্পী কোথাও বাঁধা আছেন কি না।

কমিটমেন্ট কথাটার মানে কী? নিজেকে কোথাও সংলগ্ন করে রাখা। কার সঙ্গে সংলগ্ন করব? সংলগ্ন করতে হলে একটা দ্বিতীয় পক্ষ লাগে। যেমন, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পড়েন। তা হলে সেই মহিলাটিকে লাগে। শিল্পীর জীবনেও তাই। তাকে কোথাও-না-কোথাও লাগতে হবে। আপনি কি শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সংলগ্নতার কথা বলছেন? সেই সংলগ্নতা নিজের সঙ্গে যদি করতে পারেন তা হলে দয়া করে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গেই করুন-না!

যদি না পারেন, তবে বাইরের একটা বস্তু খুঁজতেই হবে। সেটা কী?

মানুষ।

শিশু।

জীবন মৃত্যুকে অস্বীকার করে। সকল শিল্পকে তাই হতে হবে জীবন অনুগামী।

জন্মই জীবন।

শিল্প জন্ম।

এই কথাটা আমরা কখনো ভুলে যেন না যাই। যত ক্লেদাক্ত, বিষাক্ত অভিশাপের ভিতর দিয়ে আমাদের বেরতে হবে, হবে। শিল্প আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে।

বড়ো বড়ো কথা না বলে এই শেষ কথাটাকে যেন আমরা মনে রাখি।

তা হলে হয়তো আমরা আখেরে কিছু গুছোতে পারব।

বাংলা : ১৯৬৪

প্রিয় সম্পাদকমশাই,

আপনি আমাকে 'বাংলা : ১৯৬৪' এই নামে একটি তথ্যচিত্র তুললে আমি কীভাবে তুলব এ-বিষয়ে কিছু লিখতে বলেছেন। মশাই, ভেবে পাচ্ছি না যে, ছাপার অক্ষরে আপনারা ব্যাপারটাকে ধরে রাখতে পারবেন কি না।

দেখুন একটা ছবি আমি করেছিলাম, তার নাম ছিল 'সুবর্ণরেখা'। দুর্ভাগ্যবশত এখনও সেটা সাধারণ্যে প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি। তাতে এক ব্যক্তি মদ্যপান করে বেশ্যালয়ে যাবার জন্য রওনা হয়ে এক রেফিউজি কলোনিতে নিজের মায়ের পেটের বোনের সামনে গিয়ে হাজির হয়। এবং মেয়েটি আত্মহত্যা করে। এবং লোকটি সর্ব-ব্যাপারের জন্য নিজেকে দোষী বলে জগতের সামনে জাহির করে।

এর শেষ দৃশ্য ছিল এক সাংবাদিক লোকটিকে প্রশ্ন করতে যায়। আমার ইচ্ছে ছিল, এই-যে শেষ ভোটাভুটি হয়ে গেল তারই পটভূমিতে এই দৃশ্যটি নেওয়া। এক পাশে কংগ্রেস, এক পাশে কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যদিকে স্বতন্ত্র, আরো যে কত কী, উদ্ভট প্রলাপের বিকার সমস্ত। রাজনীতি যে কত ভুয়ো হয়ে গেছে আজকে, সেটাই দেখানো ছিল আমার উদ্দেশ্য। আজকের বাংলাদেশে আমরা গুণ্ডামি করি, আমরা ধর্মবিদ্বেষ প্রচার করি— এত বছরের আন্দোলন এইখানে এসে পর্যবসিত হচ্ছে, এ যে কত বড়ো মর্মান্তিক ব্যাপার তা ভাবতেও আমার কষ্ট লাগে। এই বাংলাদেশের তথ্যচিত্র যদি আমাকে তুলতে বলা হয়, আমি তুলবই না মশাই।

দেশটি ক্রমশই ইতরের দেশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর, কোনো সৎ শিল্পীর নিজের দেশকে ইতর বলে দেখানো উচিত নয়। ব্যাপারটা অধার্মিক।

প্রমথেশ বড়ুয়া স্মরণে

প্রিন্স প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া একটি ছোট্ট জমিদারির জমিদার— যার নাম গৌরীপুর। শুধু তারই প্রিন্স ছিলেন না, তিনি মানুষের মধ্যেও একজন প্রিন্স। তাঁর ব্যবহারে, তাঁর সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে তিনি সত্যিকারের একজন প্রিন্স ছিলেন। তাঁকে যারা দেখেছে বা যারা মিশেছে, তারা কোনোদিনই ভুলবে না, প্রমথেশচন্দ্র কী ছিলেন। ওঁকে আমি আমার জন্ম থেকে দেখেছি এবং জেনেছি যে উনি কী ধরনের মানুষ।

অন্য কিছু কিছু ব্যক্তি বলেন যে তাঁরা নাকি নিজেদের ছবি করার আগে, প্রমথেশের ছবি দেখেন নি, তাঁরা ডাহা মিথ্যে কথা বলেন। জোচ্চুরির একটা সীমা থাকা উচিত। এই ধরনের কথাবার্তা বলে সস্তায় হাততালি পাবার একটা ব্যাপার হয়তো ঘটতে পারে, কিন্তু এগুলো আমাদের কাছে অসম্ভব হাস্যকর লাগে। মোটামুটি ব্যাপারগুলো আমাদের জানা আছে এবং এই ধরনের হিংসে মানুষের পক্ষে আর যাই হোক, ভদ্রতাপূর্ণ নয়।

আজকাল বলা হয়ে থাকে যে, সাবজেকটিভ ক্যামেরা এক ভদ্রলোক নাকি গত তিন-চার বছর আগে আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশে। তার আগে ডেভিড লিন বলে এক ভদ্রলোক একটা ছবি করেছিলেন। সেটার নাম ছিল ডেভিড কপারফিল্ড, এটা ডিকেন্সের লেখা একটি উপন্যাস। তারপরে অলিভার টুইস্ট বলে একটা ছবি উনি করেন। তাতেও উনি বোধহয় সাবজেকটিভ ক্যামেরাকে ব্যবহার করেছেন। এর পরে আমি ঋত্বিক ঘটক 'অযান্ত্রিক' ছবিতেও কিছু সাবজেকটিভ ক্যামেরা দেখিয়েছি। কিন্তু এইসবের বহুপূর্বে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ঐ কাজটাই করে গেছেন, তাঁর একটা ছবিতে (উত্তরায়ণ), সেগুলো আজকের লোকেরা মনেও রাখে না।

ওঁর একটা ছবি আছে, 'গৃহদাহ'। সেটা আমার মনে আছে, পাব্‌লিক স্ক্রিন ছিঁড়ে দিতে গিয়েছিল। তিনদিনের বেশি ছবিটি চলে নি কিন্তু যে অনবদ্য কাটিং সে ছবিতে ছিল সেটা সে যুগের আন্দাজে ভাবা যায় না। এই কথাগুলো ভুলে বড়ুয়া সাহেব সম্পর্কে নানারকম বোকার মতো মন্তব্য করা কোনো কাজের কথা নয়। এটা গায়ের জ্বালা মেটানোর পক্ষে খুব সুবিধাজনক হতে পারে, কিন্তু যাকে ইংরাজিতে বলে প্রপার অ্যাসেসমেন্ট সেটা হয় না। আমি এই ধরনের নিচু হতে পারি না। আমি পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা এবং সম্মান রেখে বেঁচে থাকতে চাই। কিছু কিছু লোক নাকটা বেশি উঁচু করে ফেলেছেন। আমাদের সামনে পড়লে অবিশ্যি চেহারাটা বদলে যায়। কিন্তু কাগজে-টাগজে লিখে ও নানারকম বক্‌বক্‌ করে সাধারণ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁরা। কিন্তু আমি, যেটুকু বুদ্ধি দিয়ে ছবিগুলো বুঝেছি তাতে প্রমথেশ বড়ুয়াকে ভোলার ক্ষমতা আমার নেই। ব্যক্তিগত একটা সম্পর্কের ব্যাপার ছিল, সেটা আমি এখানে তুলতে চাই না। কিন্তু বড়ুয়া সাহেবের কিছু কিছু cut's আমি আজও ভুলতে পারি নি। সেগুলোতে আজকালকার নামজাদা ডাইরেকটররাও কখনো পৌঁছুতে পারেন নি। কাজেই তিনি সত্যিই প্রিন্স এবং প্রিন্সই থাকবেন। ঐ মিথ্যাবাদীর দল নানারকম বলে যাবে, তাতেও কিছু যায় আসে না। উনি থাকবেন, উনি থাকবেনই।

একমাত্র সত্যজিৎ রায়

পনেরো-ষোলো বছর আগে, 'পথের পাঁচালী' যখন বেরল আমি তখন বোম্বাইতে একটি অতি নিম্নস্তরের ছবি-করিয়ে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি অতি নিম্নশ্রেণীর কাজের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। তার আগেই প্রাণ মন এবং আর্থিক সমস্যার দিক থেকে, আমার প্রথম সম্পূর্ণ ছবি করে এবং সেন্সর-এর ছাড়পত্র পেয়ে বাজারে বের করতে না পেরে, চূড়ান্ত হতাশায় মগ্ন হয়ে বোম্বাই গিয়ে গুমরোচ্ছি। যত সামান্য মাইনে, কাজের দাবিও তত কর্তাদের প্রচণ্ড। কাজেই কলকাতায় আসা হয়ে ওঠে না। তার ওপরে দৃঢ় ধারণা যে এদেশে সমাজ ব্যবস্থাটাকে না পাল্টালে কিছু হবে-টবে না। অর্থাৎ উৎসাহেরও অভাব।

এই সময় কানাঘুসোয় খবর পেলাম কলকাতায় 'পথের পাঁচালী' ছবিটি বেরিয়েছে এবং যাদের মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি তাদের কাছে শুনলাম যে একটা চূড়ান্ত কাণ্ড ঘটে গেছে।

'পথের পাঁচালী' ছবিটা যখন সত্যজিৎবাবু করছিলেন তখন আমিও আমার উপরি-উক্ত ছবিটা শেষ করে ল্যাবরেটারিতে কাজ করছিলাম। আমার এবং ওঁর দুজনের কাজই একই 'ল্যাব'-এ হচ্ছিল। কাজে-কাজেই টুকরো-টুকরো খবর উড়ো-উড়ো ভাবে কানে আসত। যেহেতু তাঁদের গোষ্ঠীও গতানুগতিকতার বাহিরে থেকে কাজ করার চেষ্টা করছিলেন তাই কৌতূহল একটু ছিল। তার পরে আমার ছবিটি শেষ সেন্সর-এর পরে বিপর্যয়, চূড়ান্ত হতাশার মধ্যে বোম্বের চাকুরি পাওয়া এবং আমার চলে যাওয়া। তবু ভদ্রলোক তার পরেও বেশ-কিছু দিন কত কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে ছবিটি শেষ করার চেষ্টা করছিলেন সে খবর আমি পেতাম। কাজেই এখন যখন শুনলাম ছবিটা উতরিয়েছে এবং প্রায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, তখন যুগপৎ প্রচণ্ড আনন্দিত এবং খুবই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। আনন্দিত কারণ তা হলে বোঝা গেল যে, বিভিন্ন কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়ে এবং সঠিক যোগাযোগের পথ বেয়ে যদি শেষ অবধি মানুষের সামনে গভীর চেষ্টাকে তুলে ধরা যায় তা হলে এই অবস্থার মধ্যেও বদল আনা যায়।

আর সন্দিগ্ধ এইজন্যে যে ভদ্রলোককে, তখনও আলাপ না থাকলেও, যেটুকু শুনে-দেখে বুঝেছিলাম তাতে মনে হয় নি যে বিভূতিভূষণের অপরূপ গ্রামীণ রূপকথাকে উনি সত্যিকারের দরদ দিয়ে তুলে ধরতে পারবেন। কারণ ওঁর জগৎ আমি যতটুকু জানতাম অপুর জগৎ থেকে একেবারেই বিভিন্ন।

তার পরেই ঘটনাচক্রে কলকাতায় এলাম এবং ছবিটি দেখলাম। একবার নয়, পর পর সাতবার। অবাক হয়ে গেলাম, আমার সন্দেহ একেবারে অলীক প্রমাণিত হল। এখানে-ওখানে নানারকম আপত্তি থাকলেও সবমিলিয়ে অপু-দুর্গা একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠল, আমার সামনে ফুটে দাঁড়াল। মনে আছে তখন বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বার বার একটা কথাই বলেছিলাম যে 'পথের পাঁচালী'তে এমন কিছু নেই যা আমরা হাজার বার ভাবি নি এবং স্বপ্ন দেখি নি। 'পথের পাঁচালী' ছবির চিন্তার দিক থেকে বা রচনাশৈলীর দিক থেকে এমন কিছুই আনে নি আমার কাছে যা আমি হাজার বার কল্পনাই করেছি, স্বপ্নই দেখেছি, উনি সেটা গুছিয়ে-গাছিয়ে খেটে তৈরি করে ফেলেছেন।

মারাত্মক এবং প্রচণ্ড বৈপ্লবিক তফাত। যে তফাত ওঁকে আমাদের নবযুগের স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিল, যে আসন থেকে তাঁকে সরাতে কোনোদিনই কেউ পারবে না।

দুই-একটা টুকরো-টুকরো কথা, ভালো এবং খারাপ 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেমন ইন্দিরঠাকরুণ অধ্যায়টি! একমাত্র ইন্দিরঠাকরুণের মৃত অবস্থায় বসে থাকার দৃশ্যটি বাদ দিলে বলা যায় আজ পর্যন্ত ভারতীয় চলচ্চিত্রে, খণ্ডভাবে দেখতে গেলে, এর থেকে ভালো ছবি করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারে নি। তিনিও না, অন্যরা তো না-ই। ইন্দিরঠাকরুণ সম্পূর্ণ গ্রাম বাংলার আত্মার প্রতিমা। এখনও ভাবলে এক-একটি দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফেরে। যেমন যে দৃশ্যে বুড়ি ঝরা শুকনো নারকেল ডাল টানতে টানতে উঠোনে ঢুকে সর্বজয়ার কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া শুনে সবাইকে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে কী হয়েছে। কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার মনে করছে না। দুত্তেরি জাতীয় একটি ভঙ্গি করে বুড়ি আবার বেরিয়ে গেল। এ দৃশ্যটি স্বপ্নর মতো বারে বারে চেতনায় এসে ঘা দেয়, এ দৃশ্যটি জীবনের একটি গভীর সত্যকে কেমন করে জানি না উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে, একটা উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে। এমন আরও দৃশ্যের কথা মনে পড়ে।

ভালো লাগে না বুড়ি মারা যাওয়ার দৃশ্য, বরং বলা চলে মৃতা বুড়িকে অপু-দুর্গার আবিষ্কার করার দৃশ্য। এখানে একটি বিখ্যাত বিদেশী ছবির ছায়া এসে পড়েছে বলে মনে হয়।

কিন্তু আবার মনে পড়ে কাশবনে অপু-দুর্গার ট্রেন দেখার দৃশ্য। অনবদ্য। মনে পড়ে সন্দেশওয়ালা বাঁক কাঁধে যাবার দৃশ্য। অপূর্ব। মনে পড়ে পাঠশালায় মুদি-গুরুমশায়ের বেত তাড়নার দৃশ্য! স্নিগ্ধ মধুর, পরম সত্য হাস্যরস।

তেমনি ভালো লাগল দুর্গার মৃত্যু দৃশ্য বা, কানু বাঁড়ুজ্যের মেয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে অতি অভিনয় এবং করুণা ব্যানার্জীর সেই দৃশ্যে কান্নার বদলে তার সানাইয়ের ব্যবহার।

তেমনি ভালো লাগে বাঁশিতে পাগল করা, পাকড়ে ধরা মূল তানটির ব্যবহার (theme), যেটা মোক্ষম সব জায়গায় ঠিক মনস্তত্ত্বগত উচ্চাবচ গ্রামে কানে এসে বাজে। এই মূল তানটি একেবারে ছবিটির প্রাণ-স্বরূপ।

এই সুবাদে বলে রাখি, 'অপরাজিত'তে এই সুরটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে সর্বজয়া অপুকে নিয়ে ট্রেনে করে বেনারস থেকে বাংলা দেশে ফিরে আসছেন, সেখানে জানালা দিয়ে যেই দেখা যায় যে ট্রেনটি বাংলা দেশে ঢুকছে তখন, একবার মাত্র এটি বেজে ওঠে। ফল হয় ঠিক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মতো। হঠাৎ বাংলা দেশ তার সমস্ত শ্যামলিমা নিয়ে আছড়ে পড়ে আমাদের বুকের ওপরে। এটা যে ঘটে তার কারণ হচ্ছে ঐ 'পথের পাঁচালী'তে এই সুরটি সঠিক জায়গায় ব্যবহৃত হয়ে নিজেকে নিশ্চিন্দিপুর আর বাংলা দেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে নিয়েছে। কাজেই দুচোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র শেষ আমার ভালো লাগে না। বড়ো অবুদ্ধভাবে ব্যাপারটাকে শেষ করা হয়েছে মনে হয়। মূল বইয়ের উদার ভবঘুরে যাত্রার সুরটা বাজে না, তার কারণ আঙ্গিকগতভাবে আমার ধারণায় ব্যাপারটাকে ভদ্রলোক অন্যরকম করে চিন্তা করলেও

পারতেন।

যাই হোক, এটা সত্যজিৎ বাবুর শিল্পকর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা যখন নয়, বরং ছবিটি আমাদের বা আমাকে কীভাবে অনুবুদ্ধ করেছিল তারি একটি ইঙ্গিত মাত্র, কাজেই এ-নিয়ে আর বাড়ানোর অবকাশ নেই।

'অপরাজিত' যখন হচ্ছে, ততদিনে আমি আবার কলকাতায় ফিরে এসে ছবি করতে আরম্ভ করেছি এবং সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই আলাপ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। 'অপরাজিত' আমার মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি, মানে অখণ্ড একটি ছবি হিসাবে। এরও যে জায়গা-জায়গা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নেই তা না, কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয়েছে এটাতে উনি উতরেছেন। 'পথের পাঁচালী' বা পরেরকার সব ছবির থেকে অনেক উঁচুতে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র কথা মনে রেখেই বলছি। যদিও 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি বলে আমি মনে করি।

তার পরে তাঁর অনেকগুলি ছবি তো দেখা গেল, যদিও তাঁর সব ছবি আমি দেখি নি। 'অপুর সংসার' আমাব ভালো লাগে নি। বৌ-এর মরার খবর শুনে শালাকে ঘুষি মারার কথা ছেড়েই দিলাম, একেবারে ছবির শেষটা আমার মনে হয় একটা মারাত্মক প্রমাদে ভুগছে। বিভূতিবাবুর 'অপরাজিত' বইটির শেষ আট-দশ পাতা পড়লে হয়তো অনেকে ধরতে পারবেন। অন্তত আমার তো মনে হয়, কাজল নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এসে ঠাকুরদা হরিহরের ভিটের কাছে দাঁড়িয়ে যে কথাগুলো ভেবে চলেছে, যেমন ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, দেবী বিশালাক্ষী, ঠাকুমা সর্বজয়া, পিসি দুর্গা থেকে আরম্ভ করে বাঁশবনের পাশের ভিটেতে মহাভারতের চরিত্রদের লড়াই পর্যন্ত। এগুলো বোধহয় অপরিহার্য ছিল।— আর সেই মারাত্মক শেষ পঙ্‌ক্তিটি— "অপু নিশ্চিন্দপুর ছাড়িয়া যায় নাই। সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।" বইয়ের প্রাণবস্তু বোধহয় এখানেই ছিল।

এর পরে তাঁর সব ছবি, মানে যা আমি দেখেছি, কিছু-না-কিছু জায়গায় হতবাক করে দিয়েছে। যদিও আমি নিজে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের জীবনদর্শনে বিশ্বাসী এবং আমার ছবি করার ঢঙ-টাও বোধহয সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির— তবু তাঁর কাজের জায়গায় বিরাট প্রতিভার স্ফুরণ দেখে অনেক সময় স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সব চাইতে যেটা আমার মনে হয়েছে, যে তাঁর একই সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তির উৎস এবং দুর্বলতার কারণ বোধহয়, উনি নানা রকম বিষয়ের মধ্যে নানা প্রকার আঙ্গিক-প্রয়োগের চেষ্টা করে চলেছেন আজও। এটা করলে সব কাজ যে সমানভাবে উতরে যাবে সেটা আশা করাও বোকামি।

তবু আমার কেমন যেন মনে হয় নিজের চিন্তাধারাটাকে এমনভাবে বহুমুখী করে ছড়িয়ে দেওয়াটি তিনি না করলেই পারতেন। তাঁর একজন পরম গুণমুগ্ধ হিসেবেই বলছি যে এতে যেন অনেকটা শক্তির অপচয় ঘটে গেল। আমার ভুলও হতে পারে।

এই কথাগুলো আমি একজন ছবি-করিয়ে হিসেবে বলি নি, বলবার চেষ্টা করেছি একজন শিল্প-প্রেমিক হিসেবেই। আমি ছবি করি আর না করি, বিশেষ করে চলচ্চিত্রটাকে নিয়ে প্রাণপণ ভাবি এবং বুঝতে চেষ্টা করি।

এই সুযোগে কথাগুলো বলার একটা কারণ হচ্ছে, আমি মনে করি ভারতবর্ষে ছবির

মাধ্যমটাকে যদি কেউ বোঝে তবে তিনি হচ্ছেন একমাত্র সত্যজিৎ রায়। দেখুন, মেজে-ঘষে পড়াশুনা করে একটা স্তর পর্যন্ত রগড়াতে রগড়াতে পৌঁছানো যায়, এমন-কি হয়তো প্রবন্ধকার বা ইস্কুল মাস্টারের স্তর ছাড়িয়ে এক ধরনের শিল্পীতেও পরিণত হওয়া যায়, কিন্তু জাত শিল্পী হতে গেলে অন্য আর-একটা এলেম লাগে। দেশ-বিদেশের নতুন নতুন ধারা, ছবি-টবি দেখে আর নানা লেখা-টেখা পড়ে, আলোচনা-টালোচনা করে পাণ্ডিত্য ফলানো যায়, কিন্তু রসোত্তীর্ণ হওয়া যায় না। লোকের হাততালিও পাওয়া যায় হয়তো সময় সময়, কিন্তু যে-কোনো খাঁটি সমঝদারের কাছে ভাবের ঘরে চুরিটা ধরা পড়তে বেশি সময় লাগে না। পড়াশুনা, ছবি দেখা, চর্চা করা, আলোচনা করা, ভাবা, নিজেকে সর্বদিক দিয়ে তৈরি করা এবং প্রভূত পরিশ্রম একাগ্র ভাবে করা— এগুলো অপরিহার্য। এগুলো ছাড়া কোনো সৎ শিল্পী স্বভাব-কবির চেহারা নিয়ে বসে থাকলে চিঁড়ে ভেজাতে পারবেন না, এটা ঠিক।

কিন্তু এই যা বললাম, তারও ওপরে একটা ব্যাপার থাকে। যেমন ক্লাস করে রবি ঠাকুর হয় না, ইস্কুল মাস্টার হয়। যেমন, আর্ট ইস্কুলে রগড়ে-রগড়ে পিকাসো বের করা যায় না। যেমন ওস্তাদ করিম খানের সব ছাত্র-ছাত্রী হীরাবাঈ বরোদেকর হয় না। ওটা সেই আরেকটা কিছু। বিশেষ একটা কিছু এসে যখন খেলা করে, তখনই জন্মগ্রহণ করে। সেটা যে কী, সেটা নিয়ে ভবিষ্যতে লেখার ইচ্ছে রইল। এখানে তার স্থান নেই কারণ সেটা অত্যন্ত গভীর শান্ত ধ্যানের সামগ্রী। বারান্তরে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল। কিন্তু সেই বিশেষ কিছুটা সত্যজিৎবাবুর মধ্যে ভীষণ ভাবেই আছে, সেটা তাঁর গোড়ার দিকের কাজের লক্ষ করা গেছে। ভবিষ্যতে লক্ষ করা যাবে কি?

সাম্প্রতিককালের এক কবি

বর্তমান কবিতা প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গেলে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিতে হয়। 'সমালোচনা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "অনেকে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্তি হয় ; তাহার একটি কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব, মিথ্যায় কল্পনার যেরূপ উদরপূর্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না।" "কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালোবাসে..." আজকে যখন কবিতা পড়ি, তখন এই কথার সত্যতা ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে। এত বেশি কবিতা লেখা হচ্ছে যে কবিরা নিজেরাই দশকভাবে পরমায়ু নির্ধারণ করেন।

জীবনানন্দ দাশ বলতেন— "উপমাতেই কবিত্ব", রবীন্দ্রনাথ বলতেন, "স্বপ্নই কবিতা"। স্বপ্ন উপমা, অনুভূতি, চিত্রফলন এ-সব কবিতারই যা সৎ, বিশুদ্ধ কবিতায় থাকে। আমি

সাম্প্রতিক কালের এক কবির সম্পর্কে আশা রাখি, যিনি কবিতার জন্য যথার্থ জন্মেছেন। আমার মনে হয় একালে বাংলাদেশে এতবড়ো শক্তিশালী শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন কবি আর জন্মান নি। তিনি হলেন বিনয় মজুমদার। যাঁকে অনেকে পঞ্চাশ দশকের কবি বলেন। কিন্তু আমি নিজে দশক বিভাগে বিশ্বাসী নই, তাই আমার আলোচিত এই কবি কোনো দশকের নন।

বিনয় মজুমদারের কবিতাগ্রন্থে 'ফিরে এসো, চাকা' 'অধিকন্তু' 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' 'নক্ষত্রের আলোয়' 'গায়ত্রীকে' 'ঈশ্বরীকে' অনেক আগের বই। দেবকুমার ছেপেছিলেন যখন, তখনই পড়ি। আজ "ফিরে এসো চাকা" নিয়েই হই-হই হচ্ছে। কিন্তু এর সব কৃতিত্ব দেবকুমার বসুর। তিনিই আলোচ্য কবির সমস্ত কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ইতিহাস কখনো কিছু ভোলে না। আজকের বিনয়ের পিছনে ঢাক-ঢোল, বাদ্যি-কাঁসর বাজানো হচ্ছে। যেদিন বাজাবার দরকার ছিল সেদিন বই প্রকাশের ব্যাপারেও কানাকড়িও কেউ ঢালে নি। সম্প্রতি বিনয় মজুমদার যে-সমস্ত লেখা লিখছেন, অথবা তাঁকে দিয়ে..., কিংবা ঢক্কানিনাদে তিনি দুর্বোধ্য হতে চাইছেন, এটা আতঙ্কের বিষয় ঈশ্বরীর যে ব্যাপার তিনি প্রেমকে, জীবনযাত্রাকে এমন-কি মানুষের সাধারণ কার্যকারণগুলিকেও এক স্বাভাবিক অতীন্দ্রিয়তায় উচ্চারণ করেছিলেন প্রথম দিকে, যদিও তাঁর ঈশ্বরী বার বার স্বরত্বের বাসনায় (কবির নিজস্ব বিরহে) স্বর্গে যাবার পথ সামাজিক সংসারে ফিরে-ফিরে মিশেছে। নিসর্গে কাটল ; এই কবি আজকের এমন এক-একটি অলৌকিক কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছেন, যেখানে তাঁর বিষয়ে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে, তবে কি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্য কবিকে ছুঁতে যাচ্ছে? উপমাকে, চিত্রকল্পকে পরিশীলিত রুচিতে নিয়ন্ত্রিত করে নির্মাণের চিহ্ন আজ কোথায়? বিনয় মজুমদার ক্রমশ থেমে যাবেন। "অঘ্রাণের অনুভূতি মালা" অনেক আগের কথা। আমি কয়েকটি গৌরাঙ্গ ভৌমিকের 'অনুভব' কাগজে দেখেছিলাম। এও জানি বই আকারে প্রকাশিত হলে মাতামাতি শুরু হবে। কিন্তু সেও তো অনেক আগের লেখা, আজকের নির্মাণ কোথায়? তবু বিনয় মজুমদার যা লিখেছেন, তাতে তিনি এ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কবিতার সমস্ত পঙ্‌ক্তির অর্থ করা হয়তো অর্থহীন, কিন্তু সামগ্রিকরূপে শেষ পর্যন্ত একটা অর্থে আসতে বাধ্য, যখন কবিতাটিকে পড়ে শেষ করা হবে। পাঠকের মনকে একটু কুয়াশায় হাঁটাবে। কবিতার সমস্ত উপস্থিতিটাও যদি অর্থহীন হতে থাকে, কেবল ধ্বনি টালমাটালে, একটু ছন্দের নাচনে কি হবে?

ঋত্বিক ঘটক সমালোচনায় বন্ধুকৃত্য করে না। নিজে যা ভালো বোঝে তাই লেখে। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে অনেক কবিতার মেলায় এই কবিকে সহজেই চেনা যাবে।

এরা শহরের পরগাছা, জনগণ বিচ্যুত।
এদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

আমার কাছে কবিতা-সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে আসাটাই উচিত হয় নি। ভুল অ্যাপ্রোচ! বেশ লোকের কাছে এসেছেন আপনারা! কবিতার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী আমি ও-মেরুর প্রায় কোনো খবরই রাখি না, বলতে গেলে অনেকের নামধামই জানি না। ছোটোবেলায় কাব্যি করা, অল্প বয়সের বায়ু-রোগ যাকে বলে, তারই ভিত্তিতে আপনাদের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে ভাবতে পারি।

প্রথমত বলা যায়— কবিতা সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে না এবং তা হলে সে শিল্প, শিল্পই থাকে না। রবি ঠাকুরের ভাষায়— শিল্পকে সৌন্দর্যনিষ্ঠ হতে হবে কিন্তু তার আগে তাকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। আজকের সত্য হচ্ছে— আজকের বর্তমান। তা থেকে বেরিয়ে এসে বায়ুভূক শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা যাঁরা করেন, তাঁরা সর্বসাধারণের পালিয়ে যাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। এক কথায় আমরা যাকে বলি— পলায়নী মনোধর্মিতা। সেটাও কিন্তু বর্তমান সমাজে নেতিবস্থার স্বীকৃতি। এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায়ই নেই। রাবণে রাম পুজো আর কি...!

আমার কাছে যে-সব কবির নাম করলেন, তাদের কিছু লেখা আমার প্রচণ্ডভাবে ভালো লাগে। রবীন্দ্রনাথের যত কবিতা আমি পড়েছি, তার অর্ধেকের বেশি অচল বলে মনে হয়। বাকি যাঁরা থাকেন— তাঁদের সব লেখাগুলো একত্র করলেও অতদূর পৌঁছোয় না। সেখানে নজরুল বা মুকুন্দ দাস অতীব ছাড়বস্তু। তবু নজরুলের জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু তাও তাৎক্ষণিক। আর প্রমুখদের মধ্যে কে পড়েন মশাই?

কবিতা একটি মিছিলের ভূমিকা নিতে অবশ্যই পারে, কিন্তু সে-রকম কবিতা বর্তমানের কোনো কবির কাছে আশা করতে পারি না। সে-রকম কাঁচা হলেও সুকান্ত, ক্বচিৎ সুভাষ। ব্যাস শেষ! আর এখন? এখন মশায়, মাঝে মাঝে এধার-ওধার ছুটকো-ছাটকা যে-সব কবিতা-টবিতা পড়ি— তা যে কী বস্তু, তা আমার ধারণার বাইরে! আরে, এই তো সেদিন আমার এক পরিচিতি ছেলে, কী যেন একটা কবিতার বই হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। সেও নাকি আজকাল বেড়ে লিখছে-টিখছে। বইয়ের নামটাও ভুলে গেছি, কী যেন— 'ঘাম ধুলো ঘাস' এ রকম গোছের একটা কিছু হবে; তা, এ আমার বোধগম্যির বাইরে। ইদানীং সুনীল গাঙ্গুলী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরা নাকি কবিতা লিখছেন। মদটদ খেয়ে কবিতাও নাকি আওড়াচ্ছেন! তা, সেটা শুধু পয়সা ওড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়! এঁরাও নাকি শুনছি আবার নামটাম করেছে। সিদ্ধেশ্বর সেন আমার বন্ধু লোক হন, এরও কবিতা আমি এক বর্ণও বুঝতে পারে না। আমার সঙ্গে স্টুডিওতে কাজটাজ করে, একেবারে হাল আমলের অনন্য-দেরও লেখাটেখা পড়ে দেখেছি— তা এদের কবিতা কোষ্ঠকাঠিন্যের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই বলে মনে হয় না। এইসব পড়েটড়ে আর বেশি কিছু আশা করার অবকাশ থাকে কি?

কবিতা মতবাদের ভিত্তি করেও হতে পারে। মতবাদ ভিত্তি করে অনবদ্য কবিতা সৃষ্টি

হয়েছে, এদেশেও, বিদেশেও। সৎ ও ক্ষমতাবান একজন সত্যিকারের শিল্পীর হাতে সে ধরনের কবিতা একটা যুগজয়ী রূপ নিতে পারে, এর সম্পূর্ণটা নির্ভর করছে শিল্পীর শৈল্পিক সত্তা ও ক্ষমতার ওপরে। একজন মায়কোভস্কির কাছে যে শুধু ব্যাপারটা কিছুই নয় তাই নয়, ব্যাপারটাই সব। মতবাদের ভিত্তি না থাকলে মায়কোভস্কি জন্মায় না। আমার কাছে কবিতা মানব-অনুভূতির চেতনা বা অভিজ্ঞতা সর্বস্তর থেকে রসাহরণ করে, করেও থাকে। আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ শিল্পীর মানসিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল। মোদ্দা কথাটা হল— ভঙ্গি। [ঢঙ করে যেটা করা হয়, সেটা আর যাই হোক শিল্প থাকে না] অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে যে উপলব্ধি, যাকে আমরা বলি অন্তর্দৃষ্টি, তা উৎসারিত হলে তাই আমার কাছে শিল্প এবং কবিতা। আমি তাই-ই চাই যা সৎ, সত্যদ্রষ্ট এবং সৌন্দর্যনিষ্ঠ।

আজকের জনগণ থেকে কবিতা বিচ্যুত বলেই আমার মনে হচ্ছে। অন্তত আমাদের দেশে। কারণ এদেশে সমাজের শ্রেণী-বিন্যাস। আজকের সময়ে আমাদের এই সমাজ প্রচণ্ড ভাঙচুরের মুখে। সাধারণত এদেশে কবিরা যে শ্রেণী থেকে আসেন, সে শ্রেণী হল নিম্ন মধ্যবিত্ত। সেখানে যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলছে। তাতে এরাও বোধ হয় পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের শ্রেণী সত্তার ভিত্তি বোধহয় খুব একটা দৃঢ় নেই। ফলে কবিতা যে সময়ে হাটে মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল, ঠিক সেই সময়ে দেখি— বিভিন্ন 'মুক্ত' 'যুক্ত' 'গুপ্ত' মেলাফেলা করে কিছু পেট-রোগা-বংশের বদহজম উদ্গার উৎসারিত হয়ে চলেছে। মশায়, এ কখনো জনপ্রিয় হতে পারে? আর এই প্রশ্নের শেষ অংশে যা তুলে ধরেছেন অর্থাৎ 'জনগণ'। দয়া করে জানাবেন এই 'জনগণ'টা কী? বিড়লা, গোয়েঙ্কা এঁরাও কি জনগণ নয়? ধরুন একজন কলকারখানার মেহনতী মানুষ বা একজন ভূমি-চাষি আর একজন মার্চেন্ট অফিসের বড়োবাবু এঁরা কি সব্বাই এক? এঁরা কি মিছিলে একই শ্লোগান তুলবেন? নিম্ন মধ্যবিত্ত কবিরা আমার মতে ক্ষয়িষ্ণু। আজকের সাধারণ অর্থে প্রতিষ্ঠিত কবিরা দাঁড়াচ্ছে যাদের ইংরেজিতে বলা যায় Production। Productive অর্থের অংশীদার এঁরা নন। তাই এঁরা শহরে সীমাবদ্ধ পরগাছা বলে আমাদের মনে হয়। এঁরা জীবনবিচ্যুত, এঁদের কাছে কিৎসু আশা করি না। এঁরা জনগণ থেকে বিচ্যুত।

এবং আমার ছবিতে আধুনিক কবিতা ঢোকাবার কথা সচেতনভাবে আমি কোনোদিন ভাবি নি। এ সম্বন্ধে আমার কোনো বিশ্বাস নেই। তবে যদি ছবির প্রয়োজনে লাগে তবে নিশ্চয়ই তা আমি দেবার কথা চিন্তা করব। তবে কবিতা ব্যবহারের জন্যে কবিতা ব্যবহার করতে হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ কবিতা আমার কাছে কোনো পবিত্র ব্যাপারই নয়। ছবিতে যেমন গানের প্রয়োজনে গান জুড়ে দেওয়া হয়। নাটকের জন্যে নাটক। তেমনি যদি কখনো দেখি কবিতার প্রয়োজন হয়েছে, তা হলে নিশ্চয়ই কবিতা নেব।

আজকের ছবির গতি-পরিণতি

আজকের পৃথিবীতে ছবি সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নানারকম হচ্ছে। সেগুলো সম্পর্কে যদি আমরা অবহিত হতাম, তা হলে সত্যিই আনন্দ পেতাম।

প্রথমত গল্প ব্যাপারটাই মোটামুটি বাদ হয়ে গেছে। আজকের ছবির জন্যে সারা পৃথিবীতে যে জোয়ার এসেছে, সেখানে গল্পের কোনো অবকাশ নেই। অতিসম্প্রতি মিজোগুচি মারা গেছেন, তাঁর কিছু কিছু কাজ দেখেছি। বা ধরুন আন্দ্রেই তারকভ্‌সকির ছবি। অথবা ওজু এবং কুরোসাওয়া'র ছবি। এগুলোর মধ্যে যে রসের সন্ধান পেয়েছি, তা সত্যিই অনবদ্য।

এঁদের সঙ্গে আমি বলব ফেলিনি-র কথা। এই ভদ্রলোক অনেক গভীরে ঢুকেছেন যদিও জেরাসিমভ তাঁকে কান-এ আক্রমণ করেছিলেন। আমার মতে কিন্তু ইনি কিছু ভদ্র কাজ করেছিলেন এবং চুটিয়ে কিছু ভালো ছবিও করেছিলেন। এবং ভবিষ্যতেও করবেন।

পোল্যান্ডে একটা চেষ্টা-চরিত্র আরম্ভ হয়েছিল ভালো ধরনের ছবি করার। আলেকজাণ্ডার ফোর্ড ছিলেন এর পেছনে। আন্দ্রে ভাইদা কিছু ভালো কাজ করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওঁর মাথাটা এখন মোটামুটি গুলিয়ে গেছে। ও সত্যি সত্যি একজন শক্তিশালী ছবি-করিয়ে কিন্তু নানারকম চাপে পড়ে বেচারি হারিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর শেষ দিকের কাজ দেখে আমি সত্যিই দুঃখিত হয়েছি। পোল্যান্ডে এখন উনি ছাড়া, আন্দ্রে মুঙ্ক হঠাৎ একটা দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর— আর যাঁরা আছেন, তাঁরা জা পল সার্ত্রের Existentialism-কে একটা নবধারায় প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। ফলে যে ধরনের ঘটনা ঘটছে, তা রোমান পোলানস্কির ছবির মতোই দাঁড়াচ্ছে।

আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধা যদি কারো উপরে থাকে, তিনি হচ্ছেন লুই বুনুয়েল। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে, উনি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এখনো পর্যন্ত নিজের বিবেক বিক্রি করেন নি। এ দেশের মানুষেরা ওঁর বেশি ছবি দেখার সুযোগ পান নি, কিন্তু আমার কিছু কিছু ছবি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দেখে মনে হয় যে, এখনো বোধ হয় কিছু কাজকর্ম হতে পারবে ছবির জগতে।

কক্কিয়নিস জাতীয় চলচ্চিত্রকাররাও কিছু ভালো ভালো কাজ করার চেষ্টাচরিত্র করছেন। আশা করা যায়, হয়তো এঁরা একটা ভালো অবস্থায় পৌছবেন।

নাটক এবং ফিল্মের জগতে বেরটল্ট ব্রেশ্‌ট-এর চিন্তাধারা প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে এখন। ওঁর 'Verfremdung' ভীষণভাবে পৃথিবীর সর্বত্র শিল্পীদের আকৃষ্ট করেছে। মানুষজনকে গল্পে ভুলিয়ে কাঁদানো আর সাধারণ সস্তা দৈহিক ব্যাপার দেখানো— এ-

সব দিয়ে কোনো সৎশিল্পী আর খুশি হতে পারছেন না। তাঁরা ভাবছেন, চারপাশের যে জগৎকে দেখা যাচ্ছে সেই সম্পর্কে মানুষের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করা। এইটেই হয়েছে এখন সমস্ত বড়ো শিল্পীর একমাত্র চিন্তা।

এই ঘটনাগুলোর ভিত্তিতে আমরা আমাদের দেশের দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন প্রচণ্ড দুঃখ হয়। আমাদের ছবি করার জগতে রওনা হতে রয়েছে একটা অত্যন্ত বিষাদময় ঐতিহ্য নিয়ে। সাহিত্যকে আমাদের সঙ্গী করতে হয়েছিল। ফল আমাদের এখনো ভুগতে হচ্ছে। আমাদের দেশে ছবি করতে গেলে প্রথমেই একটা গল্প বলবার কথা ভাবতে হয়। তার পরে সব আসে। আমি মনে করি, এইটা আমাদের অনুন্নত দেশের অশিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারার পরিচায়ক। এ বাধা যদি না থাকত, তা হলে সত্যিই হয়তো কিছু মানুষ কিছু কাজ করে ফেলতে পারতেন। তা হল না।

আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ কিছু বলার নেই। যদি কিছু করে থাকি, করেছি। ভবিষ্যতে কিছু করতে পারব কি না সেগুলো ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে।

তবে কিছু কথা বলে যেতে চাই। সেটা আমাদের দেশে ছবি করার ব্যবস্থা সম্পর্কে। বাংলা দেশের ছবি আসলে পরিচালনা করেন প্রদর্শকরা। তাঁদের কথা ভেবেই ছবি হয়, এবং তাঁদের হুকুমেই ছবি বন্ধ হয়। এঁরাই সর্বাগ্রে টাকা তোলেন। এর পরে এঁরা সুবিধামতো পরিবেশকদের টাকা দেন। তার পরে পরিবেশক যখন ভালো বোঝেন তখন প্রযোজককে টাকা দেন। অথচ এই প্রযোজকই নিজের গাঁটের কড়ি ফেলে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে ছবিটি করে থাকেন। অথচ তাঁকেই অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় শেষ পর্যন্ত। এই ঘটনাটা সমস্ত ছবির জগৎকে গলা টিপে মারছে।

আর-একটা ঘটনা আপনাদের আমি শুনিয়ে দি। চিত্রপ্রদর্শকদের একটা খুব ভালো ব্যবস্থা আছে : : M.G. বলে, তার সাহায্যে একটা লাভের ব্যবস্থা থাকবেই। কাজেই এঁদের কোনোদিন ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। 'হাউসফুল' না হলে ওঁরা মনে করেন যে আমাদের ক্ষতি হল। এ সম্বন্ধে সকলেরই খানিকটা ভাবা দরকার। এর যে কী প্রতিকার সেটাও বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার আর বেশি কিছু বলার নেই। তবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে ভারতবর্ষে ভালো ছবি হবার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি নিজে কিছু করি বা না করি, কিন্তু ভবিষ্যৎ পুরুষ যাঁরা আসবেন, তাঁদের জন্যে কথাগুলো বলে রেখে গেলাম।

বোধহয় বলার দরকার ছিল।

চলচ্চিত্র উৎসবের কয়েকটি ছবি

এবারকার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে খুব বেশি ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, তবে যে কয়েকটি দেখেছি সেগুলি সম্পর্কে কিছু অসংলগ্ন চিন্তা করা যেতে পারে।

প্রথম যে ছবিটির কথা মনে আসছে সেটি হচ্ছে 'লাভেনতুরা'। আন্তনিওনির কোনো ছবি এর আগে এদেশে আমরা দেখি নি এবং 'লাভেনতুরা' সম্বন্ধে খুব বিশিষ্ট বিদেশি সমালোচকদের বলতে শুনেছি এটিই হচ্ছে আন্তনিওনির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছবি। কিন্তু ছবিটি আমায় হতাশ করেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার যে অবক্ষয়, পরমাণুবোমার দাপটে যে সংশয়, পাপবোধের থেকে যে অনিশ্চয়তা— ছবিটিতে মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এগুলোরই প্রতিফলন হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু ছবিটি নিতান্তই মানবিক সম্পর্কের মধ্যেই পর্যবসিত হয়ে থেকে গেল।

দ্বীপে গিয়ে 'অ্যানা'র হারিয়ে যাওয়া— তার কোনো যুক্তি আন্তনিওনি কোথাও দেখান নি। একেবারে শেষ পর্যন্ত উনি এ বিষয়ে নীরব থেকে গেছেন। এই ব্যাপারটিকে ঘিরে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু সমালোচক বহু রকম দার্শনিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি করেছেন। ব্যাপারটি আমার কাছে কিন্তু সম্পূর্ণ নিরর্থক মনে হয়েছে। কারণ, এমনভাবে ঘটনার বিন্যাস করাকে সম্পূর্ণভাবে আমি সমর্থন কবতে প্রস্তুত আছি যদি দেখি তার দ্বারা একটা মজা আদায় করা গেল। কিন্তু তা তো হল না। সান্দ্রো ফ্লবিয়ার সঙ্গে দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক স্থাপন করল ঐ অ্যানাকে খুঁজতে গিয়ে এবং শেষে, যখন সে হোটেলেতে ইচ্ছে করলেই ফ্লবিয়ার কাছে গিয়ে শুতে পারে, তখন সে একটা সাধারণ বেশ্যার সঙ্গে রাত্রি যাপন করল। ফ্লবিয়া এসে সেটা দেখল এবং ক্লাইমেক্স সৃষ্টি হল— এ অসম্ভব কাঁচা মনের পরিচায়ক বলে আমার মনে হয়েছে। তারপরে ফ্লবিয়াকে খুঁজে বার করে সান্দ্রে যখন বেঞ্চে বসে কাঁদতে শুরু করল তখন ব্যাপারটা একেবারেই পদী পিসিদেব স্তরে গিয়ে পৌঁছল।

একটা গভীর তথ্যমূলক গবেষণার অবকাশ যেখানে ছিল সেখানে এই ধরনের অপরিপক্ব ব্যাপার আত্মাকে পীড়িত করে। কাজেই হতাশা এসেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ফেলিনির 'দলচেভিতা'। কত তীক্ষ্ণ, কত সুতীব্র তাঁর প্রতিবাদ। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ দুটি পরিচালকের একটি মাত্র ছবিই আমি দেখেছি। কাজেই এঁদের সমালোচনা করা দুজনের প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু ছবির বিচারে এ দুটির জাতে তফাত। 'লাভেনতুরা' অনেক অসার, অনেক অগভীর মনে হয়েছে আমার কাছে।

কিন্তু ছবিটি ছাড়িয়ে মন অনেক সময় চলে যায় পরিচালকের দিকে। আন্তনিওনি যে কত মহৎ শিল্পী, সেটা এ ছবির কাজকর্ম লক্ষ করে উপলব্ধি করেছি। ওঁর যে ক্যামেরা নড়ানো ভঙ্গিটা সেটা একেবারেই পাকা কারিগরের হাতের কাজ। নেহাতই বাজে ব্যস্ততার দায় থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে ওঁর ক্যামেরা অভিনেতাদের খুঁটিনাটি অঙ্গভঙ্গি চলাফেরা অলসভাবে লক্ষ্য করে যায়। ফলে একটা ঢিমে তেতালার ছন্দ সৃষ্টি হয়, সেটা ওঁর গল্প বলার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন। এই ব্যাপারটা আমাকে

অভিভূত করেছে। ওঁর ছবি থেকে একটি শটও বাদ না দিয়ে, শুধু শটগুলোর ল্যাজামুড়ো কেটে অতি অনায়াসেই হাজার দুয়েক ফুট বাদ দেওয়া যায়, এবং তাতে গল্পের কোনো একটা ধারা ব্যাহত হবে না। খালি ছন্দটা যাবে শেষ হয়ে। অসম্ভব মেজাজী শিল্পী উনি।

আর আমাকে মুগ্ধ করেছে অভিনয়। মনিকা ভিত্তিকে নিয়ে নানারকম গালগল্প প্রচলিত থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে আন্তনিওনির হাতে পড়ে মেয়েটি অনবদ্য কাজ করেছে। শুধু সে কেন : প্রতিটি চরিত্রই। ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে আন্তোনিওনি সে-জাতের পরিচালক যাঁরা অভিনয় বোঝেন এবং নিজের মনের মতন করে অভিনয় করিয়ে নিতে পারেন। 'ব্যবহারিক' অভিনয় আন্তনিওনি করান না, উনি নিজের ছাঁচে ফেলে অভিনেতাকে গড়ে নেন এটা পরিষ্কার বোঝা গেল।

তাই, সব মিলিয়ে 'লাভেনতুরা' আমাকে আন্তনিওনির অন্যান্য ছবি দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব করে তুলেছে।

এর পর যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে কুরাসোওয়ার 'সেভেন স্যামুরাই'। বহু যোদ্ধা এবং চিন্তাশীল পরিচালককে (এমন-কি সত্যজিৎ বাবুকেও) বলতে শুনেছি যে 'সেভেন স্যামুরাই' একটা অসাধারণ ব্যাপার আমার কাছে তা মনে হয় নি। বিশেষ করে শেষের সিকুয়েন্সটি একেবারেই অকেজো লেগেছে। কুরাসোওয়ার দক্ষতা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন দৃশ্য গঠনে তাঁর বলিষ্ঠ কৌশল অবাক হয়ে দেখার মতো। জাপানিদের যে অতি নাটুকেপনা একটা আছে সেটাকে মেনে নিলে তোশিরো মিফুনে অবিস্মরণীয়। কিন্তু মহৎ কথা বলতে গিয়ে নিতান্তই একটা থ্রিলারে পরিণত হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। ছবিটা এমনি জমেছে খুব, কিন্তু কেন জানি না কাব্যের অভাব অনুভব করা গেল। কুরাসোওয়া যে মহৎ শিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু 'সেভেন স্যামুরাই' মহৎ শিল্প নয়।

এর পরে আসে বার্গম্যানের উইন্টার লাইট-এর কথা। বার্গম্যান লোকটা যে জোচ্চোর এ সন্দেহ আমার বহুকাল আগে থেকে ছিল। 'উইন্টারলাইট' সেটা আবার নতুন করে প্রমাণ করল। চীনেরা অ্যাটমবোমা ফাটিয়েছে এই খবরে সুইডেনের এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করল, ক্রসে বিদ্ধ অবস্থায় যিশুখ্রিস্ট ঘণ্টাচারেক অনুভব করেছিলেন যে ভগবানও তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন— ইত্যাদি জাতীয় সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করা সুইডেনের মতো দেশের পক্ষেই সম্ভবপর— যে দেশে জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উন্নত। 'উইন্টারলাইট' অত্যন্ত একটা কষ্টকল্পিত গল্প এবং ইনগ্রিড থুলিন ও ম্যাক্স ভনসিডো-এর অনবদ্য অভিনয় সত্ত্বেও শেষ অবধি কোনো একটা জায়গায় পৌঁছতে পারে না। এ ছবিটি সত্যি আমাকে হতাশ করেছে।

এর পরে আসে 'হ্যামলেট'-এর কথা।

শেক্সপিয়ারকে ফিল্মে আনার বিভিন্ন চেষ্টা আমরা দেখেছি। তার মধ্যে লরেন্স অলিভিয়ারের 'রিচার্ড দি থার্ড' আমার কাছে সব চেয়ে ন্যায্য বলে মনে হয়েছিল। যদিও ওয়াইদার কাছে শুনেছি কুরাসোওয়ার 'থ্রোন অব ব্লাড' নাকি শেক্সপিয়ারের সবচেয়ে কাছাকাছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে ছবিটি আমার দেখা হয় নি। আমার কাছে

নতুন সোভিয়েট সংস্করণ 'হ্যামলেট' শেক্সপিয়ারের সবচেয়ে কাছাকাছি বলে মনে হয়েছে। এমন পরিপূর্ণ তৃপ্তিদায়ক ছবি সচরাচর দেখা যায় না। স্বভাবতই এ সংস্করণটি সাধারণ ব্রিটিশ সংস্করণ থেকে বিভিন্ন। রাজা ক্লডিয়াসের সভা থেকেই মূল ছবিটি আরম্ভ হয়, যদিও তার আগে সেই মারাত্মক শটটি আসে যেখানে কৃষ্ণপতাকা সূর্যকে আচ্ছাদন করে রাখে। তারপর হ্যামলেট ফিরে আসেন ওয়াটেনবাগ থেকে এবং একটিমাত্র শট্-এ মার সঙ্গে মিলনের দৃশ্যটি অপূর্বভাবে বিধৃত করা হয়। এ ছবিতে গিলডেনস্টার্ন ও রোজেনক্রানজের দৃশ্যগুলি এবং ফর্টিনব্রাসের অধ্যায় সম্পূর্ণভাবেই রাখা আছে যা সচরাচর রাখা হয় না। হ্যামলেটের কিছু কিছু বিখ্যাত উক্তি বাদ পড়েছে। কিন্তু যে ভঙ্গিতে ব্যাপারটিকে দেখা হয়েছে সেটা যেমন তাজা তেমনি মনোহারী।

সংগীতে সস্ট্যাকভিচ এক অপূর্ব আস্বাদন এনে দিয়েছেন। আমরা যারা সাইকোভ্স্কির হ্যামলেট ওভারচার কানে শুনে অভ্যস্ত তাদেরকেও তিনি কয়েক মুহূর্তেই জয় করে নিয়েছেন। 'হ্যামলেট' চরিত্রে তরুণ অভিনেতাটি (নাম তার মনে পড়ছে না) অনবদ্যভাবে ব্রহ্মাণ্ডভাবনার বিষাদ তাঁর দুটি চোখে এনে ফেলেছেন।

সত্যি কথা বলতে কী 'হ্যামলেট' এই উৎসবে আমার কাছে সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ছবি বলে মনে হয়েছে।

নাজারিন ও লুই বুনুয়েল

বুনুয়েলের সম্বন্ধে অনেক কিছুই পড়া ছিল, কিন্তু এক লস অলভিদাদোস ছাড়া আর কোনো ছবি দেখার সৌভাগ্য এদেশে আমাদের হয় নি। সেও দেখানো হয়েছিল বহুকাল পূর্বে, এবং অত্যন্ত কাটাছেঁড়া একটা সংস্করণে।

অবিশ্যি, তাঁর জীবন সম্বন্ধে যা খোঁজখবর আমরা পেয়েছি তাতে অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল মনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। বুনুয়েল হচ্ছেন ছবির জগতে এক **stormy petrel**। ১৯২৮ সালে সালভাদোর দালির সঙ্গে মিলে সুররিয়ালিজমকে সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত করার অভিযানে তাঁর ছবির জগতে প্রবেশ। ককতো এবং তিনি (সালভাদোর দালির সঙ্গে মিলে) দুজনে দুটি ছবি একই ব্যাবসাদারের পয়সাতে একই সঙ্গে করেন।

সুররিয়ালিজমকে আমরা যতই উড়িয়ে দেই-না-কেন এখন, ঐ সময়টিতে তার একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল, এবং ছবিটি আমরা দেখতে না পেলেও সেই বিখ্যাত ইমেজটি আমাকে অত্যন্ত **haunt** করেছে— সেই বিগ্ ক্লোজ-আপে ক্ষুর দিয়ে চোখের মণি কেটে দেওয়া শট্টি বারে বারে আসে একটা **leit motif**-এর মতো।

তার পর বহু বছর বুনুয়েলের যে আশ্চর্য সংগ্রাম, কারো কাছে মাথা না নুইয়ে স্বেচ্ছাকৃত যে নির্বাসন, চিরকাল তা একটি শিল্পীর নৈতিক বলের উদাহরণস্বরূপ হয়ে থাকবে। বহু বছর তিনি মাদ্রিদে বসে বস্তাপচা কমার্শিয়াল ছবিগুলোকে কেটেছেঁটে একটা

ভদ্র চেহারা দিয়ে বাজারে ছাড়ার জন্যে edit করে পেট চালিয়েছেন, তবু নিজে কোনো ছবি পরের হুকুম অনুসারে করেন নি।

'নাজারিন' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বুনুয়েলের অতীত সম্বন্ধে দুটো কথা বললাম এইজন্যে যে, তাতে করে আমরা মানুষটিকে কতখানি সিরিয়াসলি বিবেচনা করব তার একটা হদিশ পাওয়া যাবে।

'নাজারিন' দেখে দুটো কথা আমার মনে হয়েছে, সেই দুটোকে গোড়াতেই সেরে রাখি। দুটোই নাজারিনে বাইরের কথা।

প্রথমে মনে হল ইংরেজি ভাষায় যে নাকউঁচু কতকগুলো কাগজ বেরোয় তাতে যে-সব সমালোচকরা লিখে থাকেন, তাঁরা কত বড়ো গণ্ডমূর্খ। কথাটা আগেও মনে হয়েছিল 'দোল্‌চে ভিতা' দেখার পর। এই সমালোচকরা এতই অশিক্ষিত এবং ছবির সম্বন্ধে তাদের ধারণা এতই ওপর-ওপর যে এরা সম্পূর্ণ দিগ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, এরা অন্যান্য শিল্প, ওদের নিজেদের দেশের এবং সভ্যতার ইতিহাস এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান— সে-সব সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। এঁরা বোধ হয় ছবি ছাড়া অন্য কিছুতে কোনো উৎসাহ খুঁজে পান না। ফলে, ছবি-করিয়েদের মহাফ্যাসাদে পড়তে হয়, কারণ তাঁরা ঠিক ওই বিষয়গুলোর থেকেই তাঁদের শিল্পকর্মের জীবনীরস আহরণ করে থাকেন। নাজারিনের সম্বন্ধে আলোচনায় বসলে এবং তার পরে তাঁদের লেখাগুলো পড়লে কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এদেশে দেখলাম ছবিটিকে দেখাবার আগে একটা ইন্‌ট্রোডাকশন hand-out ধরিয়ে দেওয়া হল হাতে। সেটা নাকি কোনো বিখ্যাত মেক্সিকান কবি, বুনুয়েলের বন্ধু, এবং এদেশে মেক্সিকোর রাজদূতের লেখা। তাতে সালভাদোর দালিকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং সার্ভেন্তেসের ডন কুইকজোট পর্যন্ত এসে পড়েছে। জানি না হয়তো স্থানাভাবের জন্যেই এরকম একপেশে লেখা হয়েছে কিন্তু লেখাটি অত্যন্ত misleading। বিশেষ করে দালির নাম ওইভাবে জড়ানোতে বুনুয়েলের সমস্ত ডেভেলপমেন্টটা এবং তার বর্তমান অবস্থিতিটা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে গুলিয়ে যাবার আশঙ্কা প্রচুর।

এর থেকে বরঞ্চ ভালো ছিল সোজাসুজি ছবিটা দেখিয়ে দেওয়া।

'নাজারিন' নামটা আমাদের সামনে সঙ্গে সঙ্গে দ্যোতনা এনে দেয়, অথচ বিলিতি কাগজে পড়লাম নাজারিন ছবিটা ভালো কিন্তু কত সংকেতময় তার নামটা পর্যন্ত, এ কথা কারো লেখায় পড়েছি বলে মনে পড়ে না। ওই নামকরণের সঙ্গে একটানে বুনুয়েল সাহেব সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতটা এনে ফেলেছেন— কারণ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় Jesus of Nazareth-এর কথা, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটির থিম আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

Persecution of the fool—এই থিমটি একটা সুপ্রাচীন এবং আর্কিটাইপাল থিম। সমস্ত দেশের সমস্ত সভ্যতার বিভিন্ন গাথার মধ্যে আমরা এই থিমটিকে বারে বারে খুঁজে পাই। সেদিক থেকে Jesus এবং ডন কুইকজোট আত্মীয় বৈকি। দুজনেই archetypes of fool। আমাদের যাজকটিও তাই। এই দেখার ভঙ্গির মধ্যে যে প্রচণ্ড

ঘৃণা এবং বিদ্রূপ লুকিয়ে রয়েছে তাকে এমন সহজ গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা একমাত্র বুনুয়েলের পক্ষেই সম্ভবপর। তার সঙ্গে ছবিটাময় একটা tension লক্ষ্য করা যায় যেটা রিলিজ হয় একেবারে শেষে Hallelujah-র অনুভূতিতে। সেটাও কিন্তু বিদ্রূপ।

এই ছবি দেখতে দেখতে আমার খালি মনে হচ্ছিল যে বুনুয়েল সাহেব অত্যন্ত ভাগ্যবান লোক। কারণ যতই সাধারণের বিশ্বাস হোক-না-কেন যে আমরা ধর্মান্ধ জাতি, আমাদের কুসংস্কার অনেক বেশি ইত্যাদি ইত্যাদি রোম্যান ক্যাথলিক cultural complex-টি অনেক বেশি শক্ত, আজও তাতে ধাক্কা মারার সুবিধে হয়। কারণ organized Church একটা ইনস্টিট্যুশন হিসেবে, বিশেষ করে মধ্যযুগের বিস্তৃতির মধ্যে দিয়ে চমৎকার একটা target, আমরা ও-পুণ্যে বঞ্চিত। আমাদের লড়াই করতে হয় হাজারো রকম cross current-এর সঙ্গে যা কখনোই একটা tangible object হয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় না। ভারতীয় হিন্দুধর্ম সেদিক থেকে অনেক ফিচেল এবং বদমাইস। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। নাগার্জুনের শূন্যবাদ (বোধ হয় তদানীন্তন কাল পর্যন্ত মানবচিন্তার উচ্চতম শিখর, কারণ নাগার্জুন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের অন্যতম।) যেহেতু বৌদ্ধ দর্শনের (মহাযানবাদী) যুক্তিযুক্তভাবে পরম সিদ্ধান্ত, তাই যতদিন ও ভদ্দরলোক বেঁচেছিলেন হিন্দুরা চুটিয়ে গাল দিয়ে গেছে তাঁকে। যখন তিনি নিরাপদভাবে একেবারে মৃত এবং কিছু শতাব্দী কেটে গেছে, তখন arch reactionary শংকরাচার্য সেটিকে আত্মসাৎ ও কুক্ষিগত করে বেড়ে অদ্বৈতবাদ বলে চালিয়ে দিলেন। এবং হিন্দুধর্মের একটা cornerstone হয়ে রইল অদ্বৈতবাদ।

যতদিন বুদ্ধ বেঁচে ছিলেন (দৈহিকভাবে না হোক মানুষের মনে এবং সামাজিক শক্তি হিসেবে) ততদিন তাঁর সঙ্গে প্রচুর কুস্তি চলল। তার পর যখন তিনি আর নেই, তখন তাঁকে বিষ্ণুর এক অবতার করে ছেড়ে দেওয়া হল। জয়দেব স্তোত্র লিখলেন।

এ-রকম ভূরি ভূরি নমুনা দেখানো যাবে যাতে করে ভারতীয় আর্যধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং ফিচলেমি পরিষ্কার হয়ে আসে।

সেদিক থেকে Roman Catholicism অনেক বেশি বোকা। Heresy কথাটাকে যত্রতত্র প্রয়োগ করে এবং Pope the Pontifex ব্যাপারটিকে খাড়া করে তারপর চুটিয়ে Inquisition চালিয়ে একটা অত্যন্ত tangible Goliath খাড়া হয়ে উঠেছে যাকে যে-কোনো শিল্পী David গুলতি মারতে পারে।

এবং আশ্চর্যজনকভাবে আজও ওই সভ্যতার মানুষের মনে এই ধর্ম ব্যাপারটা বিশাল স্থান অধিকার করে আছে। অতি অধুনা Catholic John Kennedy-র নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা ভালোভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে।

তাই বলছিলাম, বুনুয়েল সাহেব অত্যন্ত ভাগ্যবান।

এবং তিনি সেই সৌভাগ্যকে চুটিয়ে ইস্তেমাল করেছেন। অবিশ্যি Viridiana ছবিটা এদেশে দেখানো হয় নি। কিন্তু সেই মারাত্মক stillটি আমি দেখেছি, যাতে সেই rogue-রা খেতে বসেছে আর camera তাদের ধরেছে Da Vinci-র সেই Last Supper-এর ভঙ্গিতে। কতখানি তীব্র ঘৃণা এই ছবিটি থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এবং সেই

একই ঘৃণা Nazarin-এর প্রেরণার উৎস।

অনেককে এখানে বলতে শুনেছি যে, Bunuel অত্যন্ত violent। এই violence-কে আমি ভালোবাসি। কারণ, চিত্তের বিশুদ্ধতা এবং ঘৃণার পবিত্রতা না থাকলে এ violence আনা কারও সাধ্য নেই। বুনুয়েল পুতুপুতু ভাবে জীবনকে দেখেন নি ; তার গভীরে প্রবিষ্ট হয়েছেন। একটা গোটা সভ্যতার সম্পূর্ণ যোগফলের ওপরে তিনি রায় দিচ্ছেন এবং সে রায় অমোঘ। একটি মূর্খ, যার পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণা যীশু এবং ডন কুইকজোটের মতোই মূর্খতাময়, সে লড়ে চলেছে। এবং একটি বৃদ্ধ ফলওয়ালীর সাংকেতিক ভাবে একটি আনারস দেওয়ার মধ্যেই সে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল। বুনুয়েলের এ ছবি একটি সভ্যতার মিথ্যাচরণের চরম দলিল।

একটি বিষয়ের কথা এখানে আমার মনে পড়ছে। সেটা অবিশ্যি সম্পূর্ণ কারিগরি দিক।

সমস্ত ছবিটিতে কোনো আবহ-সংগীত নেই। সব সময়েই আবহ শব্দ ভরে রেখে দিয়েছে ছবির পারিপার্শ্বিক। শুধু শেষের সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল দৃশ্যটিতে কাড়ানাকাড়া বেজে ওঠে, religious ecstasy-র চূড়ান্ত প্রতীকরূপে।

আরও মনে পড়ে বামনটির ব্যবহার। বেশ্যা মেয়েটির সঙ্গে বামনের যে অপূর্ব সম্পর্ক তিনি তৈরি করেছেন, তার শেষ হয় গিয়ে বামনের দৌড়ে দৌড়ে সেই বন্দী মেয়েটির পেছনে ছুটে, তার পর সেই কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে থাকাতে।

সেই যে সেই চাষি মেয়েটি— যাকে তার প্রেমিক ছেড়ে গেল, fade out-এর আগে সেই শুঁড়িখানায় তার যে sexual orgasm— কী মুন্সীয়ানা ওই দৃশ্যটিতে।

যখন বিয়াত্রিচের মা তাকে বলে যে তুমি পাদ্রিটার প্রেমে পড়েছ, যেহেতু কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি, তাই বিয়াত্রিচের যে হিস্টিরিয়া, এমন সূক্ষ্মভাবে মনস্তত্ত্বের উপস্থাপন খুব কম ছবিতেই দেখা যায়।

সেই যে গাঁ-টিতে মড়ক লেগেছিল সেখানে এরা তিনজন গিয়ে পৌঁছল এক ঘরে, যেখানে মুমূর্ষু মেয়েটি last prayer শুনতে চায় না, শুধু ডাকতে চায় তার দয়িতকে— কী গভীর মানবতাপূর্ণ সেই দৃশ্যটি।

সেই গভীর রাত্রের দৃশ্যটি মনে করুন, যেখানে পাদ্রির কাঁধে মাথা রেখে বিয়াত্রিচে ঘুমিয়ে পড়ল, পাদ্রি সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে থেকে একটা toad-কে তুলে নিয়ে হাতের ওপর রাখল— আদর করল, তার পরে সেই বেশ্যা মেয়েটি এসে কাঁদতে আরম্ভ করল, তুমি ওকে বেশি ভালোবাসো, আমাকে না, এর সঙ্গে যখন বেশ্যাটির শেষদৃশ্য মেলাই, যেখানে সে একটা বন্দীকে কৃতজ্ঞতা জানাল এবং অন্য বন্দীটির গায়ে থুতু ছেটাল তখন জানি ওই মেয়েটিই জিতেছে। এই মেয়েটিই এ ছবির একমাত্র positive character।

এবং গভীর, কী subdued এবং প্রাণবন্ত positive বক্তব্য— যা বেরিয়ে আসছে একটি খুনী, আইনের হাত থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ানো, একটি অতি সাধারণ বেশ্যা মেয়ের মধ্যে দিয়ে। যে কয়েকটা fancy বোতাম চুরির জন্যে খুনও করতে পারে।

বুনুয়েল সত্যিকারের একজন মহত্তম শিল্পী।

লা দল্‌চে ভিতা ও ফেলিনি

ছবির জগতে অতীব সহজে একেবারে চূড়ান্ত বিশেষণ প্রয়োগ করা আগে সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাবসাদারি কাগজগুলোর মধ্যেই, কিন্তু ক্রমশ সেটা সংক্রমিত হয়ে যাচ্ছে তথাকথিত চিন্তাশীল সাময়িকী সমূহেও এবং দায়িত্বশীল চলচ্চিত্রকারদের নিজেদের বিজ্ঞাপনেও। ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে ভয় হয় অচিরেই আমাদের বাংলা ভাষা তার ধার হারিয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়বে, তার সীমানা দেখিয়ে ফেলবে এঁদের হাতে এসে। এককথায়, ছবির কথা বলতে বসে সংযম বলে পদার্থটি প্রথমেই উড়ে যায় আজকাল।

তাই ছবি সম্বন্ধে কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে আজকাল রীতিমতো লজ্জা করে। ব্রীড়াবনত হয়ে পড়তে হয়। তবু বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে ফেলিনির এই ছবিটি আমার দেখা সব ছবির মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছবি। কাজের ছবি। অনুধাবন করার ছবি।

একটি বিরাট সভ্যতার বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ড, তার পর্যবসিত ফলশ্রুতি এই একটি ছবিতে বিধৃত। ফেলিনি ভদ্রলোকটি "ক্রতো স্মর"-ও বলেছেন, "কৃতং স্মর"-ও বলেছেন, আমাদের কঠোপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা কবির মতোই।

পশ্চিমী সভ্যতার মূলে যে খ্রিস্টান আদিম পাপের উপলব্ধি, যার থেকে সমস্ত মধ্যযুগীয় ও রেনেসাঁসের শিল্পের উৎপত্তি— এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের যে প্রাচুর্যপূর্ণ রূপকল্প— যা এই সভ্যতার এক মহা ইঙ্গিতময় প্রকাশ— এই ছবির প্রতিটি চিত্রকল্প তার থেকেই উঠে এসেছে। এবং মৃত্যুর দরজায় দাঁড়ানো সে সভ্যতার আজকের যে অবচেতন জীবন চেতনা, অর্থাৎ দু-হাজার বছরের যে ধর্মচক্র আবর্তন— এই গোটা ব্যাপারটির একেবারে বুকে গিয়ে লেগেছে এ ছবির সমস্ত দ্যোতনা। এমন তীব্রভাবে— সত্য ধারণ, একেবারে লাগসই রূপকল্প দিয়ে সেই সত্যের উদ্‌ঘাটন, অথচ সহজভাবে স্বচ্ছন্দগতি চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া— এর পেছনে যে প্রাণ, সে প্রাণকে প্রণাম করতে মন চায়। যে শিক্ষিত মনের পরিচয় এ ছবি, সে মন মেজাজীও, দরদীও। সে মন জানে সে কী বলতে চায়, সে যার সম্বন্ধে বলতে চায় তাকে সে ওতপ্রোত ভাবে চেনে। যার মাধ্যমে বলতে চায়, তার সম্বন্ধে সে মনের কোথাও কুয়াশা নেই, দ্বিধা নেই। একেবারে তীক্ষ্ণভাবে সঠিক।

ছবিটি দেখে আমার পরম শ্রদ্ধেয় এক বন্ধুর মনে হয়েছিল, এ ছবিতে একটা চালাকি আছে। যৌন প্রগল্‌ভতাকে এ ছবিতে ব্যাবসাদারি কাজে লাগানো হয়েছে। আর দানবত খ্রিস্টের টিকি ধরে হেলিকপ্টারে ঝুলিয়ে "চিরন্তন নগরী"-র সেন্টপলস-এ নিয়ে যাওয়া দিয়ে ছবি শুরু করে, সূর্যস্নানরত বিকিনি-পরিহিতা নাগরীদের তার'পরেই উৎসুক দেখিয়ে এবং একেবারে কেটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বোধিসত্ত্বের আকুলতার আবহে ক্রন্দনময় সাংগীতিক অনুরণন পিঠোপিঠি ফেলে যে ধরনের আশার সঞ্চার করা হয়, পরে ধর্মের সেই সুতোটি যেন আর ছবির বুনুনির মধ্যে সেভাবে আসে না।

ছবিটি যে অবস্থায় এ শহরে দেখানো হয়েছে, তাতে করে এ দুটো কথা নিশ্চয়ই মনে আসতে পারে। আমাদের সেন্সার অনেক কেটেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-

ব্যাবসাদারেরা এখানে ছবিটি চালিয়েছেন চিত্রগৃহে প্রদর্শনের সময় মাথায় রেখে তাঁরা খোদার ওপর খোদকারি করেছেন। তা নইলে 'মিরাক্‌ল্'-দৃশ্যটি কোনো কারণেই না দেখানোর যুক্তি নেই। ওখানে কোনো যৌন প্রগল্‌ভতা নেই। অথচ এই অধ্যায়টি বোধহয় প্রাণস্বরূপ এ ছবির। অবিশ্বাসী সেই ধর্মযাজক, সেই বৃষ্টির মধ্যে নায়কের সহবাসিনী মেয়েটির অঘটনে বিশ্বাস, আর চাষি ধূর্ততায় ভর্তি বাচ্চা-দুটির কাকা— এরা একেবারে সেই উলটো দিকটা তুলে ধরছে, যার অভাবেই ছবিটিতে ভারসাম্যের অভাবের কথা মনে হয়েছে।

ব্যাবসাদারি মতলবকে যৌন ক্ষুধার দুর্দম এবং যথেচ্ছ অভিযান এ ছবিতে মোটেই দেখানো হয় নি। মানুষের এতেই পর্যবসিত হয়ে যাওয়া, যখন একটা আবেগ খোঁজার জন্যে, একটি দুর্বারতাকে বুকে ধরার জন্যে আর কিছু থাকে না— এটা যার উপসর্গ, যার লক্ষণ— ফেলিনি সেই অবস্থাটিকেই ধরতে চেয়েছেন। আশ্বিন মাসের কুকুর কুকুরী বিহারের সঙ্গেই এই কর্মকাণ্ডের মিল আনতে চেয়েছেন তিনি। শেষ "প্যাট্রিশিয়া"-র ছন্দ সংগীতের সাথে যে "স্ট্রিপ টিজ"-এর দৃশ্য আছে, তার শেষে বোকা মেয়েটির পিঠে মার্চেল্লোর সওয়ার হওয়া এবং বালিশ ফাটিয়ে পালক তুলো ওড়ানো— এই ছবিগুলোর বীভৎসতাতে তিনি এই সুতোটির শেষ টেনেছেন। এই পর্যন্ত পুরো ছবি দেখা গেলে, নিশ্চয়ই সেই ডিসগাস্ট দেখা দিত, যা তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

আমিও গোটা ছবিটা দেখি নি। কিন্তু চিত্রনাট্য পড়ে নিয়ে আবার যখন ছবি দেখলাম, শূন্য জায়গাগুলো পূরণ করে নিতে গিয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। সমস্ত নকশাটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার সামনে।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুরও ছাপানো চিত্রনাট্যটি পড়ার পরে এই একই ধারণা।

আমি শুনলাম, অনেকের নাকি মনে হয়েছে, এ ছবি করার দরকারটা কী ছিল।

কথাটা শুনে আমার দুটো ব্যাপার মনে হয়েছে।

ধরুন, ছবিটি ইয়োরোপে প্রচুর পয়সা পিটেছে। দরকার তো টাকার, সেটা সিদ্ধ হয়েছে। ফেলিনি ভদ্রলোক এখন দাপটে আরো কয়েকটি ছবি করতে পারবেন। এটা একটা প্রচণ্ড দরকার।

আবার ধরুন, হ্যামলেট লেখার সত্যিই কোনো দরকার ছিল কি? চতুরঙ্গের? ওঅর অ্যান্ড পীসের? লোকটির মাথায় কয়েকটি কথা চেপে বসেছিল, সে ভেবেছে, পড়েছে, দেখেছে— তার পর সুযোগ পেয়ে ছবিটি করেছে, কালে আমাদের মোহিত করে দিয়েছে। যাকে দেয় নি, দেয় নি। রুচি আর বোধশক্তির স্তরের ওপরে নির্ভর করে ভালো লাগা— এ নিয়ে তর্ক করে তো ফল মেলে না।

আমি মোটেই ভাবি না, এ মার্চেল্লো একটি আধাফ্যাসিস্ট নোংরা কাগজের সাংবাদিকই শুধু, তার কলঙ্ক-সংগ্রহের অভিযানে আমাদের কোনো দায়ভাগ নেই।

আমি মনে করি এই সেই মানুষ যার দ্বিধাজড়িত অনিশ্চয়তাপূর্ণ প্রতিটি পদক্ষেপে আমার জীবনেও দিক্‌নির্দেশ করছে— আমিও তার মতো দেবদূতকে দেখি দূর থেকে। কথা শুনতে পাই না— এবং আবার চলে যাই রাত্রির জীবদের সঙ্গে আমার খোঁয়াড়ে।

আমি জানি, এই পশ্চিমী সভ্যতার ক্ষয়রোগপূর্ণ প্রভাব আমাদের দেশে, আমাদের

মনেও পড়েছে। এর বিস্তার অনেক গভীর পর্যন্ত।

আর-একটা কথা। আমার খালি মনে হয়েছে, ফেলিনি ভদ্রলোক প্রচুর মানসিক শক্তির অধিকারী। যে ভাবে এই অর্বাচীন জগতের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড ভাবনাকে তিনি মিলিয়েছেন, তার দোলায় দোলায় যে ছন্দ সৃষ্টি করেছেন, তা দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। এক-এক লাফে তিনি এমন একটা মন্তব্যে পৌঁচেছেন থেকে থেকে, যার প্রস্তুতির কথা মাথায়ও আসে না আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। অথচ যখন আসে সে ছবি, তখন মনে হয় কত স্বাভাবিক এই লাফ। সেই গভীর দুঃখী বাঁশি-বাজিয়ের কথা ভাবুন, যে বেলুনদের ডেকে নিয়ে ফিরে যায়, অ্যানিটা একবার্গ যখন কুকুরের ডাক দেয় সুষুপ্তিমগ্ন পাড়াতে অথবা সে ধারাস্নানে খুশিয়াল হয়ে ওঠে শিশুর মতো, স্টাইনারের স্ত্রী যখন চরম দুঃসংবাদ শোনার আগে নিষ্পাপ হরিণের মতো চায়, অথবা যখন ভোররাতে মার্চেল্লো ফিরে আসে গাড়ি নিয়ে এম্মাকে তুলে নিতে। মানব-জীবনের আর জগৎ-জীবনের কী দোলা! এ অনুভূতির ব্যাপার, বোঝানো শক্ত।

এ ছবিতে যে সংকেত, যে অর্থবহ ইঙ্গিত— তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, আমার জীবনে শুনতে পাচ্ছি তার অস্ফুট কোলাহল, আর পাচ্ছি একটা গোটা সভ্যতার ধারার বিচিত্র রূপকল্প।

এত গভীর, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অথচ এত দরদী ছবি আমার কপালে দেখা হয় নি।

অবশ্য দেখেছিও খুব কম।

বার্গমান প্রসঙ্গে

বার্গমান প্রাথমিকভাবে একজন মঞ্চশিল্পী। সুইডিশ স্টেট অপেরাতে এতকাল রেজিসিয়োর (Regisseur) হিসাবে কাজ করছেন। এবং আমার ধারণা চলচ্চিত্রেও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন। ভদ্রলোকের গোটা কয়েক ছবি দেখে তো আমার এ কথাটাই মনে হল।

আমার এই মনে হওয়া ব্যাপারটা ভুলও হতে পারে কারণ ভদ্রলোকের সব কাজ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কাজেই আলোচনাটা হয়তো একপেশে হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমি যা বলব সেগুলো অনেকের কাছেই একদেশদর্শী বলে মনে হতে পারে।

এই ভূমিকাটুকু করে বার্গমান সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করব।

বার্গমানের ছবি দেখলেই তাকে আমার একজন নকল-নবিশ বলে মনে হয়। 'স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ান সাগা' অথবা একেবারে নতুন 'সেলমালেগার লোফ' যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে ব্যাপারটা মোটেই চমকপ্রদ নয়। আমার মনে হয় আমেরিকানদের কাছে (অথবা সেই রকম চিন্তাধারা যাদের) বিক্রি করার জন্যে ভদ্রলোক সব জিনিসকেই খানিকটা ভাইকিংসদের ফিলসফির সঙ্গে মিলিয়ে চালাবার চেষ্টা করছেন। যাকে আমি

চমক ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না।

যেমন ধরুন 'ভার্জিন স্প্রিং'-এর প্রথম শটেই দাসী মেয়েটা ঐ 'থ্রাসিং ফ্লোরে'র মাঝখানের কাঠটাকে ধরে উপরের দিকে মুখ করে চেঁচাতে থাকে "ওডিন কাম", এই যে কাঠের খণ্ডটি ওটি একটি সিস্টেমের প্রকাশ করে। ইনি হচ্ছেন প্রাচীন নোমাডিক সভ্যতার দেবতা। সমস্ত লড়াইটা হচ্ছে প্যাগান এবং খৃস্ট সভ্যতার মধ্যে। আমাদের ভুললে চলবে না, সুইডেন হচ্ছে ইউরোপের প্রায় শেষতম দেশ যেখানে খৃস্টধর্ম শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বার্গমান ব্যাপারটাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন।

হয়তো এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে এই থিমেটিক ধারণার সঙ্গে দেখা বিষয়কে এক করার চেষ্টা কেন? কিন্তু এটা তো ঠিক বার্গমানের আঙ্গিক নৈপুণ্যের যেটুকু বৈচিত্র্য তার সবটুকুই থিম-নির্ভর।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ভদ্রলোকের 'সেভেন্‌থ্ সীল' অথবা 'দি ফেস' দেখে আন্তরিকতার অভাব এবং চিন্তাশূন্য চমক ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। ইদানীং সত্যজিৎবাবুর ছবির মধ্যেও একই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায়।

এর বেশি বলতে গেলে অনেক বেশি আলোচনায় অনুপ্রবিষ্ট হতে হয়। দয়া করে মাপ করবেন। ভবিষ্যতে ইচ্ছে রইল বিস্তারিত লেখার।

তবে এটা ঠিক বার্গমানের কনটেন্ট্-নির্ভর নাটুকেপনা শিল্প-চলচ্চিত্র-বহির্ভূত ব্যাপার। যার আয়ু খুবই কম।

পরিচালনা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : আপনার মতে অর্থনৈতিক দিক বজায় রেখে উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রসৃষ্টি সম্ভব কি না?

উত্তর : সম্ভব। অবশ্য উল্লেখযোগ্য চিত্রনির্মাণ বলতে আপনারা কী বলতে চান, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। উল্লিখিত হবার মতো যোগ্যতা নানা ধরনের ছবির থাকতে পারে— 'টেন কম্যান্ডমেন্টস' থেকে আরম্ভ করে 'অ্যাশেস অ্যান্ড ডায়মন্ডস'-এর মতো ছবি। আপনাদের মাথায় যদি এই থেকে থাকে যে, চিত্রের স্বকীয় শিল্পগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পয়সা পাবার মতো ছবি— তা হলেও বলব সম্ভব।

অর্থনৈতিক দিক মানেই জনপ্রিয়তা। অর্থাৎ দেশ, কাল অনুপাতে মানুষের শিক্ষা ও রুচির ন্যূনতম যে পরিমাপ তাকে ভিত্তি করে শিল্পগত উৎকর্ষে পৌঁছবার প্রশ্ন। এটা যে সম্ভবপর তা চ্যাপলিন থেকে 'পথের পাঁচালী' পর্যন্ত প্রমাণ করেছে। চ্যাপলিন-এর সেন্টিমেন্টাল মেলোড্রামাগুলি— 'সিটি লাইট্‌স' 'গোল্ড রাস' অথবা 'লাইমলাইট' (বড়ো ছবিগুলোর কথাই বললাম) সাধারণ মানুষের বোধগম্য মানবিক সম্পর্ক এবং তার আবেদনগত বিকাশকে আশ্রয় করেই পৃথিবী সম্পর্কে এক ব্যক্তিগত শিল্পীর দৃঢ়তম উপলব্ধিকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

অর্থাৎ সম্ভব। কিন্তু খুব কঠিন। উত্তীর্ণ রসশিল্পী যাকে ইংরাজিতে বলে, completely consummated artist, এঁদের দ্বারা ছাড়া আর কারও এ-কর্ম মানাবে না সহজে। সাধারণত মোদ্দা ব্যাপারটা জোলো হয়ে যায়, ফিকে হয়ে যায় ওই অর্থনৈতিক দিকের কথা ভাবতে গেলে। কাজেই ঘটনাটা ঠিক ব্যক্তিগত মতামতের অপেক্ষা রাখে না— দৃষ্টান্তের অপেক্ষা রাখে। যখন হয় তখন অপূর্ব সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে এক অখণ্ড রূপানুভূতিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে সে শিল্পকর্ম দেখা দেয়, আর যখন হয় না, তখন সুকুমার রায়ের বকচ্ছপ মূর্তি নিয়ে দেখা দেয়।

এই তো মনে হয় মোট ব্যাপারটা।

প্রশ্ন : আপনার অভিজ্ঞতায় চলচ্চিত্রের দুরূহতম দিক কোন্‌টি এবং কেন?

উত্তর : আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রথমের মধ্যেই পাবেন।

প্রশ্ন : আপনার শ্রেষ্ঠ ছবি কোন্‌টি? তার নির্মাণে আপনি কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

উত্তর : তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর নয়। আমার হাত আসতে আসতেই আরও বছর দশেক কেটে যাবে বলে মনে হচ্ছে। তখন হয়তো এ ধরনের প্রশ্নের কথা ভাবা যেতে পারে।

এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ যেটা সেটারও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা এরকম প্রশ্নোত্তরের পরিধির মধ্যে সম্ভবপর নয়। পরে বিস্তৃতভাবে বলার ইচ্ছা রইল সুযোগ পেলে।

প্রশ্ন : বর্তমানে কয়েকজন য়ুরোপীয় চলচ্চিত্রশিল্পীর ধারণা এই যে, চলচ্চিত্র-শিল্পের চরম উৎকর্ষ তখনই, যখন তা সাহিত্যনিরপেক্ষ হয়ে স্বাধীনভাবে শিল্পসৃষ্টিতে সমর্থ হবে। আপনার মত কী?

উত্তর : কয়েকজন য়ুরোপীয় চলচ্চিত্রশিল্পী বলতে আপনারা আরও পরিষ্কার হতে পারতেন। বিশেষ করে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভাল-এর সেমিনার-এর আলোচনাটা তুলে ধরতে পারতেন। কারণ কয়েকজনের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজস্ব একটি করে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়েছেন এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে তফাত আছে। কাজেই এ তর্কের জের না টেনে সোজাসুজি সাহিত্য-নিরপেক্ষ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

চলচ্চিত্রের উন্নতি বলতে আপনারা কি তার স্বাধীন-বিকাশের কথা জিজ্ঞেস করছেন? এমন ছবি তো বহু হয়ে গেছে। ফ্ল্যাহার্টি-র সব-কটা ছবি, আইজেনস্টাইন-এর প্রধান ছবিগুলি দেসিকা ও জাভাতিনি-র কাজগুলি, হাজার হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তাই বলে কি আমি ভাবব পদভকিন-এর 'মাদার' চলচ্চিত্রের উন্নতি করে নি? এ ধরনের ছবিও তো প্রচুর রয়েছে। তর্কটি Source material নিয়ে কেন উঠবে আমি বুঝতে অপারগ। শেষ শিল্পফল যেটা, তার ওপরই উন্নতি অবনতি নির্ভর করছে।

অপর একটা কথা। থিয়োরি মাত্রেই জীবন এবং তার বহুব্যস্ত কর্মকাণ্ডের একটা খণ্ডাংশ। কাজেই যে থিয়োরিই আমি তুলে ধরি-না-কেন, সেটা একটা-না-একটা অংশকে বাদ না দিয়ে জানাতে পারব না। তার মানে এ নয় যে গাইডিং প্রিন্সিপল্‌স থাকবে না, ডিরেকশনাল অ্যাপ্রোচ থাকবে না। কিন্তু সেটা হচ্ছে দর্শকের কথা, এবং শিল্পের আঙ্গিকগত অর্গানাইজেশন-এর কথা।

কাজেই আমি নিজে যা prefer-করি সেটাই সবাই করুক এইভাবে জাহির না বা করলাম। কারণ মূলগত দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে (যেটা ফিল্ম নয়, সমস্ত শিল্প এবং তার অনেক মানবোতিহাস ও জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তা) আমার যাই মতামত থাকুক, তার বেশি আমার কিছু বলার নেই এবং কোনো ধরনের শিল্পকর্মেই আমি অপাংক্তেও করতে রাজী নই। অপরে আমার মতো করুক, এটা না চেয়ে অপরে তার মতো করুক, এটাই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য, নৃত্য, লোকসাহিত্য অন্যান্য যৌথশিল্প অথবা সরাসরি স্বাধীনভাবে দেখা জীবন— প্রেরণাটা যেখান থেকেই আসুক-না-কেন, আমি তার শিল্পফলটি দেখার জন্যেই উন্মুখ।

চিত্রনাট্য সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : আপনার মতে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য ও নাটকের মধ্যে প্রকৃতিগত ও শৈলীগত পার্থক্য কতটুকু এবং কোথায়?

উত্তর : পার্থক্য অনেক। মূলত মাধ্যমের বি-সমতাই এই পার্থক্যগুলির জন্ম দিয়েছে। মঞ্চকে কোনো সময়েই তার মঞ্চত্ব অর্থাৎ staginess ঢাকার চেষ্টা করতে হয় না—চেষ্টা করেও খুব ফল হয় না। কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের অনুভূতি (feeling of spontaneity) ছায়াছবি গোড়া থেকেই দর্শকের মনে এনে দেয়।

এই মূলগত পার্থক্য থেকে জন্ম নিয়েছে কী হয় কী হয় ভাব কাটানোর চেষ্টা অর্থাৎ avoidance of intrigue, তথাকথিত de-dramatization এবং গল্পাশ্রয়ী নয় এমন ছবির অতি আধুনিক অনুশীলন। এ-সমস্তই ছবি-করিয়েদের মাথায় আসছে গোড়ার ঐ মাধ্যমগত সুযোগ এবং বাধা থেকে। বাধাটা হচ্ছে এই যে, এই স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে নাটুকে ছবি ভেজাল বলে মনে হয়, অর্থাৎ stage-managed.

প্রকৃতি এবং শৈলী— ঐ দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর বিভিন্ন দিকের মধ্যে না গিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে একেবারে গোড়ার কথা সেটাই ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করব।

অবশ্য নাটকও আজকে ব্রেশট-এর হাতে পড়ে একটা মহাকাব্যিক পথ ধরেছে যার মধ্যে পশ্চিমী ঐতিহ্যের সঙ্গে অপূর্ব সমন্বয়ে এসে মিলেছে চীনে, জাপানি আর ভারতীয় জীবন্ত শিল্পগুলির তীব্র প্রভাব। তাই ব্রেশট অনেক এগিয়ে এসে ছায়াছবির বহু সুবিধেকে অঙ্গীভূত করে নিতে পেরেছেন। অথচ ছায়াছবির যেটা প্রধান দোষ— পল ভালেরির ভাষায় ছায়াছবি শুধু বাস্তবের ওপরের আস্তরণটাকেই আঁচড়াতে পারে— সেটা ব্রেশট সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছেন। ভালেরির সমালোচনার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। ছায়াছবি সত্যিই গভীর দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশকে কতখানি ধরতে পারে সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। একটা জায়গায় গিয়ে খেলো হয়ে যাবার একটা ব্যাপার ঘটে, এটা আমার মনে হয়েছে। শ্রেষ্ঠ সংগীতে তা ঘটে না ; শ্রেষ্ঠ আঁকা ছবিতে তা ঘটে না ; শ্রেষ্ঠ নাটকেও তা ঘটে না।

কথাটাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে, জানি। সমস্ত ব্যাপারটিকে গুছিয়ে বলতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে পড়ার ভয় আছে। আমি মোটেই ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছি না এমন ধরনের কোনো কথা যে পিরানদেল্লোর কর্মকাণ্ডের পর 'রসোমন্' কোনো নতুন খবর নিয়ে আসে নি। আমার বক্তব্য, যে-কোনো শিল্পকর্ম, যেটিকে বহুর সঙ্গে বহুর মধ্যে বসে উপভোগ করতে হয়, তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডভাবনার কিছু কিছু দ্যোতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া বড়োই কঠিন। নাটকও বহু লোক একসঙ্গে বসে উপভোগ করে বটে কিন্তু নাট্যকার জানেন মঞ্চের বাইরেও তাঁর লেখার একটা মূল্য আছে। এবং সব শ্রেষ্ঠ নাটকের সম্পূর্ণ রসাস্বাদনে একা বসে পড়াও একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করে। কাজেই নাট্যকার তাঁর চিন্তায় এ-সম্ভাবনাকে ধরে নিয়ে এগোন। চিত্রনাট্যকার এরকম

কোনো সম্ভাবনাই কল্পনা করার অবকাশ পান না।

আর-একটা কথাও আমি ভেবে দেখতে বলি। নাটক সম্পূর্ণ জাতীয়। দেশজ ভাষাই তারা বাহন। কিন্তু চিত্রনাট্য একটা উৎকট দ্বন্দ্বে সবসময় ভোগে। দেশজ পটভূমি ও ভাষা তার উপজীব্য হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে ছড়িয়ে আছে। ফলে গভীরতম কথা বলতে হলে একটি ধারাবাহিক কালচার-কম্‌প্লেক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আপনাকে বলতে হবে। সেই কনটেক্সটটা যাঁদের কাছে নেই তাঁরা কতদূর উপভোগ করবেন এই আশঙ্কায় অনেক সময় চিত্রনাট্যকারকে সস্তায় কিস্তিমাৎ-এর দিকে এগোতে হয়। সারা ভারতবর্ষের সৃষ্টিশীল চিন্তায় কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জটি যে স্থান অধিকার করে আছে, বিভূতিবাবুর সমস্ত লেখাতে এই কাল্পনিক কালপুরুষ যেভাবে বারে বারে এসে ধাক্কা দেয়, এই সিম্বল থেকে যে তীব্র তেজ এবং ঘরছাড়া বেদুইনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভূতিবাবু আহরণ করেছিলেন— সত্যজিতের 'অপরাজিত'-র বিদেশী দর্শকদের মধ্যে কজন ওরিয়ন কথাটা শুনে সেইভাবে মেতে উঠেছিলেন?

প্রশ্ন : সার্থক সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে শিল্পীকে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

উত্তর : 'সার্থক সাহিত্য' কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। সার্থকটা হওয়া দরকার যে ছবি করছে তার কাছে। মূল সাহিত্যিক-কল্পনার প্রেরণা নিয়ে ছবি-করিয়েদের নতুন ছবির কল্পনায়, স্বপ্নে ডুবতে হয়। কাজেই তাঁর কাছে যেটা valid তাই-ই হচ্ছে সার্থক সাহিত্য— অন্তত আমাদের এই আলোচনার পক্ষে।

আমার মনে হয়, এ কাজে সার্থক সাহিত্য দুরকমের হতে পারে। এক হচ্ছে, যে সাহিত্যের জীবনদর্শনের সঙ্গে চিত্রনাট্যকার সম্পূর্ণ একমত, আর দুই হচ্ছে যার ভূয়োদর্শন আংশিক সমালোচনা জাগায়।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে আইজেনস্টাইনের 'অ্যান্ অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি'র প্রস্তাবিত চিত্রনাট্যকে। ড্রাইজারের সমস্ত বক্তব্যের মূল যেটি আইজেনস্টাইন তার একটা বিরাট অংশের সঙ্গে একমত ছিলেন। ফলে উপন্যাসের বীজ ঘটনা যেটি তার দ্যোতনা এবং তাৎপর্যকে তিনি বদলে নিলেন। এ ঘটনাটি চিত্ররসিক মাত্রেরই জানা আছে।

ড্রাইজারের দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বুঝে ড্রাইজার যে জীবনখণ্ডটিকে তুলে ধরেছিলেন স্বাধীনভাবে নিজে তার তথ্যের মধ্যে আবার ডুবে গিয়ে ড্রাইজারের সীমার পরিধিটা উপলব্ধি করে তবেই তিনি আর-এক ধাপ এগোবার জন্য স্পষ্ট দিক্‌নির্ণয় করেছিলেন। ফলে ড্রাইজার নিজে তাঁর এই প্রস্তাবিত চিত্রনাট্যে এত বদল করা সত্ত্বেও উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।

এই হচ্ছে এক ধরনের সমস্যা। এখানে গোটাকে গ্রহণের প্রশ্ন আসেই না। 'পথের পাঁচালী'-এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর-এক ধরনের যে গ্রহণ সে হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্রহণ। সেখানে সমস্যা খাঁটি সমস্যা। যেমন ধরুন, পুডভকিন গর্কির 'মাদার' করলেন। দুজন শিল্পীর আত্মিক যোগাযোগ ছিল অখণ্ড।

সেখানেও বদল করতে হয়েছে। যেমন সেই বিখ্যাত দৃশ্য · পাভেল জেলখানা থেকে

ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে উদার শস্যক্ষেত্রের মধ্যে মার সঙ্গে এসে মিলল। গর্কির বইয়ে এ-দৃশ্যটি এবং ঘটনাটি এইভাবে এই জায়গায় ছিলই না। কিন্তু গর্কিকে এই দৃশ্যটি উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল!

সমস্যাটা এখানে এই, নির্যাসটিকে গ্রহণ করে আসল বক্তব্যটিকে মাথায় রেখে ভেঙেচুরে নতুন করে সাজাতে হবেই। এ প্রয়োজনটা পড়ে প্রাথমিক শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিকেরই visionটিকে ছবির জগতে সৃষ্টিশীল interpretation-এর মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করার জন্যে। অনেক সময় এই ভাঙাচোরার কাজে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিলেও হয়।

আসলে ঘটনাটা নির্ভর করে চিত্রশিল্পীর শিক্ষার উপর, তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার উপর। তিনি যদি জানেন যে কোথায় তাঁর স্থান, তিনি কী বলতে চান এবং কীভাবে সেটা বলতে হবে– তা হলে যে-কোনো সাহিত্য তার আংশিক বা সম্পূর্ণ সার্থক মূল্য নিয়ে সঠিকভাবে প্রতিভাত হবে তাঁর কাছে। তিনি স্থির করতে পারবেন কী গ্রহণীয় কী বর্জনীয়, কীভাবে accentuate করতে হবে, কীভাবে plastic image-এর মধ্য দিয়ে বলতে হবে এবং কীভাবে telescope করতে হবে।

একখানি ছবি দেখে যে বুঝতে পারা যায়, ভদ্দরলোক সাহিত্যকর্মটিকে পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছেন, তার একটা চটকদার অংশে মোহিত হয়ে ছবি করতে ঝাঁপ দেন নি।

তখনই মনে হয় নজরুলের ভাষায়, দে গরুর গা ধুইয়ে।

প্রশ্ন : সাহিত্য-নিরপেক্ষ চলচ্চিত্র সৃষ্টির সমস্যা ও সুবিধা আপনার মতে কতটুকু?

উত্তর : শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে যেটি একমাত্র প্রয়োজন, সেটি সবসময় সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে নিজের বলার কথাটিকে সোচ্চার প্রকাশ করা প্রয়োজন। এবং যখন আর কোনো অতীত শিল্পকর্ম তা সে সাহিত্যবোধ আর যাই হোক নিজের বলার কথাটিকে প্রতিফলিত করছে না দেখতে পাওয়া যায় তখনই আসে নিজে ভেবে গুছিয়ে নতুন সৃষ্টির তাগিদ। ব্যাপারটি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

সাহিত্যনিরপেক্ষ বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন? অন্যের গল্প না নোওয়া? অথবা অন্য কিছু? কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

যদি আর কোনো লেখা না নিয়ে এবং সেইসঙ্গে অন্য কোনো উৎস থেকে প্রেরণা না পেয়ে নিজের তাগিদে নিজের কথা বলার ব্যাপারটিকে ভেবে থাকেন– তা হলে বলব, সেক্ষেত্রে সমস্ত প্রারম্ভিক শিল্পীর সমস্যা– একেবারে নিজের উপলব্ধি ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার সমস্যা। তার সুবিধে এবং অসুবিধে মূলত অন্য যে-কোনো প্রারম্ভিক শিল্পসৃষ্টির সুবিধে এবং অসুবিধের মতোই, কোনো তফাত নেই। ফিল্মের নিজস্ব সমস্যা এটা না, যে-কোনো মূল শিল্পীর সমস্যারই ক্ষেত্রবিশেষের রূপান্তর।

তবে হ্যাঁ। স্বাধীনতা সম্পূর্ণ। আমাকে আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। আমিই এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা। যা বুঝেছি তাই তুলে ফেলব।

অসুবিধে? তা হবে বৈকি। খুব সম্ভাবনা আছে ধ্যাড়ানোর। নিজের চিন্তা যদি স্ফটিক-স্বচ্ছ আকার ধারণ না করে, জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। অপরের

দেওয়া শিরদাঁড়াটা নেই তো এখানে।

অবশ্য নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক ভাবলে এ-নিয়ে দিশেহারা হবার কোনো কারণ নেই। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজে হেঁটে পথে চলতে গেলে যদি পটল তুলি সেটাও মোটামুটি প্রাপ্তবয়স্কের মতো ব্যবহারই হবে এবং সেটা অপরের শাড়ির আঁচল ধরে চলার থেকে বোধ হয় সার্থকতরও হবে।

চলচ্চিত্রের সেকাল ও একাল

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাচীন পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী? উভয় পদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে আপনার মতই বা কী?

উত্তর : চলচ্চিত্রের প্রাচীন পদ্ধতি এবং আধুনিক পদ্ধতি বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন আমি ঠিক বুঝলাম না। প্রাচীন এবং আধুনিক বলতে কোন্ দেশের কথা বলতে চেয়েছেন আপানারা— আপনারা কি বাংলাদেশের কথা বলতে চেয়েছেন? আমি এখানে মোটামুটি ধরে নিচ্ছি তাই।

পদ্ধতি-পদ্ধতি বুঝি না মশাই, আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই।

আমার আজও মনে পড়ে 'গৃহদাহে'র সেই অসম্ভব transitionটা : সেই যে হাইহীল জুতোপরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতামাখা পা পালকি থেকে নাবছে— আমি আজও ভুলব না। এবং ব্যাপারটা ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৩৬ সালে এ কথা ভুলবেন না। আর সেই যে সেই 'উত্তরায়ণে' বড়ুয়া সাহেবের জ্বর হওয়ার পরে camera সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল সেটাই কি ভোলা যায়! এবং কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক David Lean-এর 'Oliver Twist'-এর বহু আগে। আজকাল subjective camera সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পাই, বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা মহারাজ প্রভাতকুমার বড়ুয়ার ছেলের কাছ থেকে কিছুটা শিখতে পারতেন, তাঁর পায়ের তলায় বসে।

কাজেই ব্যাপারটা মোটামুটি মশাই, আমার কাছে গুলিয়ে গেছে— প্রাচীন আর আধুনিক বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন। এ-সব ধরনের কথা শুনলে আমার একটা কথাই মনে হয়— কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় "দে গরুর গা ধুইয়ে— "

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রে অভিনেতার স্থান ও নাটক অভিনেতার ভূমিকার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? সময়ের অতিক্রমণের সঙ্গে অভিনেতার ভূমিকার কী কী বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর : চলচ্চিত্রে এবং নাটকে অভিনেতার ভূমিকা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তার ব্যবহারিক তফাত ছাড়াও দার্শনিক একটা তফাত আছে। কেন আমরা বলি যে চলচ্চিত্রে শিশুরা সবচেয়ে ভালো অভিনেতা— কথাটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন। শিশু কিংবা বৃদ্ধ,

এবং বিশেষ করে অশিক্ষিত অভিনেতা, চলচ্চিত্রের সবচেয়ে ভালো উপাদান।

অভিনয়ের ধারা বিজ্ঞান এবং প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে পালটেছে এবং পালটে যাচ্ছে। আমরা আজকাল behaviourism-এর কথা বলি, ওটাও পুরোনো হয়ে গেছে। Zavattini এখন সেকেলে! Brecht-এর Organon-এর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা ওলটপালট ঘটে গেছে। তারই সূত্র টেনে ধরে এনে ছবিতে Jean Luc Goddard এবং আপনারা যাঁর কথা বেশি শুনেছেন সেই Alain Resnais এবং Alain Robbe-Grillet-এর L'ance Darniere Mar.ienbad ছবিতে। এবং বিষয়বস্তু অনুসারে ছবির অভিনয়পদ্ধতি বদলাতে বাধ্য। 'Seven samurai'-তে Toshiro Mifune-কে আপনাদের মনে আছে কি? তাকে কি করে ব্যাখ্যা করবেন?

স্বল্প পরিসরে উত্তরের আকারে ছবিতে এবং নাটকে অভিনয়ের পার্থক্য সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না।

প্রশ্ন : প্রাচীন ও আধুনিক চলচ্চিত্রের সমাজচেতনার মধ্যে প্রধান কোন্ পার্থক্য আপনার কাছে সবচেয়ে উল্লেখ্য বলে মনে হয়? আপনার মতে চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়িত্ব কোনো যুগে অধিকতরভাবে পালিত হয়েছে?

উত্তর : সব সময়ে হয়েছে। হয় Positive না-হয় negative ভাবে। ছবিটাকে আমি একটা শিল্প বলে ধরি, কাজেই মনে করি সর্বশিল্পের শর্ত পালিত হচ্ছে এখানেও। আমি মনে করি না যে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' Chaplin-এর Essenny যুগের এক রিলের ছবিগুলোর চেয়ে বেশি সচেতন। ১৯২৫ সালে তোলা Eisenstein-এর 'Strike' ছবির চেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন ছবি কি আজ পর্যন্ত তোলা হয়েছে? Pabst-এর 'Kameradescheft' আজও পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বেশি সমাজসচেতন একটি ছবি। চারু রায়ের 'বাংলার মেয়ে' বহু আগে তোলা— প্রথম বাংলা ছবি যাতে outdoor ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশিভাবে তাতেও সমাজচেতনা পরিপূর্ণ ছিল। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' আজকের যুগের যুগপ্রবর্তক। তার চেয়ে বেশি কি আমরা এগুতে পেরেছি চেতনায়?

শিল্পরসোত্তীর্ণতার কথা আমি এখানে তুলছি না, শুধু চেতনার কথা বলছি। রবি ঠাকুর মশায় একটা বড়ো ভালো কথা বলে গিয়েছেন, "শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয় তার পরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ"। কথাটা ভাবার মতো। যদি পারেন ভেবে দেখবেন।

ঋত্বিক ঘটকের সাথে সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : 'নাগরিক' আপনার প্রথম তোলা ছবি। সে ছবিটি মুক্তিলাভ করে নি বলে বাঙালি দর্শন লাভে বঞ্চিত। আজকের দিনে আপনার কাছ থেকে সেই ছবিটি সম্পর্কে মতামত শুনতে চাই। এই ছবিটি আমাদের উৎসব-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, ফলে এই ছবিটির বিষয়ে আপনার মতামত পেলে আপনার বর্তমান মনোভাব বুঝতে পারব।

উত্তর : 'নাগরিক' এর চিত্রনাট্য ১৯৫০-৫১ সালের রচনা, এর চলচ্চিত্রায়ণ সমাপ্ত হয় ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে। তখনকার দিনে বাংলাদেশে বাস্তববাদী ছবি মোটেই হত না। সেদিক থেকে একটা ভালো বিষয় নিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম। চলচ্চিত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণার এটিই প্রথম বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ। 'এক টুকরো নিশ্চিন্ততা'র সন্ধানে এক দৃঢ়-প্রত্যয় নাগরিকের জীবনপথ পরিক্রমা এর বিষয়বস্তু। টেকনিকের দিক থেকে ছবিটি মোটেই উচ্চাঙ্গের নয়। বরং হয়তো আজকের পরিণত দর্শকের কাছে এর কিছু কিছু বিষয় খুবই খারাপ লাগবে। যেমন এর Sound Track বা Make-up খুবই জঘন্য, তবে বক্তব্য বিষয় আমার কাছে এখনও valid। একটি ছেলে স্বপ্ন দেখত যে সে খুব বড়ো হবে। একটার পর একটা চাকিরতে Interview দিতে যায় এবং হতাশ হয়ে ফিরে আসে। তাতে তার আশা নিভে যায় না, সাময়িকভাবে দমে গেলেও আবার তা জেগে ওঠে। তার মনে হয় around the corner the lucky good turn is waiting. কিন্তু ক্রমশ সে উপলব্ধি করল There is no good turn to wait for him. কেননা আমাদের এই সামাজিক কাঠামোতে তা হওয়া সম্ভবপর নয়, আমরা যারা মধ্যবিত্ত তারা চিরকালই অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পর্যায়ে থেকে যাব, কোনোদিনও ওপরে উঠতে পারব না। এই উপলব্ধিতেই গল্প শেষ। এখানে ছেলেটির সাথে একটি মেয়ের প্রেম দেখানো হয়েছে, তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক বছরের পর বছর চলছে অথচ কোনো সুপরিণতি লাভ করছে না— পরে তারা দুজন দুজনের প্রতি বিষ ছুঁড়তে আরম্ভ করল— এটাই স্বাভাবিক, সাত-আট বছর কেটে গেছে, অথচ ছেলেটির বিয়ে করার মুরোদ নেই, কোনোখানে কোনোরকম একটা কর্মসংস্থান না হলে তো আর চার্কার রা যায় না, অথচ এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে ; হয়তো দুটো হাতের জায়গায় চারটে হাত হলে আরও বেশি খাটা যাবে আরও বল পাওয়া যাবে এই ভেবে ছেলেটি মেয়েটিকে গ্রহণ করল। এই কাহিনীর এই কাঠামোতে আমি তখনকার বাংলাদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপ বর্ণনা করেছিলাম, সেই বক্তব্য আমার কাছে এখনও valid.

প্রশ্ন : আধুনিক চলচ্চিত্র দর্শকদের পক্ষে alienation এবং স্রষ্টার পক্ষে involvement-এর বিষয়ে আপনার মতামত কী?

উত্তর : কথাটা ঠিকই। আমি শিল্পী হিসেবে involvement-এ বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে চারপাশের মানুষের জীবনের সাথে নাড়ীর যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না হলে ছবি করে কোনো মানে হয় না। যে-কোনো সৎ শিল্পীকেই সমাজের

অংশীদার হতে হবে, লক্ষ মানুষের জীবনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সংগ্রামের অংশীদার হতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার সাথে দিকে দিকে প্রসারিত আন্দোলনের সাথে গভীর যোগাযোগ না রাখলে আমার দ্বারা, যে-কোনো শিল্পীর দ্বারা ভালো ছবি তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি শিল্পীর কর্তব্য এবং প্রয়োজন এই involvement-এর। সেই সাথে audience-কে alienate করব। এই দুটি বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। একটি শিল্পকর্মর প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মে যে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার সাথে সে যদি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে না থাকে যদি সে বিষয়টি তার পূর্ণ পরিচিতির গণ্ডির ভেতরে না হয় তবে তার প্রকাশ-ভঙ্গিতে জড়তা থেকে যাবে– সে তার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। তা ছাড়াও কোনো কিছুর সাথে deeply involved না হলে সেই বিষয় সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা বা প্রেম জন্মাবে না। এইরূপ আবেগসঞ্জাত কোনো কিছু শিল্পীর হৃদয় develop করলেই তাকে সে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারবে– এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে দর্শককে সম্পূর্ণ alienate করতে পারবে। দর্শকদের alienate করা involve করার জন্যই। আমি কোনো সময়ে একটা সাধারণ পুতুপুতু মার্কা গল্প বলি না– যে একটি ছেলে একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে–প্রথমে মিলতে পারছে না তাই দুঃখ পাচ্ছে পরে মিলে গেল বা একজন পটল তুলল এমন বস্তাপচা সাজানো গল্প লিখে বা ছবি করে নির্বোধ দর্শকদের খুব হাসিয়ে বা কাঁদিয়ে ওই গল্পের মধ্যেও involve করিয়ে দিলাম– দুমিনিটেই তারা ছবির কথা ভুলে গেল। খুব খুশি হয়ে বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এর মধ্যে আমি নেই। আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব it is not an imagnnary story, বা আমি আপনাকে সস্তা আনন্দ দিতে আসি নি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে hammer করে বোঝার যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই থিসিস্‌টা বুঝুন– সেটা সম্পূর্ণ সত্যি– সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যই আমি আপনাকে alienate করব প্রতি মুহূর্তে। যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলানোর কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার protest-কে যদি আপনার মধ্যেই চারিয়ে দিতে পারি তবেই শিল্পী হিসেবে আমার সার্থকতা। এইজন্যই বলছি involvement হচ্ছে, শিল্পীর alienation হচ্ছে audience এর। আমি যে কতগুলো কল্পিত ঘটনা ও চরিত্র সাজিয়ে গল্প বলছি তার মধ্যে কিছু বক্তব্য রাখছি সেগুলো দেখে আপনারা আবার ভুল কি ঠিক, ভালো কি মন্দ তা বিচার করুন। যদি ভালো বোধ করেন তবে বাইরে গিয়ে বাস্তবকে বদলানোর কাজে নিযুক্ত হন। এই alienation সকল আধুনিক চলচ্চিত্র বা অন্য শিল্পেরও লক্ষ্য।

প্রশ্ন : একটি পূর্বতন লেখায় আপনি 'La dolce vita' প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে ছবিটিকে ভালো ভাবে উপলব্ধি করতে হলে মাইকেলেঞ্জেলোর ভাস্কর্যর সাথে পরিচিত হতে হয়। আপনি কি মনে করেন যে চলচ্চিত্র রসিক বা সমালোচকদের শিল্পের অন্য শাখার রসিক বা সমালোচকদের থেকে বিশেষ কোনো দায়িত্ব আছে?

উত্তর : মাইকেলেঞ্জেলো বোনাভিত্তির কতগুলো বিখ্যাত Murals আছে, তাকে বলা হয় Umbrian angel। পরিচালক Fellini তাঁর ছবির বাচ্চা মেয়েটিকে ইচ্ছে করে (একমাত্র শেষ দৃশ্য বাদে) বার বার Profile রেখে মেয়েটির নাক-মুখ-চিবুক-কণ্ঠনালীর সাথে মাইকেলেঞ্জেলোর Umbrian angel-এর একটা মিল আনার চেষ্টা করেছেন। Umbrian angel-এর কথা মনে পড়লেই আমরা বুঝি যে ওই বাচ্চা মেয়েটি অন্য সব Creatures of darkmen-এর চাইতে কত আলাদা একেবারে reverse। আমাদের ধারণা তীব্রতর হয় (এরূপ Cross reference-এ) ছবিটি ব্যাপ্তি লাভ করে।

সাহিত্য বা অন্য শিল্প-সমালোচকদের থেকে ভিন্ন কোনো বিশেষ দায়িত্ব চলচ্চিত্র-সমালোচকদের আছে এমন কথা বলা চলে না। সকল শিল্প-সমালোচকদের দায়িত্ব থাকে। ধরুন জাপানি ছবি Seven Samurai-এর সমালোচক যদি তদানীন্তন জাপান তার সামাজিক ইতিহাস, Samuari-দের জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হন তবে ছবির রসগ্রহণ করতে পারবে কী? বা, বার্গম্যানের Virgin Spring দেখার সময় আমাদের 12th Century Sweden সম্বন্ধে ধারণা থাকলে ভালো হয়। আপনি যদি সমালোচক হন তবে এ কথা বিশেষ করে আরও প্রয়োজন। ইউরোপের মধ্যেও সবচেয়ে শেষে যে-সব দেশ Christianity গ্রহণ করে তার মধ্যে অন্যতম Sweden। Christianity গ্রহণ করার আগের Swedenএ Viking Philosophy-র খুব প্রচলন ছিল Pagan Philosophy। এর সাথে লড়াই করে আস্তে আস্তে Christranity কী ভাবে বিস্তার লাভ করে তার উপর লেখা অসংখ্য ballad-এর একটিকে কেন্দ্র করে এই Virgin Spring রচিত। Pagan philosophy কী বা Viking Philosophy কী—এর সাথে Christianity-র বিরোধ কেন বা কোথায় এ না জানলে ছবির মূল থিম আপনার অগোচরে থেকে যাবে। হ্যাঁ, একটা চমৎকার ছবি দেখলাম, এই দৃশ্যগুলি ভালো বা এই shot-গুলি ভালো এ কথা লিখলে তো সমালোচনা হল না। সমালোচককে ছবির বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে হবে। শিল্প সব সময়ে যে-দেশের back ground-এ রচিত সেই দেশের মাটিতে শিকড় গাড়ে, তাই সেই ছবি থেকে রস গ্রহণ করতে হলে সেই দেশের মাটির, লোকের সমাজব্যবস্থার কথা না জানলে কী চলে? দেখুন-না, বাইরের বিদেশী সমালোচকরা 'অপরাজিত' ছবির কত প্রশংসা করে। কিন্তু অপরাজিত-তে যে একটা কালপুরুষের প্রসঙ্গ আছে তা কি সঠিকভাবে বিদেশীরা উপলব্ধি করতে পেরেছে? ভারতীয় দর্শনে উপনিষদে আছে যে কালপুরুষ যাকে ভর করে সে ঘরছাড়া হয়ে যায়, ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ায়— কোথাও বাসা বাঁধতে পারে না। বিভূতিবাবুর প্রায় সব লেখাতেই এই কালপুরুষের প্রসঙ্গ আছে। ছবিতে এক জায়গায় অপু জলের মধ্যে কালপুরুষের ছায়া দেখে উচ্চারণ করে 'কালপুরুষ'। যেন বিবাগী জীবনের ইশারা। বিদেশী সমালোচক Translate করল Orion, কিন্তু এতে গভীরতা স্পর্শ করল কি? দার্শনিক ব্যাপ্তির সামান্য কথাও কি ওই কথাতে কানে এসে বাজল? আমার মনে হয় না। Georges Sadoul 'সুবর্ণরেখা'কে explain করে দিতে বলেছিলেন। কেননা, দেশ বিভাগের ব্যথা হয়ত Europe বুঝবে না। আমরা কি বুঝি Second world war-এর intensity, এজন্যেই তো Poland-এর entire History

পড়ি। যদি না পড়তাম তবে আমরা Ashes and Diamonds বুঝতে পারতাম না।

প্রশ্ন : আপনি প্রথমে নাটকের স্থানে যুক্ত ছিলেন, পরে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে এলেন। এর পেছনের অন্তর্গত কারণ কী?

উত্তর : গণনাট্য আন্দোলনের প্রথমযুগে আমার আন্দোলনের সাথে গভীর যোগাযোগ ছিল। কয়েকটা নাটক লিখেছিলাম। অভিনয় করতাম। চলচ্চিত্রে এলাম কী করে? আগে আমি লিখতাম, অর্থাৎ সাহিত্য করতাম। দেখলাম এই গল্প, কবিতা মানুষকে সোজাসুজি effect করে না। বড়ো remote। সেইজন্যে গেলাম নাটক করতে— Stage-এ। সামনে এক হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার লোক পাব— তাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারব। Immediate reaction হবে। পরে দেখলাম সিনেমা আরও শক্তিশালী মাধ্যম, আরও বেশি লোককে একসাথে Hit করতে পারব। আমি যা বলতে চাই তার...

প্রশ্ন : এবার আপনার পুরোনো একটি ছবি সম্পর্কে বলি। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' আপনার অন্য ছবির তুলনায় একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছবি। ছবিটি টেকনিকের দিক থেকে বেশ কিছুটা experimental, যদিও বক্তব্য খুব অসাধারণ নয়। এই ছবিটি সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : হ্যাঁ, ঠিকই 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' অন্যান্য ছবি থেকে আলাদা ছবি। একটি শিশুর চোখে মহানগর। তাই একটা বিশেষ lens ব্যবহার করেছিলাম। ঠিকই, ছবিতে Technical কাজ বিশেষভাবে করেছি। কিছুটা সময় Sound Track বিশেষভাবে বাজিয়েছি— যেমন ধরুন, যে— Speed-এ music টেক করেছি তার প্রায় তিনগুণ Speed-এ Transfer করে ছবিতে ব্যবহার করেছি। Lens 300 Long Focus-এ বিশেষ angle-এ ছবি তুলেছি। এতে যে effect হয়েছে তাতে ছবিতে দেখা যাবে যে গাড়ি চলেছে— চাকা ঘুরছে অথচ এগোচ্ছে না। দর্শকের কাছে একটা Fantastic effect বলে মনে হবে। আবার কোনো কোনো জায়গায় 18 m.m. lensএ object-কে intentional distortion করেছি, এগুলো যেন ছেলেটির চোখ দিয়ে দেখা Subjective use।

আবার অন্য একটি জায়গায় cross reference হিসেবে সুকান্ত ভট্টাচার্যর একটি কবিতা 'চিল'-এর Symbol এনে প্রয়োগ করেছি। ছবিতে দেখা যায় ছেলেটির আশাভঙ্গ। Camera দেখছে চিল পড়ে আছে। 'চিল' দেখে ওই কবিতাটির কথাই মনে পড়ে যাবে। ছবির শেষের দিকে একটি মুটেকে দিয়ে একটা important কথা বলিয়েছি : 'এ লড়ায়ের জায়গা— কলকাতা শহর— দয়া মায়া কুছু নেই যা ঘরে চলে যা।'

প্রশ্ন : শুনলাম আপনি 'সংসার সীমান্তে' গল্পটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন। কী মনে হয় এ ছবিটি সম্পর্কে। এ ছাড়া আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? 'বগলার বঙ্গদর্শন' ছবিটি কেন সমাপ্ত করলেন না?

উত্তর : ইচ্ছে আছে প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'সংসার সীমান্তে' গল্পটি নিয়ে একটি ছবি তোলার। এই গল্পের নায়ক একজন চোর, নায়িকা একটি বেশ্যা। তাঁরা কেউই ছোটোবেলার থেকে জীবনে কোনোদিন ভালোবাসা পায় নি। জীবনের স্রোতে ভাসতে

ভাসতে এখানে এসে পৌঁচেছে। হঠাৎই এদের দেখা, এবং ক্রমে আবিষ্কার করল যে মানুষে মানুষেও ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। যা ওদের আগে জানা ছিল না। ওরা সৎ হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় ওরা হতে পারল, চোর চোরই থেকে গেল, বেশ্যাও বেশ্যা থাকল। ছবি শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত কিছু বলা যায় না কেমন হবে, কেননা মধ্যেকার এতটা সময় ও এতসব ঘটনা (যা ঘটবে) তা সবই তো আমার হাতের মধ্যে নয়।

এ ছাড়া বিভূতিবাবুর 'আরণ্যক' কিনে রেখেছি। Scriptও তৈরি। সুযোগ পেলে করব। আর প্রমথেশ বড়ুয়ার দেশ গৌরীপুরে ওখানকার জঙ্গলের মানুষের শিকারী জীবন নিয়ে একটি ছবি করার ইচ্ছে আছে। এ গল্পটা আমার নিজের। দেখা যাক কতদূর কী হয়, কেননা সবই নির্ভর করছে আমাদের প্রযোজকদের উপর।

'বগলার বঙ্গদর্শন' একটা হালকা mood-এর ছবি হবে। ইতালীয়ান লেখক Blasetri-এর লেখা গল্প বাংলায় adapt করেছি। বেশ খানিকটা হয়ে আছে। বাকিটা নানা কারণে শেষ করা যায় নি। তবে শেষ করার ইচ্ছে আছে।

সাক্ষাৎকার

ঋ : বাবা যখন ঢাকায় ডি. এম. ছিলেন, সেই সময়েই আমি পৃথিবীর প্রথম সূর্যোদয় দেখি। পিতৃদেব, রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র ঘটকের তখন খুব রবরবা। বাল্যের প্রভাব আমার জীবনে এসেছে এবং ভীষণভাবেই এসেছে। এসেছে যে, তা আমার শিল্পকর্মই বলবে। যদিও খুব শৈশবে আমায় চলে আসতে হয়েছিল, কিন্তু আজও পূর্ববাংলার স্মৃতি ভুলে উঠতে পারি নি। উদার উন্মুক্ত মাঠ, ধানের ক্ষেত, নীল আকাশ এবং সবচেয়ে বড়ো—পদ্মানদী, এ-সবের চিন্তা আমাকে এখনও আচ্ছন্ন করে রাখে। আমার সমস্ত বাংলাকে ভালোবাসার মূল হচ্ছে পূর্ববাংলা। পরে নিজেদের ষোলোআনা সুবিধের জন্যে জোচ্চুরির দ্বারা যে দশ ভাগ করা হল, তার ফলে আমার মতো প্রচুর বাঙালি শিকড় হারিয়েছে। এ দুঃখ ভোলার নয়। আমার শিল্প তারই ভিত্তিতে।

আমার প্রথম পাঠ ময়মনসিংয়ের মিশন স্কুলে। তারপর কলকাতা বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে (এখানে ক্লাস থ্রি থেকে) ম্যাট্রিক পাস করি। পরে রাজশাহী কলেজে সায়েন্সে ভর্তি হই। সায়েন্সে ঢুকে ভুল হল। ছেড়ে দিয়ে আর্টস নিলাম। এবং তারপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি.এ. পাস করি। এখানেও সেই দৈবক্রম—ইংরেজি অনার্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেলুম। শুরু করলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজিতে এম. এ. পড়তে। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার ঠিক আগেই ছেড়ে দিলুম। কমিউনিস্ট পার্টিতে ঢোকার জন্যে। পার্টি লাইনের কাজে, পড়ায় ইস্তাফা দিলুম।

প্রশ্ন : কেরিয়ার নষ্ট হবার জন্যে কোনো ক্ষোভ নেই আপনার?

ঋ : (হো হো করে হেসে উঠলেন) ক্ষোভ! কেরিয়ার! কার কেরিয়ার? কীসের

কেরিয়ার? সমস্ত দেশটাই খাপরিখানা হয়ে গেল— কেরিয়ার-টেরিয়ার ওসব ভাঁওতাবাজির কথা।

[থামলেন। মুহূর্তে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি নিজে একটি সিগারেট নিয়ে তাঁকে আর-একটি বাড়িয়ে ধরতে—]

উঁহু, সিগারেট আমি খাই না। আমার যা করে বিড়ি। আপনি খান। তবে— বলছিলুম, ঠিক মেজাজ পাচ্ছি নে। মানে, মেজাজ আর কী!

প্র : আপনার অতীত ও বর্তমান জীবিকার ওপর কিছু জানতে চাই।

ঋ : (তির্যক হাসি ঠোঁট উলটিয়ে) মানে এই জীবন! এবং তার জীবিকার কথা? জীবন শুরু করি নিউ থিয়েটার্সের ফ্লোরে, শ্রদ্ধেয় বিমল রায়ের সঙ্গে। পরে, বিমলদা এ ছেড়ে বম্বে যান। আমি যাই নি। এখানে বিমলদার কাছে ছিলাম চিফ অ্যাসিসটেন্ট এবং স্টোরি রাইটার হিসেবে। এর পরে স্বর্গত নির্মল দে-র কাছে স্টোরি রাইটার এবং চিফ অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করি। এই সময়েই 'বেদেনী' ছবি শেষ করার ভার আমাকে দেওয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে তা শেষ করতে পারি নি। এরপর নিজের গ্যাঁটের পয়সায় 'নাগরিক' বলে ছবি শুরু ও শেষ করি। কিন্তু সেটা আজ পর্যন্ত আঁতুড়ঘর ছেড়ে পৃথিবীর আলো দেখল না। তারপর মাঝখানে ক-বছর ফাঁকা। ফাঁকা হয়ে শুরু করলাম নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করা। কালী বাঁড়ুজ্যে, উৎপল দত্ত, গীতা সোমা, শোভা সেন— এরা সব আমার কাছে কাজ করত সে-সময়। তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমি একজন নেতা। সে-সব নাটকের মধ্যে যে নাটকটি বোম্বাই-এ সর্বভারতীয় নাট্য সম্মেলনে প্রথম পুরস্কার পায়, তার নাম 'দলিল'। তাতে আমি নিজেও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করি। আমি যে অভিনয় করি, এটা আজকালকার লোকজনেরা বিশেষ জানেন না। এর পরে আমি বোম্বাই-এর ফিল্মিস্তানে চাকরি নিয়ে চলে যাই, গল্প-লেখক এবং চিত্রনাট্য-লেখক হিসেবে। কিছু পরে আবাব বিমল রায়ের জন্য 'মধুমতী' বলে একটি গল্প এবং তার চিত্রনাট্য লিখি। এ ছবি সফল ছবি হিসেবে চলেছে। এরপর হেমেন গুপ্ত, হিতেন চৌধুরী ও রাজ কাপুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। কিন্তু পরে সব ছেড়ে দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসি শ্রীযুক্ত বি. এন. সরকারের অনুরোধে। যে-কোনো কারণেই হোক, সরকার সাহেব ছবিটি শুরু করতে পারেন নি। তখন শ্রীযুক্ত লাহিড়ীর অনুরোধে 'অযান্ত্রিক' ছবি করি। এর পর আমার নিজের প্রোডাকশন থেকে করি 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবি। পরের ছবি, একই প্রোডাকশনের— 'কোমল গান্ধার'। পরে, আমার বিশিষ্ট বন্ধু রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালার জন্যে 'সুবর্ণরেখা' ছবি করি। তারপর আবার ফাঁকা সব। অবস্থা যা দাঁড়ায়, আমাকে চাকরি নিতে হয় একটা ভাইস প্রিন্সিপালের সরকারি পোস্টে, পুনায় ফিল্ম ইন্সটিটিউট অফ ইন্ডিয়াতে। কিছু দিনের মধ্যেই এখানকার স্বরূপ জানতে পারলুম। এখানে সরকারি অব্যবস্থার চরিত্র দেখে আমার ঘৃণা জন্মাল। এবং কয়েক মাস বাদেই আমার কপাল থেকে এ-দুর্ভোগ ঝেড়ে ফেলে দিলুম। এখানে থাকার সময় ছোটো ছোটো দু-তিনটি ছবি করেছি। সেগুলি কিছু নামও করেছে। সেগুলি হল— 'রঁদেভু', 'ফিয়ার' ইত্যাদি ছবি। এর পরে ফিল্ম ডিভিশনের হয়ে কিছু কাজ করি। তারপর ইস্টার্ন রেলওয়ের হয়ে কিছু ডকুমেন্টারিও

করেছি। বর্তমানে কোন্ ছবিতে আছি-না-আছি, তা বলব না। তবে 'অভিনয় দর্পণ' বলে নাটকের ওপর একটি দ্বিমাসিক কাগজ চালাচ্ছি। এ ছাড়া, নাটকের ওপরই আর-একটি কাগজের তোড়জোড়ও করছি।

প্র : ভালো ছবি এদেশে হয় না কেন? ছবির মধ্যে আপনি জনপ্রিয়তার কথা কিছু ভাবেন না কি? আপনার ছবি, করার সমস্যা কী?

ঋ : আঃ সেইসব পুরোনো জিনিস আবার!

ভালো ছবি এদেশে হয় না, তার কারণ এদেশের চিত্র-প্রযোজকরা থেকে শুরু করে প্রদর্শকরা, এই সমস্ত ধরনের ছবি দেখাবার উৎসাহ পান না। যে চিন্তাটা সম্পূর্ণ ভুল। এদেশে ভালো ছবি তৈরি করে এইসব পয়সাওলারা কখনো দেখেন নি, দেখলে দেখতেন যে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ আলাদা। আমার দেশের মানুষ ভালো কাজকে এখনও ভালোবাসে। সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি বা ক্ষমতা এই লোকগুলির আদৌ নেই। তাই এঁরা ভালো ছবি থেকে পাল্স অ্যাপার্ট-এ সরে থাকেন।

আর জনপ্রিয় ছবি জিনিসটা যে কী, তা পৃথিবীর কোনো শিল্পীই বলতে পারেন কি? তা যদি বলতে পারতেন, তা হলে প্রত্যেকটি ছবিই প্রচণ্ড পপুলার হত। কিন্তু ঘটনাটা তা নয়। সবারই ইচ্ছে, কিছু পয়সা হাতিয়ে নেওয়া। কিন্তু তাঁদের, ভগবান জানেন, কেন সেটা হাতানো হয় না। সিসিল ডি. মেলি সাধারণত গৃহীত হয়ে থাকেন ভীষণ নামকরা অর্থকরী শিল্পী হিসেবে। কিন্তু তার 'টেন কম্যান্ডমেন্টস' এক কোটি ডলার খরচ করেও ফেল করল কেন? চ্যাপলিন 'মডার্ন টাইমস' অত্যন্ত চিন্তা করে করেছিলেন। কিন্তু মোটামুটি পয়সার দিক তিনি ধেড়িয়েছেন। আইজেনস্টাইন 'আলেকজাণ্ডার নেভস্কি' করে থেকে ভেবেছিলেন খুব পয়সা কামানো যাবে। ছবিটি একদম চলে নি। আন্দ্রেই তারকোভস্কি 'ইভান্স চাইল্ডহুড' করে ভেবেছিলেন ব্যাপারটা জমাতে পারবেন। সম্পূর্ণ ধেড়িয়েছেন। মিজোগুচি তাঁর ছবিতে ভেবেছিলেন দারুণ চলবে। চলে নি। এরকম উদাহরণ আরো হাজারটা দিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর ছবি জনপ্রিয় হবে কি হবে না, এ কথা মানুষ তো ছাড়, স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন না।

প্র : আপনার বিবাহ হয়েছে, না করেছেন? প্রেম ও ভালোবাসার জন্যে কাঁকনের খোঁচায় আপনাব রক্তক্ষরণ, না পাওয়ার বেদনায় মানসিক অবসাদ ও নৈরাশ্য— এতে আপনার শিল্পীজীবনই বা কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে? বর্তমানে সংসার-জীবনে সুখ, আনন্দ আছে কি? অন্ধকার জীবন বলতে কোন্ অভিজ্ঞতার কথা আপনি বলবেন?

ঋ : আমার স্ত্রী হচ্ছেন একজন সতী। আমার সর্বক্লেদ ওঁর কাছে গিয়ে পৌছলে পরিষ্কার হয়ে যায়। বেদনা ও অন্ধকার সবার জীবনেই আসে। কিন্তু তাই নিয়ে যাঁরা হারিয়ে যান, তাঁদের মেরুদণ্ড নেই বলেই আমি মনে করি। আমার জীবনেও এ-সব এসেছে। কিন্তু আজো পর্যন্ত আমি মাথা উঁচু করে আছি। সেগুলি সম্পর্কে ইনিয়ে বিনিয়ে গল্প বলার কোনো অবকাশ নেই বলেই আমি মনে করি। দুঃখ দুর্দশা না হলে মানুষ কখনো শিল্পী হতে পারে না। আমি যা-কিছু দুঃখ পেয়েছি, তার দ্বারা কিঞ্চিৎ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি— অবশ্য যদি আমাকে মানুষ বলে আপনাদের মানুষ কুল ভাবেন। দুঃখকে ভালোবাসতেই হবে। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে পরম প্রাণ, যেটাকে খুঁজে

বার করার মতো মনুষ্যত্ব থাকার অবশ্যই দরকার বলে আমি মনে করি। আর সংসারজীবনে আমি সাংঘাতিক সুখী। ওইরকম দেবী— আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্যে লক্ষ্মী এযাবৎ যে দুঃখ পেয়েছে এবং পাচ্ছে— আমার মনে হয় না, এ জাতীয় ভালোবাসা আর কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে। আর, সংসার জীবনে জটিলতার কথা কী বলব।

[কথাকটি শেষ হতে-না-হতেই আবার সেই অস্থিরতা। এক সময় উনি বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার কাছে গিয়েই আবার ফিরে এলেন।... অস্থির পায়চারি থামিয়ে হয়তো নিতান্ত অনিচ্ছায় উনি বসলেন আবার।]

প্র : পানাসক্তি আপনার কতদিনের? এ জিনিস আপনাকে স্বকীয় কাজে এগিয়ে দেয়, নাকি কেবলমাত্র নেশার জন্যেই খান। এখন এ-পানদোষ পরিত্যাগের অন্তরায় কী? শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখতে মানুষ ঋত্বিকবাবু কতটা সজাগ? মানুষ কেমন লাগে আপনার? ঈশ্বর বলে কোনো অস্তিত্বকে স্বীকার করেন কি?

ঋ : গত দশবছর ধরে আমি পানাসক্ত। এইটা আমায় শিল্পকর্মে মদত দেয় যথেষ্ট— এ কথা বলবই। কিন্তু খুবই বিপদজনক ও বেদনাদায়ক। একসময় এই পানকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে এটি আরম্ভ করে আমি যা বিপদে পড়েছি, তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। প্রতি মুহূর্তে ভাবি যে একে বিদেয় করব। কিন্তু দেহের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায যে, ছাড়তে গেলে সোজাসুজি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এককথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়। আর, মানুষকে ভালোবাসি আমি পাগলের মতো। মানুষের জন্যেই সব-কিছু। মানুষই শেষ কথা। সব শিল্পেরই শেষ পর্যায়ে মানুষে পৌঁছতে হয়। যাঁরা তা করেন না, তাঁরা শিল্পী বলে আমার কাছে কোনো আদর পাবেন না।

ঈশ্বরে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। শুধু তাই নয়, এ নামটাকেই আমি ঘৃণা করি। এইসব গল্প দিয়ে আর কতদিন সমাজ-সংসার চালাতে হবে, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। এ-সব বানানো গপ্পো সম্পূর্ণ জোচ্চুরি। আর, বেবাক জোচ্চুরি দিয়ে খুব বেশিদিন ঠকানো বা ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এটাও ভাববার সময় এসেছে।

প্র : মণীশবাবু কিন্তু গত সাতবছর পানদোষমুক্ত। এখন তিনি অন্য চৈতন্যে, তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

ঋ : বিলক্ষণ জানি। উনি ভায়েদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং পরম শ্রদ্ধাভাজন আমরা। উনি এখন ভগবান টগবান করছেন। আমি সর্বকনিষ্ঠ। ভগবানের ব্যাপারগুলো তো আগেই বলেছি। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করি না আপনাদের ভগবানকে।

প্র : বর্তমান বাংলা ছবির রাজ্যে পরিচালক হিসেবে আপনি কাদের কথা বলবেন? সত্যজিৎবাবু এবং তপন সিংহ আপনার শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে কীভাবে চিহ্নিত হতে পারেন? জীবনে এবং শিল্পে কোনো কম্প্রোমাইজ করা আপনার পক্ষে সম্ভব কি না—

ঋ : মতলব সুবিধের নয় মনে হচ্ছে! নিন লিখুন : কারো নামই আমি করতে চাই না। কারণ, ছবির ব্যাপারে কারো ওপরই আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই। এঁদের মধ্যে দু-একজনের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাঁরা নামতে নামতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেচেন

যে তার সীমা নেই। এঁরা প্রত্যেকেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু তাঁদের শিল্পকর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। অবশ্য এটা শিল্পী হিসেবে আমি বলছি না, শিল্পদ্রষ্টা হিসেবে বলার চেষ্টা করছি। আশা করি আমার এ স্পষ্ট কথা এবং তীব্র মতবাদ তাঁরা খারাপভাবে নেবেন না।

আমৃত্যু আমার জীবনে কম্প্রোমাইজ করা সম্ভব হয়। সম্ভব হলে তা অনেক আগেই করতাম এবং ভালো ছেলের মতো বেশ গুছিয়ে বসতাম কেতা নিয়ে। কিন্তু তা হয়ে উঠল না, সম্ভবত হবেও না। তাতে বাঁচতে হয় বাঁচব, না হলে বাঁচব না। তবে ওইভাবে শিল্পকে কোলবালিশ করে বাঁচতে চাই না।

ছবি লোকে করে সাধারণত দুটি কারণে— একটি খ্যাতির বিড়ম্বনা, অন্যটি অর্থাগম। এ-দুয়ের কোনোটির উদ্দেশ্যেই আমার ছবি করার বাসনা নেই। আমি যদি ছবি করতে চাই সেটা সম্পূর্ণ হবে— আমার কিছু দিগ্‌দর্শন আছে, জগৎ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা অছে, সেগুলি ঠিক বা ভুল যাই হোক-না-কেন— তা প্রকাশ করা সম্পর্কে। আমি খ্যাতি কিংবা ইনামও চাই না— অর্থও চাই না। মানুষকে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যেটুকু অর্থের দরকার হয়, সামান্য সেটুকুমাত্র পেলেই আমি নিশ্চিন্ত। আর, খ্যাতির ভুলে আমি ঢুকতে প্রস্তুত নই। কাজেই কোনো আপসের মধ্যে ঢুকতে আমি ঢুকতে প্রস্তুত নই। কাজেই কোনো আপসের মধ্যে ঢুকতে আমি একদম তৈরি নই। কম্প্রোমাইজ করলে হয়তো কিছু পয়সা পাওয়া যেত, কিন্তু তার চোরাগলিতে জীবন থাকতে নিজেকে পাচার করতে পারব না। শিল্পী হিসেবে লড়াই করার একটা প্রশ্ন আছে, সেটাই আমার কাছে বড়ো প্রশ্ন। নিজের স্বপ্ন নিয়ে লড়াই, সেটা তো সহজে বাইরের কাউকে বোঝানো যায় না। বোঝানোর কিছু দরকার আছে বলেও আমি মনে করি না। আমার জীবনের লড়াই হচ্ছে সেই লড়াই। এর মধ্যে রাজনীতির কোনো ব্যাপার নেই। ঝগড়ার কোনো ব্যাপার নেই। এটা সম্পূর্ণ নিজের খাটার ব্যাপার। জানি না, কোনো পেরে উঠব কি না। আজো তো পারি নি। যদি পারি, আপনারা কিছু দেখবেন।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : প্রথমে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই চলচ্চিত্রে বাস্তবতা সম্পর্কে আপনার ধারণা?

উত্তর : চলচ্চিত্রে বাস্তবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা? তার আগে বলুন শিল্পে বাস্তবতা। ও দুটো জড়াজড়ি করে আছে। সিনেমায় বাস্তবতা একটা আন্দোলনের ফলশ্রুতি, এ তো জানা কথা। উনিশ শতকের শেষ দিকে সাহিত্যে এমিল জোলা বাস্তবতার সূত্রপাত ঘটালেন। তথাকথিত রোম্যান্টিকতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই ঢেউ এল। আর সেই পরিবর্তন এল মঞ্চে। ১৯০৫ সালে মুক্তি পেল "দি গ্রেট ট্রেন রবারি"। চলচ্চিত্র যে

একটি মহৎ শিল্পমাধ্যম হতে পারে, তার প্রথম প্রকাশ দেখতে পেলাম ডি ডব্লুউ গ্রিফিথের বিশেষ করে 'ইনটলারেন্স''-এ। হ্যাঁ, বাস্তবতার দিক থেকেও। মাঝামাঝি আর একটা ধারার সূত্রপাত ঘটালেন জর্জেস মেলিস। তার কাজে ফ্যান্টাসির প্রাবল্য। চলচ্চিত্রে বাস্তবতাকে সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে যিনি হাজির করলেন, তিনি হলেন ক্লাসিক স্রষ্টা আইজেনস্টাইন। ছবিতে শব্দ এল। তখন যা তৈরি হতে শুরু হল, তা না রোম্যান্টিক, না রিয়ালিস্ট। না ফিউচারইজম। ব্যাপারটা হলো অদ্ভুত। সব মালমশলা মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি।

আস্তে আস্তে তা থেকে এল তথাকথিত বাস্তব মার্কা ব্যবসায়িক পণ্য। যুদ্ধের সময় মানুষ দেখল ধ্বস্ত পরিপার্শ্ব। সেই সময় ইতালির মহান স্রষ্টা রোসেলিনি, ডি সিকা, জাভাত্তিনি, সরাসরি বাস্তববাদী ছবি সার্থক অর্থে তৈরি করতে লাগলেন। তাঁরা এর নাম দিলেন নিও-রিয়ালিজম। দেখুন মশাই, খোলাখুলি কথা কই, ও সব নিও-ফিও আমি বুঝি না। এর মধ্যে নিও কী আছে? যা আছে তা হল সাদা-মাঠা বাস্তবতা। যেমন যেমন ঘটছে তেমন তেমন দেখিয়ে যাও। জোলার যে ন্যাচারালাইজম, তাকে আমি বলি ফোটোগ্রাফিক রিয়ালিজম। কিন্তু রিয়ালিজম বলতে আমি বুঝি যে বাস্তব ঘটনার সমন্বয়ে এমন এক ইঙ্গিত দেওয়া যা কিনা উপলব্ধিতে গর্ভবতী। সোশিয়ালিস্ট রিয়ালিজম শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে নির্দেশ করে লক্ষ্য। জনসাধারণকে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে চেতন করে। বন্ধ্যা সমাজকে বদলে অগ্রসরমাণ শক্তির সমর্থনে সংগঠিত করা। অর্থাৎ শেষ বিচারে বাস্তবতা দাঁড়াচ্ছে এই রকম— জীবনের থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করো। তাকে এমনভাবে গুছিয়ে নাও যা থেকে সমস্ত ব্যাপারের উপর একটা 'বক্তব্য' বেরিয়ে আসে। অন্তত আমার তো এই রকম ধারণা।

প্রশ্ন : ধন্যবাদ। চলচ্চিত্র একটা শিল্প-মাধ্যম। সেখানে বাস্তবতার সুযোগ কী রকম? অর্থাৎ সেখানেও তো নানারকম স্কুল রয়েছে...

উত্তর : হ্যাঁ, আমি আগেই বলেছি বাস্তবতা হচ্ছে শিল্পের একটি বিশেষ ধারা। এর মানে এই নয় যে বাস্তবতার সঙ্গে মহান শিল্পের সম্পর্ক বৈরীমূলক। অন্য যে-সব ধারা জন্ম নিচ্ছে, তাও সত্যিকারের সিনেমা ব্যাপারটির সতীন নয়। কিন্তু সিনেমার কথা বলতে গেলে আমি বলব— বাস্তবতাই হল সবচেয়ে প্রধান, আগ্রাসী এবং উন্নত ধারা। না, এটা একটা স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়। অন্য সব-কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ বর্জিতও নয়। মনুষ্যচরিত্রে নানা ব্যাপার রয়েছে জানেন। পিকাসোর নাম জানেন। তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ বাস্তবতার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। কিন্তু তাকে তিনি যে চিত্রভাষায় প্রকাশ করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাস্তববাদী নয়। কিন্তু, সামগ্রিক বিচারে পিকাসোর চিত্রবাণী ভয়ানকভাবে বাস্তব। যেমন ধরুন ব্রেখ্ট-এর এপিক রিয়ালিজ্‌ম। এ হলো অ্যাবসলিউট এক্সপ্রেশন। সোজাসুজি অন্য একটা স্তরে উত্তীর্ণ করে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেষ্টা দর্শককে একটা বিশেষ মতবাদের শরীক করে তোলা।

প্রশ্ন : আপনি 'সুবর্ণরেখা'তে রাগ কলাবতী ব্যবহার করেছেন। বাস্তববাদী ছবিতে এ-হেন সংগীত ব্যবহারের সুযোগ কতটা?

উত্তর : এ হচ্ছে একজনের ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। ধরুন বুনুয়েলের বিখ্যাত

ছবি "নাজারিন"। ছবিটা কঠিন রকমের বাস্তব। সমস্ত ছবির শেষ এক মিনিট ছাড়া কোথাও কোনো মিউজিক নেই। এবং সেই শেষ এক মিনিটও কেবল ড্রাম বীটিং। অসাধারণ এফেক্ট। ব্যাপারটা হল, আমরা কী বলতে চাই। কেউ বলে ছবি এঁকে, কেউ গান গেয়ে, কেউ বা অন্যভাবে। বোমা ছুঁড়ব, না কামান— সেটা সম্পূর্ণ পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আপনাদের আছে।... এ ক্ষেত্রে শিল্প হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমার তো মনে হয় না রাগ কলাবতী ব্যবহার করে ছবির মেজাজে কোনো ক্ষতি হয়েছে।

প্রশ্ন : না, আপনি ভুল বুঝেছেন। আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা রাগ কলাবতীর ব্যবহারে সুবর্ণরেখার মেজাজ আরো জমেছে।

উত্তর : শুধু সুবর্ণরেখায় রাগ কলাবতীর কথা কেন? পৃথিবীর বহু অসাধারণ ছবি যেমন ফেলিনির "লা দোলচে ভিতা"-তে প্যাট্রিশিয়া নামক এক বিশেষ মেজাজের মিউজিক ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে রাগ কলাবতী ব্যবহার মর্জিমাফিক হয়েছে কী না সে তো বিচার করবেন আপনারা।

প্রশ্ন : ১৯৩০-এর সোভিয়েত বাস্তবতা এবং ১৯২৭-এর জর্মন বাস্তবতা অথবা ৪০-এর দশকের নয়া বাস্তবতার গোত্র বিচার সম্পর্কে আপনার ধারণা?

উত্তর : ১৯২৫ সালে আইজেনস্টাইনের "স্ট্রাইক" ছবি দিয়ে, পরে "ব্যাটেলশিপ পোটেমকিন" দিয়ে সোভিয়েত বাস্তবতার সূত্রপাত। জার্মান উফা ধরনের বাস্তবতার জন্ম ১৯২৬-২৭-এ, ফ্রেড সারনাজ, ফ্রিজ লাং এঁরা আবার নিজস্ব নিরীক্ষা চালান। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে জি ডব্লিউ পাবস্ট্ এর Kameradschaft (১৯৩১) -এর কথা। সোভিয়েত বাস্তবতার জাত হল বিপ্লবী। ছবিটাই শুধু ওদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়। মানুষ সম্পর্কে উদাসীনতা ওরা বরদাস্ত করে না। সেটা শুধু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। যদি তা শিল্প হয়ে ওঠে, ভালো মানুষকে জাগাও। স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়তে শেখাও সর্বত্র। এটাই হল সোভিয়েত বাস্তবতার মোদ্দা ব্যাপার। দ্বিতীয় যুদ্ধের সমসময়ে অথবা পরে মনে করুন, রোসেলিনির paisan অথবা ডি সিকার "সু শাইন" ছবি দুটির কথা ভেবে দেখুন। এ হচ্ছে ভিন্ন এক ধারার বাস্তবতা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত এক দেশের ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ত্রাস এবং দুঃস্বপ্নকে দুহাতে সরিয়ে মানুষ এক নতুন ভাষা আয়ত্ত করছে। কিন্তু শিল্প তো স্থবির নয়। তা বয়ে চলে, বয়ে চলে, নিরবধি বয়ে চলে। আজকের বাস্তবতা কিন্তু সে দিনের থেকে আলাদা। বুঝতে পারলেন!

প্রশ্ন : ফেলিনি এবং আন্তোনিওনি একদা রিয়ালিজমের আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ তারা সরে এসেছেন সুররিয়ালিজমের দিকে।...

উত্তর : আমি অবশ্য একে সুররিয়ালিজম বলব না। কিন্তু এক্ষুনি আমি বললাম শিল্প হল চলমান। পুরোনো ফেলিনি আর আজকের ফেলিনি এক নন। তিনি বেড়েছেন, বড়ো হয়েছেন, আরো বড়ো...। অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন। ছবি করেছেন। বেশি করে ভেবেছেন। পড়েছেন। মিশেছেন। সুতরাং লা স্ত্রাদা আর এইট অ্যান্ড হাফ আর -এর ফেলিনি এক নন। হুম, যদি কোনো শিল্পী একই জিনিস অনবরত দিয়ে যান তবে বুঝতে হবে সে

ভদ্দরলোকের ভিতরটা পচে গিয়েছে। তার বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। আন্তোনিওনির ব্যাপারেও সেই। তবে ফেলিনির সাথে ওঁর একটা তফাত রয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে ফেলিনি সম্পূর্ণ কমিটেড! কিন্তু তাঁকে লেবেল মারা যায় না। তিনি সমাজের বড়ো বড়ো ব্যাপার সম্পর্কে আগ্রহী। তাঁর চরিত্রগুলো বিভিন্ন টাইপের মানুষের প্রতিফলন। আন্তোনিওনির বেলাতে সেটা সত্য হলেও তিনি কম-বেশি মানবিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত।... এঁদের দুজনেই মহৎ শিল্পী।

প্রশ্ন : ত্রুফোর ন্যুভেল ভাগ অথবা গোদারের ক্যাহিয়ে দ্যু সিনেমা...

উত্তর : ন্যুভেল ভাগ বলে কিছু নেই। আসচে সমালোচকেরা একটা নাম দিতে ভালোবাসে। ক্যাহিয়ে দ্যুসিনেমার ছেলেরা সম্পূর্ণ আলাদা। এদের প্রত্যেকেই নিজস্ব সময়ের ঝোঁক সম্পর্কে নিরাসক্ত। তবে সকলেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যবাদী। এই যে কাল হরণ, আসা, যাওয়া এইসব তো সাহিত্যে অনেক আগেই জেমস জয়েস এনেছেন— ইউলিসিস। আমি একটা বিষয় গ্রহণ করলাম। আমি কিছু বলতে চাই। দরকার একটা অস্ত্র। আমি যদি মনে করি "হিরোসিমা মন আমুর" -এর ফর্ম এ আমার বক্তব্য বিষয় সব চেয়ে ভালো প্রকাশ করতে পারব, তবে তাই করব। কিন্তু শুধু একেই নব তরঙ্গ বলে না। আজ গদার যে ভাবে দেখতে চাইছেন, ব্রেখ্‌ট বহু আগেই সেভাবে দেখেছেন। গদার তাঁর ক্যামেরায় একটি ছোকরাকে তার প্রিয়তমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে দেখালেন। তারপরই দেখালেন স্টুডিওর লাইট। ভাবখানা চুলো যাক। আমি তোমাদের প্রমোদ বিতরণ করতে বসি নি। এগুলো নকল। চোখ ভোলানো। দ্যাখো। মন্তব্য করো। ব্রেখ্‌ট তো ঠিক এটাই করেছেন। সবাই আলাদা। কিন্তু স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সকলেই এক মঞ্চে। এভাবে কেউ জাঁপল সার্ত্র-র, কেউবা মার্কস-এব দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। কেউ হন না।

জীবনশিল্পী : ঋত্বিককুমার ঘটক

প্রশ্ন : পুরুলিয়ার লোক-সংস্কৃতির ওপর তথ্যচিত্র করলেন কেন?

উত্তর : অন্যান্য জেলাগুলোর চেয়ে দারিদ্র্যের ছায়া যেন এখানে বেশি। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয়, ওখানকার দরিদ্র মানুষগুলো এখনো ঠিক আগের মতো নানান উৎসবের মধ্য দিয়ে লোক-সংস্কৃতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে, বলতে কি অনেকটা যেন লড়াই করে বাঁচিয়ে রাখছে।

প্রশ্ন : তা ছৌ নাচ আপনি পছন্দ করলেন কেন?

উত্তর : এই নাচের মধ্যে বীর রসের আধিক্য বেশি। তা-ছাড়া আর একটা কথা, ঐ অঞ্চলের আদিবাসীরা একদিন নানান ধরনের উপজাতির আক্রমণের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করবার জন্যে লড়াই করত। বীরের জাতের এই দিকটা জড়িয়ে

পড়েছে তাদের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে বিশেষ করে ছৌ নাচে।

প্রশ্ন : বর্তমানে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির পথে দেশকে নিয়ে যাবার যে প্রলোভন আর জোয়ার এসেছে তার হাত থেকে কি এই গ্রাম্য সরল দরিদ্র মানুষগুলো তাদের সাহসী শক্ত বুকখানা দিয়ে নিজেদের লোক-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

উত্তর : বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। বর্তমানে শহরের মানুষ পুরুলিয়ার এই লোকনৃত্যের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত হতে চাইছে। কালে কালে দেখা যাবে পুরুলিয়ার শান্ত সরল মানুষগুলোর অর্থের লোভ দেখিয়ে টেনে আনা হবে শহরের মঞ্চে। তখন থেকেই চলবে আধুনিকতার আর-একটা স্রোত এই সকল নাচে গানে। আর তা ছাড়া পুরুলিয়ার আশপাশের সিনেমার গানের হালকা হাওয়া যে বিষের ধোঁয়ার মতো আস্তে আস্তে এই সংস্কৃতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তাই বা বলি কী করে? তখন এই শিল্প যে হারিয়ে যাবে, তা আর আশ্চর্য কী? হারিয়ে যাবার আগে, আমি আমার এই তথ্যচিত্রে তা ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি মাত্র।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনার এই তথ্যচিত্রে এই কথা, এই ব্যথা সব বলতে পেরেছেন?

উত্তর : দু'হাজার ফিটের ছবি। বলতে গেলে নাচের বিষয়বস্তু দেখানো যায় না, আবার দেখাতে গেলে বলা হয় না। তবুও কিছু কি চেষ্টা করেছি।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : আপনি কী উদ্দেশ্যে film করেন?

উত্তর : মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সর্বশিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : সব Creative Art যেমন mimesis of life অর্থাৎ জীবনানুকরণ— আপনার মতে film-ও কি সেরূপ জীবনের প্রতিচ্ছবি।

উত্তর : ফিল্ম একটা নতুন কিছু না। সর্ব শিল্পে যেমন, তেমনি ফিল্মেও কতগুলো গভীরতম ঘটনা খুঁজে বের করতে হয়। আমি মনে করি ছবি একটা শিল্প। এবং যখন শিল্প, তাকে দায়ী হতে হবেই। দায়িত্ব মানবের প্রতি। একথাটা ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন : যদি জীবনানুকরণ— তবে সে কোন্ জীবন? সমাজ-জীবন অথবা ব্যক্তিজীবন?

উত্তর : বর্তমানে ব্যক্তিজীবন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এখন সমাজ-জীবনটা অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। কাজেই, শিল্পের অনুষঙ্গ থাকা উচিত মানুষ-জীবনের সঙ্গে সমাজ-জীবনেব সঙ্গে। একটা ভালো লাগার প্রশ্ন আছে, যেটা না থাকলে শিল্পী হারিয়ে যায়। আমার মনে হয় সেটা শিল্পে বিকৃত একটা রূপ। এই কথাটা মনে রাখলে আমার আগেকার কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আর পাঁচটা Form of Art থেকে (যেমন সাহিত্য, চিত্রকলা নৃত্য, গীত

ইত্যাদি) Film form-এর কি কোনো পৃথক গুণ আছে?

উত্তর : কোনো পৃথক গুণ নেই। মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং তাকে বিমোহিত করা যে ঘটনা, সে সব শিল্পেই সমান। এটা ফিল্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে কোনো মূল্য দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। মানুষ মানুষই। তাদের স্নেহ একই ধারায় বর্ধিত হয় সর্বশিল্পে। এখানে ফিল্মকে বড়ো করে তুলে ধরার কোনো মানে আমি বুঝতে পারি নি। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে film-এরও কি film এবং content-এর পরিবর্তন ঘটে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর . Content প্রথমে আসে। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলে গিয়েছিলেন যে আগে সত্যনিষ্ঠ হতে হয় তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। কথাগুলোর মানে আপনারা ভালো করে বুঝে দেখবেন। Form-টা কিছু না, ওটা আকার মাত্র। যেমন তুলনা করতে পারি আঁদ্রে ভাইদা অনেক কষ্ট পেয়ে যে-সব ছবি তুলছে, সেগুলো অভদ্র। মানবজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। তার থেকে content রূপক গ্রহণ করে এবং form তার নিজস্ব গতি গ্রহণ করে। কিন্তু এগুলো বাহ্যিক। আসলে দার্শনিকতা। সেইটে আজকাল খুব কম পাওয়া যাচ্ছে। লুই বুনুয়েলের পর মিজোগুচি আজ নেই, ওজু আজ নেই, খালি কুরোসাওয়া করে খাচ্ছে। ফেলিনি বিক্রি হয়ে গেছে। আন্তোনিওনি—সমস্ত ব্যাপারটার গভীরে ঢোকার মতো মানসিকতা তাঁর নেই। বার্গম্যান একটি সম্পূর্ণ জোচ্চোর। ককিয়নিস কিছু ভালো চেষ্টা করেছিল ইলেকট্রা জাতীয় ছবিতে, কিন্তু সেও হারিয়ে গেল। ফরাসি ন্যুভেলভাগ এবং তার অনুকরণে Polish Czechoslovakian ন্যুভেলভাগ আমাকে পীড়িত করে। এবং জাঁ পল সার্ত্রে ও আলবেয়ার কামুর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিল যেগুলো অত্যন্ত infantile, শিশুসুলভ। এর মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। ছবির জগতে জালিয়াতি শার্লি ক্লার্কও করেছে তার Connection ছবিতে, Lindsay Anderson করেছে, কিন্তু এরা কোনো গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি।

সমস্ত শিল্প ধ্রুব শিল্প। ফিল্ম যদি সত্যি হয় তা হলে আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, গ্রিফিথ, চ্যাপলিন (প্রথম দিকের যুগে) এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সত্যিকার প্রচণ্ড শক্তির রূপ গ্রহণ করে। সেখানে আজকালকার বাঁদরামি আমার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। অবশ্য ফেলিনির লা দলচে ভিতা বুনুয়েলের সমস্ত কাজ বাদে। এ সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিক কালের ইউরোপীয় চলচ্চিত্রগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের film-এর সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিমীদেশের film গুলির সঙ্গে form এবং content-এর কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

উত্তর : আমার মনে হয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ফরাসি চালিয়াতির অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে। এটাকে আমি গভীর ভাবে ঘৃণা করি। তাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এইসব ছবির কোনো মিল নেই। রাশিয়ান ছবিগুলো, দুই-একজন ডিরেক্টর ছাড়া, সম্পূর্ণ গাধার মতো। সেগুলো নিয়ে কোনো গভীর আলোচনার অবকাশ নেই।

ভিয়েৎনামের ছবি আমি দেখি নি, কিউবার ছবি আমি দেখি নি, চীনের ছবি আমি দেখি নি— সুতরাং এইসব দেশের ছবি সম্বন্ধে কোনো কথা বলার আমার অধিকার নেই। তারা যদি ভদ্রলোকের মতো ছবি করে থাকে তা হলে ধন্যবাদ। আমি ও-বিষয়ে কোনো কথা বলার অধিকারী নই।

প্রশ্ন : জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী কি কোনো সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছে দেয়?

উত্তর : শিল্পী খুঁজে ফেরেন। কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, হয়তো কখনো কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না। কিন্তু দুটোই ঠিক। শিল্পীর চেষ্টা থাকে, যে চেষ্টার অবসান একবার হয়। কিন্তু ঐ যে প্রশ্ন তুলল সেইটাই মানুষকে আকর্ষণ করে নাড়া দেয়, মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সেইখানেই শিল্পীর সার্থকতা।

প্রশ্ন : সেই সিদ্ধান্ত যদি সমাজ-জীবনের গ্রহণযোগ্য বলে দর্শক সাধারণ মনে না করে তবে সেখানে শিল্পীর কাজ কী হবে?— নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা না দর্শক সাধারণের সিদ্ধান্তকে নতুন করে পরখ করে দেখা?— এ ক্ষেত্রে শিল্পীর কোনো স্বাধীনতা থাকতে পারে কি?

উত্তর : নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকাই শিল্পীর উচিত।

প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ও অপরাজিত সৃষ্টির পটভূমিতে যে-জাতের প্রেরণা কাজ করছিল নায়ক ও অরণ্যের দিনরাত্রির মধ্যেও কি সেই প্রেরণা অবিকৃত ভাবে উপস্থিত?— যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে সে পরিবর্তনের কারণ ব্যক্তিগত না সমাজগত?

উত্তর : এ প্রশ্নের আমার উত্তর দেওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে কী ধরনের ছবি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে কী ধরনের ছবি হওয়া উচিত বলেক আপনি মনে করেন?

উত্তর : বর্তমান যুগে দু-ধরনের ছবি হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে মানুষকে খুশির আনন্দে ধুইয়ে দেওয়ার জন্য নানাপ্রকার দৃশ্যাবলী এবং নারীর মূর্তি দেখানো প্রয়োজন। আর-একটি হচ্ছে খেটে কাওয়া মানুষের সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা। এ দুটোর মধ্যে লড়াই হোক। দু'জনের সম্পর্কে সম পরিমাণে অর্থব্যয় করা হোক। তারপর বোঝা যাবে কে জেতে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ব্যাপারটার সমাধা হোক। আমি জানি কী ঘটবে।

সাক্ষাৎকার

বসু : আপনি তো প্রথমে নাটক করতেন। নাটক থেকে সিনেমায় এলেন কেন? সিনেমা কি নাটকের চেয়ে উন্নততর শিল্প?

ঘটক : আমি প্রথমে কবিতা লিখতাম। তারপর গল্প ও উপন্যাসের জগতে এলাম। কিন্তু চারপাশের বদমাইশির বিরুদ্ধে অনেক চিৎকার আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। তখন ভাবলাম নাটকের মাধ্যমে মানুষের সামনে ঘটনাগুলো সোজাসুজি পৌঁছে দেওয়া যাবে। তাই নাটক নিয়ে পড়লাম। তারপর দেখলাম যে নাটক অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ঘোরে। তখন মনে এল সিনেমার কথা। আমার সিনেমায় সিনেমায় আসার একমাত্র কারণ হচ্ছে নিজস্ব উপলব্ধিগুলো সোচ্চারে বলে যাওয়া। এর বেশি কিছু নেই।

বসু : ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে 'অযান্ত্রিক' মুক্তিলাভ করে। আপনার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে এটি সর্বপ্রথম। কিন্তু এর আগেও তো আপনি ছবি তুলেছেন। সেগুলি সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঘটক : ১৯৪৯-৫০ সালে তারাশঙ্করবাবুর কাহিনি অবলম্বনে 'বেদেনী' নামে একটি ছবি তৈরি করতে অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটাকে শেষ অবধি নিয়ে যেতে পারিনি। তারপর আমার নিজের টাকায় 'নাগরিক' ছবিটি সম্পূর্ণ করি। সেটা ছিল ১৯৫৫ সালে বিহার সরকারের জন্যে তিনটি ডকুমেন্টারি আমি করেছিলাম এবং সেগুলির মধ্যে ওরাওঁ-দের ওপরে ডকুমেন্টারিটি ফিলিপিনে প্রথম পুরস্কার পায়। এ-খবরগুলো অনেকেরই জানা নেই। যাই হোক, এর পর কয়েকবছর অবক্ষয়ের পর আমি 'অযান্ত্রিক' তুলি এবং সেটি আমার প্রথম ছবি হিসেবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

বসু : 'বেদেনী' এবং 'নাগরিক' ছবি দুটির প্রধান চরিত্রগুলোতে কারা অভিনয় করেছিলেন?

ঘটক : 'বেদেনী'র নায়ক ছিলেন অভি ভট্টাচার্য নায়িকা কেতকী দত্ত। এ ছাড়া দুটি অত্যন্ত জরুরি চরিত্র রূপদান করেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও প্রভা দেবী। 'নাগরিক'-এর প্রধান চরিত্রগুলোতে ছিলেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, কেতকী দত্ত, প্রভা দেবী, গঙ্গাপদ বসু, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, গীতা সোম (এখন সেন, মৃণাল সেনের সহধর্মিণী)। একটি চরিত্রে আমিও অভিনয় করেছিলাম।

বসু : 'নাগরিক' ছাড়া আর কোনো ছবিতে কি আপনি অভিনয় করেছেন?

ঘটক . করেছি। তবে একেবারে ছোটোখাটো চরিত্রে। তার কোনো গুরুত্ব নেই।

বসু : আপনি কী পদ্ধতিতে ছবি তোলেন? আইডিয়া থেকে স্ক্রিপট এবং স্ক্রিপট থেকে ছবি তোলার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি কি বিশেষ কোনো রীতিতে নিয়ন্ত্রিত করে?

ঘটক : না। সমস্ত ব্যাপারটা মায়ের জন্ম দেওয়ার মতো ব্যাপার। কীভাবে সৃষ্টি পরিণতি লাভ করে তার কোনো হিসেব নেই। সব-কিছুই ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয়। ভালোবাসি তাই ছবি করি। এর মধ্যে ভাগ করতে গেলে, রীতি বা পদ্ধতির সন্ধান করতে গেলে আমি কূল-কিনারা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় যাঁরা ভালো ছবি

করেন তাঁরা এর বাইরে যেতে পারেন না।

বসু : সিনেমার অভিনেতাদের সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

ঘটক : আমি দুধরনের অভিনেতাকে চিনি। প্রথমত, শিশু অভিনেতা। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ফিল্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হচ্ছে শিশু। এরা কী করতে হবে তা খুব সহজে বোঝে। দ্বিতীয়ত, আমি চিনি শিশির ভাদুড়ীর মতো অভিনেতা কিংবা প্রভা দেবীর মতো অভিনেত্রীকে। এঁদের কাছে কী আমার প্রয়োজন তা গুছিয়ে বলা যায়। এবং এঁরা বোঝেন। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। এদের সিনেমা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। এদের খাটিয়ে নিতে হবে কলের পুতুলের মতো।

বসু : অভিনেতাদের আপনি কীভাবে নির্দেশ দেন। কীভাবে অভিনয় করতে হবে তা কি তাদের বুঝিয়ে দেন মাত্র অথবা নিজেই অভিনয় করেন। তারা অনুকরণ করে মাত্র?

ঘটক : আমি সর্বদাই নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিই। এবং যতক্ষণ না আমার মনোমতো অভিনয় আমি তাদের কাছ থেকে পাচ্ছি ততক্ষণ আমি শট গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

বসু : অভিনেতাদের আপনি কতটা গুরুত্ব দেন?

ঘটক : অভিনেতারা আমার কাছে রোবট মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। কারণ সিনেবায় কম্পোজিশনগুলোর মধ্যে মানবজীবনের ঘটনাবলী ঘটতে থাকে, অভিনেতা এগুলোর মধ্যে আছে। কিন্তু এগুলোর তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য শিল্পের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি তাদের থাকে না।

বসু : তা হলে, অভিনেতাদের Compositional valueও আপনার কাছে বেশি নয়।

ঘটক : অভিনেতাদের Compositional Value ফ্রেমের অন্যান্য বস্তুর সমান।

বসু : আপনি কোনো ছবি করার সময় কি নিজের ভালো লাগা ভালো না লাগাকেই একমাত্র গুরুত্ব দেন অথবা বাইরের প্রয়োজনকেও মনে রাখেন?

ঘটক : আমি আজ পর্যন্ত কোনো ছবি অন্য কারো কথা ভেবে করিনি। সে ছবি যদি আপনাদের ভালো না লাগে তা হলে সতি কথা বলতে কি আমার কিছু যায় আসে না। আমি যা করতে চাই তাই করব, তার বাইরে আমি যাব না।

বসু : কিন্তু এ কথাও তো ঠিক যে সমালোচকেরা নয় বরং দর্শকেরাই কোনো শিল্পীর ভবিষ্যকে সাময়িকভাবে হলেও নিয়ন্ত্রি করে। এমন-কি বলা যায়, দর্শকদের সম্পূর্ণভাবে বাদ দিলে কোনো ছবির অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন।

ঘটক : দেখুন, দর্শকদের অবহেলা করে কোনো শিল্পী সৃষ্টি করতে পারেন না। প্রত্যেকেরই মাথার মধ্যে ঘোরে যে দর্শক ছবিটিকে ভালোবাসবে কি না। কাজেই এটা মিথ্যে কথা বলা হবে যদি কোনো কোনা শিল্পী বলেন যে, তিনি দর্শকদের ভুলে গিয়ে তার শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তবে আত্মপ্রেরণার একটা প্রশ্ন আছে, বিবেকের একটা প্রশ্ন আছে, শিল্পী সেইখানে হয়তো বাধা পেতে পারেন! সেখানে দর্শকেরা ছবি দেখতে নাও

পারেন। সেখানে কিছু করার নেই। কারণ শিল্পী সাময়িক প্রয়োজনের কাছে মাথা নিচু করতে প্রস্তুত নন।

বসু : আপনার বিভিন্ন ছবিগুলোর মধ্যে কি বক্তব্যের বা আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো যোগসূত্র আছে?

ঘটক : আমি যে-কটি ছবি এ পর্যন্ত করেছি বা করতে দিয়েছেন এদেশের মানুষেরা তার মধ্যে 'অযান্ত্রিক' একটি আলাদা রসের ছবি। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'-র একটি বিশেষ ঢঢ় আছে, সেটা আমি দর্শকদের ধরাতে পেরেছি বলে মনে হয় না।' 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার' এবং 'সুবর্ণরেখা'-কে কোনো কোনো সমালোচক একটি যোগসূত্রে আবদ্ধ এই যুক্তিতে 'ট্রিলজি' বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু এটা ঠিক নয়। আমি যখন যেভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়েছি সেভাবে ঘটনাগুলিকে আমি প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে কোনো ঘটনা-পারম্পর্য নেই।

বসু : আপনার অন্য ছবিগুলোর তুলনায় 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিটিকে একেবারে স্বতন্ত্র, এমন-কি প্রায় বেমানান মনে হয়।

ঘটক : 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' আমার মতে একটি নতুন ধরনের ছবি। একটি শিশুর চোখ দিয়ে আমি শহরটাকে ঘাঁটতে চেয়েছিলাম। হয়তো সম্পূর্ণ পেরে উঠি নি। কিন্তু কয়েকটি টেকনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে আমি করেছি যা আজকে সমাদর না পেলেও ভবিষ্যতে মানুষেরা বুঝবে বলে আশা করি।

বসু : টেকনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো কী?

ঘটক : যেমন ধরুন 18 m.m. Extreme wide Angle lens-এ প্যানিং করে সিমিক এফেক্ট আনা কিংবা 300 m.m. long focus lens ব্যবহার করে নানারকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা— যেমন গাড়ির চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই।

বসু : আপনার ছবিগুলোকে সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগ করা যায়। ছবিতে সংগীতের ভূমিকা কি আপনার মতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ?

ঘটক : একটি ছবিতে সংগীতের ভূমিকা ততখানি গুরুত্বপূর্ণ যতখানি ক্যামেরার। সংগীত সিনেমার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

বসু : 'সুবর্ণরেখা'য় আপনি বিদেশী ভাষার গান ব্যবহার করেছেন করেছেন। এর তাৎপর্য কী? কেবলমাত্র মুড সৃষ্টি অথবা অন্য কিছু?

ঘটক : 'সুবর্ণরেখা'য় যে অবাঙালি গানগুলো আমি ব্যবহার করেছি তার মধ্যে অধিকাংশ হচ্ছে প্রাচীন ধ্রুপদ। এগুলো সাধারণত আজকাল ব্যবহৃত হয় না। কলাবতী রাগে গাওয়া 'আজ কি আনন্দ' গানটি অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' থেকে নেওয়া। এগুলো সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল তাই ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রসংগীতেরও ব্যবহার এখানে আমি করেছি। সংগীত সম্পর্কে আমার কতকগুলো ঝোঁক আছে। এ ছবিতে সেই ঝোঁকগুলো প্রকাশ পেয়েছে।

বসু : যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা' তেমনি 'সুবর্ণরেখা'য় নাটকের গতি নারী চরিত্রে নির্ভরশীল। আপনার মতে নারী কি সমাজের চালিকাশক্তি?

ঘটক : নারীরা আমার মতে সমাজের এবং সংসারের আদ্যাশক্তি। সেজন্য আমার

ছবিতে সর্বদাই নারীর প্রতি মমতা, স্নেহ এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ রাখার চেষ্টা করেছি।

বসু : 'মেঘে ঢাকা তারা' এবং 'সুবর্ণরেখা' উভয় ছবিরই নায়িকারা সুস্থ জীবনকে কামনা করেছে। পায়নি এর জন্যে প্রথম জনের সংগ্রাম আমৃত্যু সৎ কিন্তু দ্বিতীয়জন শেষ পর্যন্ত কলুষিত জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এর মধ্য দিয়ে আপনি কি বলতে চেয়েছেন যে আজকের যুগে সৎ এবং অসৎ উভয়েরই পরিণতি এক? সততার কোনো বিশেষ পুরস্কার নেই।

ঘটক : এ প্রশ্নের উত্তর তো আপনরা নিজেরাই চারপাশে পাচ্ছেন। আপনারা জানেন কী ঘটনা চারপাশে ঘটছে। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে আপনারা একটার পর একটা ঘটনার খবর পাচ্ছেন। এর বাইরে আমার আর কিছু বলার নেই।

বসু : আপনার ছবির চরিত্রেরা সর্বদাই সংগ্রাম করে কিন্তু জয়লাভ করে না। এ থেকে কী বলা যায় না যে আপনি নৈরাশ্যবাদী?

ঘটক : এ বিষয়ে আমি নিজে কিছু বলতে চাই না। আপনারাই বিচার করবেন আমি নৈরাশ্যবাদী অথবা আশাবাদী।

বসু : আপনার ছবিগুলোতে, বিশেষভাবে 'সুবর্ণরেখা'য় সংলাপ যথেষ্ট সুগঠিত। আমার মনে হয় অন্য অনেকের মতো আপনি সংলাপকে চিত্রকল্পের অনুগামীমাত্র মনে করেন না বরং ছবিতে সমৃদ্ধ এবং ইঙ্গিতপূর্ণ সংলাপ ব্যবহারের পক্ষপাতী বলা যায় আপনাকে।

ঘটক : সংলাপ আঙ্গিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অন্যতম। সংলাপ ইঙ্গিতপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং সেইভাবে সংলাপ তৈরি করার চেষ্টা করি।

বসু : থিয়েটারের আশ্রয়ে নাটক যেমন সাহিত্য হিসেবে গড়ে উঠেছে সিনেমার আশ্রয়ে তেমনি চিত্রনাট্য কী অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?

ঘটক : চিত্রনাট্যের নিজস্ব কোনো জীবন নেই। চিত্রনাট্যকে বাঁচতে হলে ছবির মধ্য দিয়ে বাঁচাতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে চিত্রনাট্যকে নিয়ে সাহিত্যের ঢোকা যায়। চিত্রনাট্য আলাদা, সাহিত্য আলাদা।

বসু : আপনি কি ছবি তোলার সময় চিত্রনাট্যকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন?

ঘটক : না, কোনো চিত্রপরিচালকই তাঁর তৈরি স্ক্রিপট অনুসরণ করে চলতে পারেন না। আমিও না। বাংলায় যাকে বলে 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা' সেটা সর্বদাই করতে হয়। যেমন সংলাপ তেমনি চিত্রনাট্যের অন্যান্য দিক সম্পর্কে এ কথাটা খাটে।

বসু : আপনার ছবিতে যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা সাধারণত খুব immediate— স্বপ্নকে বজায় রাখার কিংবা বেঁচে থাকার। কিন্তু এই বেঁচে থাকার সমস্যা প্রায় সর্বদাই সামাজিক সমস্যা হিমাবে আত্মপ্রকাশ করেছে— দার্শনিক সমস্যা হিসেবে নয়। আপনি এ বিষয়ে কিছু বলুন।

ঘটক : আমার মনে হয় দার্শনিক সমস্যা একা একা প্রকাশিত হতে পারে না। তাকে সামাজিক সমস্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে হয়। সেজন্য আমার ছবিতে সমস্যাগুলিকে

সামাজিক সমস্যা রূপেই প্রকাশ করেছি।

বসু : আপনার চিন্তা ভাবনায় কি বিশেষ কোনো দর্শনের প্রভাব আছে?

ঘটক : আমার চিন্তা-ভাবনা প্রভাবিত হচ্ছে প্রধানত মার্ক্স এবং লেনিনের চিন্তা থেকে। বুদ্ধদেবও আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন এবং তাঁর চিন্তাধারা থেকে উদ্ভুত কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদী দর্শন থেকেও আমি বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তা ছাড়া বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রামে আমি ঘুরে কাটিয়েছি। সেখানে গ্রাম্য গান সংগ্রহ করার সময়ে আমি বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিলেছি এবং তাদের দর্শনের সাথে পরিচিত হয়েছি। এসমস্তই আমাকে বিচলিত করেছে। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না, যেমন বিশ্বাস করি না। বিশেষ কোনো পার্টির চিন্তাধারায়।

বসু : প্রত্যেক শিল্পেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যার জন্যে তার স্রষ্টাদেরও সে অনুসারে কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। সার্থক সিনেমা-পরিচালক হওয়ার জন্যে কী কী গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন?

ঘটক : সার্থক পরিচালক হতে হলে একজন কবির মতো তার একটি ছন্দোময় স্বপ্নভরা চোখ থাকা দরকার। এর বাইরে তিনি সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষ।

বসু : অনেকে মনে করেন সিনেমা এখনও সাহিত্য কিংবা ভাস্কর্যের মতো উন্নত স্তরের শিল্প হতে পারে নি। ধারণাটা কি ঠিক?

ঘটক : আমার মনে হয় সিনেমা এখনও সাহিত্য বা ভাস্কর্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না যে সাহিত্য এবং ভাস্কর্যের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন। সিনেমা সবে মাত্র তার কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। এখনও অনেক এগোনোর রয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস সিনেমাও একদিন অন্য যে-কোনো শিল্পের পাশে নিজের স্থান করে নিতে পারবেনই।

বসু : আমার মনে হয় উন্নত স্তরে শিল্প হওয়ার পথে সিনেমায় সবচেয়ে বড়ো বাধা মূলধনের প্রতি নির্ভরশীলতা।

ঘটক : এই বিষয়টি শিল্পের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে, কিন্তু একে অতিক্রম কার কোনো উপায় নেই। ব্যাবসাদারদের দাবিকে মেনে নিতেই হবে শিল্পীকে কিন্তু নিজের চারিত্রিক বলও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

বসু : যেমন প্যারিসে চেষ্টা চলছে, তেমনি এখানেও ফিল্ম সোসাইটি এবং থিয়েটারগুলোর মাধ্যমে যদি রুচিমান দর্শকমণ্ডলী সৃষ্টি করা যায় তা হলে ভালো ছবিগুলো দর্শকদের অভাবে মার খাবে না।

ঘটক : সমস্যার সমাধান এ-সব জায়গাতে নয়। প্রকৃত সমস্যা সমাজব্যবস্থার সমস্যা। সমাজব্যবস্থাকে সম্পূণ বদল করতে না পারলে অর্থাৎ সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে না পারলে এ সমস্ত কাজ হবে না। ফিল্ম সোসাইটি বা আর্ট থিয়েটারগুলি একটা আঁচড় কাটতে পারে মাত্র। কিন্তু সমস্যাকে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এদের একেবারেই আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে চেষ্টা করতে কোনো দোষ নেই, চেষ্টা চলুক, আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে।

বসু : ভারতীয় সেন্সরশিপ সম্পর্কে সন্তুষ্ট এমন কোনো চিত্র পরিচালকের সন্ধান

এখনও আমি পাই নি। সেন্সরশিপ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

ঘটক : আমাদের দেশের সেন্সরশিপ, আপনরা বোধহয় জানেন না, সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যে যখন কর্তা হন তিনি তাঁর মাথা থেকে যা ভালো ভেবে বসেন তাই করেন। কাগজে কলমে কতকগুলি নীতির কথা লেখা আছে বটে কিন্তু সেগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ মোটেই হয় না। এ ছাড়া সেন্সরবোর্ডের Advisory Committee-তে ফিল্ম ছাড়া অন্য সব জগতের লোককে রাখা হয়। এ নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন আছে— রুচির প্রশ্ন। এঁরা কে কতখানি ছবি বোঝেন সে সম্পর্কে আমার ধারণা খুব স্বচ্ছ— এঁদের ছবি বোঝার ক্ষমতা খুবই কম। অথচ এই সেন্সরবোর্ডই কোন্ ছবি কীভাবে দেখানে হবে তার ব্যবস্থা করেন। ফলে সমাদেব দেশে যে-ধরনের সেন্সরি চলেছে তাকে এক কথায় বলা যায় বিচিত্র।

বসু : ভারতীয় ছবিতে কি চুম্বন অনুমোদিত হওয়া উচিত?

ঘটক : চুম্বনটা এমন একটা বড়ো প্রশ্ন নয় যাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যের যে প্রকৃত তাতে আমার মতে স্ক্রিনে চুম্বন দেখানো উচিত নয়।

বসু : ভারতীয় সিনেমায়, প্রধানত হিন্দী সিনেমায়, ভালোবাসার প্রকাশ দেখানোর জন্যে যে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া হয়— নাচ, গান এবং যৌন আবেদনমূলক অঙ্গ-ভঙ্গি তা হয়তো এড়ানো যাবে চুম্বনের মাধ্যমে। এতে আর কিছু না হোক কাঁচা ফিল্মের সাশ্রয় হবে।

ঘটক : হিন্দী ছবিতে যাঁরা যৌন আবেদনমূলক নাচ গান এবং অঙ্গভঙ্গি দেখান তাঁরা এগুলি সংশোধিত করার কোন চেষ্টাই করবেন না সে চুম্বন অনুমোদিত হোক আর নাই হোক। এঁরা বক্স অফিসের সিকে লক্ষ্য রেখে এ কাণ্ডগুলি ঘটিয়ে যাবেন যাতে মানুষের যৌন প্রবৃত্তিগুলো জাগ্রত হয়। সুতরাং এ সমস্যার সঙ্গে চুম্বন সম্পর্কিত সমস্যার কোনো যোগ নেই।

বসু : আপনি তো পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানকার শিক্ষা কি ভারতীয় সিনেমার মান উন্নয়নে কোনো কার্যকরী ভূমিকা নিতে পেরেছে? এখানে যারা বিভিন্ন পরিচালকেরা ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কাজ শেখেন তাদের শিক্ষা কি তুলনামূলকভাবে কম কার্যকরী?

ঘটক : পুনাতে সিনেমা শিল্পে ট্রেনিং দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ কবার পর চাকরি পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। ফলে অত্যন্ত মেধাবী ছেলেমেয়েরা ওখান থেকে বেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার সুডিওতে যাঁরা সহকারীর কাজ করেন তাদেরও শেখার অবকাশ আছে। কিন্তু সিনেমা ব্যাবসার প্রকৃতিটাই এমন যে মৌলিক চিন্তাধারার মানুষেরা সুযোগ পায় না। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই মোট পরিণতিটা একই দাঁড়াচ্ছে।

বসু : সাধারণত যে-কোনো শিল্পের এক শ্রেণীর স্রষ্টা সমালোচকদের যথেষ্ট সুনজরে দেখেন না। কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে এই শিল্পের মানোন্নয়নে সমালোচকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে মনে হয়। এ-বিষয়ে আপনি কি বলুন।

ঘটক : সমালোচক হচ্ছে সেতু। তাঁর কর্তব্য শিল্পীকে অনুধাবন করা এবং সে-

সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা দর্শকের কাছে ব্যক্ত করা। এভাবে শিল্পী যেমন নতুন পথের সন্ধান পেতে পারেন। তেমনি দর্শকও ক্রমশ বেশি পরিমাণে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য এর জন্যে সমালোচক গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং তার দায়িত্ব পালনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করবেন।

বসু : পৃথিবীর বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে কাদের আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?

ঘটক : আমার মতে বর্তমান চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন লুই বুনুয়েল। তাঁর চার-পাঁচটি ছবি আমি দেখেছি। ছবিগুলি আমাকে একেবারে পাগল করে দিয়েছে। বুনুয়েলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশৃঙ্খলা এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের একটি ছন্দে পৌঁছে দেওয়া। তিনি আমাদের মতো সাধারণ পরিচালকদের ভঙ্গিতে গুছিয়ে শট তোলেন না বা গুছিয়ে গল্প সাজান না। মনে হবে যেন তিনি পরম অবহেলায় ছবি তুলেছেন অথচ প্রায়শ এক-একটি মারাত্মক মুহূর্তে আমাদের তিনি নিয়ে যান যা রীতিমতো স্তম্ভিত করে দেয়।

এ ছাড়া কয়েকজন জাপানি পরিচালকের ছবি আমার খুব ভালো লাগে। তবে তাদের সমস্ত ছবি নয়। আন্দ্রেই তারকোভসকি একটি মাত্র ছবি করার পর আর ছবি করেন নি, কিন্তু ছবিটি আমার ভালো লেগেছিল। গ্রীসের মাইকেল কাকোয়নিস ভবিষ্যতে একজন শক্তিশালী পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। রজার ভদিম-জাতীয় পরিচালককে আমি পছন্দ করি না। সমস্ত ফরাসি স্কুলটাই আমার কাছে বিরক্তির বিষয়। ব্রিটিশ স্কুলের Room at the top আমার কাছে অতি সাধারণ মনে হয়। 'A kind of loving' ছবিটি অবশ্য ব্যতিক্রম। এ ছাড়া কার্ল ড্রেয়ার-পরিচালিত 'The Passion of Joan of Arc' ছবিটি আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। প্রসঙ্গত, ছবিতে অভিনয়কালে নায়িকার ওপর এত প্রবল মানসিক চাপ পড়ে যে শুটিং শেষ হওয়ার ছমাস বাসে তিনি আত্মহত্যা করেন।

বসু : যেকালে ছবি প্রথম প্রথম বলতে শিখল তখন অনেকেই আতঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে আর্ট হিসেবে সিনেমার যে সম্ভাবনা ছিল তা বিনষ্ট হল। আধুনিককালে রঙিন ছবি সম্পর্কেও অনেকে একই আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন। এই আতঙ্ক কতটা ঠিক।

ঘটক . ছবিতে রঙের ব্যবহার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভীষণ সাহায্য করতে পারে এবং এতে শিল্পের ক্ষতি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সব-কিছুই অপব্যবহারে তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে এবং ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। যেমন ধরুন এই ধরনের ক্ষতি শব্দের অপব্যবহারও হতে পারে এবং হচ্ছেও।

বসু : অনেকেই মনে করেন সিনেমার বর্তমান রূপের পরিপ্রেক্ষিতে নিও-রিয়ালিজম নিতান্তই সেকেলে।

ঘটক : এ কথা ঠিক যে সময়ের সঙ্গে ছবি করার ধারা পালটে যায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা। এক-একজন মানুষ এক-একভাবে জগৎকে দেখে এবং তার ভিত্তিতে শিল্প সৃষ্টি করে। সেখানে নামকরণে যতই আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাক জিনিসটা এত সোজা নয়। পাওলো পাসোলিনি এখন যা করে যাচ্ছেন সেটার নাম নিওরিয়ালিজমই দিতে হয় যদি কিছু দেওয়ার থাকে। ভবিষ্যতে যদি কোনো মহৎ

শিল্পী আসেন এবং তিনি যদি তথাকথিত নিও-রিয়ালিজম পদ্ধতিতে ছবি করেন তা হলে তখন মানতেই হবে যে ও-জিনিসটার আয়ু ফুরোয়নি। আসলে এভাবে বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে শিল্পকে আবদ্ধ করাতে কোনো লাভ নেই। চিরকাল শিল্পীরা এগুলোকে ভেঙে দিয়েছেন— শিল্পের সমগ্র ইতিহাস এর প্রমাণ।

বসু : শিল্প হিসেবে পূর্ণ কাহিনি এবং তথ্যচিত্রের সম্পর্ক কি ঘনিষ্ঠ এবং পরস্পর নির্ভরশীল?

ঘটক : নিশ্চয়ই। তথ্যচিত্রের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কাহিনিচিত্রে আরোপিত হয় বলা যায়, পরস্পর পরস্পরকে প্রতিফলিত এবং প্রভাবিত করে।

বসু : আপনার মতে বাংলা সিনেমার বর্তমান সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কী?

ঘটক : আমাদের পরিচালকদের সোজা ফুটপাথে নেমে আসতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে একটা কঠিন ডামাডোলের মধ্য দিয়ে চলেছে। এখন আমাদের মানুষের সঙ্গী হতে হবে। যা-কিছু করণীয় তা মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করতে হবে। এভাবেই সার্থক ছবি তৈরি হবে।

বসু : আমরা জানি যে ১৯৫৮ সালের মে মাস থেকে ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত দুবছর দশ মাসে আপনার চারটি ছবি মুক্তি পেয়েছে। যে-কোনো দেশের চিত্র-পরিচালককের পক্ষে এ-একটি চমৎকার রেকর্ড। কিন্তু তারপর দীর্ঘ প্রায় সাত বছরে একটিমাত্র ছবি মুক্তি পেয়েছে। এই কারণ কী? কিসের বাধা?

ঘটক : বাধা প্রধানত আমার স্বাধীনচিত্ততা। আমি কোনোদিন মাথা নিচু করতে চাই নি এবং কোনোদিন চাইব না। এটা স্বাভাবিকভাবে ব্যবসায়ীদের কাছে অসুবিধাজনক। ফলে এই ঘটনাটা ঘটেছে।

বসু : আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

ঘটক : আমার অনেকগুলো পরিকল্পনা আছে। সেগুলির কোন্‌টা করে উঠতে পারব সেটা নির্ভর করছে ধনীদের ওপর। সুতরাং এ-বিষয়ে এখন কোনো আলোচনা নয়।

শেষদিনে যখন আমি শ্রীঘটককে বললাম যে আমার প্রশ্ন করা শেষ হয়েছে, তিনি বললেন, "এখন তাহলে কলম বন্ধ করুন, নোটবই বন্ধ করুন। কয়েকটা কথা বলি, ভিতরের কথা, ছাপাবেন না, ছাপিয়ে লাভ নেই বলে।" তার পর তিনি যা বললেন তার মধ্যে নতুন তথ্য ছিল অনেক কিন্তু সমস্ত তথ্যেরই উৎস সেই স্বার্থপর দৈত্য যে সাধারণ ভারতীয় সিনেমাকে শৈশবত্বের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে আজও, যে প্রাচীর লঙ্ঘনের প্রচেষ্টায় অকালমৃত্যু ডেকে এনেছেন বহু পরিচালক। কিন্তু আমাদের বিদায় মুহূর্তে তাঁর একটি মন্তব্য সমচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে আমার কাছে : "যে পরিস্থিতি আমাকে পর্যুদস্ত করেছে মৃত্যুর আগে তার কবল থেকে বাংলা সিনেমাকে আমি মুক্ত করবই" বাংলা সিনেমার এককালে বিদ্রোহীরা যখন আপসে মনোযোগী তখন এমন সংকল্প ভবিষ্যতে আমাদের আস্থা আর-একবার ফিরিয়ে আনে নিঃসন্দেহে।

ঋত্বিক ঘটক ও দুই বাংলার ছবি

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ছবি করতে গিয়ে আপনি কী ধরনের সুযোগ সুবিধে পেয়েছেন? কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

উত্তর : ওখানে ছবি করতে গিয়ে প্রাথমিক ভাবে কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছি। তারপর যখন ওখানকার মানুষরা আমাকে বুঝেছে, তখন যে স্নেহ-ভালোবাসা আমি পেয়েছি তার তুলনা নেই। 'বাংলা দেশ' নামটা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে কেননা আমরা মানে এ দিকে যারা আছি, তবে কি বাঙালি নই? তবে পদ্মা, মেঘনা, শীতলক্ষা— এইসব নদীর মধ্যে ফিরে যাওয়া— যেখানে আমি মানুষ হয়েছি— সেই ফিরে যাওয়াটা মায়ের কাছে ছেলের ফিরে যাওয়ার মতন ব্যাপার। এর মধ্যে প্রেরণা-ট্রেরনার ব্যাপার নেই। এতদিন ফিরে যেতে পারি নি অভদ্র রাজনৈতিক কারণে ; এখন পারছি সেটাই একটা বিরাট ব্যাপার আমার কাছে। ওখানে সরকার থেকে আরম্ভ করে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সকলেই আমাকে ভালোবাসে। ওখানে যে ছবি করছি তার বিষয়বস্তু মনোমতো, প্রযোজকও মনোমত, কাজেই কোনো বাধা নেই। সব দিক থেকেই অনেক সাহায্য পাচ্ছি। তাই আশা করি এ-ছবির মধ্যে দিয়ে কিছু বলতে পারব। হ্যাঁ টেক্‌নিক্যাল বাধা আছে, সে সবজায়গাতেই থাকে, কলকাতার আছে। কোথায় নেই? সে-সব বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়— সেটা করা যাচ্ছে। কেননা সব স্তরেই সাহায্য পাচ্ছি। যদি ছবি খারাপ হয় অন্য কাউকে ধরতে পারব না, সেটা আমার দোষেই হবে।

প্রশ্ন : 'তিতাসে'র মিউজিক কি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র করবেন?

উত্তর : হ্যাঁ। এ ব্যাপারে ওঁর মতো সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি আমার মতে আর কেউ নেই। পাশ্চাত্য, দেশীয় ক্লাসিকাল ও লোকসংগীত সব-কিছুর ওপরই ওঁর অসামান্য দখল, কাজেই ওঁকে এ ছবির জন্য দরকার।

আপনার অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তাই তো মনে পড়ল— ঢাকার কিছু কিছু কাগজে আমার বিরুদ্ধে লেখা হচ্ছে সেটা বোঝা যায়— হাজার হোক চোখেতে আমি বিদেশি তাই মনে করতে পারে যে মাতব্বরি করতে এসেছি। কিন্তু সেগুলি পিন্‌প্রিক মাত্র। যে স্নেহ যে ভালোবাসা পাচ্ছি, বিশেষ করে যে ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে কাজ করছে তাদের কাছ থেকে, তার তুলনায় সে-সব কিছু নয়। ঢাকার প্রচুর ছবি হয়। এখন ১৫৩টা ছবি হচ্ছে বলে শুনছি। রোজি মেয়েটি সেখানে খুবই জনপ্রিয় নায়িকা। স্টুডিওতে অন্য ছবিতে ভয়াবহ মেক-আপ পরে অভিনয় করতে হয়। আমার ছবিতে বিনা মেক-আপে দারুণ অভিনয় করছে। মুস্তফা অসম্ভব খাটছে। নদীতে ডুবে, জলে ভিজে, কাদা মেখে, ওরা যেভাবে প্রাণ দিয়ে হাসিমুখে কাজ করছে— এই যে ভালোবাসা, এটা আন্তরিক— এটা দুর্লভ।

প্রশ্ন : অদ্বৈতবাবুর (মল্লবর্মন) উপন্যাস সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আপনারা জানেন কি না জানিনা অদ্বৈতবাবু তাঁর উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেন এবং বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে উনি সম্পূর্ণ ছশো পৃষ্ঠার উপন্যাসটি

আবার লেখেন। এই উপন্যাস স্বভাবতই "পদ্মানদীর মাঝি"র কথা মনে করায়। মানিকবাবুর উপন্যাস অনবদ্য শিল্পকর্ম। মনে হয় ছবি করবার জন্য ভাঙা যায় না— অসামান্য তীক্ষ্ণ, তীব্র। কিন্তু বাবুদের চোখ দিয়ে দেখা। অদ্বৈতবাবুর লেখা শিল্পকর্ম হিসাবে মানিকবাবুর উপন্যাসের ধারে কাছে নয়। অদ্বৈতবাবু অনেক অনেক অতিকথন করেন, কিন্তু লেখাটা একেবারে প্রাণ থেকে, ভেতর থেকে লেখা। আমিও নিজে বাবুর চোখ দিয়ে না দেখে, ঐভাবে ভেতর থেকে দেখবার চেষ্টা করছি। স্বাভাবিক চিত্রণের জন্য candid camera-তে চট করে ছবি তুলে নিচ্ছি। তবে অনেকসময় গ্রামের লোকরাও টের পেয়ে যায়। একটি মেয়ের ছবি তুলতে গেছি, সে হঠাৎ "দাঁড়ান" বলে দৌড়ে গিয়ে আবার ফিরে এল ; দেখি ঠোঁটে আলতা মেখে এসেছে, শহুরে ছাপ আর কি। লিপস্টিক-এর নকল করতে গিয়ে ওরা পায়ের জিনিস ঠোঁটে মাখছে। তবে ছবিতে অনেক ক্ষেত্রেই খাঁটি জিনিস, raw জিনিস তুলে ধরা যাচ্ছে। আমি তাই চাই। পৃথিবীকে দেখাতে চাই আমার দেশ কী, আমার মা কী।

অদ্বৈতবাবু যে সময় তিতাসনদী দেখেছেন তখন তিতাস ও তার তীরবর্তী গ্রামীণ সভ্যতা মরতে বসেছে। তাঁর বইতে তিতাস একটি 'নদীর নাম'। তিনি এর পরের পুনর্জীবটা দেখে যান নি। আমি দেখাতে চাই যে মৃত্যুর পরেও এই পুনর্জীবন হচ্ছে। তিতাস এখন আবার যৌবনবতী। আমার ছবিতে গ্রাম নায়ক, তিতাস নায়িকা। বাসন্তীর চরিত্রে অভিনয় করছে রোজি। শেষ দৃশ্যে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত বাসন্তী চর থেকে মাটি খুঁড়ে জল বার করতে চেষ্টা করল। পাশে ধান গাছের চারা দুলছে— একটা ন্যাংটো খোকা বেরিয়ে এল— তার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী মরছে, কিন্তু ছেলেটি হাসছে, সে বাঁচবে।

'যুক্তি তক্ক গপ্প' সম্পর্কে তৃপ্তি মিত্র

স্ক্রিপ্টটা শুনে আমার অপূর্ব লাগল। এ রকম কখনো শুনি নি। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। শুটিং শুরু হয়েছে— স্ক্রিপট্ যা আছে ঠিকমতো যদি তা করা হয় তবে এটা একটা দারুণ ছবি হবে বলে আমার মনে হয়।

ছবির বিষয়টা হল— একটা স্তরে একজন লোকের জীবনী। কিন্তু অন্য স্তরও আছে। কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট, উপরতলা, নীচেতলা, সব-কিছুকেই সমাজের সবদিকেই দারুণভাবে ধরা হয়েছে। গ্রামেরও ব্যাপার আছে, বীরভূম, বাঁকুড়া অঞ্চলের দৃশ্য, পুরুলিয়ার ছৌ, দেবী প্রতিমার শক্তিরূপ— নকশাল ছেলেরা, ভালোভালো ছেলেরা কিভাবে বিপথে গেল, অনেক কিছু রয়েছে। এ সব-কিছু link করছে পরিচালকের নিজের চরিত্র, তিনিই নায়ক। তাঁর মান অভিমান, তাঁর চোখ দিয়ে জীবন দেখা, এদিকটাও রয়েছে। একটি বিশেষ sequence আমাকে খুবই move করেছে তার কথা বলি। দেখানো হচ্ছে এবারকার গণ্ডগোলের সময় বাংলাদেশ থেকে একটি গরিব মেয়ে এসেছে, সে নায়কের কাছে আশ্রয় চাইছে। নায়ক তাকে জিজ্ঞাসা করছে, তুমি কি বাংলাদেশের আত্মা? সে মেয়েটি আত্মা মানে না বুঝে বলছে হ্যাঁ, বহুদিন কিছু খেতে

পাইনি। এটা এমন একটা গভীরতার সৃষ্টি করে বলে বোঝানো যায় না। তা ছাড়া যে-কোনো মানুষকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসার ব্যাপারটা আমাকে খুবই অভিভূত করেছে।

ঘটক : দেখুন আমি একটা transcendental ব্যাপার করতে চেষ্টা করেছি। আমার কাছে বাংলা একই বাংলা, আমি মনে মনে সীমানা মানি না। সীমাটা ইতিহাসের পরিহাস। আমার কাছে দুই বাংলা নেই, ভালোবাসার রাজ্যে বাংলা এক মা। একজন মায়ের আবার ভাগ কি?

প্রশ্ন : আপনি তো শুটিং সমস্তই আউটডোরে করছেন?

ঘটক : হ্যাঁ। অবশ্যই। আসল জিনিস নইলে পাব কোথায়? অসুবিধায় পড়লে অবশ্য স্টুডিওতে যেতে হয়। সেটাকে আমি surrender করা বলে মনি করি। পারতপক্ষে আমি স্টুডিওতে যেতে চাই নে। অভিনেতা আমি পেশাদার অপেশাদার মিলিয়ে নিই। যখন যেমন দরকার বুঝি। ও ব্যাপারে আমার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

সুখ অসুখ ও ঋত্বিক ঘটক

বসু : আপনি একাধিক ছবি একসঙ্গে করছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঘটক : আমার হাতে এখন তিনটি ছবি। একটি ঢাকায়— 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আর একটি কলকাতায়— যুক্তি তক্কো আর গপ্পো। আরো একটি দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে, এটি character study, documentrary বলা ভুল। তিতাসের গল্পটা— অদ্বৈত মল্লবর্মণ যা বলবার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে— নদীর ধারে একটা জেলেদের সমাজ এবং সেই নদীটা আস্তে আস্তে শুকোতে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজটাও চুরমার হয়ে গেল। তার স্মৃতি বহন করছে শুধু একটি ব্যাপার— আশেপাশের গ্রামের লোক এখনও বলে যে এখানে তিতাস নামে নদী ছিল। অদ্বৈতবাবু এইখানে শেষ করা সত্ত্বেও আমি একটু টেনে ছেড়েছি। নদী আর নেই কিন্তু ধানের ক্ষেত রয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা সভ্যতা শেষ হয়ে যাওয়াটাই শেষ নয়। তার মৃত্যুর মধ্যেই উপ্ত আছে নতুন সভ্যতার বীজ। এভাবেই মানব জীবনপ্রবাহ চলে। বাবা ও ছেলের সম্পর্কের মতো। 'যুক্তি তর্ক' সম্পূর্ণটাই ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সালের গোড়া পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে দিন রাত্রিবাস করে যে জীবনপ্রবাহ আমি দেখেছি তার ওপর ভিত্তি করে। একটা সুতীব্র আক্রমণ এ ছবির লক্ষ্য। এ ছবিতে আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছি। এমন সব ঘটনা যা ঘটছে কিন্তু ঘটা উচিত নয়। এ অন্যায় এ পাপ। অবশ্য ব্যাপারটা নতুন নয়। সৎ শিল্পীরা সব সময়েই এই প্রতিবাদ করে আসছেন। প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না তারা অন্যায় করছে। শিল্প দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এগিয়ে

যাওয়ার। শিল্পী সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে সমাজের দাস, এই দাসত্ব স্বীকার ক'রে তবে সে ছবি করবে।

বসু : আপনার ছবিতে টেকনিককে আপনি কতখানি গুরুত্ব দেন?

ঘটক : টেকনিকের নিজস্বতা নেই। আমরা মায়ের পেট থেকে পড়ি। তখন ভাষা-জ্ঞান নেই। বয়স বাড়লে ভাষা শিখি, ব্যাকরণ শিখি। কেন? আমাদের ভাবকে প্রকাশের জন্যে। ভাষার দাম নেই ; তার প্রকাশিত ভাব-ভালোবাসা-ক্রোধের দাম। ভাষা শেখা সে-সব তীব্রভাবে প্রকাশ করার জন্যে। সিনেমায়ও ব্যাপারটা তাই। যন্ত্রপাতি নিয়ে চলতে হয় তাই শিখতে হয়। টেকনিক-সর্বস্বরা জোচ্চোর। আমি ওর মধ্যে নেই। আমি একটা কথা বলতে চাই— টেকনিক আপনাআপনি আসে। আগের ছবিতে কী টেকনিক করেছি তা এখন আমার মাথায় নেই। পরে বলাটা intellectual ফাজলামি। Film is no mystery. এটা একটা ডাল-ভাত। একটা ভোর দেখছি। কী লেন্স দরকার তা কি অঙ্ক কষে দেখি? মনে করি ভালো হবে তাই। হয়তো ভালো হবে ; হয়তো নয়। ফিল্ম-এর কাগজগুলো গেঁড়োমিতে ভর্তি। পড়তে পারি না। আসলে ছবি করার সময় অন্য কোনো শক্তি ঢোকে। তার প্রথমে থাকে আবেগ ; আবেগ চালিত করে। সমস্ত ব্যাপারটা আবেগ থেকে আসে। যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। এ হল ভেতর থেকে উৎসারিত। যে-কোনো শিল্পকর্ম সম্পর্কে এ কথা খাটে। লোকে গ্রহণ করুক অথবা না করুক। যেদিন দর্শকরা স্ক্রিন ছিঁড়ে দিল সেদিন থেকে চুল থাকতে শুরু হল। শিল্পী কি গাড়ি রেডিওগ্রাম বৌ-এর গহনার জন্যে ছবি করবে? সবচেয়ে বড়ো কথা চেষ্টা করা। হবে কি না জানি না। I can never say I shall succeed.

বসু : 'যুক্তি তর্ক' কি পলিটিকাল ছবি?

ঘটক : সম্পূর্ণভাবে। পলিটিকাল ছবি করা আসলে মেরুদণ্ডের প্রশ্ন।

বসু : সেন্সারে অসুবিধে হবে না?

ঘটক : Up to the end চেষ্টা করব। পলিটিক্স কি জীবনের বাইরে? ১৯২৮ সালে চ্যাপলিন মস্কোয় বলেছিলেন : I am interested in man. Politics is a part of man ফিল্ম apolitical— কোনো শিল্পী এ কথা বলে না। কিন্তু প্রশ্নটাই রাজনীতিভিত্তিক। Schlessinger-এর মতো পলিটিক্স ছাড়া উচিত শিল্পীর— কিন্তু এটাই পলিটিকাল কথা।

বসু : পলিটিক্স এবং সেক্স— এ দুটো দিয়ে সেন্সরের সবচেয়ে ভাবনা। অকারণে সেক্স এও এক ধরনের পলিটিক্স।

ঘটক : Law of life বলে একটা জিনিস আছে। শিল্পের প্রয়োজনে নয়, পয়সার প্রয়োজনে যে সেক্স তা vulgar বম্বের ছবিতে যে-সব কাণ্ড হয় তার চেয়ে bare breast দেখানো ভালো।

[এর পরই ঋত্বিক ঘটক ছবির কাজে গেলেন বিদেশে— মানে ঢাকায়। ('ঢাকাটা একটি বিদেশে'— এক অচেনা ভঙ্গিতে বলেছিলেন পরে আমাকে)। ফিরে এলেন হাসপাতালে— বাংলা দেশের হাসপাতাল থেকে বাংলার হাসপাতালে। গেলাম। এবং হাসপাতালের ঘরে পা রেখেই বোধ হল শেষ অবধি সাদৃশ্যই বুঝি সময়ের পরিমাপ। কিংবা বৈসাদৃশ্য। বোধ

হল এক যুগ কেটে গেছে, কিংবা একাধিক। পাঞ্জাবী হোটেলের ঋত্বিক ঘটক ব্যাক-স্টেজ-এ, অন্য ঋত্বিক ঘটক যিনি তীব্র স্রোতের দীর্ঘ নদী পার হয়ে যেন কেবল তীরে উঠলেন, ক্লান্ত, শীর্ণ। বিছানার ওপর বসে আছেন, সোজা শিরদাঁড়া। অবিন্যস্ত বিছানা। লম্বা ঘর ; ঝড়ে পড়ে যাওয়া ডালের মতো কতকগুলি মানুষ শুয়ে আট-দশটা বিছানায়, একজনের সামনে বেডপ্যান। জিজ্ঞাসা করলাম 'কেমন আছে?' 'ভালো, ভালো হয়ে গেছি তবে এরা ছাড়ছে না'। মনে হল আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। 'এখানে তো অবসর, লিখছেন কিছু 'script ?' 'script ?' চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না। চারিদিক তাকিলে দেখুন। আমি আসার পর দুটো লোক পটল তুলল, প্রায় ঠ্যাং ধরে নিয়ে গেল, আর একটা লোকও তুলবে। আপনার পিছনে।' তাকালাম না, আগেই দেখেছি, বেড-প্যান সমেত লোকটি— নাটক শেষ হওয়া এবং পর্দা পুরোপুরি নামার মাঝে যে কয়েক মুহূর্ত সংজ্ঞার অতীত সময়— সেই সময়ের মধ্যে রয়েছে এই অভিনেতাটি। একটু থেমে বললেন, 'এর মধ্যে লেখা যায়?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিকিৎসা কেমন হচ্ছে।'— 'খুব ভালো, চিকিৎসার কোনো ত্রুটি নেই, ওষুধপত্রে অভাব নেই।'— 'খাওয়া দাওয়া'?— 'খাওয়া দাওয়া। খাবার যা দেয় ঋত্বিক ঘটক খেতে পারে না। অসম্ভব। পাশের ক্যান্টিনে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম। দুদিন খেলাম। ওরা বিল পাঠালো বিয়াল্লিশ টাকার মতো। শখ মিটে গেছে। এখন নিজেদের রান্না করা খাবার খাই। পাঁচ টাকার মধ্যে হয়ে যায়।' একটু থেমে বললেন, 'ভালো হলে মাস চারেকের মধ্যে ছবি দুটোর কাজ শেষ করে মাস ছয়েক শুধু বিশ্রাম নেব, কলকাতার বাইরে আমার স্ত্রীর কর্মস্থলে।' আমি কী প্রশ্ন করতে পারি এরকম ক্ষেত্রে, কী উত্তর দিতে পারি— এ সময় নীরবতাই সবচেয়ে বান্ধব। হঠাৎ মনে পড়ল তখন শেষ বিকেলে, পশ্চিমের আকাশ বহুরঙা ; ডোবার আগে সূর্য এত রঙ ছড়ায়।

এর কয়েকদিন বাদেই ঋত্বিক ঘটক মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন পার্কসার্কাসের একটি ছোটো হাসপাতালে। ছোটো হাসপাতাল, ভালো পরিবেশ। পরিচিত ডাক্তার। বেশ আশাপ্রদ পরিস্থিতি, একটা কবিতার ছন্দে মিলে যাওয়ার মতো। তৃতীয় দিন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার নেওয়ার শেষদিন সকাল সাড়ে আটটায় ঘরে ঢুকলাম, প্রথম প্রশ্ন করলাম নটায়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কৌতূহল মেটাতে হল, এই সময়। টেপ রেকর্ড করলাম সময় বাঁচাবার জন্যে।]

বসু : আপনি যে দুটি ছবি করছেন তাতে special কোন obstruction এসেছে কি?

ঘটক : obstruction তো সব ছবিতেই আছে। without obstruction কোনো ছবি কোনোদিন হয় নি। তিতাসে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম আর এটাও editing-এর মাঝখানে অসুস্থ হওয়াতে এটা গেল পিছিয়ে। So both of them are suffering.

বসু : আমি বলছিলাম যে, যে-ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে আপনার ছবি দুটো তৈরি হয়েছে তা কি satisfactory ?

ঘটক : কলকাতার ছবি সম্পর্কে— মানে যেটুকু হয়েছে— পরিপূর্ণভাবে satisfactory কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারছি না ঢাকার ছবি সম্পর্কে। ঢাকার ছবি শেষে কী দাঁড়িয়েছে সে দেখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। আমি তখন হাসপাতালে। কাজেই তারা কী করেছে শেষ অবধি সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। I am not sure. আমার নিজের ধারণা তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু generally speaking এতই নিম্নস্তরের ঢাকার ছবি যে তার দ্বারা influenced হয়ে আমি যে মহৎ ছবি করার চেষ্টা করেছিলাম সেটা একটা cheap ছবিতে পরিণত হওয়া খুব

সোজা। কাজেই ছবি আমি না দেখে কিছু বলতে পারব না।

বসু : আচ্ছা direction তো আপনি দিয়েছেন...

ঘটক : Last shot নেওয়া হল দেওয়া হল বালির মধ্যে বেলা দুটোর সময়, তপ্ত বালির মধ্যে আমার হিরোইন মারা গেল। সেই পাঁচটা নিলাম। ছবির last shot ; সঙ্গে সঙ্গে বালির মধ্যে অজ্ঞান হলে গেলাম।

বসু : তার মানে ছবির তখন shooting complete...

ঘটক : Shooting comple.

বসু : শুধু technical side-টা ওদের ওপর আছে...

ঘটক : Technical side-টা কী মশায়। Film is not built, film is made. আমি চিত্রপরিচালক নই, আমি চিত্রস্রষ্টা। চিত্র সৃষ্টি করে একজন— সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন— চিত্র সৃষ্টি করে, তারা চিত্রপরিচালক নন। অত্যন্ত ভুল এবং বাজে কথা আপনারা লেখেন। একজন সৃষ্টি করেন। একজন প্রণয়ন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শকুন্তলা প্রণয়ন করেছিলেন, তিনি (তার) লেখক নন।

বসু : তার মানে হচ্ছে editing ইত্যাদি...

ঘটক : সেটাই হচ্ছে আসল প্রাণ।

বসু : সেটা ওদের ওপরে করার ভার আছে?

ঘটক : তবে আমি বলছি কী? (অসুস্থ হয়ে) বিছানায় শুয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি এর পরে এই করো, এর পরে এই করো। Rush-ও আমি দেখি নি ছবিব শেষের দিকের। কিন্তু কলকাতার ছবিটা সম্পর্কে এইজন্য আমি একমত যে এর দশ আনা অংশের বেশি হয়ে গেছে। যতখানি হয়েছে ততখানি আমার নিজের পবিযার তত্ত্বাবসানে, নিজে হাতে আমি কেটেছি, নিজে হাতে আমি কাটাছি কাটব। কাজেই এখানে সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের কব্জার মধ্যে ওখানে জিনিসটা আমাব কব্জার মধ্যেই নয়। এখানে যা অসুবিধে তা হচ্ছে যে ওখানকার ছবিটাব জন্যে দেরি, তার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে দেরি, plus টাকাকড়ির গণ্ডগোল আমার কিছু। দেখুন মশায়, একশোটা মেয়ের বিয়ে দিতে যা খাটতে হয় একটা ছবি করতে সেই খাটনি পড়ে। বাধা আসবেই। বিপত্তি আসবেই, গণ্ডগোল হবেই। আপনরা সব ইতিহাস জানেন যে মারধোর না খেলে ছবি শেষ হয় না।

বসু : বাংলাদেশের ছবিটা আপনি সুস্থ হওয়া অবধি বন্ধ রাখা যায় না? editing বা অন্যান্য কাজ?

ঘটক : তাঁরা আসেন নি। ওঁদের একটা অসুবিধে আছে ওঁদের Foreign Exchange-এর ব্যাপার আছে— এটা বিদেশী ব্যাপার তো! ঢাকাটা একটা বিদেশ। আমি তাদের বলে এসেছিলাম এবং তারা promise করেছিল যে edit করতে হবে আমাকে। টাকা আমার চাই নে। তবে সেটা কলকাতায়.ছাড়া হবে না, print কলকাতায় করতে হবে, ঢাকার কাজের চেয়ে কলকাতার কাজ অনেক ভালো ভালো মানে দুটোব মধ্যে তুলনা হয় না। তাতে তারা বলেছে তাই করব। চেষ্টা করব। এই অবধি হয়ে আছে। তারপর তারা কোনো যোগাযোগ করে নি। তারা বোধহয় ভাবছে যে তাদের

তো ওখানে এখন season off, প্রতিদিন সন্ধেবেলা ঝড়বৃষ্টি হয়। কাজেই সেখানে হল্-এ লোক যায় না। ওরাও পুজোর জন্যে wait করছে। আর আমারও হাসপাতাল থেকে না। বেরিয়ে কোনো কথা বলার উপায় নেই। কাজেই তিন-চার মাসের আগে কিছু হচ্ছে না।

বসু : আপানার মতে FFC-র লোন দেওয়ার নীতিটা কী হওয়া উচিত? অর্থাৎ নতুন পরিচালকেরা পাবে, না পুরোনো পরিচালকেরা যারা ভালো ছবি করার টাকা পাচ্ছেন?

ঘটক : মণি কাউল ছবি করেছেন, ছবিটা ভালো হয়েছে এবং সম্মান পেয়েছে। তাঁকে FFC টাকা না দিলে তিনি ছবি করতে পারতেন না। মৃণাল সেন নতুন ছেলে নন, কিন্তু মৃণাল সেন যদি FFC-র টাকা না পেতেন তাঁর 'ভুবন সোম' হত না। বেদী পুরোনো লোক, 'দস্তক' ছবি তিনি করতে পারতেন না যদি FFC টাকা না দিত। সুতরাং নতুন director পুরোনো director এ-সব foolish কথাবার্তা।

বসু : সুতরাং বড়ো কথা হচ্ছে...

ঘটক : বড়ো কথা হচ্ছে ভালো ছবি জন্যে যাকে দেওয়া উচিত তাকেই দেওয়া উচিত।— পুরোনো director যদি ভালো script নিয়ে হাজির হয় নতুন director যদি ভালো script নিয়ে হাজির হয়। এখানে পুরোনো-নতুনের কোনো ব্যাপারই নয়— ব্যাপার হচ্ছে এ দেশে ভালো ছবির একটা আন্দোলন, একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া।

বসু : আচ্ছা, যে ভাবে আমাদের বাংলাদেশে ছবি distribute করা হচ্ছে না বা produce করা হচ্ছে তাতে কী উন্নতি করা যেতে পারে। এটা ঠিক কি?

ঘটক : এটা খুবই বেঠিক। কিন্তু এই বেঠিকটাকে আস্তে আস্তে ঠিক করার চেষ্টা চলছে। নানা রকম হচ্ছে-টচ্ছে, জানি না তার ফল কী দাঁড়াবে। distributor কেউ না, আসলে ছবি control করে exhibitor-রা। চার-পাঁচ বছর আগেও এরাই ছিল কর্তা। এরা বলত যে বাব্বা ফিল্মে টাকা দেব? এরা প্রথম টাকা পেত। কাঁচা টাকা। টাকা না পেলে লোকে ঢুকতে পেত না। কিন্তু ফিল্ম ব্যাবসায় টাকা দেব না। আমাদের industry-টা ছিল একটা চৌবাচ্চা, তার তলে ছ্যাঁদা। যত টাকাই ঢালুন-না তলার ছ্যাঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে যায়। সুইজারল্যাণ্ডে ছেলের জন্যে বাড়ি করবে— বাবু,— হলের মালিক, ফিল্মে টাকা দেব? ওরে বাবা, মরে যাব না? তো এই যদি attitude হয় তারা যদি কব্জা করে সব রক্তটা চুষে নেয়, ফিল্মের glamour-এ যত রাজ্যের মেয়েছেলের গায়ে গা ঘষব এই তাল ক'রে মাড়য়ারি আসে, এসে heavy টাকা গচ্চা দিয়ে পালায়— এই করে একটা ভালো industry, একটা ভদ্র জায়গা হতে পারে না। হয়ও নি। (এ হল) আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত। এখন ব্যাটারা বুঝেছে যে এ যা তারা করছে এটা suicide। এতে আমরাই মরব। এখন State Govt. কী সব করছে-টরছে...

বসু : Film Development Board...

ঘটক : কী সব করছে-টরছে। কী হতে কী হবে আমি জানি না। আমি back dated ও-সব খবর আমি ভালো রাখি না।

বসু : বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

ঘটক : খুব ভালো।

বসু : Artistically ?

ঘটক : খুব ভালো। এটা হচ্ছে ধাক্কার ব্যাপার। আবার বলছি ধাক্কার ব্যাপার। এখন যা দেখছি তাতে হতাশর শেষ চূড়ান্ত। কিন্তু হতাশ হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। চার-পাঁচটা ভালো ছবি যদি বাংলাদেশ থেকে বেরোয় তা হলে নতুন ছেলেদের মধ্যে অনেকেই আছে, আমি যাদের জানি, তারা সাহস করে এগোবে। FFC যযি তাদের সাহায্য করে এবং যদি তারা তার উপযুক্ত হয়— হবেই ; আমার হতাশার কোনো কারণ নেই।

বসু : হিন্দি ছবি করাটা better ?

ঘটক : সবসময়। ভাষার একটা নিজস্ব ধ্বনি-মূল্য, সুরু (থাকে) একটা গ্রামের মহিলা তার ছেলেকে ডাকল, এ দইয়া দইয়া রে— এই যে সুর এই সুরে বাঙালি মা ছেলেকে ডাকবে না। এ সুরটা হচ্ছে ছবির প্রাণ— জমির থেকে শব্দটা আসছে, এ শব্দটা আপনি প্রত্যেক গ্রামে শুনেছেন। ধ্বনিমূল্যের একটা বিরাট প্রয়োজন আছে। আপনি হিন্দি ছবি করছেন তা বলে যে হিন্দুস্তানি হতে হবে তার কোনো কথা নেই; সঙ্গে একজনকে থাকতে হবে... আমি যদি হিন্দি ছবি করি, সঙ্গে নিশ্চয়ই শিক্ষিত এবং ছবির সঙ্গে অবহিত, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে ধ্বনিমূল্য সম্পর্কে অবহিত— এমন কাউকে সঙ্গে নেব।

বসু : সাধারণভাবে বাংলা ছবির এখন যে artistic standard সেটা...

ঘটক : এখন খুব নিচু স্তরের।

বসু : সেটাকে improve করার জন্য কী করা উচিত?

ঘটক : FFC-ই এখন রাস্তা আর এই Film Dev. Board।

বসু : FFC-র লোন তো সকলে পাচ্ছে না...

ঘটক : পাচ্ছে না তো যারা পাচ্ছে না তারা deserve করে না। Tom Dick and Hary পাবে এমন কোনো কথা নেই। Film Dev. Board যদি সেভাবে টাকা যাকে-তাকে দেয় তা হলে দুদিনে তো লাটে উঠে যাবে। পাচ্ছে না মানে কী। পৃথিবীতে সব্বাই হয় না। একলক্ষের মধ্যে একজন artist।

বসু : আচ্ছা আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছে— আপনি বলছেন বাংলা ছবির ভবিষ্য ভালো— কিন্তু আপনারা দু-তিনজন ছাড়া— নতুন কেউ তো হচ্ছেই না।

ঘটক : হচ্ছে না। কারণ তাদেরকে আপনারা চেনেন না। আমি জানি India Lab-এ ঘুরে বেড়ায় অন্তত আট-দশটি ছেলে যারা কাজ পায় না। তাদের মধ্যে অন্তত দু-তিনজন brilliant-script নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু কোথায় করতে হবে কীভাবে করতে হবে— এক ; দু নম্বর হচ্ছে যে সাহস নেই। আশাবাদী কোন্ দিক থেকে আমি? আমরা যে দু-তিন জন— আমরা যদি সাহস আনতে পারি। লড়াই করতে হয়, কিন্তু শেষ অবধি যদি জেতা যায় এবং সত্যি সত্যি ভালো ছবি হয়— পয়সাও পাওয়া যায়। ওদের আসল কথা আমার প্রতি ছবি, জীবনের সেই ছবির জন্যে ভয়।

বসু : ভয় করলে কী হবে?

ঘটক : ভয়টা ভাঙবে কে? leader ? আবে মশায় ভয় আপনি করছেন না। করুন-না ছবি? এ-সব পত্রিকা করছেন কেন? ভয় ও-সব থাকে। career-এর প্রথম ছবি করব তারপর এমন মার খাব যে শালা পথের ভিখিরি হয়ে মুখে ফেনা উঠে রাস্তায় পাগল হয়ে মারা যাব— বৌ বাচ্চা নিয়ে টিবি হয়ে— এ তো কেউ চায় না। এইখানে FFC বা Film Dev. Board যদি বুদ্ধিমানের মতো সৎভাবে ভালোবেসে— যেটা FFc করছে এটা কলকাতায় যদি করে— কেন হবে না? আশাবাদী না তো কি আমি? আমি তো আশাবাদী। কথা হচ্ছে সততা থাকা চাই, যারা দিচ্ছে তাদের ভেতর। পাঁচিশ লাখ টাকা বলে খালাস হলে তো হবে না।

বসু : talent আমাদের আছে...

ঘটক : আছে। ব্যাপার হচ্ছে leadership-এর অভাব।

বসু : সুস্থ হওয়ার পর আপনার plan কী? এই ছবি দুটো শেষ হলে নতুন ছবি?

ঘটক : ছবি তো নিশ্চয়ই করতে হবে, ছবি না করলে খাব কী? তিন-চার মাসের মতো একটা অবস্থা হবে এ দুটো ছবি release করলে। তারপর পেটের দায়ের আবার আসব কাজের চেষ্টায়। Ultimately money matters, nothing else matters. আমরা কাগজকলমের ব্যাপারেতে নেই— বিদেশি পবিচালকের কথা যে কাগজ-কলের মতো সস্তা (যখন হবে)— ওসব ফাজলামির কথাবার্তা বলে তো কোনো লাভ নেই। আমার বাংলা ছবি করতে গেলে আড়াই লাখ খরচ হয়— হিন্দি ছবি করতে গেলে পাঁচ লাখ টাকা minimum। আমার পাঁচটা পয়সা নেই। পকেটে শালা একটা বিড়ি খাওয়ার পয়সা নেই তা আমি কোত্থেকে টাকা পাব। কাজেই পয়সা অর্থ এ-সব লাগে। এগুলো avod করে ওসব পাকামি করে— (লাভ নেই)। কাগজ-কলমের ব্যাপার নয়, এক টাকা দুটাকা দিয়ে invest করলেই হয়ে গেল!

বসু : এ তো গেল সিনেমা সম্পর্কে। এখন কেমন মনে হচ্ছে, এখন তো সুস্থ? মনের দিক থেকে কীরকম মনে হচ্ছে।

ঘটক : মনে আমি খুব সুস্থ।

বসু : Script লিখছেন?

ঘটক : 'তিতাসে'র script-টা revise করলাম পুরো।

বসু : আরো পাঁচ-ছ দিন বাকি আছে?

ঘটক : না। দিন দশেক।

বসু। এখানকার পরিবেশ ভালো। personal care আছে।

ঘটক : personal care আছে। Homely— এখানে তিনজন আছেন, বন্ধুত্ব করে থাকা যায়। ওখানে যা অবস্থা দেখছেন তো আপনি।

বসু : Dr. Banerjee বলছিলেন যে করে হোক সুস্থ করে তুলবই। আর অনেক improve-ও করেছেন।

ঘটক : না, আমি মনের দিক দিয়ে সুস্থ আছি, স্ফূর্তিতে আছি, দেহের দিক থেকেও মোটামুটিভাবে সুস্থ আছি।— এরা অনেকখানি আমাকে সারিয়ে তুলেছে।

প্রসঙ্গ : 'তিতাস' ও অন্যান্য

ট. দ. : প্রায় এক যুগ কোনো ছবি না করে চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের প্রযোজক ডাকামাত্র ছবি করা শুরু করলেন, এটার আসল কারণ নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ওপর আপনার বিশেষ দুর্বলতা?

ঋ. ঘ. : প্রথমেই বলি বাংলাদেশ কথাটাই আমার কাছে খুব খটকাজনক; এখনও ঠিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংজ্ঞা আমার অস্থি-মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। এখন পর্যন্ত আমি ও কথাটাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানেতেই বুঝে থাকি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়ীগঙ্গা, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, তিস্তা, সুরমা ও তিতাস-অধ্যুষিত বাংলার এই ভূভাগ আমাকে আকর্ষণ করে, তাই এই ছবি করার প্রস্তাব একজন হটেনটট্ অথবা জুলুর কাছ থেকে এলেও সমানভাবে গ্রহণ করতাম।

ট.দ. : কলকাতায় ছবি করা আর বাংলাদেশে ছবি করার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার পার্থক্য কী?

ঋ.ঘ. : কলকাতা থেকে এখানকার যন্ত্রপাতি উন্নত তো নিশ্চয়ই। এ ছাড়া এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে সুবিধে-অসুবিধে ব্যাপারটা সব ছবিতেই থাকে। কোথাও বেশি কোথাও বা একটু কম, যে-ধরনের অসুবিধে হওয়ার কথা তার থেকে কিছু কমই হয়েছে বলে আমার ধারণা। তবে যেটুকু হয়েছে সেটা যে-কোনো ছবির পক্ষেই যথেষ্ট ক্ষতিকর— কারণ এমন একটা দেশে এমন একটা সময়ে ও এমন একটা বিষয় নিয়ে আরম্ভ করা গিয়েছিল যেটা এখন অভিজ্ঞতার পুঁজি হবার পর ভাবলে মনে হয় হাড়িকাঠে বলির পাঁঠার মতো মাথা গলিয়ে দিয়েছিলাম। এ-ছবি এ-দেশে এখন আরম্ভ করে হয় এক উম্মাদ, নয় একটি গর্দভ— যার দুটোই আমি।

ট. দ : 'তিতাস' করার কারণ কী?

ঋ. ঘ. : 'তিতাস' পূর্ববাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দু বাংলাতেই) এইরকম লেখা দেখা পাওয়া যায় নি। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সংগীতের টুকরো ; সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়, আমার মনে হয়েছিল, তাই এটা করছি। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল, সুযোগ পেয়েছি, ধরেছি।

ট. দ. : জনপ্রিয় শিল্পী অথবা ছবিতে নতুন মুখ নেওয়া বা না নেওয়ার মধ্যে আপনার মতামত কী?

ঋ.ঘ. : জনপ্রিয় বা নতুন মুখ, এ-সব ব্যাপারে আমি কোনোকালেই সংকীর্ণ মনোভাব পরিপোষণ করি না। আমি প্রয়োজনানুসারে প্রথম থেকে জনপ্রিয় শিল্পী ব্যবহার করে আসছি এবং শেষ পর্যন্ত করেও যাব, তবে নামী-দামী হিসাবে নয় ; উপযুক্ত শিল্পী হিসেবেই।

আমি তথাকথিত কোনো তত্ত্বে বিশ্বাসী নই, কারণ আমি বিশ্বাস করি শেষ পর্যন্ত

বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কতকগুলো ক্রীড়নক মাত্র, আমরা আমাদের ছবির ভাষায় শুটিং-ঘরের দেওয়াল, চেয়ার, টেবিল, আয়না এগুলোকে সেট্-প্রপার্টিজ্ বলে থাকি ; অর্থাৎ নিশ্চল নির্বাক সম্পত্তি, এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও আমার কাছে কেবল চলমান সবাক প্রপার্টিজ্। এর অধিক সম্মান দিতে আমি প্রস্তুত নই। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সময়ে তেমন প্রতিভাও আসে, যদিও তা আসে খুবই কদাচিৎ।

ট. দ. : বহুজনের মুখে শুনে থাকি যে ঋত্বিক এখন শেষ, ওঁর দ্বারা আর ছবিটবি হবে না এবং ছবি শুরু করলেও শেষ হবে না, হতে পারে না। আপনাকে নিয়ে কেন এত বিরূপ মন্তব্য? এত আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক?

ঋ.ঘ. : লোকে যখন বলে থাকে তখন ঘটনাটা সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে সত্য। আমার ছবি আরম্ভ করা ও না করার কারণ বোধহয় বহুবিধ। প্রথমত আমার বদমায়েসি। কেন জানি না কাজ আরম্ভ করে ফাজলামি করাব একটা ইচ্ছা জাগরূক হয়। এ যেন সেই রবি ঠাকুরের ছেলেটির বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 'দেখিই না কী হয়', এই ধাঁচের একটা মনোভাব আর কি!

নিজের এবং আশপাশের লোকদের বারোটা বাজিয়ে কতখানি মজা পাওয়া যায় তা দেখা। দ্বিতীয় আমার বিচিত্র মদ্যপ্রিয়তা। কেন জানি আমার কাছে মনে হয় সর্বমার্গের শেষ-মার্গ হচ্ছে মদ ; বেড়ে জমে, অন্তত আমার কাছে। তৃতীয়ত, এই ফিল্মের ব্যবসাদার জাতটা আদ্যন্ত শুয়োরের বাচ্চায় ভর্তি। এদের আগা-পাছতলা শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে লোহিতবর্ণ করতে পারলে কিছু একটা কাজের কাজ হত।

এই ব্যক্তিরা পরের ছিদ্রান্বেষী। এঁরা পরের ক্ষতি করতে পেরে যে তুরীয় আনন্দ উপভোগ করেন তা কেবল সপ্তম-স্বর্গেই সম্ভবপর। সোজা কথা সহজভাবে শোনা ও বলার ক্ষমতা, সৎসাহস বোধ হয় এইবি প্রাগ্-মানবদের নেই। প্রধানত আমি বোধহয় ছবির জগতে কোনোদিন জোচ্চুরি করিনি— জীবনে বহু করেছি। ওটা মনে হয় এ বাজারে জমে না, উলটোটা জমে।

ট. দ. : আপিনি কি জানেন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ভেতর ও পাইরে আপনার অনেক গুণগ্রাহী আছেন যাঁরা আপনি ছবির জগৎ থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে, ক্ষোভে, দুঃখে ও অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে আপনার ওপর গুমরোচ্ছেন?

ঋ.ঘ. : জানি, আর তাই ওদের এই ভালোবাসাকে কবর দিতে পারলাম না বলেই আবার ছবি করছি। নইলে ছবি বোঝে ক-ব্যাটা! বেশির ভাগই তো ড্যাব্-ড্যাব্ করে দ্যাখে, সব ছবি ড্যাব্-ড্যাব্ করে দেখলেই কি হয়, সূক্ষ্মবোধযুক্ত মন নিয়ে দেখবার সেরকম তৈরি হওয়া সমঝদার দর্শক চাই। আর সেই তৈরি-দর্শকের অভাব যেদিন পূরণ হবে সেদিন কি ঋত্বিক ঘটক নামক এই মিঞা থাকবে।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : মারি সীটন তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন, আপনি হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের 'বিদ্রোহী শিশু'। তাঁর ধারণায় আপনার অতিরিক্ত মননশীলতা আপনার নিজের কিংবা আপনার চলচ্চিত্রের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কী?

উত্তর : এ সম্বন্ধে আমার কোনো মতামত নেই। কারণ বিদ্রোহী শিশুটা তো বাংলা করা হয়েছে। ওটা আসলে 'infant terrible'। এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দই নেই। আর ওটা লিখেছিল 'অযান্ত্রিক'-এর সময়। 'অযান্ত্রিক' হচ্ছে ১৯৫৭-৫৮ সালের ছবি। আজকে চুয়াত্তরে তার উত্তর দেবার তো কোনো মানে হয় না। আমার কোনো কিছু বলার নেই। একজন সমালোচক আমার সম্বন্ধে কী বলেছে তা দিয়ে আমি কী করব।

প্রশ্ন : শিল্পাঙ্গনের কতকগুলি মাধ্যম পেরিয়ে আপনি চলচ্চিত্রে এসেছেন। যেমন প্রথম জীবনে কবি ও গল্পকার, তারপর নাট্যকার-নাট্যপরিচালক ইত্যাদি এবং অবশেষে চলচ্চিত্রকার। শিল্পমাধ্যমের প্রতি অগাধ মমত্ববোধই সাধারণত শিল্পীকে তাঁর ভালোলাগা মাধ্যমের প্রতি টেনে আনে। আপনি 'চিত্রবীক্ষণ'-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, '...যদি কাল চলচ্চিত্রের চেয়ে better Medium বেরোয় তা হলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। আমি সিনেমার প্রেমে পড়ি নি... I don't love film...।' এইসব কথায় মাধ্যমটির প্রতি আপনার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় না কি?

উত্তর : একেবারেই পায় না। মাধ্যমটা কোনো প্রশ্নই না। আমার কাছে মাধ্যমের কোনো মূল্য নেই। আমার কাছে বক্তব্যের মূল্য আছে। আমি কেন এ-সমস্ত মাধ্যম Change করেছি, বদলেছি? কারণ বক্তব্যটা মানবদরদী! বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোনো কাজেরই কথা না। ও সমস্ত যাঁরা নন্দনতাত্ত্বিক তাঁরা করুন গিয়ে। Art for Art's sake যাঁরা করেন তাঁরা করুন গিয়ে। All art expressions should be geared towards the betterment of man— for man, আমি গল্প লিখেছিলাম, তখন দেখলাম গল্পেতে কাজ হচ্ছে না। কটা লোক পড়ছে? নাটকে immediate hit— আরো বেশি লোককে convert করা যায়। I am out to convert. তারপর দেখলাম নাটকের থেকেও ভালো কাজ হচ্ছে সিনেমায়। অনেক বেশি লোককে approach করা এবং convert করা যায় এতে। So cinema is important, cinema as such এমন কোনো value নেই। I don't think it has any value. এবং যারা এ সমস্ত কথা বলে তারা সিনেমাকে ভালোবাসে না, নিজেকে ভালোবাসে। এজনাই কাল যদি একটা better medium পাই তা হলে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এখন পর্যন্ত আর medium কোথায়! আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত জনতার কাছে পৌঁছতে পারে এমন medium হচ্ছে cinema। কালকে TV হতে পারে। এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে সিনেমাই সবচেয়ে বেশি লোককে at the same

time reach করতে পারে। কাজেই আমার বক্তব্যের হাতিয়ার হিসাবে একেই বেছে নিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনাদের চলচ্চিত্রে আগমন— অর্থাৎ আপনি, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, রাজেন তরফদার এঁরা সাধারণত ইতালির 'নিও রিয়ালিজম' দ্বারা অনুপ্রাণিত। যুদ্ধ-পরবর্তী ইতালিতে চলচ্চিত্রে যে বিপুল শৈল্পিক উৎকর্ষতা তদ্দ্বারা আমার মনে হয় কমবেশি সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের শেষভাগে এবং ষাটের দশকে ফরাসি দেশে যে, 'নবতরঙ্গ-চলচ্চিত্র-আন্দোলন' সংঘটিত হয়েছিল সে আন্দোলনের ধারা কি আপনাকে আলোড়িত করেছিল? ফরাসি 'নবতরঙ্গ' এবং নবতরঙ্গ গোষ্ঠীর অন্যতম চলচ্চিত্রকার জঁ লুক গদার সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন।

উত্তর : প্রথম কথা হচ্ছে যে মৃণালবাবু একদিক দিয়ে এসেছেন, সত্যজিৎবাবু একদিক দিয়ে এসেছেন, আর আমি আর-একদিন দিয়ে এসেছি। এটা কোনো একটা আন্দোলন— সংঘবদ্ধ আন্দোলন থেকে আসে নি। যেমন সত্যজিৎবাবু ছবি সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। রেনোয়া সাহেব যখন এলেন ছবি করতে তখন তাঁর সঙ্গে থেকে তিনি highly influenced হলে। রেনোয়াই তাঁর গুরু। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন। নিও-রিয়ালিজমটা তার পরে। আমি সম্পূর্ণরূপে আইজেনস্টাইনের বই পড়ে influenced হয়ে ছবিতে আসি। ১৯৫২-তে Flim Festival-এ যে neo-realistic ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল সেগুলো আমাদের definitely খুব মোহিত করেছিল, কিন্তু কাকে influence করেছিল আমি ঠিক বলতে পারি না। কেননা সত্যজিৎবাবু ছবিতে রেনোয়া সাহেবের লিরিসিজম এবং ফ্লাহার্টির লিরিসিজম— নেচার লাভ এই থেকে তার আরম্ভ। আমার ছবিতে কারোই বোধ হয় না। যদি থাকে আইজেনস্টাইনের আছে। কেননা neo-realistic ছবি আমার 'অযান্ত্রিক' একদমই না। 'নাগরিক' -ও না। 'অযান্ত্রিক' কমপ্লিটলি একটা Fantastic Realism। একটা Car—। একটা গাড়ি— without any trick shot ওটাকে animate করা হয়েছে। She is the heroine, আর Driver হচ্ছে হিরো। Whole গল্পটা একটা ড্রাইভার আর তার গাড়ি। আর কিছু নেই। এটার সঙ্গে neorealism-এর সম্পর্ক কী? ওটাকে সম্পূর্ণরূপে fantastic realism বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি এবং সে সময় ওটা খুব Powerful ছিল। এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের খুব ভালো লেগেছিল। Unconsciously হয়তো খানিকটা— সেই যেমন সারা পৃথিবীর ছবি দেখলেই হয়ে থাকে, যেমন জাপানি ছবি দেখেও হয়েছে।

প্রশ্ন : না, আপনাদের চলচ্চিত্র সৃষ্টির পরপরই ভাবতে Subjective Realism-এর যুগ শুরু হয় বলে বলা হয়েছে। এজন্যেই আমি এই প্রশ্নটা করেছিলাম।

উত্তর : হ্যাঁ, এরকম অনেক কিছুই বলা হয়ে থাকে। এ সমস্ত lebelling-এর কোন মূল্য নেই। ওই lebel-গুলো lebel-ই। ওগুলো কোনো কাজেরই না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথে চলেছে। আর ঐ ফরাসি 'নিউ-ওয়েভ' আমি একেবারে পছন্দ করি না, ওটা একটা stunt আমার মতে।

প্রশ্ন : আমরা 'নিউ-ওয়েভ' এর কিছু ছবি দেখেছি, যেমন ত্রুফোর 'ফোর হান্ড্রেড

ব্রোজ' কিংবা গদরের 'ব্রেথলেস'। এগুলো দেখে মনে হয়েছে যে এটা একটা আন্দোলনের ফসল।

উত্তর : 'ফোর হান্ড্রেজ ব্রোজ'। ওটা-ওয়েভই না। তবে খুব ভালো ছবি। আর 'ব্রেথলেস' আমি দেখি নি, ওদের যেটা দারুণ 'নিউওয়েভ', রেনের 'লাস্ট ইয়ার অ্যাট মারিয়ানবাদ,' ওটা একেবারে completely existentialist ছবি। 'নিউ ওয়েভ'টা কী? লেবেলিং-এর ব্যাপারগুলো কাটো তোমরা পথের থেকে। তোমরা নতুন করে ছবি ভালোবাসতে এসেছ। এই লেবেলগুলো হচ্ছে অত্যন্ত false-critic-দের তৈরি। লেবেলিং বলে কিছু নেই। একটা অবস্থা থেকে একটা পটভূমি থেকে এখন তোমাদের ঢাকায় নতুন ছবি শুরু হবে। তোমাদের এখানকার শিল্পীরা পৃথিবীর ছবি দেখে তার থেকে influenced হবে যেমন, তেমনি এদেশে ইতিহাসের যে পটভূমি, তাদের suffering-sorrow-র যে পটভূমি— তা থাকতে বাধ্য। তার থেকে নাম লেবেল করার দরকার কী? এক-একজন এক এক দিক থেকে করবে। I don't believe in names.

প্রশ্ন : বেশ, আপনি গদারের ছবি সম্পর্কেই কিছু বলুন।

উত্তর : গদার কি new wave নাকি? Godard is an utter communist film maker এবং একেবারে bold। He believes in street-fight from the street— এই তো বক্তব্য তাঁর। সে 'নিউ ওয়েভ' মোটেই না। আর সেও বদলাচ্ছে তো। তাঁর last statement-গুলো কী? ত্রুফোর সাথে গদারের কোথায় মিল? আলী রেনের সাথে হব্ব গ্রিয়ের কোথায় মিল?

প্রশ্ন : ফর্ম-এর দিক থেকে কিছু মিল থাকতে পারে।

উত্তর : তা হলে তো সব ছবিতেই কিছু কিছু মিল পাওয়া যাবে। ফর্ম-টর্ম কিছু একটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে Content— Approach তার থেকে Expressionটা আসে। For-টা শুধু expression-এর জন্য। যেমন গদার completely একজন Working communist। যে ভেবেছিল গল্পের কোনো value নেই। এই ছিল তাঁর stand। এখন সে বলছে, যে, না গল্পের দরকার আছে। এখন he has changed, লোকে অভিজ্ঞতা থেকে নিজের ছবি দেখে, পৃথিবী দেখে। তার ছবি দেখে অন্যের reaction দেখে আস্তে আস্তে বদলায়। যে আমি 'অযান্ত্রিক' করেছিলাম, সে আমি কি আছি? সত্যজিৎবাবুর 'সীমাবদ্ধে'র সাথে 'পথের পাঁচালী'র কী মিল? 'অশনি সংকেত'-এর সাথে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটা শট-ফটে মিল থাকতে পারে, আর কী মিল?

প্রশ্ন : কোনো এক লেখায় বার্গম্যানকে আপনি নকলনবীশ বলে উল্লেখ করেছেন।

উত্তর : জোচ্চোর বলেছি।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন বার্গম্যান সব জিনিসকে খানিকটা ভাইকিংদের ফিলসফির সঙ্গে মিলিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন যাকে আপনি চমক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। আপনি 'তিতাস'-এর শুটিং চলাকালীন এক সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন বার্গম্যান হল শিল্পের জোচ্চোর। আপত্তি না থাকলে বার্গম্যান সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণাটা একটু বিশদভাবে বলুন।

উত্তর : বার্গমান সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। বার্গম্যানের দু-একটা ছবি ছাড়া আর সব ছবিই মধ্যযুগ, আদি মধ্যযুগ, ক্রুসেডের পিরিয়ড এবং তারও আগের পিরিয়ড— এগুলো নিয়েই সৃজিত হয়েছে। কেন হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে সুইডেন হচ্ছে one of the last countries to be christianised। সুইডেনে বিশেষ করে whole Scandinevia-তে Vikings philosophy যেমন সারাজ, হালহালা ইত্যাদি একটা খুব vigorous ব্যাপার ছিল। তার সঙ্গে লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে Conflictটাকে althrough refer back করে continuously। যেমন 'Virgin Spring', Virgin Spring-টা কী? আসলে ব্যাপাবটা হচ্ছে একটা চার্চ স্থাপন করে তার পিছনে একটা মিথ্যা গপ্পো তৈরি না করলে তো লোককে আর টানা যায় না। সেইজন্যেই গপ্পো ফাঁদা হয়েছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে raped হয়েছিল but she was so innocent যে সেখানে একটা spring grow করল, এবং সেখানে বিরাট করে Cathedral তৈরি শুরু হল। এখন এর পেছনে একটা গুল তৈরি করতে না পারলে তো পুরুতদের জমবে না। সেইজন্য একটা গুল তৈরি করা— সে মেয়ে হেন তেন— আসলে কিছুই না। আসলে হচ্ছে যে একটা emotional surcharge না করে তো আর Pagan philosophy-কে আনা যাবে না। লোকের মধ্যে ঐ জায়গায় একটা পীর, ওখানে একটা দরবেশ, এখানে একটা গুরুদেব— এই সমস্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে— উনি ছিলেন সেখানে, কাজেই এটা হয়েছে। এই যে গুল— এগুলো কী? What is this 'Seventh seal'? Terrific, জোচ্চোর বলেছি এজন্য— জোচ্চোর তো আর যাকে-তাকে বলা যায় না। জোচ্চোর কাকে বলবে, One of the supreme brain, one of the supreme technician, যে জেনেশুনে বদমাইশি করছে। গাধাদের কাছে থেকে তো এটা আশা করা যায় না— যে জোচ্চোরি করতেই জানে না। If he does not know the truth, he cannot cheat. So knowing fully well he is cheating. Do you follow me? সেইজন্যেই তাকে জোচ্চোর বলেছি।

প্রশ্ন : কিন্তু তাঁর কিছু কিছু ছবি যেমন ধরুন 'Soul' ব্যতিক্রমধর্মী মনে হয়।

উত্তর : Terrific ছবি। শুধু 'Soul' কেন, "The Face'ও Terrific ছবি। শেষটায় আমার মনে হয় যেন ego থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা আজকের agony-কে ধরার চেষ্টা আছে। 'Silence'ও তাই। তাই বলছি যে series of film যেমন 'Winter light,' 'Wild strawberries' christain philosophyর সেই ডাক্তার— সেই স্টিগমেটারের চিহ্ন, ক্রসের চিহ্ন, সিম্বল— সমস্ত কিছু Biblical। এই জিনিসগুলোকে I don't like।

প্রশ্ন : এটা তো social consciousness-এর ব্যাপার।

উত্তর : এখানে social consciousness কোথায়? Seventh Century কি Eighth Century-এর সাথে আজকের সুইডেন-এর কোনো সম্পর্ক আছে? social consciousness-এর মানে কী? একবার করলাম সেটা একটা কথা। তা করছে তো পাসোলিনি করে নি? 'Gospel according to St. Mathews' সম্পূর্ণ Biblical কিন্তু কী terrific ভাবে সেটা আজকের context-এ টেনেছে। কাকয়নিস-রাও তো ক্রিশ্চিয়ান myth-গুলো নিয়েই ছবি করেছেন এবং আজকের context-এ টেনে। কিন্তু এ-ব্যাটা

শুধু পেছনের দিকে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করছে। এঁরা ঐতিহ্যটাকে টেনে আজকের দিনের সঙ্গে তার মানে তৈরি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর এ ভদ্রলোক চেষ্টা করছেন আমাদের পিছনমুখী করতে। একই জিনিস— ওটা আমি কেন করব না? আমি করতে পারি— আমিও কি রামায়ণ-মহাভারতের গল্প করতে পারি না? করা মানে, আমি কি করব ওটাকে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মোটেই না। ওখান থেকে টেনে আমাদের ঐতিহ্যের অংশ আমাদের দেশের কাজেই তাকে আমার টানার সমস্ত অধিকার আছে। এদের সবাইকে আমি দেখিয়েছি আমার ছবিতে। আমি দেখাচ্ছি যে এই হচ্ছে ছবিটুকু।

প্রশ্ন : ওটা এক ধরনের exposition। কিন্তু আপনার নিজের একটা বক্তব্য থাকতে পারে তো?

উত্তর : সুইডেন-এর চলচ্চিত্রকার হিসেবে definitely অধিকার আছে করার। Crusades, প্রথম Christianity advent, pagan philosophy এগুলো সম্পূর্ণ ওর সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পত্তিটাকে তুমি কীভাবে ব্যবহার করছ? যেহেতু সে extremely powerful— One of the greatest film maker of the world। সে জন্যই ও- কথা বলা হয়েছে। একটা হেজি, পেজি, Tom, Dick and Harry-কে তো আর কেউ জোচ্চোর বলবে না। That fellow does not know, বুঝেছ?

প্রশ্ন : সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের তো বক্তব্য থাকতে পারে?

উত্তর : আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাজার বছর ধরে আমার চাষি বসে আছে। আর তোমরা নেচেকুঁদে যাচ্ছ। সকলে নচ্ছার। ছবি আরম্ভ হচ্চে এক বুড়োকে দিয়ে। আর কিছু নেই। শেষও হয়েছে সেই বুড়োকে দিয়ে। বুড়ো বসেই আছে। সে কাশছে। কী করবে? আর দাদারা সব করে খাচ্ছে। বাকতালা বাজিয়ে বড়ো বড়ো কথা, হ্যান ত্যান। সকলেই দেশের মুক্তি আন্দোলন পকেটে করে বসে আছে। কী করে মুক্তি আসবে? কী করে সব-কিছু হবে? সকলে জানে— সব ডাক্তার। সব গদির জন্য দৌড়াদৌড়ি করছে। এই তো বক্তব্য আমার। আমি এটা as a common citizen of India, who has gone through all these things, এর point of view থেকে দেখেছি। No political issues. আমার Universal গালাগালি। সেটা হল এইজন্য যে ওরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি জানি নে solution, আমার কাছে কোনো theory নেই।

প্রশ্ন : আপনার নিজের লেখা কাহিনী নিয়ে ছবি 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো'-কে সরাসরি পলিটিক্যাল ছবি বলতে চেয়েছেন। পলিটিক্যাল ছবির যদিও কোনো নির্ধারিত সংজ্ঞা নেই তথাপি আপনিও কি মৃণাল সেনের মতো কোনো বিশেষ একটি মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শ ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হবেন, না কি অন্য কিছু?

উত্তর : না, ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭০ সালে পশ্চিম বাঙলার যে রাজনৈতিক পটভূমি এবং সেটাকে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাতে কোনো মতবাদের ব্যাপার নেই। আমি সেটাকে দেখেছি from a point of view of not a politician. Political কোনো মতবাদকে যেমন

Naxalite মতবাদ আমার Please করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধীকে please করার কথা না, CPM-কে Please করার দরকার নেই, CPI-কেও please করার দরকার নেই— আমার থাকলেও ছবিতে আমি শ্লোগানে বিশ্বাস করি না। ওর থেকে যদি কিছু emrege করে, through situation, through conflict একটা কিছু যদি তোমাদের mind-এ আসে তো এলো। কিন্তু আমি এইটেই solution বলতে পারি না।

প্রশ্ন : অবশ্য এটা কোন ছবিতেই আপনি বলেন নি।

উত্তর : না, বলা যায় না। আমি তো মনে করি বলা উচিতও নয়। কিন্তু এগুলোকে ধরা উচিত, কারণ আমি চোখের 'পরে দুঃখের কটাক্ষ তো দেখছি।

প্রশ্ন : আপনার প্রায় সব ছবিতেই একটা Optimism লক্ষ করেছি। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত কী?

উত্তর : ও সমস্ত অপটিমিজম্-টপটিমিজম্ বুঝি না। মোদ্দা বাঙলা হচ্ছে— এই হচ্ছে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো। একে যদি তোমরা political বলো তো politicl, non-political বলো তো non-political. But no slogan, no partyবাজি। Universal Condemnation. আমার কিছু বক্তব্য নেই। I am not a political man, আমি politics করি না। কাজেই কোনো party করি না। কিন্তু চারপাশে আমি reality দেখেছি তো?

প্রশ্ন : আপনি কি কোনো 'ইজমে' বিশ্বাস করেন?

উত্তর : আমি কিসেতে বিশ্বাস করি সেটা আমার অন্য জায়গায়। As an artist আমি সেটাকে চাপাতে চাই না। আমি mainly present করতে চাই যে এই ব্যাপারগুলো হয়েছে। এখন তুমি decide করো।

প্রশ্ন : তার মানে আপনি কোনো ideology impose করতে চান না?

উত্তর : Automatically থাকবেই ভিতরে, কিন্তু সেটা সোচ্চার নয়। তোমরা 'সুবর্ণরেখা' দেখ নি? এতে ideology নেই? এতেও থাকবে।

প্রশ্ন : হ্যাঁ, দেখেছি। ভীষণ আশাবাদী ছবি।

উত্তর : আশাবাদ ছাড়াও ideology একটা definitely আছে। Analysis of the condition of the then West Bengal. তারপরে একটা comment আছে তো? এখানেও একটা comment থাকবে। আর সেই comment-টা দিয়ে আমি একটা slogan mongering বা ওই সমস্তের মধ্যে নেই।

প্রশ্ন : ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন যাদের টাকা দিচ্ছে আর যারা এফ. এফ. সি.-র টাকা পাচ্ছে না— এ নিয়ে দুটো গ্রুপ তৈরি হয়েছে। তাঁদের বক্তব্যও দু'রকম। এফ. এফ. সি.-র পক্ষপাতিত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্রকাররাই এফ. এফ. সি.-র অর্থসাহায্য পাচ্ছেন। নতুনরা যারা ভালো ছবি করতে চাইছে তারা তাদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে দেন-দরবার করতে করতে উৎসাহ ধৈর্য্য দুটোই হারিয়ে ফেলছে। এতে কি এফ. এফ. সি.-র দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পাচ্ছে না? তা হলে আর ভালো ছবি সৃষ্টিতে এফ. এফ সি.-র ভূমিকাটা রইল কোথায়?

উত্তর : FFC এ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে, আমি ঠিক exactly এর পরিসংখ্যানটা বলতে

পারব না, তবে জন্ম থেকে গোটা ষাটেক ছবি finance করেছে। তারমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলতে কি, আগে যাদের নাম ছিল এমন লোকের মধ্যে একমাত্র মৃণাল সেন এবং আমিই সাহায্য পেয়েছি। আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে কেউ পায় নি। আর অপ্রতিষ্ঠিত সব নতুন নতুন ছেলে তাদের মধ্যে more than 75% যারা ছবি করতে গিয়েছিল, টাকা মেরে পালিয়েছে। Straight টাকা মেরে হাওয়া হয়েছে। যেমন একজনের নাম বলছি অচলা সচদেব বলে একজন actress আছেন তার স্বামী জ্ঞান সচদেব। আড়াই লাখ টাকা advance নিয়ে বসে আছে। ফেরত দেওয়ার কোনো উপায় নেই। এইভাবে ছয়লাপ করছে ; আর তারা যে নতুন ছেলেদের টাকা দেয় নি তা না। আমারই student, Gold Medalist from Film Institute of poona— মণি কাউলের দু-দুটো ছবিকে finance করেছে এবং ওর দুটো ছবিরই যথেষ্ট নাম হয়েছে। He has established himself, not only that, এ বছরই ফ্রাঙ্কফুর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যে সেমিনাব হয় সেখানে Jury হয়ে সে গিয়েছে। এতকিছু সম্মান সে পাচ্ছে। কুমার সাহনীকেও FFC একটা ছবি করতে দিয়েছে। সে ছবিটা এখনো release হয় নি। কে বলেছে, নতুন ছেলেদের দেয় না? একজন দুজন এখানে-ওখানে তড়পে বেড়াচ্ছে। এখনকার মধ্যে আমি যতদূর জানি পূর্ণেন্দু পত্রীকে ওরা দেয় নি। সেজন্যই এতসব ব্যাপার। কিন্তু He is not a new director। সে 'স্বপ্ন নিয়ে' বলে একটা ছবি করেছিল। তারপর এখন 'স্ত্রীর পত্র' করেছে। কাজেই তাকে— You cannot say, he is a new one.

প্রশ্ন : কিন্তু তাঁর অভিযোগটা খুব বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

উত্তর : সেটা আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রুপ। Because he works in আনন্দবাজার। তারা ওটা নিয়ে নাচানাচি করেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের কিস্‌সু যায় আসে না।

প্রশ্ন : পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে ক'বছর ছিলেন? সেখানে শিক্ষক থাকাকালীন অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলুন।

উত্তর . এটা কে বলল, আমি ছিলাম মানে? পুনায় আমি Visiting professor হিসাবে দু'বছর জড়িত ছিলাম। প্রত্যেক দু'মাস পর পর যেতাম। দশদিন করে থাকতাম— চলে আসতাম। তারপর আমি Vice-Principal হিসাবে মাত্র তিনমাস ছিলাম। পুনায় আমায় অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমি মনে করি আমার জীবনে যে-কয়টা সামান্য ছবি করেছি সেগুলি যদি পাল্লার একদিকে দেওয়া হয় আর, মাস্টারিটা যদি আর-একদিকে দেওয়া হয় তবে ওজনে এটা অনেক বেশি হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রী আজকে উঠছে। I have contributed at least a little in their luck which is much more important than my own film making— আমি বলছি তো ওজনে ওটা অনেক বেশি।

প্রশ্ন : পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আপনার ছাত্রদের মধ্যে কুমার সাহনী 'মায়া দর্পণ' এবং মণি কাউল 'উসকী রোটী' ছবির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে আপনি দারুণ গর্বিত। পুনা থেকে পাস করা কে. কে. মহাজনও আপনার

ছাত্র যে এখন সবচাইতে প্রতিভাবান আলোকচিত্রী। আপনি শিক্ষক থাকাকালীন পশ্চিম বাঙলার কোনো ছাত্রছাত্রী কি পুনায় ছিল না যাদের প্রতিভা উপরোক্ত শিল্পীদের সাথে তুলনা করা চলে?

উত্তর : ছিল। বেশ কয়েকজন ছিল। ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে ধ্রুবজ্যোতি বসু ও সোমেন বলে দুটো ছিল এবং এরা দু'জনেই সুযোগ-সুবিধা পেলে মহাজনের থেকে খারাপ কাজ করবে না। ব্যাপার হচ্ছে ফিল্ম লাইনে ভালো কাজ জানলেই তো আর নাম করা যায় না। প্রতিযোগিতাও করা যায় না। মহাজন lucky যার ফলে সে একটা ভালো break পেয়ে গিয়েছে। এরা break এখনো পাচ্ছে না তাই ডকুমেন্টারি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদের কাজ খুব ভালো।

প্রশ্ন : দেশভাগ অর্থাৎ ভাঙা বাঙলার প্রতি আপনার যে মমত্ববোধ সেটা আপনার ছবির একটা বিশেষ দিক। অন্তত সে কারণেই আপনার বিষয়গত ভাবনা-সমন্বিত ট্রিলজি 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমলগান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আপনার মতে আমাদের এই ভাগ হয়ে যাওয়াটার কারণেই আজকের এই অর্থনৈতিক সংকট। স্বাভাবিকভাবে তাই আপনার ছবিতে কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও আলোচিত হয়। আপনি কী ভাবেন না ভাবেন সেটা বড়ো কথা নয়, আপনার ছবিটাই বলে দিচ্ছে এই হয়েছে বলে এরকম হচ্ছে, এটা না হলে হয়তো অন্যরকম হতো ইত্যাদি। বেশ বোঝা যায় আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যথাটা কোথায়। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আপনি সেরকম একটা ছবি করলেন না কেন? বিষয়বস্তুর দিক থেকে আপনি 'তিতাস'কে বেছে নিলেন কী কারণে? এ ছবিটা তো আরো পরে হতে পারত। কেননা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আপনার পূর্বেকার চিন্তা-ভাবনাগুলো আরো উন্নতভাবে প্রকাশ পেতে পারত।

উত্তর : যখন আমার তিতাস করার কথা আসে তখন এদেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে। এবং most unsettled। এখন যে খুব একটা স্বাধীন হয়েছে তা মনে হয় না। কিন্তু তবু তখন একেবারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না কী চেহরা নেবে। সব শিল্পই দু'রকমভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে খবরের কাগুজে শিল্প। সেটা করতে পারতাম। আর-একটা হচ্ছে উপন্যাস— যেটা lasting value। সেটার জন্য থিতোতে দিতে হয়। নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ঞতা খরচা করতে হয়। Time দিতে হয়— ভাবতে হয়। It takes two- three years, four years and then only you can make such a film, otherwise you cannot be honest. তুমি খবরের কাগুজেপনা করতে চাও করতে পারো। আমি খবরের কাগুজে তো নই। আমি অনেক গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি। কাজেই তখন ফট করে এসে— পঁচিশ বছর যেখানে আসি নি, সেখানে এসে কিছু বুঝতে-না-বুঝতে নাড়ির যোগ না করতে করতে দেশের মানুষকে গঞ্জে, বন্দরে, মাঠে, শহরে যাদের দেখি না, জানি না, চিনি না— আমি পাকামো করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার কোনো অধিকারই নেই। এই হচ্ছে এক। অর দু' নম্বর হচ্ছে তখন condition কেমন fast changing এটা, ওটা, সেটা, নানারকম— তার মধ্যে থেকে একটা Pattern আস্তে আস্তে বেরোক। আমি ভাববার সুযোগ-সুবিধা পাই। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ

হোক বারে বারে। আস্তে আস্তে ঠিক সময়েই ওটা হবে। আর ফরমায়েস দিয়ে শিল্প হয় না। তুমি হুকুম দিলে 'দরবেশ' খাব, কি 'রাঘবশাহী' খাব কি 'রসকদম্ব' খাব তা নয়। 'দৈ দাও মরণচাঁদের' এ ব্যাপারটা নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভেতর থেকে যখন ইচ্ছে আসবে তখন করব। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সেইটে করার পক্ষে তিতাস-টা ছিল আমার পক্ষে আইডিয়াল। কারণ তিতাস ছিল একটা subject যে subject মোটামুটি যে-বাংলাটা নেই তার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকাব বাংলা। তার উপর তো পটভূমিটা। এর subject-টা ইচ্ছে এমন যা বাংলাদেশের সর্বত্র ঘোরার সুযোগ দেয়— গ্রামবাংলাকে বোঝার সুযোগ দেয়। গাঁয়ে গিয়ে shooting করাটা বড়ো কথা নয়। Shooting করাব ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সাথে মেশা, নাড়ীর স্পন্দনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। কাজেই তিতাস-টা একটা অজুহাত এদিক থেকে। এবং ঐ অবস্থায় তিতাস ধরে করলে হয় কী— সেই মা-কে ধরে পুজো করা হয়। তা এতগুলি কারণেই এই, তিতাস পরে হতে পারত না। এখনো তিতাস আমার একটা study আর আমার একটা worship হিসাবে দেখা যেতে পারে। This river, this land, these people— এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবাব আছে এর সঙ্গে নিজেকে re-establish করা। আর শেষ কথা হচ্ছে ও সময়ে ওটার time ছিল না এবং time এখনো আসে নি। এখনো serius study করে serious work যেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর লোকে দেখে কিছু বুঝবে, সেরকম ছবি করার অবস্থা আমার আসে নি। মানে আমি এখনো এতটা বুঝে উঠতে পারি নি— কোন্‌দিকে যাবে ইতিহাস। আমি যেদিন তাগিদ বোধ করব, আমি যেদিন তাগিদ বোধ করব, আমি ঠিক জুড়ে দেব। বুঝতে পেরেছ?

প্রশ্ন · আপনি তো বাংলাদেশে একটা ছবি করলেন। এখানকার অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলী এবং যান্ত্রিক আয়োজন নিঃসন্দেহে ভালো ছবি তৈরিব পক্ষে যথেষ্ট। তা নয়তো তিতাসের মতো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হতো না। তবু কেন বাংলাদেশে ভালো ছবি হচ্ছে না? বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে যতটুকু জেনেছেন তাতে কী মনে হচ্ছে আপনার? গলদটা কোথায়?

উত্তর : আমার জানা নেই। কারণ আমি এত ভালো করে জানিও না। আর এ কথা আলোচনা আমার কি করা উচিত?

প্রশ্ন : আমাদের একটা suggession হিসাবে যদি কিছু বলেন, আমরা যারা আছি তাদের প্রতি আপনার একটা উপদেশ অত্যন্ত প্রয়োজন। আপনি তো ইন্ড্রাস্ট্রিতেও কিছুদিন ছিলেন।

উত্তর : Suggestion হচ্ছে, এখানে ছবি না হওয়াব কারণ হচ্ছে যে পঁচিশ বছর ধরে তোমাদের দবজায় কুলুপ দিয়ে রাখা ছিল। কিস্‌সু দেখতে, শিখতে কিংবা পড়তে দেওয়া হয় নি। Somehow this has happened হঠাৎ দরজা খুলেছে। এখন এই সুযোগটা গ্রহণ করে তোমাদের উচিত, যে করে পাবো Film Society Movement করার সাথে সাথে একটা পাঠাগার তৈরি করা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ film সম্পর্কে বই, ম্যাগাজিন এবং ক্লাসিক বইগুলো জোগাড় করে নিজেরা পড়াশুনা করো। আসলে

জিনিসটা হচ্ছে যে Serious attitudeটা develop করা উচিত। কিন্তু attitude develop করতে যেটা আমরা করেছিলাম সেটা হচ্ছে পড়াশুনা। কারণ আমাদের কারোরই মুরোদ ছিল না film করি বা বিদেশের ছবি দেখি। এই অবস্থা ছিল কলকাতার, তা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫০-এ শুরু হলো আমাদের World ক্লাসিক্স এবং অন্যান্য ভালো ছবি দেখা, যদিও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন (Calcutta Film Society) শুরু হয়েছে ১৯৪৮ থেকে। তার আগে আমরা কী করেছি? আমরা তার আগে কোথায় আইজেনস্টাইনের Film Form, Film Sense, পুদভকিনের Film Technique & Film Acting, ক্রাকাওয়ের এবং পল রথার বই জোগাড় করে, রজার ম্যানভিলের বই জোগাড় করে, পড়ে বুঝবার চেষ্টা করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি, তারপর ছবি পেয়েছি এবং দেখেছি। আমাদের এই চেষ্টাটা Film Industry-র completely বাইরে ছিল। আমরা সকলেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে জড়িত ছিলাম। যেমন আমি Assistant Director ছিলাম, আমি গল্পলেখকও ছিলাম আবার অ্যাকটিংয়েও ছিলাম। কিন্তু সেটা ছিল একটা দিক। কারণ ওখানে এ-সব কথা বললে হাসত আজকের মতো। একই, কোনো তফাত নেই। নিজেদের individual চেষ্টায় বা বন্ধুবান্ধবরা কয়েকজন মিলে এদিক ওদিক করতে করতে এক-আধটা বই নিয়ে, পড়ে, আলোচনা করে বোঝবার চেষ্টা করা। এই করতে করতে বছরখানেক বা দুয়েকের মধ্যে এক আন্দোলন দানা বাঁধল। তখন society করার একটা অবস্থা তৈরি হলো। দুই ভালো ছবির movementটা, সত্যিকারের সৎ ছবির movement এই commercial world-এর বাইরে করতে হয়। পরে commercial world-এ তার effect পড়ে এবং সেখানে আঘাত করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আঘাতটা করবে কে? অপ্রস্তুত সেটাই কতকগুলো— হাতে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার— তা তো আর করতে পারবে না, তাদের তো complete mental preparation থাকা উচিত। আর ভেতরে কী আছে সেটার দরকার নেই। সব পৃথিবীতেই সমান আর কী।

প্রশ্ন : উভয় বাংলার মানুষদের নিয়ে তো আপনি যথেষ্ট ভাবেন। আপনার চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতেও তারই পক্ষপাতিত্ব। এখন এই যে দু'দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময় এবং যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র সৃষ্টির কথা উঠছে, এ সম্পর্কে আপনি কী বলেন।

উত্তর : করা উচিত। যত বেশি পারা যায় যৌথ প্রয়োজনায় ছবি করা উচিত। আদান-প্রদান হওয়া উচিত। যাওয়া-আসা উচিত। মেশা উচিত। এটা তোমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর কোনো দেশেই সম্পূর্ণভাবে আশা করা যায় না যে এ সমস্ত ব্যাপারে সরকারি আমলাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। কোনো জায়গায় কোনো Film Society, কোনো Film Movement, কোনো Art Movement কোনোদিন burreaucratদের দিয়ে হয় নি। এরা একটা চেহারা করে পাঠাবে, আবার তারা ওখান থেকে একটা চেহারা করে পাঠাবে। এ চলবেই, এগুলো inevitable। কতগুলো ব্যাপার, তোমাদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত কলকাতায়, গিয়ে ঘুরে দেখা উচিত। কিছু বই পড়া উচিত, কিছু মেশা উচিত। আবার ওখান থেকে ছেলেপুলে এখানে আসা উচিত। ঠিক same।

তার একটা পথ হচ্ছে ঐ joint production। ওখান থেকে কিছু ছেলে কিছু কর্মী এলো, তোমরা কিছু জুটলে। ঠিক এগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু এগুলো করার জন্য মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থেকো না। নিজেদের মধ্যে জোর আনতে হবে, পরে সরকারকে convince করতে হবে। যেমন Indian Government এখন আর এই media-র গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারছে না। যার জন্য তারা FFC তৈরি করতে, Film Institute তৈরি করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তার আগে কত বছরের চেষ্টায় তাদের মনে এই seriousnessটা ঢোকাতে হয়েছে, নইলে প্রথম দিন বললে কেউ দিত নাকি? ১৯৪৮-এ ভাবতে পারত নাকি কেউ যে সরকার টাকা দিচ্ছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে Film-কে।

প্রশ্ন . চলচ্চিত্র সর্বাধুনিক শিল্পমাধ্যম। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের শিল্পীদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে না জানলেও বোধহয় স্বীয় মাধ্যমে করে খাওয়া যায়। কিন্তু চলচ্চিত্রকারকে সকল প্রকার শিল্পকলা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে হয়। বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা চলচ্চিত্রের ব্যাপারে আদৌ কোনো উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন বরং এ মাধ্যমটির প্রতি তাঁদের চরমতম অনীহা। চলচ্চিত্রের প্রতি সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আপনার ব্যক্তিগত ধারণা কী?

উত্তর : ওই বললাম তো, লোককে জোর করে তো আর কিছু করানো যায় না। সাহিত্যিকদের অনীহার কারণ হচ্ছে সাহিত্যিকরা চোখের সামনে যা দেখেছেন তার ভিত্তিতে হবে অনেক। কাজেই তাঁরা যখন দেখবেন কিছু ছেলেপুলে কিছু serious চেষ্টা করছে, পারুক আর না পারুক, সবাই যে successful হবে এমন তো নয়। কিন্তু attempts হচ্ছে। Some good boys, রুচিবান কিছু ছেলেপুলে কিছু করার চেষ্টা করছে। তখন automatically সাহিত্যিকরা বুঝবে যে জিনিসটা serious। এখন বললে তাঁরা বলবেন যে এখানে যা হয় তাতে আমরা কী বলব? ভালো একটা গল্প দেব, কেউ নেব না। তাই তো এখন সত্যি সত্যি ঘটনা। আমরা করবটা কীভাবে। How to help and why to get intersted? তাদের সবাইকে interested করতে গেলে এখান থেকে একটা force আসা উচিত। তা হলে automatically তাদের মনের মধ্যে আগ্রহ আসবে। আগ্রহ এলেই interested হবে। এবং তখন তাঁরা সেইদিকে লেখার কথা ভাবেন। Filmic story কাকে বলে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। যাঁরা তোমাদের এখানে sincere লেখন আছেন তাঁরা এটা করবেন। কিন্তু এখন how do you expect serious people to be interested?

প্রশ্ন : যতদূর জানি এযাবৎ আপনার কোনো ছবি সরকারিভাবে কোনো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রেরিত হয় নি। জর্জ শার্দুলের আমন্ত্রণের পর কি 'সুবর্ণরেখা'কে কোনো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল? আপনার ছবি বিদেশ না পাঠানোর ব্যাপারে কারণটা কী— সরকারি আমলাদের কারসাজি না কি রাজনৈতিক?

উত্তর : আমি তো সমস্ত কিছু বলতেও পারব। তবে এটা ঠিকই যে সরকারিভাবে কখনো আমার কোনো ছবি যায় নি। আর আসল কথা হচ্ছে যে 'সুবর্ণরেখা'র পিরিয়ড পর্যন্ত আমি ব্রাত্য ছিলাম, আমি অপাঙক্তেয় ছিলাম। সেটা রাজনৈতিক কারণে তো

বটেই। তা ছাড়া ভেতরে ভেতরে সব হিংসার ব্যাপার স্যাপার থাকে। এখন আমি জাতে উঠেছি। তখন তো আমি ছিলাম না এমন। কাজেই এখান থেকে নানা রকম খোঁচাখুঁচি—অমুক তমুক। যেমন 'সুবর্ণরেখা' তারা আটকাতে পারে নি। তখন India-তে ভালো subtitle হতো না। কোনো ছবি বিদেশে পাঠাতে গেলে subtitle না করে পাঠানো ঠিক নয়। You cannot expect তারা Venice কিংবা Cannes-এ বসে বাংলা বুঝবে।

প্রশ্ন : শুনছি বাংলাদেশে সৃজিত আপনার ছবি 'তিতাস একটি নদীর নাম' বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। সরকারিভাবে, কিংবা অন্য কোনো বাধা এসেছে কি? আর তিতাস যে বাণিজ্যিকভাবে ভারতে প্রদর্শিত হবার কথা ছিল তার কী হলো।

উত্তর : সবগুলোই চেষ্টা চলছে। এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে এঁরা বিভিন্ন festival -এ যেখান থেকে দাওয়াত পেয়েছেন সে-সব জায়গায় এঁরা পাঠাবার কথা ভাবছেন। সে একই ব্যাপার কলকাতায় দেখানোর ব্যাপারেও। ওখানেও এটা আলোচ্য অবস্থায় আছে। এখনো final কিছু হয় নি।

প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায় কোনো এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতবর্ষে এখন তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি— এবং আমি সত্যিই জানি না যে তার অর্থে কী? কমিউনিস্ট পার্টির এই দ্বিধাবিভক্তিতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর : তিনটে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আমার আপত্তি— ওটা ফিল্মের কোনো ব্যাপার নয়। ওটি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে আমার বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসবে, আর রাজনীতি আলোচনা আমি করতে পারি। ৮/১০ ঘণ্টা আমি বলতে পারি। কিন্তু why— লাভটা কী! ওটার সাথে ফিল্মের কি সম্পর্ক আছে? কমিউনিস্ট পার্টি-ফার্টির কথা তুলে লাভ কী আছে। আমি তো মনে করি না যে as a film maker আমার politics নিয়ে কথা বলা উচিত। As a social being I may have some feelings, some ideas. যা আছে ছবিতেই আছে, ওটা নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে চাই না।

প্রশ্ন : ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবেন বলে একবার ভেবেছিলেন তার কী হলো?

উত্তর : ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করবো বলে ভেবেছিলাম, তার স্ক্রিপ্ট হয়েছে এবং সে স্ক্রিপ্ট ছাপাও হয়েছে। এই হয়েছে। কিন্তু ছবি হওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা না? ছবি করা গেল না।

প্রশ্ন : ওটা কি একেবারে বাদই দিয়েছেন, নাকি ছবি করার ইচ্ছা আছে আপনার।

উত্তর : এখন সে ভিয়েতনাম আর কোথায়? এখন আর ছবি করার কোনো মানেই হয় না।

প্রশ্ন : 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র পর কী ছবি করবেন? কোনো পরিকল্পনা থাকলে কিছু বলুন।

উত্তর : এখনো আলোচনা চলছে, ভাবছি। এখনো কিছু final হয় নি। কথাবার্তা চলছে।

প্রশ্ন : আপনার অধিকাংশ ছবির কিছু কিছু চরিত্র Archetypal symbol হয়ে

প্রকাশ পায়। আপনি মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং-এর কালেকটিভ আনকনশাসনেস দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তাই আপনার ছবির চরিত্ররা যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা, গৌরী, 'কোমল গান্ধার'-এর অনসূয়া, শকুন্তলা, 'সুবর্ণরেখা'র সীতার মা, সীতা এবং 'তিতাসে'র রাজার ঝি, ভগবতী প্রত্নপ্রতিমার আদলে গঠিত। আপনার 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' এবং আগামী ছবিতে কি এ ধরনের আর্কিটাই পাল ইমেজের প্রকাশ ঘটবে?

উত্তর : আর্কিটাইপাল ইমেজ এমন একটা জিনিস যেটা অঙ্ক কষে আসে না। আর দ্বিতীয়ত সে চিন্তা এখন যদি আমার থাকে তবে ওটা প্রভাবিত হবেই কোনো-না-কোনো চরিত্রে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোনো ছবি দেখেছেন কি? দেখে থাকলে আপনার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলুন।

উত্তর : বাংলাদেশের একটাই ছবি দেখেছি আমি, 'জীবন থেকে নেয়া।' হ্যাঁ, "ওরা এগারোজন'-ও দেখেছি। এই দুটো, দুটো ছবি দেখে আমি বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে কী বলব। 'জীবন থেকে নেয়া' আমি কলকাতায় দেখেছি। ও সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে তখনকার অবস্থায় এমন একটা ছবি এখানে বসে করা, এর জন্যে বুকের পাটা দরকার, ছবির content-এর দিক থেকে বলছি। Form বা Structural ব্যাপার-এ সমস্ত আমি আলোচনাই করছি না। তখনকার যে অবস্থা ছিল তার মধ্যে একটা ছেলে এরকম bold ভাবে কাজ করতে পারে, ভাবতে পারে, সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আর 'ওরা এগারোজন'—ঠিক আছে।

প্রশ্ন : 'তিতাস' এখানকার দর্শক নেয় নি। এর কারণটা কী? আপনি নিজে এ ব্যাপারে কী মনে করেন।

উত্তর : আমি তখন প্রথমত মৃত্যুশয্যায়। কাজেই কে নিয়েছে কে নেয় নি তারপরে যে লেখা 'তিতাস' সম্পর্কে এখানে হয়েছে তা উড়ো উড়ো শুনেছি। আমি পড়িও নি কিছু। কারণ আমি বলতেই পারব না। কারণ আমি এখানে ছিলামও না এবং কোনো interest নেওয়ার মতো অবস্থাও আমার ছিল না। আমি হাসপাতালে তখন পড়ে আছি। আর এর মধ্যে লেখাও বিশেষ পাইটাই নাই। কাজেই এর সম্বন্ধে আমি বলি কী করে। কেন নেয় নি সে সম্বন্ধে তো তোমরা বলতে পারবে। তোমরা তো এখানে উপস্থিত ছিলে। আমি তখন এখানে নেই। So how can I feel!

প্রশ্ন : 'চিত্রবীক্ষণ'-এর' সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আপনি বলেছিলেন যে এখানকার খবরের কাগজওয়ালারা 'তিতাস' করার সময় প্রথম প্রথম আপনাকে সুচক্ষে দেখে নি। পরে নাকি এই বিরূপ ভাবটা প্রীতির সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু 'তিতাস' মুক্তি পাবার পর এখানকার পত্র-পত্রিকাগুলি আপনি পড়েছেন কি না জানি না, অনেকেই আপনাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গালগাল করেছে। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর : এ বিষয়ে আমার বলার মতো কোনো ব্যাপার আছে? প্রথমে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন সত্যি সত্যি কিছু লেখা-টেখা বেরিয়েছিল। সেগুলি পড়ে বুঝতে পারলাম যে তারা খুব ভালোভাবে নেয় নি। তারপর সে লোকগুলোর সাথে কাজ করাকালীন আমার ব্যক্তিগত পরিচয়-টরিচয় যখন হলো আমি দেখলাম যে তাদের

more or less আমার প্রতি বেশ ভালোই attiude, তারপর ছবি বেরুনোর পরে কেউ যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে কিছু করে থাকে— প্রথমত কে করেছে, কে করে নাই— বললাম তো আমি কিছু জানি না। যদি করে থাকে তার উত্তর দেওয়া আমি ঘৃণ্য মনে করি। আর যদি ইচ্ছা ক'রে না ক'রে তার সত্যই মনে হয়ে থাকে তা হলে আমি তাকে সেলাম করি, কিন্তু এটা যদি বোঝা যায় কেউ অভিসন্ধিমূলকভাবে কোনো কিছু করছে তবে তার উত্তর দেওয়া কি উচিত? কী লাভ হবে দিয়ে?

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোনো ছবি করার কথা ভাবছেন কি না।

উত্তর : না এখনো পর্যন্ত ভাবার মতো সুযোগ আসে নি।

প্রশ্ন : ডাক পড়লে আসবেন কি?

উত্তর : সে-সব পরের কথা পরে হবে। এসব conjectural কথাবার্তাগুলো আলোচনা করে লাভ কী? কেউ যখন এখনো ডাকে নি তখন ডাক পড়লে আসব কি না তা ভেবে কী হবে? তাছাড়া নিজের হাত এখন full। এই তিতাসের পুরোটা তৈরি করতে হবে তো, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো শেষ করতে হবে। তা আমার হাত তো at least for a month or two full। তার পরে এ দুটো ছবি কলকাতায় রিলিজ করতে গেলে যথেষ্ট ঝামেলা, আমাদের দেশে Director-এর বিশেষ করে কলকাতায় ছবি রিলিজের জন্য তার দায়িত্ব বেশি, তাই সেই রিলিজের পেছন দৌড়াও, তারপর রিলিজের সময় লোককে ইয়ে করো, কাজেই ঐসব দিকে এখন concentrate করতে হবে, কাজেই immediately এখন বলে কী লাভ?

প্রশ্ন : ইন্দিরা গান্ধীর ওপর প্রামাণ্য ছবি (যাকে আপনি প্রামাণ্য ছবি না বলে Charecter study বলতে চেয়েছেন) করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? এ ধরনের বিষয়বস্তু আপনার চলচ্চিত্র মানসের সাথে খাপ খায় না। দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক এবং চিন্তার দিক থেকেও যা একান্তই ভিন্ন। ইন্দিরা গান্ধীর উপর এই ছবি করতে যাওয়াটাকে অনেকে আপনার কম্প্রোমাইজিং অ্যাটিচুড এবং স্ববিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করতে চাইছে। এ সম্পর্কে আপনি যদি স্পষ্ট করে কিছু বলতেন।

উত্তর : আমার স্পষ্ট করে কিছুই বলার নেই এ বিষয়ে, ছবিটা আদ্ধেক হয়ে পড়ে আছে, যদি শেষ হয়— ছবি যখন বেরোবে তখন কেন করতে চেয়েছিলাম পরিষ্কার দিনের আলোর মতো হয়ে যাবে। এবং স্ববিরোধিতা কি না ওটাই প্রমাণ করবে। এবং compromise কি না ওটাই প্রমাণ করবে। আর্টিস্ট-এর কাছে এ-সব প্রশ্ন করে লাভ নেই, খালি একটাই কথা যে wait করো। See it and then condemn it.

প্রশ্ন : কিছু কিছু লোক এ ধরনের মন্তব্য করছে যে 'ঋত্বিক ঘটক তো এখন ইন্দিরা গান্ধীর ওপর ছবি করছে!' এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : এ সমস্ত কথার উত্তর দেবার কী আছে? যে উত্তর দিয়েছি সেই উত্তরই। অভিসন্ধিমূলক কথার উত্তর দেওয়াটা ঘৃণ্য। ছবিটা আমি যদি শেষ করি, ছবিটা দেখলেই যদি বোঝা যায় যে আমি অভিসন্ধিমূলক কাজ করছি— কি আমি commromise করছি, কি স্ববিরোধিতা করছি, তখন আমাকে তুলে খিস্তি কোরো। তার আগে যেটা হয় নি, হবে কি না তা জানা নেই, সম্ভাবনার ওপর তো বলা যায় না?

প্রশ্ন : পুনাতে যে দুটো শর্ট ফিল্ম হয়েছে যেমন 'রাঁদেভু' আর ফিয়ার'— ওগুলো কি আপনিই করেছেন না ছেলেরা করেছে আপনার তত্ত্বাবধানে?

উত্তর : 'রাঁদেভু'টা ছেলেরা করেছে তত্ত্বাবধানে। For Direction students, আর 'ফিয়ার'টা, আমি করেছি for acting course.

ঋত্বিক ঘটক : একটি সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : আপনি ছবির জগতে এলেন কি ভাবে?

ঘটক : এ প্রশ্নের উত্তর এতবার দিয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় বেরিয়েছে। ছবির জগতে আসার অনেকগুলি কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল। আমার এক দাদা, মেজোভাই মারা গেচেন, এদেশে প্রথম টেলিভিসন এক্সপার্ট। মেজদা গ্রেট ব্রিটেনে ডকুমেন্টারি ক্যামেরাম্যান হিসাবে ছ-বছর কাজ করে দেশে ফিরে আসেন নাইনটিন থার্টি ভাইভে, সিক্সে তিনি join করেন নিউ থিয়েটার্সে। সায়গল-কাননবালার 'স্ট্রীট সিঙ্গার' ছবিতে তিনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন, এই ধরনের অনেক ছবিতেই তিনি কাজ করেছেন। মেজদার সুবাদে ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি বড়ুয়া সাহেব থেকে শুরু করে বিমল রায় অবধি অনেককেই, তাঁরা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। কাজেই আমাদের বাড়িতে সেই যুগের film-এর একটা আবহাওয়া বা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। আর সকলেই যে-রকম ছবি দেখে সে-রকম আমিও এঁদের ছবি দেখতাম, আমার একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল কেননা এঁদের আমি দেখতাম দাদার সঙ্গে আড্ডা মারতে। কাজেই পরিবেশ মোটামুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ছবির জগতে আসব এ কথা অবশ্য তখনো ভাবি নি।

নানারকম করেছি, বাড়ি থেকে দু-তিনবার পালিয়েছি। কানপুরের একটা textile mill-এ কাজ করেছি bill deaprtment-এ। সিনেমাটা মাথায় ঢোকে নি তখনো। বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এল কানপুর থেকে, সেটা বিয়াল্লিশ সাল। মাঝখানে দুবছর পড়াশুনো gone। বাড়ি থেকে যখন পালিয়েছিলাম তখন আমার বয়েস চোদ্দ। বাবা বলেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার-ফিঞ্জিনিয়ার হাওয়া যায়, নইলে নাকি মিস্তিরি হয়ে থাকতে হবে। হঠাৎ পড়াশুনায় মন এসে গেল এবং তারপর পড়াশুনার দিকেই মন থাকল। এবং বাঙালি ছেলেদের যা বাঁধা এবং ফরাসিদেরও যা হয় শুনেছি যে ভেতরে একটা creative uge দেখা দিলেই প্রথমে কবিতা বেরোয়, তা দু-চারটে অতি হতভাগা লেখা দিয়ে আমার শিল্পচর্চা শুরু হল। তারপরে আমি দেখলাম ওটা আমার হবে না। কাব্যির একলক্ষ মাইলের মধ্যে আমি কোনোদিন যেতে পারব না। তারপরে হল কি, রাজনীতি ঢুকে পড়লাম। ৪৩-৪৪-৪৫, সে সময়কার কথা যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন যে সে সময়টা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পটপরিবর্তনের সময়।

প্রশ্ন : ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন—

ঘটক : ফ্যাসি বিরোধী ব্যাপারটা হবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানি আক্রমণ, ব্রিটিশদের পালানো, এখানে সেই যুদ্ধ-বোমা-টোমা, হ্যানা ত্যানা— মানে very quickly in succession কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। placid, শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবন ছিল চল্লিশ-একচল্লিশে। হঠাৎ চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সালে পরপর কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, চালের দর চড়ে গেল, দুর্ভিক্ষ famine, পরপর কতকগুলো changes সমস্ত মানুষেব চিন্তাধারাকে একটা বিরাট ধাক্কা দিল। আমি তখন—

প্রশ্ন : আপনি কি তখন মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন?

ঘটক : হ্যাঁ, আমি তখন মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছি, ঝুঁকে পড়েছি শুধু নয়, active কর্মী, card-holder ছিলাম না অবশ্য, কিন্তু close sympathiser, fellow traveller আর কি। সেই সময় গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। গল্প লেখার urge-টা কিন্তু সেই কবিতা লেখার মতো ভুয়ো ধোঁয়াটে ব্যাপার ছিল না। চারপাশে যে-সমস্ত খারাপ বদমাইশি অত্যাচার ইত্যাদি দেখছি তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জীব হিসাবে সোচ্চার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থেকেই গল্প লেখাব urge এসেছিল সেই ছোটো বয়সেই। গল্প আমি খুব খারাপ লিখতাম না। আমার এখনো মনে আছে আমার আর সমরেশের প্রথম ছাপা গল্প বেরোয় 'অগ্রণী'তে তারপর সজনীবাবুর 'শনিবারের চিঠি', 'গল্পভারতী'—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বাবু তখন editor। 'দেশ'—সব মিলিয়ে আমার গোটা পঞ্চাশ গল্প বেরিয়েছিল। এর মধ্যে একটা magazine ও বের করেছিলাম, Marxist-ঘেঁষা। ঐ মফস্বল শহর থেকে আমি তখন রাজশাহী শহরে third year-এ পড়ছি। মফস্বল শহরে ছাপা magazine তখন খুব দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। বেশ কয়েকমাস চলেওছিল কাগজটা, সবই নিজেদের ট্যাঁকের পয়সা থেকে, অবশ্যই উঠে গিয়েছিল যথারীতি। তারপর মনে হল গল্পটা inadequate, ভাবলাম গল্প কজন লোককে নাড়া দেয় আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে, কাজেই অনেক সময় লাগে পৌঁছাতে। আমার তখন টগবগে রক্ত, immediate reaction চাই। সেই সময়ে হল 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবনধারা পালটে ছিল।

প্রশ্ন . আপনি কি তখন গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত?

ঘটক : গণনাট্য সঙ্ঘে তখনো join করিনি। তবে আশেপাশে ঘুরছি। প্রত্যেকেই আমার চেনা, শম্ভুদা, বিজনবাবু সুধীবাবু, দিগিনবাবু, গঙ্গাদা, গোপাল হালদার মশায়, মানিকবাবু, তারাশঙ্করদা। গণনাট্য সঙ্ঘ তখন আলাদা ছিল না, Progressive Writers' Association-এর একটা অংশ ছিল। তারাশঙ্করদা ছিলেন P. W. A.-র President, এঁদের সকলের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমার বড়দা কল্লোলযুগের একজন নামকরা কবি ছিলেন, যুবনাশ্ব : মনীশ ঘটক, সেই সুবাদে সাহিত্যিক মহলের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের একটা যোগাযোগ ছিল। কাজেই সিনেমার লোকজনদের যেমন চিনতাম তেমনি চিনতাম এঁদেরও। আর এঁদের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই 'নবান্ন' আমার কাছে হঠাৎই লেগেছিল। পরে জেনেছি প্রথমে বিজনবাবুর 'আগুন', পরে সেটাকে বাড়িয়ে 'জবানবন্দী' একাঙ্কিকা, 'জবানবন্দী'র success-এর পর সেটাকে বাড়িয়ে পূর্ণ নাটক—

'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত চিন্তাধারা পালটে দিল, আমি নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। 'I. P. T. A.'-র member হয়ে গেলাম। তারপর 'নবান্ন'ই যখন আবার revised হল সাতচল্লিশের শেষের দিকে তখন তাতে আমি অভিনয়নও করেছি। তারপর আমি পুরোপুরি গণনাট্যতে, central squad-এর leader-ও ছিলাম, নাট্যকার হিসাবে তখন নাটকও লিখেছি। নাটক immediate reaction তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সেটাও মনে হল inadequate, মনে হল এটাও সীমিত। ব্যাপারটা হচ্ছে চার-পাঁচ হাজার লোক, আমরা যখন মাঠে-ময়দানে নাটক করতাম তখন চার-পাঁচ হাজার লোক জমা হত, নাট করে তাঁদের একসঙ্গে rouse করা যেত। তখন মনে হল সিনেমার কথা, সিনেমা লাখ লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে complete মোচড় দিতে পারে। এইভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসি নি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয় তা হলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। I don't love film.

প্রশ্ন : সিনেমাকে কি আপনি বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন?

ঘটক : হ্যাঁ, বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে, হাতিয়ার হিসাবে—

প্রশ্ন : সেটা কি রাজনৈতিক লোক হিসাবে— মানে তখন কী feel করেছিলেন—

ঘটক : সেটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বললে বাজে কথা বলা হবে। রাজনীতি জীবনের একটা বিরাটতম অংশ, রাজনীতি ছাড়া কিছুই হয় না, প্রত্যেকেই রাজনীতি করে, যে করে না বলে সেও করে। Apolitical বলে কোনো কথা নেই। You are alawys a partisan, for or against—কাজেই ওসব কথা ছেড়ে দিন, ও-সব বললে অন্য তর্কে চলে যেতে হবে। তখনো ভেবেছি এখনো ভাবি রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, ভারতীয় ঐতিহ্য সমস্ত-কিছুকে নিয়ে। কারণ নতুন ছবির ব্যাপারে ভারতীয় প্রাচীন জীবনটাকে ভারতের যে বিরাট ব্যাপারটা তাকে ভীষণভাবে neglect করা হচ্ছে, অর্থাৎ এ-সব নিয়ে পড়াশুনা করাটা যেন Progressivism নয়। আমি মোটামুটি এ-সব নিয়েই করে যাচ্ছি এবং যাব যতদিন বেঁচে থাকব। ছবি as such, cinema as such, film as film পেটের ভাত দেয়, সোজা বাংলা কথা। ছবি লোকে দেখে। ছবি দেখানোর সুযোগের পথ যতদিন খোলা থাকবে ততদিন আমি পেটের ভাতের জন্য ছবি করে যাব। কালকে বা দশ বছর পরে যদি সিনেমার চেয়ে ভালো কোনো medium বেরোয় আর দশ বছর আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি সেখানে চলে যাব। সিনেমার প্রেমে মশায় আমি পড়ি নি।

প্রশ্ন : আপনার গোড়াব দিকের ছবিগুলো মুক্তি না পাওয়ার কারণ কী? যেমন 'নাগরিক' বা 'বেদেনী'।

ঘটক : অনেক কারণ আছে।

প্রশ্ন : কারণগুলো কি ব্যবসায়িক?

ঘটক : হ্যাঁ ব্যবসায়িক, ব্যবসায়িকই বলা যায়।

প্রশ্ন : 'সুবর্ণরেখা' অবধি আপনি যে-সমস্ত ছবি করেছেন, সে ছবিগুলি সম্পর্কে

আপনরা বিশেষ ভালো লাগা বা খারাপ লাগা সম্পর্কে কিছু বলুন। অর্থাৎ তখন কী feel করেছেন—

ঘটক : এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই difficult, লোকে ছবি যখন করে তখন খুব ভালো না লাগলে করে না অন্তত আমি করি না। মানে subjectটা, যেটা নিয়ে আমি ভাবছি সেটা ভালো না লাগলে কীভাবে ছবি করা সম্ভব। ছবি করার একটা অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের দিক আছে, inhuman labour-এর একটা ব্যাপার, খাটুনি মানে সাংঘাতিক খাটুনি। আর্থিক দিক তো আছেই। অর্থ সংগ্রহ করলাম এত কষ্ট করে, তারপর উন্মাদের মতো খেটে একটা ছবি করলাম। সেই ছবির যদি না আমার পছন্দ হয়, যদি আমার তা ভালো না লাগে তাহলে কি কোনো কিছু করার প্রেরণা পাওয়া যায়? যায় না। মানুষে খাটে মানে এরকম খাটুনি creative খাটুনি আর কি, ভালো লাগে বলেই খাটে। শুধু পয়সা পাবে বা নাম হবে বলে খাটে আমার তা মনে হয় না। naturally বুঝতে পারছেন আমি তাঁদের কথা বলছি না মানে বেশিরভাগ মানুষের কথা বলছি না। মুষ্টিমেয় যাঁরা ছবিটাকে গভীরভাবে নিয়েছেন তাঁদের কথাই বলছি।

'নাগরিক'-এর কথা তুলে লাভ নেই। 'নাগরিক' মোটামুটি একটা co-operative venture ছিল, কেউ পয়সাকড়ি নেয় নি, laboratory নেয় নি, studio নেয় নি এমন কি, raw film stock যেটা পাওয়া যায় না সেটাও আমি বিনে পয়সায় পেয়েছিলাম। এ-সব ছাড়া যে সামান্য পয়সা লাগে তা আমরা নিজেদের ট্যাক থেকে জড়ো করে করেছিলাম ছবিটা। কিন্তু আমরা এমন বোকা ছিলাম যে ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যাবসাগত ব্যাপারে একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়লাম আর সমস্ত জিনিসটাই নষ্ট হয়ে গেল, আমাদের মন ভেঙে গেল, বুক ভেঙে গেল। ও ছবি কোনোদিনই release হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা ধরেই নিলাম যে লোকে আর ও-ছবি দেখতে পাবে না।

প্রশ্ন : ছবিটি কি complete হয়েছিল?

ঘটক : ছবি complete censored, এ একটা ট্র্যাজেডি, এ এক ইতিহাস, এর স্তরে স্তরে বহু অধ্যায় আছে। ও-সব কথা থাক, মোটামুটি কথা হচ্ছে বেশ ভালো জুতো খাওয়া দিয়ে আরম্ভ হল আমার careerটা। ভালো মার খাওয়া দিয়ে আরম্ভ, পেটে ভালো পড়েছিল, পিঠেও পড়েছিল, বাবা মারা যাওয়ার পর যা কিছু সামান্য খুদকুঁড়ো পড়েছিল সব চলে গেল এ ছবি করে।

তা-ছাড়া এ ছবিতে আমাদের একটা প্রাণপণ চেষ্টা ছিল রাজনৈতিকভাবে কিছু করার, কিছু বলার। আমার একজন বন্ধু, যিনি এদেশের একজন খুব বড়ো পরিচালক এ ছবি দেখে আমায় বলেছিলেন আপনার এছবি ভয়ংকর রাজনীতিঘেঁসা। আমারও তাই ধারণা। তখন আমাদের বি. টি. আর-এর যুগ, বি. টি. রণদিভে, অর্থাৎ leftism-এর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ঢুকে গিয়েছিল, অনেকটা এখানকার Naxalite রাজনীতির মতো।

প্রশ্ন : তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের সময়?

ঘটক : হ্যাঁ অনেকটা সমসাময়িক। একান্ন সালে লেখা, একান্ন সাল পুরো লাগে, একটু একটু করে পয়সা আসে, একটু একটু করে কাজ হয়। বাহান্নসালে ছবি শেষ

হয়, censoredও হয়। আমার ঐ বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন, ছবিটি রাজনৈতিক ছিল। ঐ আপনি বলছিলেন রাজনীতির জন্য ছবি করেন কিনা হ্যানা ত্যানা। ও ছবিটি দেখলে লোকে ভাবত ঋত্বিক ঘটক রাজনীতির জন্য ছবি করে। ও ছবিতে রাজনীতি ছিল সোচ্চার ভাবে, বেশিরকম ভাবে। ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসও ছিল। তবু হয়তো কিছু ছিল, জানি না। যাকগে। সে ছবি recover করার কোনো উপায় নেই। তখন ছবির Print-গুলো ছিল nitrate based, ভালো ভাবে না রাখলে কিছুদিন vault-এ থাকলেই sticky হয়ে যায়। এখন film-গুলো একেবারে তাল পাকিয়ে গেছে।

তারপর ছাপান্ন সালে 'অযান্ত্রিক', সাতান্ন সালে বেরোয়। তারপর পরপর কয়েক বছর ছবি করলাম। ভালো না লাগলে ছবি কী করে করে মানুষ? কাজেই আপনার ঐ প্রশ্নের কী উত্তর আছে আমি জানি না? 'সুবর্ণরেখা' পর্যন্ত সব ছবি করেই আমি আনন্দ পেয়েছি, ভীষণ ভালো লেগেছে। কোন্ ছবি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আর কোন্ ছবি আমার খারাপ লাগে, দয়া করে ওরকম মামুলি প্রশ্ন করবেন না কেননা ওই প্রশ্নের উত্তর পরিচালক যা দেবে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশ্ন : 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা', দেখে মনে হয়েছে দেশবিভাগ অর্থাৎ বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে আপনি বিশেষ ভাবিত, যেন এই দেশভাগটাই আপনার কাছে সমস্ত সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু—

ঘটক : বটেই তো। আমি সচেতনভাবেই ওটা দেখাতে চেয়েছি।

প্রশ্ন : কিন্তু দেশভাগ ছাড়াও তো অনেক সমস্যা ছিল বা আছে— অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক। আপনি যেন এব্যাপারে ভীষণ রকম emotoonally ınvolved

ঘটক : এই বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাওয়াটা আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। সেই সময়ে আপনাদের বয়স কত ছিল আমি জানি না তবে তখন জ্ঞান-গম্যি যাদের হয়েছিল তাদের জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন আজকের সমস্ত অর্থনীতিটা যে চুরমার হয়ে গেছে তার basıc factor ছিল ঐ বাংলা ভাগ। বাংলা ভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি। আজও পারি না। আর ঐ তিনটে ছবিতে আমি ওকথাই বলতে চেয়েছি। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও হয়ে একটা trilogy, 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আমি 'মেঘে ঢাকা তারা' দিযে যখন আরম্ভ করলাম তখনো আমি রাজনৈতিক মিলনের কথা বলি নি, এখনো ভাবি না। কারণ ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা গেছে, তা পালটানো ভীষণ মুশকিল। সেটা আমার কাজও নয়। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে বাধা যে ছেদ যার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি সবই এসে পড়ে সেটাই আমাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল। আর এই সাংস্কৃতিক মিলনেব কথাই 'কোমল গান্ধার'-এ পরিষ্কার করে বলা আছে, 'মেঘে ঢাকা তারা'র ভেতরকার কথাও তাই, 'সুবর্ণরেখা'তেও সেই একই কথা। এখন অবশ্য অর্থনৈতিক সমস্যা নানান গণ্ডগোলে জড়িয়ে গেছে, তবু ভালো করে ভেবে দেখুন বহু অর্থনৈতিক সমস্যার জট হচ্ছে ঐ দেশভাগ। একেবারে দুটুকরো করে দিল দেশটাকে, একেবারে ছিনিমিনি খেলে গেল এরা। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : 'সুবর্ণরেখা' ছবির পর আপনি feature ছবির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত,

সাত বছর হল বোধ হয়। এই সাত বছরে ছোটো ছোটো ছবি করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন, এ ছাড়া এই দীর্ঘদিন feature ছবি না করার কারণ কী?

ঘটক : দুটো প্রশ্ন করেছেন। feature ছবি না করার কারণ এক আমার ছন্নছাড়া জীবন। দুই হচ্ছে যে আমার ছবিগুলো, দেখেছি, সেই 'অযান্ত্রিক' থেকে আরম্ভ করে 'সুবর্ণরেখা' অবধি পাঁচখানা ছবিতেই, যখন release হয় চলে না, একদম চলে না। কয়েক বছর যাবার পর লোকের টনক নড়ে তখন খানিকটা দেখে-টেখে। এক 'মেঘে ঢাকা তারা' খানিকটা পয়সার মুখ দেখেছিল, সেটা পুরোপুরি চলে গেল 'কোমল গান্ধার'-এ 'কোমল গান্ধার'-এ আমার যথাসর্বস্ব ডুবে গেল। ওটারও producer আমি ছিলাম। এরপর দেখলাম যে ব্যাবসাদাররা যারা ছবির টাকা দেবে তারা আমাকে বিষবৎ পরিহার করেছে, কেননা আমি একটা flop director। ছবি release হয়, এত পয়সা খরচ করে করি, এত খাটি-টাটি কিন্তু হয়-না-হয় জানি না, মোদ্দা কথা পয়সা পাই না। কাজেই কেউই আমায় পাত্তা দেয় না। সেই সময়ে একটা সুযোগ এল Poona Film Institute-এ চাকরির। এই সাত বছর যে আমি ছবি করি নি সেটা ঠিক কার্যকারণ পরম্পরায় ঘটে নি, অনেকটা accidental, পুণার চাকরি তো আমার বেশিদিন ছিল না, দুবছর, এসেও তো করতে পারতাম, করি নি, মানে ঐ ভাবতাম আবার গিয়ে ভিক্ষে করব, কীরকম ভিখিরি ভিখিরি মনে হত নিজেকে— এই অবস্থাটা আর মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।

পুণার চাকরির যুগ আমার সবচেয়ে আনন্দময় যুগের মধ্যে একটা। সেখানে নতুন ছেলেমেয়েরা অনেক আশা নিয়ে, অনেক বাঁদরামি নিয়ে আসে, বাঁদরামি মানে ঐ নতুন মাস্টার এসেছে তার পেছনে লাগতে হবে। তাদের মধ্যে গিয়ে আমি ঝপাঙ্ করে পড়লাম। তাদের মন জয় করা, তাদের বলা যে ছবি অন্য ধরনের হয়। এরা যা আনন্দ ঠিক বলে বোঝানো যাবে না, অন্য ধরনের আনন্দ যে, অনেক ছেলেমেয়ে গড়লাম। আমার ছাত্রের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে, কেউ নাম করেছে, কেউ করে নি, কেউ দাঁড়িয়েছে, কেউ ভেসে গেছে।

প্রশ্ন : মণি কাউল কি আপনার ছাত্র?

ঘটক : মণি কাউল আমার ছাত্র— ভীষণভাবেই আমার ছাত্র, মণি, কুমার সাহানী ঐ batchটা। K. T. John, এখন কেরালাতে আছে। শত্রুঘ্ন সিন্‌হা, রেহানা সুলতান, মহাজন তারপর ধ্রুবজ্যোতি— এরা সবাই আমার ছাত্র। দিল্লি গিয়ে দেখি sound engineer আর ক্যামেরাম্যানের মধ্যে ভর্তি আমার ছাত্র। ও-সব দেখে একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়, মাস্টারদের আনন্দ, যাদের আমি পড়িয়েছি, শিখিয়েছি তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নিজের নিজের sphere-এ তারা successful, এর মধ্যে আমারো contribution আছে বলে গর্বিত মনে করি, rightly or wrongly.

তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। লোকের কাছে ভিক্ষে করব না, মাথা নিচু করব না, এইভাবে চলছিল, এর মধ্যে drinking-টা ভয়ংকর বেড়ে গেল, বারবার অসুখে পড়তে লাগলাম, আপনারা সবই জানেন, পাগলা গারদের কথাও জানেন। তা এরই ফাঁকে ফাঁকে ছবিগুলো করেছি প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে, কেউ পয়সা

দিতে চায় না, ডকুমেন্টারির কাজ পাওয়া যায় না। নানা ধরনের ফ্যাঁকড়া। এর মধ্যে কোনোটা একেবারে পয়সাবিহীন অবস্থায় করা, কোনোটা একটু ভালোভাবে করা। চেষ্টা করেছি ভালোভাবে করার। ওর মধ্যে West Bengal Govt.-এর হয়ে করা 'পুরুলিয়ার ছৌ' ছবিটা মনে হয় লোকে দেখতে পারে। 'আমার লেনিন' একটা রিপোর্টাজ গোছের যেটাকে গুছিয়ে একটা গল্পের আকার দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, মন্দ হয় নি। এ ছাড়া পুনায় ছাত্রদের সঙ্গে শার্ট তুলেছি দু-একটা। 'রাঁদেভু' আমার ছাত্রদের সঙ্গে করা ; এ ছাড়া 'ফীয়াব'— মনে হয় ওগুলো খারাপ হয় নি।

প্রশ্ন : আপনি যে সাতবছর বাংলাদেশে ছবির জগতে অনুপস্থিত সেই সাতবছরে বাংলাছবির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন কি? বিশেষত ছবির দর্শকদের চেহারা কি পালটাচ্ছে?

ঘটক : দর্শকদের ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন এসেছে, ভালো ছবি সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে কমবয়সী ছেলেদের মধ্যে ভালো ছবির জন্য একটা অদ্ভুত টান এসেছে। এটা আমার কাছে যে কী আনন্দের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা কথা বলছি। ১৫ই আগস্ট লাইট হাউসে-এ আমার 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি দেখানো হয়, আমি শুনেছি সেখানে এক টাকার টিকিট নাকি সাত টাকায় ব্ল্যাকে বিক্রি হয়েছে, এবং বেশির ভাগই Young audience, তারা ছবি দেখেছে এবং তাদের ভালো লেগেছে, তারা অনেকেই এখানে এসেছে দলে দলে, এমন বহু ছেলে যাদের আমি চিনি না, তারা শুধু আমায় দেখতে এসেছে। এখানে বসে আমি অনুভব করতে পারছি দর্শক এখন মোটামুটি তৈরি। এর পেছনে দু-তিনজন পরিচালকের contribution অবশ্যই আছে, দু-তিনজন বলব কেন— দু-জন, মৃণাল সেন, আর সত্যজিৎ রায়, তাঁরা বাংলা ছবির অনেকখানিই ওলট-পালট দিয়েছেন, আশা রাখি ভবিষ্যতেও দেবেন।

ছবি আমি কম দেখি। সত্যজিৎ বাবুর বা মৃণাল সেনের ছবিই আমি কম দেখেছি, বাকিদের ছবি আমি দেখি না। আমার স্ত্রী বা অন্য কেউ দেখে আসে, এসে গল্প-টল্প করে, আমি বলি ঠিক আছে, ঠিক আছে। কী হবে ও-সব দেখে। তোমরা ছবি দেখবে, ভালো লাগলে ভালো, আনন্দ হলে আনন্দ, বেরিয়ে বলবে দূর! আমি ছবি দেখতে ঢুকে ইস্কুলের ছাত্র হয়ে যাই, এই শটের পর এই শটে কাটল কেন? এখানে কাটল কেন, এটা কী করল, ওটা কী করল, continuously brain work করতে থাকি। যদি সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ না করতে পারে যা একদিন 'পথের পাঁচালী' করেছিল, তা হলে শুধু Grammar-এ দিকে চলে যাই, ফলে কোনো আনন্দ পাই না।

প্রশ্ন . 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবির খবর কি?

ঘটক : আর দশ-বারো দিন শুটিং, তারপর কাটাকুটি হ্যান ত্যান— মাস খানেক মাস দেড়েকের কাজ বাকি আছে। ছবি টু-থার্ড হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : ওতেও তো দুই বাংলার ব্যাপার আছে?

ঘটক : যখন লেখা তখন দুই বাংলার ব্যাপার এসে গিয়েছিল, সে সময় আমি সদ্যসদ্য ও-বাংলায় ঢুকে পড়ে খানিকটা চোখে দেখে এসেছি—

প্রশ্ন : 'দুর্বার গতি পদ্মা' ছবি করতে গিয়ে—

ঘটক : হ্যাঁ, ছবিতে অবশ্য কিছুই তুলতে পারি নি, তোলা যায়নি, সম্ভবপর ছিল না, শুধু চোকে দেখে এসেছি। মনের মধ্যে এমনিই একটা semi-romantic ভালোবাসা, তারপর সদ্যসদ্য ওই-সব দেখে এসে ওই একাত্তরের জুন মাসে এছবির script লিখতে বসছি— কাজেই ওই দুই বাংলার ছোঁয়া এখানে আছে। তবে তিয়াত্তরের শেষে গিয়ে, চুয়াত্তরে যদি ছবি release করে একাত্তরের চিন্তাটা যাতে back-dated না হয়ে যায় তার জন্য কিছু রদবদলের প্রয়োজন আছে, সেটা করা গেছে। ছবি শেষ না হলে এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার মানে হয় না, ছবি শেষ হোক, তার পরে—

প্রশ্ন : এছবির মধ্য দিয়ে আপনি কী বলতে যা বোঝাতে চাইছেন?

ঘটক : বলতে আমি কিছুই চাইছি না, বলতে কী চাইছি তা ছবি দেখে বুঝবেন, বলে দিলে মজা নষ্ট। নিজেদের মতো করে বুঝে নেবেন। রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে রবি ঠাকুর যা ভেবে লিখেছিলেন আপনি তো তা ভাবেন না, আপনি নিজের রস দিয়ে একটা কিছু করে নেন।

প্রশ্ন . ছবিটা কি আত্মজীবনীমূলক?

ঘটক : ও-সব মূলক-ফূলক নয়। ঐ সময় আমার জীবনে যা ঘটে গেছে, ঐ একাত্তরে, সেখান থেকেই ছবির starting point। আর ঐ মাতাল অবস্থায় একাত্তরের গোড়ার কলকাতার রকে বসে কলকাতাটাকে খুব ওতপ্রোতভাবে দেখা গিয়েছিল। false হোক আর true হোক আমার যেহেতু একটা status আছ তাই বড়োলোকদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের reaction-গুলোও দেখেছি, তাই আমি সমাজের প্রতিটি স্তরকে কেটে দেখা এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, সমস্ত মানুষ কীভাবে react করেছিল সেসময়, সালতামামি গোছের আর কি। Starting of point আরম্ভটা শুধু আমার জীবনের কিছু ঘটনা দিয়ে।

প্রশ্ন অর্থাৎ আপনি রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থাটা তুলে ধরবার—

ঘটক : ছবির নাম হচ্ছে 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো', 'Arguments and a story'। তোমাদের গল্প না হলে ভালো লাগে না, তাই একটা গপ্পো দিচ্ছি, আসলে এটা যুক্তি তর্ক, it is completely a political film.

প্রশ্ন যুক্তি-তর্কের পর তো সিদ্ধান্তেরও একটা প্রশ্ন আছে— সেই সিদ্ধান্তটা কী? নাকি সেটা দর্শকদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন?

ঘটক : সেটা You see ছেড়ে দিয়েছি কি দিই নি তা আপনারা দেখেন, আমি ও-সমস্ত কথার মধ্যে নেই। মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পটভূমিকা তখন যা ছিল, তা যেভাবে আঘাত করেছিল শহরের মানুষকে, শহরের মানুষ শুধু না এ ছবিতে আমি গ্রাম বাংলাতেও গেছি, তা বেশির ভাগই আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা। এদিক থেকে এছবিকে কিছুটা ব্যক্তিগত, আত্মচরিতমূলক বলা যায় তবে আত্মচরিতমূলক বলতে যা বোঝায়, এছবি সে ধরনের নয়। যা দেখেছি, যা বুঝেছি যা পেরেছি—ছবিতে তা বলার চেষ্টা করেছি। যুক্তি-তক্কো নিয়ে বেশি প্রশ্ন করবেন না। ছবি শেষ হোক, ছবি চলুক, তারপর তর্কাতর্কি করা যাবে।

প্রশ্ন : এবার তা হলে 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি সম্পর্কে কিছু বলুন। ওটা

তো 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পোর' আগেই শুরু বা simultaneously শুরু করেছেন, না?

ঘটক : তিতাসের শ্যুটিং অনেক আগে আরম্ভ হয় কিন্তু কথাবার্তা পাকা হয় আগে যুক্তি-তক্কোর। কিন্তু সরকারি ব্যাপার, ছবিটা এফ. এফ. সি.-র টাকা নিয়ে করা, ঐ টাকা-ফাকা পেতে দু-চার মাস লেগে যায়, ওরই ফাঁকে তিতাসের লোকেরা এসে যায়, আমি ঢাকায় গিয়ে ছবির কাজ আরম্ভ করি।

বাংলাদেশ বলতে আমার যা ধারণা ছিল, ঐ দুই বাংলা মিলিয়ে স্টো যে তিরিশ বছরের পুরোনো সেটা আমি জানতাম না। আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ব বাংলায় কেটেছে। সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই nostalgia আমাকে উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে। তিতাস উপন্যাসের সেই Period-টা হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার, যা আমার চেনা, ভীষণভাবে চেনা। তিতাস উপন্যাসের অন্য সব মহত্ত্ব ছেড়ে দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ডভাবে টেনেছে। ফলে তিতাস একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের— সেই ফেলে আসা জীবনস্মৃতির উদ্দেশ্যে। এ ছবিতে কোনো রাজনীতির কচকচি নেই, উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় এপিকধর্মী, এ ছবিতে আমি প্রথম এই ঢঙটা ধরার চেষ্টা করেছি। আমার শৈশবের সঙ্গে তিতাসের বহু ঘটনা ঝড়িয়ে আছে, অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি, ঐ যে বললাম এই তিরিশ বছর মাঝখানে blank— আমি যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছি।

একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা আমাকে, সত্যজিৎবাবুকে এবং আরো কয়েকজনকে state guest করে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকায়। প্লেনে করে যাচ্ছিলাম, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা cross করছি তখন আমি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেন নি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন . আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি সেই জীবনের মাঝখানে.. এখনো যেন সব সেরকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলে নি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে তিতাস আরম্ভ।

ছবি করতে করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ংকর নিষ্ঠুর, ও হয় না, কিস্সু নেই, সব হারিয়ে গেছে। এছবির script লেখা থেকে শ্যুটিংয়ের অর্ধেক পর্যন্ত আমি মানুষের সংস্পর্শে প্রায় আসি নি। ঢাকায় আমি থাকতাম না, এখান থেকে ঢাকায় touch করে চলে যেতাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া নইলে কুমিল্লা নইলে আরিচাঘাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যর বাজার, এইসব মানে গ্রামে-গঞ্জে-ছবিটা তো নদী নিয়েই, কাজেই সমস্ত সময়েই গ্রামে থেকেছি, ঢাকায় একদিন rest নিয়েছি চলে গেছি, কারুর সঙ্গে দেখা করি নি, মিশি নি ; ওদের রাজনীতি কী হচ্ছে না হচ্ছে তাকিয়ে দেখিনি, খবরের কাগজ পর্যন্ত সবসময় দেখে উঠি নি। কাজেই ছবি করার first half পর্যন্ত এখনকার বাংলাদেশের যা চেহারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, আমি নিজেকে সমস্ত-কিছু থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। তারপর ঢাকায় গিয়ে কয়েকদিন থাকতে হল, ছবির এটা-ওটা-সেটার জন্য। তখন ক্রমশ দেখলাম সমস্ত

জিনিসটা ফুরিয়ে গেছে মানে একেবারেই গেছে, আর কোনোদিন ফিরবে না, এটা খুবই দুঃখজনক আমার কাছে, কিন্তু দুঃখ পেলে কী হবে, ছেলে মারা গেলে লোকে শোক করে কিন্তু it is inevitable.

প্রশ্ন : আপনি কি মানুষের অর্থনৈতিক সংকট, দারিদ্র্য ইত্যাদির কথা বলছেন?

ঘটক : না-না, মানুষের চিন্তাধারা পালটে গেছে, মানুষের মন গেছে পালটে, মানুষের আত্মা গেছে পালটে। টাকা-কড়ির সমস্যা, খাওয়াদাওয়ার সমস্যা, দারিদ্র্য ওখানেও আছে। চুরি জোচ্চুরি বদমাইশি ওখানেও আছে, এখানেও আছে। এখানে চুরি জোচ্চুরি, বদমাইশি, পাইপগান-বোমা-পেটো এ-সব নিয়ে হয়। ওখানে একটা সুবিধে হয়েছে এ ব্যাপারে, খান সেনারা প্রচুর arms ফেলে গেছে, সে-সব দিয়ে ওই-সব হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা একই, মানুষের সাংস্কৃতিক মন পচে গেছে, অতীতের সঙ্গে নাড়ির যোগ একেবারে কেটে গেছে। অবশ্য আশার কথা কিছু Young ছেলে সবে University-তে ঢুকছে, বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে এমন সব ছেলে তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বোধ এবং অত্যন্ত সচেতনতা এসেছে। এরাই ভরসা, ওখানকার ভালো যা-কিছু সবই এদের contribution।

প্রশ্ন : আপনার ছবির ক্ষেত্রে কি interference হয়েছে?

ঘটক : না ছবিতে interference সেরকম কিছু হয় নি। আর্থিক দিক থেকে যখন যা চেয়েছি তা এরা দিয়েছে। আশ্চর্য ঘটনা, শিক্ষাই হল বলা যায়, কলকাতার এই হ্যাংলা জায়গায় থেকে আমার একটা ধারণা ছিল যে ছবির ব্যাপারে পয়সাটাই একমাত্র সমস্যা, পয়সার যদি সমাধান করা যায় অর্থাৎ পয়সাওয়ালা লোক যদি জোটে তা হলে ছবির ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত, পয়সা থাকলেই ছবি হয়। এই প্রথম আমার অভিজ্ঞতা হল শুধু পয়সা থাকলেই ছবি হয় না। ওখানে যন্ত্রপাতি, film-এর অভাব, সে যে কী অসুবিধে কী কষ্ট technician ছাড়া কেউ বুঝবে না, যারা worker তারাই বুঝবে। অসুবিধে এখানেও আছে বম্বেতেও আছে। আমি কলকাতা, বম্বে, পুণা, সব জায়গাতেই ছবি করেছি, অসুবিধেগুলো আমি জানি। কিন্তু সমস্ত অসুবিধে hundred times magnified সেখানে। যন্তর চাই, যন্তর নেই, editing room চাই, নেই, পাওয়া যাবে না। Sound machine এখানে হাত দিলে ওখানে ঝম করে ঝরে পড়ে, সব একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে, misuse করে করে। Brilliant সমস্ত machine, এমন সব machine বাপের জন্মে কখনো দেখি নি, ক্যামেরার যা সব লেন্স আছে ওখানে, বাপের জন্মে এখানে সেসব দেখি নি, কিন্তু বাজে ভাবে use করে, misuse করে এমন কাণ্ড করেছে যে সেগুলো properly use করা যায় না। ফলে প্রতিদিন প্রচণ্ড বিপদ, এবং অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের।

প্রশ্ন : Production-এর অন্যান্য কলাকুশলীরা, শিল্পীরা কিরকম cooperation করেছেন?

ঘটক : না, তারা আপ্রাণ করেছে, ওদের পক্ষে ওর মধ্যে যা possible তা ওরা করেছে। ছবির producer সেও young, অত্যন্ত বড়োলোকের ছেলে, এ-সবের মধ্যে কখনো ঢোকে নি। Film সম্পর্কে ওর ধারণা ঋত্বিকদা একটা ছবি করবে cut to

air conditioned হলে বসে ছবি দেখছি। ছবি করা মানে যে একবছরের প্রচণ্ড পরিশ্রম, সেটা ওর ধারণা ছিল না। টাকা দিলাম, ঋত্বিকদা ছবি করবে, ছবি release হবে, হলে বসে ছবি দেখব, টাকা পেলাম না-পেলাম বয়ে গেল, ছবি না চললে কিছু এসে যায় না, ছবি ভালো করতে হবে। এরকম ছেলে আমি আগে পাই নি। অন্যান্য কলাকুশলী বা শিল্পীরা, সবাই চেষ্টা করছে, খেটেছে, সব জায়গাতেই কিছু ত্যাঁদড় থাকে, ওখানেও ছিল।

প্রশ্ন : আপনার এ ছবি করার ব্যাপারে local industry বা অন্য কোনো তরফ থেকে opposition ছিল কি? এখানকার আর-একজন director-কে তো ছবি করতে দেওয়াই হয় নি।

ঘটক : অন্য কার সঙ্গে কী হয়েছে আমি বলতে পারব না। তবে আমাকে এটা ওরা বলেছিল যে India থেকে শুধু আপনি আসবেন, আমি বললাম যে একজন assistant director, ওরা বলল যে না, তাও চলবে না। আমি বললাম O.K. তাই করেগা, ওহি করেগা। ফলে আমার অসুবিধে হয়েছে। ওখানকার ছেলেদের আস্তে আস্তে তৈরি করে নিয়ে সে অসুবিধে আমি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি, কিছু ছেলে ভালো, প্রাণপণ খেটে cooperate করেছে, কিছু ছেলে করে নি। খবরের কাগজওয়ালারা গোড়ার দিকে আমায় সুচক্ষে দেখে নি, প্রথম প্রথম দল বেঁধে আমার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে। দশ-বারোজন মেয়ের constant role, ঐ মেয়েদের সামনে drink করা নিয়ে ভয়ংকর কথা উঠত। কিন্তু আমার হাবভাব, চলা, বসা, ছবি করা, পদ্ধতি, ঢঙ সমস্ত কিছু তারা দেখেছে, বুঝেছে drink করাটাই সব নয়, drink—করলেও শুটিংয়ে কোনো গণ্ডগোল হয় না, তখন আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা পালটেছে, এবং ঐ opposition-এর বদলে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কাগজওয়ালাদের সঙ্গেও। আমি এখন ফিল্ম লাইনের লোকজনদের কাছেও মোটামুটি accepted।

প্রশ্ন : ছবি কেমন চলছে? লোকে কী বলছে?

ঘটক : ছবি finally আমি কাটতে পারি নি, ছবি কী হয়েছে আমি জানি না, ছবি আমি দেখি নি। অনেকে বলছে editing খারাপ হয়েছে। খবরের কাগজের review দু-চারটে পড়েছি, favourbble, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

প্রশ্ন : আপনি কি editing সম্পর্কে clear instruction দিতে পারেন নি!

ঘটক : আমি বলে দিয়ে এসেছি, কিন্তু তা কি হয়! একটা কথা বলি শুনুন, film director আমরা নই, film director হল যে আর-একজনের গল্প কেনে, একজনকে দিয়ে scenarion লেখায়, নিজে direction দেয় আর direction মানে floor-এ দাঁড়িয়ে থাকে, start-cut করে। ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা সাজায়, সব-কিছু করে, assistant-বা কাজ করে, editor edit করে, music director music take করে। আমরা creator, চিত্রস্রষ্টা। ছবি প্রথম ইঞ্চি থেকে শেষ ফ্রেম অবধি আমার সন্তান, নিজের বাচ্চাকে যেরকম ভালোবাসি, ছবিকে সেইরকমই ভালোবাসি। আমি কাটলাম না, কেটে দেখলাম না কী হয়েছে কাজেই মনের মধ্যে সংশয় থাকবেই। তিতাস আমি সম্পূর্ণ দেখি নি— কাগজে পড়েছি বা লোকজনদের মুখে শুনেছি editing নাকি খারাপ

হয়েছে। যারা বলছে তাদেরও আমি খুব একটা... হয়তো দেখব একটা minor গণ্ডগোল যেটাকে অত্যন্ত বিরাট করে দেখা হচ্ছে। আর public response, প্রথম দিকে দারুণ roaring, ঋত্বিক ঘটকের ছবি যা হয় যথারীতি ঐ, দশ আনা-ছ আনা খালি, একেবারে flop, শিক্ষিত লোকজন ছবি দেখছে, কিন্তু পয়সা উঠছে না। ঐ একেবারে বাঁধা ব্যাপার।

প্রশ্ন : ছবিতে কি সমকালীন জীবনের কোনো পরিপ্রেক্ষিতে বা ইঙ্গিত আছে?

ঘটক : না।

প্রশ্ন : আপনি কি কাহিনীকে হুবহু অনুসরণ করেছেন?

ঘটক : না, সম্ভবও নয়। অদ্বৈতবাবুর কাহিনী অবলম্বনে বলা যায়। ছবিটা আমার মনে হয়েছে খুব delightful। এখানে আসার কথা আছে , যদি আসে তা হলে আমি আবার কেটে, edit করে re-recording করে ছাড়ব। তখন দেখবেন, আমার ধারণা শিশুর মতো সরল মন নিয়ে ছবিটা করা হয়েছে। অদ্বৈতবাবুর পক্ষে যা স্বাভাবিক ছিল তাই তিনি করেছেন, শেষ করেছন একটা অবক্ষয়ের মধ্যে, সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমার রাজনৈতিক বক্তব্য, সেখানে আমি সম্পূর্ণ প্রাণের পক্ষে নতুন জীবনের ইঙ্গি তো ছবি শেষ করেছি, একে Marxism বলা যায়, রাজনীতি বলা যায়-আবার নাও বলা যায়।

প্রশ্ন : ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঘটক : ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে, ভালো এবং খারাপ দুইই। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফলে এদেশের লোক দেশ-বিদেশের বহু ছবি দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যে বহু চিন্তাশীল লোক, ছাত্র, যুবক এবং অন্য ধরনের মানুষও আছেন। লোকে এ-সব ছবি দেখছে, দেখে বুঝছে ছবি এখন আর ফ্যালনা ব্যাপার নয়, সাহিত্যের চেয়ে ছবির মধ্য দিয়ে অনেক বেশি বলা যাচ্ছে বলছেন বিভিন্ন শিল্পী। ফলে একটা নতুন বোধ আসছে, রুচি পালটাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমরা ছবি করতে সাহস করছি, আর ঐ আগে যে Young audience-এর কথা বলছিলাম, তাদের ছবি নিয়ে যে এই প্রচণ্ড আগ্রহ, সে ব্যাপারে film-society movement-এর contribution অনেকখানি। সেদিক থেকে একে hail করা উচিত, অভিনন্দন জানানো উচিত। খারাপ দিক হচ্ছে ঐ censorship তুলে নেওয়ার ফলে কিছু বাজে লোকজন এ-সবের মধ্যে ভিড় করছে। আমি ছবি বিশেষ দেখি না তবে 'ঐ' সব ছবি নাকি অনেক আসে-টাসে বলে শুনেছি আর ঐ ধরনের ছবি দেখতে যারা ভিড় করে তারা শিল্প করতে যায় না। তা এ ব্যাপার avoid করা যায় না, ভালোর সঙ্গে কিছু খারাপ থাকবেই।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র সমালোচনা বা সমালোচকের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

ঘটক : কলকাতায় তিন ধরনের film journalist আছে। এক হচ্ছে তথাকথিত national papers, এখানকার film journalist-রা মোটাসোটা মাইনে পান, আর-এক হচ্ছে প্রসাদ-উল্টোরথ জাতীয় সাংবাদিক, রগরগে খবরেই তাঁদের উৎসাহ, বেশির ভাগ ঐ actor-actress নিয়ে। আর তৃতীয় হচ্ছে film society-র আশেপাশের লোকজন, যাঁরা কাগজ বের করেন, film-টাকে seriously নেবার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে প্রথম দুটো group সম্পর্কে বলে কিছু লাভ নেই। ছোটো ছোটো অনেক কাগজ

বেরোয়, আমার লেখাও মাঝে মাঝে বেরোয় শুনেছি, লেখা নিয়েও যায় আমার কাছ থেকে। কিন্তু সাহিত্য বলছি, magazine আমি বিশেষ পড়ি না। খুব বেশি আমি পড়ি না তবু আমার সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এই-সব কাগজের role অত্যন্ত progressive। মধ্যে মধ্যে অনেক লেখা দেখি যাতে কাঁচা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, আমি বলছি কাজেই ভুল হোক বা ঠিক হোক, আমি বলছি। এই ধরনের ছেলেমানুষি, কিছু কিছু ছেলেপিলের লেখার মধ্যে থাকে, এগুলো খুবই স্বাভাবিক, এগুলো তারুণ্যের ধর্ম। সময়ে সময়ে অত্যন্ত ভালো লেখাও চোখে পড়ে। অত্যন্ত সীরিয়াস লেখা। দেশবিদেশের বিভিন্ন ভালো ছবি, বিভিন্ন শিল্পীরা যে-সব পরীক্ষ-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তার সঙ্গে ফিল্ম সোসাইটির এখানকার অনেক মানুষের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। অর এই সব নিয়ে লেখা, ছবির আলোনা, বুদ্ধিমানের মতো লেখা— এ-সবের ফলে একটা পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, যাঁরা বুঝতে পারছেন কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল। সেদিক থেকে contribution নিশ্চয়ই আছে।

প্রশ্ন সুস্থ হয়ে উঠে আপাতত কী করবেন?

ঘটক : 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো' শেষ করব, আর তিতাসের editing।

প্রশ্ন . অন্য ছবি কিছু ভাবছেন?

ঘটক . আপাতত কিছু ভাবা নেই, তবে ছবি করে যেতে হবে, খেতে হবে তো, পেটে দানাপানি ভরতে হবে, ছবি করা ছাড়া আমি আর কীই বা জানি, বয়সও তো পঞ্চাশের কাছে এসে গেল. ।

কিছু প্রশ্ন নিয়ে ঋত্বিক ঘটকের মুখোমুখি

প্রশ্ন : ছবিতে আপনি যে চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেন বাস্তবতার সঙ্গে সেই চরিত্রগুলির কিছু অসংগতি বা অমিল দেখা যায়। আপনি কি মনে করেন তা সত্ত্বেও আপনার ছবির মধ্য দিয়ে যে character-গুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো কোনো elemental বা basic চরিত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে?

ঘটক : আমার কী মনে হল সেটা বড়ো কথা নয়, দর্শক কী মনে করেন সেটাই হচ্ছে আসল কথা। আমার ছবিতে আমি চরিত্রগুলোকে পার্থিব জগতের সঙ্গে যুক্ত করে রাখি, ছোঁয়া দিয়ে আটকে রাখি— তারপরে কিন্তু তারা এক-একটা চিন্তাগত ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে। যে-কোনো একটা ছবির প্রসঙ্গ এলে আমি বলতে পারব— এই এখনি যে ছবিটা তোমরা দেখে এলে, 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'— এছবিতে শাওলির চরিত্র তো ঠিক বাস্তব চরিত্র নয়, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ সম্পূর্ণ, at least আমার তো তাই ধারণা। তারপর এই চরিত্রের মধ্যে আমি সারা বাংলাদেশটা প্রতিভাত করার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের ছবিতে বাঙালি মেয়েদের সবসময়েই দেখা যায় ন্যাকা-ন্যাকা, আহ্লাদে-আহ্লাদে পুতু-পুতু, কিন্তু বাঙালি মেয়ে তা নয়। আমি তাই এনেছি এক

তেজ-দৃপ্ত মেয়ে— আর তার মধ্য দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশেব আত্মাটাকে ধরার একটা চেষ্টা করেছি। কথা হচ্ছে সমস্ত ছবিতে আমি কিছু-না-কিছু ধারণা ভাবনা একটা চরিত্র দিয়ে ফোটাতে চেষ্টা করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি জগৎ-বহির্ভূত কিছু করি। তা বোধ হয় করি না।

প্রশ্ন : পুরাণ, myth ইত্যাদি এবং অধুনা জীবন আপনার ছবিতে মিশে যায়— এটা কি আপনি deliberately করে থাকেন?

ঘটক : এটা আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ব্যাপার। কারণ আমি মনে করি যে আমাদের দেশেব যে বিরাট store-house আছে, যে ভাণ্ডার আছে, myth, পুরাণ ইত্যাদি— তার মধ্যে যে wisdom আছে, যে জ্ঞান আছে সেগুলো আজকালকার আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি। আমরা সেগুলোকে আর পাত্তা দিই না অথচ তার মধ্যে প্রচুর সত্য আছে। এবং সেগুলোকে যদি আজকের জগতের জন্য shorn of its mysticism ধরি তবে দেখব সেগুলো জানা আজও প্রয়োজনীয়— আমি যেটুকু ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তা থেকে এটা বলতে পারি। আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, তার মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শ্রুতির সমস্ত অংশ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্য। এগুলো নিয়ে পড়াশুনা করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশেব প্রাচীন ঋষিই বল আর যাই বলে ঐ লোকজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা human psychology কত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। আজকের psychiatrist-এ পৌঁছোচ্ছেন যা ঐ প্রাচীন ব্যাপারগুলো আছে। কাজেই সেটাকে টেনে বার করার একটা প্রয়োজন আছে— টেনে বার করে সেগুলোকে আজকের জগতের সঙ্গে দাঁড় করাতে হবে, এটা হল এক নম্বর ব্যাপার, আর দুই হচ্ছে যে আমি যদি সোজাসুজি একটা বক্তব্য place করতে যাই তা হলে সেটা alien হয়ে যায়। এবং যখন সেটাই হয়ে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা— আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছবি করছেন বড়ো alien হয়ে যাচ্ছেন। আমার দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখাটা ভীষণ প্রয়োজন-- আমার দেশের মানুষকে তাতে অনেক তাড়াতাড়ি convince করা যায়, অনেক তাড়াতাড়ি জয় করা যায়— কেননা এগুলো রক্তের মধ্যে রয়েছে আমাদের।

প্রশ্ন : মানে গোটা ব্যাপারটাকে acceptable করার প্রয়োজনে—

ঘটক : শুধু acceptable করানোই নয়। At the same time it contains a very big amount of truth, as far as human psychology is concerned.

প্রশ্ন : আপনার ছবিতে উপস্থিত চরিত্র ও ঘটনার দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের ideological base-টা কী।

ঘটক : Ideological base-টা basically fundamental Marxism. Marxism not in the sense of this party or that party. Marxism Philosophically, psychologically— Marx, Engels, Lenin— এঁদের লেখার অনেক ছোঁয়া আছে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে— এ ছবিতেও আছে যুক্তি তক্কোতে অ্যান্টি ডুরিং-এর প্রচুর touch আছে, আলোচনা করলে আমি করতে প্রস্তুত। এটা completely philosophical লেখা। এই আমার basis।

প্রশ্ন : form বা Structure-এ আপনি ঐ পুরাণ বা myth ইত্যাদি ব্যবহার করছেন মার্কসবাদকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করানোর জন্য— এটা কি বলা চলে?

ঘটক : আমি একীভূত করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : চলতি ভাষায় আমরা যাকে melodrama বলি, আপনার ছবিতে সে জাতীয় ব্যাপার থাকে, ঐ repitition, co-incidence ইত্যাদির বাহুল্য বা ছড়াছড়ি, এটা কি আপনি deliberately করেন, আপনার কি ধারণা এ ব্যাপারগুলো নিয়ে এই form আলাদা কোনো dimension পায়?

ঘটক : definitely। আমি মনে করি film-form or any other art-form primarily একটা make-belife। যারা ছবি দেখতে হলে ঢোকে তারা কেউই বাস্তব দেখতে যায় না। তারা সাধারণভাবে যায় entertained হতে। তা entertain করার চেষ্টা-ফেষ্টা খানিকটা করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে আমি তাদের educate করতে চাই। এবং এটা করার জন্য আমাকে যদি lost of co-incidence use করতে হয় আমি তা করব। লোকে জানে যে সে একটা গল্প দেকছে— লোকে জানে এটা বাস্তব নয়। Documentary যখন কবব তখন পুরোপুরি documentary করব, কিন্তু যখন বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য একটা কাহিনীর বিন্যাস করব তখন যদি আমাকে co-incidence use করতে হয় আমি any amount of co-incidence use করতে ভয় পাই না আর meldrama আমি কোনোরকম ভয়ই পাই না। Melodrama হচ্ছে একটা brith-right, এটা একটা form।

প্রশ্ন: এটা তা হলে আপনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন?

ঘটক : নিশ্চয়ই, আমার মনে হয় এটা প্রয়োজন। লোকের যদি মনে না হয় তো ঠিক আছে, they are at liberty to have their opinions। কিন্তু আমি মনে করি আমায় এটা করতে হবে তা না হলে আমার বক্তব্য সোচ্চার হবে না। বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য আমি যে-কোনো form, সে lyric থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে প্রস্তুত। আমাব ছবিতে গানের ছড়াছড়ি থাকে। আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা নতুন ধরনেব ছবি করেন তাঁবা ছবিতে গানের ব্যবহারটা খুব নফরৎ করেন, গানটান ব্যবহার কবেন না। আমি করি এবং গান দিয়ে যদি আমার বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো ব্যবহার কবব' সোজা কথা আমার হাতে যা অস্ত্র আছে আমি তাই ব্যবহার করব।

প্রশ্ন : আপনি পুরাণ, myth ইত্যাদিকে আশ্রয় করে ছবিতে একটা ভারতীয় form বা structure-কে অবলম্বন করতে চাইছেন এটা ধরে নিচ্ছি। এখন এই tune-টা আপনার ছবির মিলন আনন্দ ইত্যাদি sequence-এর সঙ্গে মেলে, কিন্তু যন্ত্রণা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদির কাছাকাছি গিয়ে ছবির সুর যেন অত্যধিক চড়া হয়ে যায় এবং তখন যেন একটা jerk লাগে, এই অংশগুলো তখন যেন পশ্চিমী ছবির স্টাইলের সঙ্গে মেলে— আপনি কি এ-ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?

ঘটক : এ বিষয়ে আমি কিছু ভাবি নি। আমি ওভাবে ভেবে কাজ করি না, আমি অনুভব করেছি ওভাবে ওকথাটা বলা দরকাব তাই করেছি। আমি ওভাবেই বলেছি,

সব ছবিতে বলেছি। তোমাদের একটা কথা বলেছি তোমরা যে-কোনো serious film-maker-কে তার কাজ analyse করতে বলো, সে পারবে না, পাবার চেষ্টা যদি সে করে তা হলে জেনে রাখো সে গুল মারবে। কতকগুলো sub-conscious ব্যাপার কাজ করে, কতকগুলো unconscious... একটা অন্ধ আবেগ একটা প্যাশন, একটা blind urge... সেটাকে পরে অঙ্ক কষে অনেক কিছু বানিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি actually আমি যখন ও-সব করেছি, তখন অত ভেবে কিছু করি নি। মনে হয়েছে এটা দরকার, করেছি। এই জিনিসগুলোকে সমালোচনার অংশ হিসেবে যিনি স্রষ্টা তাঁকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। সব শিল্পকর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে যে-কোনো sincere শিল্পকর্মের পেছনে একটা blind urge একটা অন্ধ আবেগ কাজ করে।

কাজেই ও-সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। আমি বলতে পারব না। আমি যদি মিথ্যেবাদী হই তো বানিয়ে অনেক বড়োবড়ো কথা বলতে পারি। আমি বাপু ও-সব ভেবে করিনি, মনে হয়েছে ওটা দরকার, করেছি। এই জিনিসটা না থাকলে এই freedon না থাকলে, নিজের mind-কে completely free access না দিলে শিল্প সৃষ্টি mechanical হয়ে যায়, নিতান্ত কেরানী-মার্কা মাজাঘষা কাজ হয়— তাতেও ভালো কাজ হয়তো হয়, আমি জানি না— কিন্তু সত্যিকারের দরদ তাতে থাকে না। সত্যি সত্যি যদি দরদ থাকে তো অনেক জায়গাতেই অত ভেবে-চিন্তে কিছু করা যায় না। মনে হয়েছে— করেছি, finish, এখানে আর বেশি-কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : আপনি অনেক জায়গায় বলেছেন, বহু জায়গায় লিখেছেন সি. জে. ইয়ুং-য়ের তত্ত্ব সম্পর্কে, stream of collective unconsciousness। আবার আপনি বলছেন আপনার ideological base হচ্ছে Marxism— ইয়ুং-এর তত্ত্ব কি মার্কসবাদের পরিপূরক?

ঘটক : সম্পূর্ণ পরিপূরক। ইয়ুং-এর তত্ত্ব যদি তোমরা পড়াশোনা করে থাক, I hope you have read, তা হলে দেখবে ইয়ুং-এর তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনো গণ্ডগোল নেই। মার্কস একটা জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ইয়ুং অন্য একটা জগৎ নিয়ে। দুটোর মধ্যে কোনো inner contradiction নেই, আমি বলছি কোনো inherent contradiction নেই। Collective unconscious মানুষের unconscious behaviour-কে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আর entire class structure conscious behaviour-কে determine করবে। কিন্তু unconscious যেমন dream world, তুমি আমি স্বপ্ন দেখি, মার্কসবাদ দিয়ে তাকে analyse করে কি কোনো লাভ হবে? সেখানে ইয়ুং, this is what I feel. ইয়ুং-এর সঙ্গে মার্কসের কোনো বিরোধ নেই, দুজনে দুই জগৎ নিয়ে কারবার করেছেন। দুটো প্রচণ্ডভাবে পরস্পরের পরিপূরক।

আমার ছবিতে ইয়ুং-এর যে ব্যাপারটা প্রচণ্ডভাবে আসে সেটা হল ঐ mother complex। আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছিল তোকে মা-এ খেয়েছে। আমার সমস্ত ছবিতে ঐ মা এসে পড়ে— তা মা-এ খেয়েছে কেন? এই যুক্তি তক্কো ছবির entire ছৌ নাচটার raison-de-tre হচ্ছে মা— mother complex। এখানে ঐ মেয়েটাকে

—শাঁওলিকে তার সঙ্গে equate করো, জ্ঞানেশ বলছে নাচো তোমরা নাচো, তোমরা না নাচলে কিছু হবে না। এটা সম্পূর্ণ ইয়ুংয়িয়ান, তিতাসে ছেলেটি স্বপ্ন দেখে মাকে ভগবতীরূপে, এই mother complex একটা basic point।

প্রশ্ন : ভগবতীর প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। ছেলেটি মাকে ভগবতীরূপে ভাবছে, এই ধর্মীয় ইমেজ, এই অলৌকিকত্ব কি ধর্ম বা অলৌকিকতা সম্পর্কে কোনো মোহ সৃষ্টি করে না?

ঘটক : এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : কিন্তু সাধারণ দর্শকমানসে এর প্রতিক্রিয়া—

ঘটক : সাধারণ দর্শকমানসে যদি এর ফলে কোনো মোহ সৃষ্টি হয় তো আমি নাচার, আমার বলার কিছু নেই। আমার দিক থেকে এ ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। Primordial force হচ্ছে ভগবান, you can not deny it, basic primordial force হচ্ছে mother complex-- মা—

প্রশ্ন : কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়— আপনি বেদ-উপনিষদের প্রসঙ্গ এখনকার জীবনের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ব্যাপারটা বিমূর্ত ভাববাদ হয়ে যায় না কি? Indian tradition-এর তো একটা class base আছে, সেটাকে আধুনিক জীবনের সঙ্গে মেলাতে গেলে তা বিমূর্ত বা ভাববাদী দর্শন হয়ে যেতে পারে না কি?

ঘটক : পারে। নিশ্চয়ই পারে। risk থেকে যায়। কিন্তু সেই risk-এর মধ্যে আমি বোধ হয় যাই নি।

প্রশ্ন : এ ছাড়া আর-একটা প্রশ্ন— আপনি ছবিতে classical music ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেন, folk culture-এর বিভিন্ন element কাজে লাগান, কিন্তু traditional বা classical form of art যেগুলি শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সৃষ্ট ও পুষ্ট সেগুলি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে বর্তমানে চীনে folk music-এর class division নিয়ে যে জাতীয় আলোচনা হচ্ছে—

ঘটক : চীনে কী আলোচনা চলছে আমি জানি না। কিন্তু আমার নিজের একটা ধারণা আছে। সেই Primitive Communism-এর পরের যুগ থেকে সব যুগই class divided। সেই Primitive Communism-এর period-বিশেষ কোনো শিল্পকর্ম সম্পর্কে এক ঐ স্পেনের আলতামিরা বা কাইমুর রেঞ্জের গুহাচিত্র ছাড়া, আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কাজেই যা হয়েছে যা জানি তা সবই ঐ class-art, আমি তার প্রত্যেকটার অংশীদার। প্রশ্ন হল আমি কিভাবে সেটাকে apply করব, basic point হচ্ছে application— যে ভাষায় আমি কথা বলছি পাণিনির ব্যাকরণ থেকে derivation অপভ্রংশ— অপভ্রংশ থেকে অর্ধবহ, অর্ধবহ থেকে বাংলা এসবই শ্রেণীর সৃষ্টি, class-কে বাদ দিয়ে আমি যাব কোথায়? Proper Communism আসে নি কোথাও, সে সোভিয়েত ইউনিয়নই বলো আর চীনেই বলো। All art-work is class work, সমস্ত কিছুই class based, classical music নিশ্চয়ই class music। এখন আমি আমার চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি দিয়ে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সে সমস্তকেই ব্যবহার করব, ব্যবহার করব আমার প্রয়োজনে।

প্রশ্ন : আচ্ছা এবার 'যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো' নিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করছি। আপনি এ ছবিতে আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অধুনা সমস্যার কথা বলতে চেয়েছেন? কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানের দিক থেকে এ ছবির মূল্য কতটা?

ঘটক : এটা আমার নিজের পক্ষে কি বলা সম্ভব? যারা দেখবে তারা যদি এর কোনো মূল্য খুঁজে পায় তা হলেই ব্যাপারটা সার্থক হয়ে উঠবে। আমার মনে হয়েছে আমাদের জীবনে একটা অভাব ঘটেছে— সেই অভাববোধকে যদি জাগ্রত করতে পারি সেটাই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু আমি slogan mongering-এ বিশ্বাস করি না, তাই আমি এ ছবিতে কোথাও slogan দিই নি। আমি খালি জিনিসটাকে তুলে ধরেছি— such is the present-day Bengal। এখন তোমরা যদি এটা নিয়ে একটু ভাব, এই ছবি যদি তোমাদের ভাবায় যে way-out কী— তা হলেই আমার সার্থকতা।

প্রশ্ন : গোটা সমাজব্যবস্থা এই সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী, আপনার ধারণা এই বক্তব্যটা কি ছবির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে?

ঘটক : বের করার চেষ্টা তো করেছি। বেরিয়ে এসেছে কি না সে বিচার করবে তোমরা।

প্রশ্ন : যদি বেরিয়ে আসে তা হলে সাথে সাথে এই সমাজ ব্যবস্থা পালটাবার প্রশ্ন তো এসে পড়ে।

ঘটক : নিশ্চয়ই আসে, কিন্তু কোন্ দিক থেকে?

প্রশ্ন : নিশ্চয়ই positive দিক থেকে।

ঘটক : কিন্তু কোন্ positive দিক? positive দিকটা কোথায়?

প্রশ্ন : সেটা একমাত্র সামাজিক বিপ্লবেব মধ্য দিয়েই হতে পারে।

ঘটক : সামাজিক বিপ্লব বলতে কী বোঝাচ্ছ! কোন্ দিকে—

প্রশ্ন : অবশ্যই মার্কসবাদ ভিত্তিক পথে।

ঘটক : হ্যাঁ মার্কসবাদ ভিত্তিক, কিন্তু—

প্রশ্ন : আপনি বলছিলেন যে আপনি সমাজের দ্বন্দ্বগুলো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, তাই যদি হয় অর্থাৎ দ্বন্দ্বগুলো যদি মার্কসবাদকে ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করি তা হলে এই দ্বন্দ্বের সমাধানও একমাত্র মার্কসবাদ ভিত্তিকেই হতে পারে।

ঘটক : কোন্‌টা সমাধান? সমাজ অত্যন্ত জটিল বস্তু। এর মধ্যে বহু ধারা-উপধারা প্রবাহিত। কোন ধারাকে কী ভাবে এগোব— এটাই প্রাথমিক প্রশ্ন।

এখন এদেশেব যা অবস্থা যে অব্যবস্থা সমস্তই হচ্ছে ঐ great betrayal— সেই সাতচল্লিশের তথাকথিত 'স্বাধীনতা'-র reasult। এটা আমি ছবিতে বলেছি। এখন আমরা কিসের মধ্য দিয়ে pass করছি neo-colonialism, absolutely neo-colonialism, এটা আমি ছবিতে বলি নি, একথাগুলো বলতে গেলে আমার ছবি রাজনীতি হয়ে দাঁড়াত, ছবি হত না। আমি in human terms ব্যাপারটা ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি slogan mongering করে, বড়ো বড়ো বাতেলা করে সমাধান দেখিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার নিজের ধারণা এদেশে কেউ সেভাবে সমস্যাগুলোকে ধরার চেষ্টা করে নি। আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে

ছুড়ে ফেলতে পারি যে এই হল তোমাদেব সমস্যা, এখন ভাবো— what is to be done? তা হলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ।

সমস্যাটা কোথায় everybody knows। সমাজের সেই উচ্চতম স্তর থেকে নিম্নতম পর্যন্ত আমি মিশি, আমি মিশেছি— প্রত্যেকে জানে। একদল আছে যারা এই অবস্থা থেকে ক্ষীর লুঠছে, ননি লুঠছে, সব লুঠছে, কাজেই এই অবস্থাটা তারা perpetuate করতে চায়। আর-একদল দিশেহারা হয়ে ঘুরছে কতকগুলো নেতার পেছনে যেগুলো প্রত্যেকটা চোর, প্রত্যেক তাদের নাম বজায় রাখা, পয়সা করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এরা এইসব লোকের দ্বারা বিভ্রান্ত। এই হল অবস্থা, কিন্তু কারো কাছে কোনো কিছু লুকোনো নেই। জিনিসটা অত্যন্ত প্রকট, সূর্যের আলোর মতো প্রকট। এই যে ছেলেপিলেগুলো বখে যাচ্ছে, রাস্তায় বেরোলে দেখি আজকালকার ছেলেপুলেরা যে ধরনের behaviour করে তা বলা যায় না, এ সমস্তই হচ্ছে frustration-এর ফলে।

এবং এখন আমার নিজের ধারণা দুটো রাস্তা পরিষ্কার— হয় straight fascism আর নইলে Leninist পথে কোনোকিছু। তোমরা যদি ২৯ থেকে ৩৩ সালের জার্মানির দিকে তাকিয়ে দেখো তো দেখবে যে এই যে এখানে পনেরো-ষোলো বছর থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের ছেলেরা বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছে এটা যেন তারই প্রতিরূপ। এরাই S.S., এরাই গেস্টাপো এই lumpen-দের থেকেই তৈরি হচ্ছে ভীষণভাবে। গোটা সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে চুরমার হয়ে— দুটো পথ খোলা— হয় Leninist পদ্ধতিতে নিয়ে যাবার একটা ব্যাপার আছে, নইলে clean fascism হবে। এবং আমার ধারণা within three four or five years এটা হবে— হয় এদিকে নয় ওদিকে। এ চলতে পারে না। ছবিতে এ বলার অবকাশ নেই, কেননা আমি জানি এদেশে leadership বলে কোনো পদার্থ নেই।

প্রশ্ন : যুক্তি, তক্কো আর গপ্পো-তে একটা sequence-এ আপনি সাদা ধবধবে পাহাড়, গাছ এবং তিনটে black মানুষ নাচছে দেখিয়েছেন— এই setটা কি সুররিয়্যালিস্টিক?

ঘটক : ও-সব আমি বলব না, আমি stamping করতে রাজী নই, আমি সুররিয়্যালিজম-ফিজম বুঝি না বাবা, আমার ইচ্ছে হয়েছে, করেছি!

[আমাদেব মধ্যে দীপক দে এই প্রশ্নটা করেছিলেন। দীপক ছবি আঁকেন। আমরা বলি ও আর্টিস্ট বলে এই প্রশ্ন কবেছে. আমরা কিন্তু এখন ছবিব অতশত ডিটেলস নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি না। আপনি বুনুয়েলেব ভাবশিষ্য— বুনুয়েলের সঙ্গে সালভাদোর দালি, এসব জড়িয়ে বোধ হয় দীপক প্রশ্নটা বেখেছেন।]

— বুঝেছি, বুঝেছি। আমি বাপু বলতে চেয়েছি ভূতের নৃত্য চলছে গোটা বাংলাদেশ।

প্রশ্ন : এবং ওখানে যে স্থবির ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখেছেন সে বোধ হয় ভারতবর্ষ, সে যেন অপেক্ষা করছে—

ঘটক : হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ, অপেক্ষা করছে, তোমরা নাচন-কোঁদন, কীর্তন করে যাচ্ছ, যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছে, all political leaders। এবং এই ভূতের নৃত্যের জন্য তুমি এবং তোমরা দায়ী এটা বার বার বলা হয়েছে। dancing figure-গুলোর আঙুল তোমাকে সব সময়ই point out করছে— you are responsible।

একে তোমরা সুররিয়্যালিজম বলো আর যাই বলো, আমি ঐ-সব ইজম-ফিজমের মধ্যে নেই, আমি কোনোরকম ছবি আঁকার coterie-এর মধ্যে নেই। আমার যা ভালো লেগেছে তাই করেছি।

প্রশ্ন : এবার 'তিতাস' নিয়ে দু-একটা প্রশ্ন করছি। তিতাস এপিকধর্মী উপন্যাস। আপনি ছবিকে সাহিত্য-আশ্রয়ী করতে চেয়েছেন তবু ছবির episodeগুলো কীরকম বিচ্ছিন্ন এবং disjointed লাগে। যেমন ধরুন ঐ মালোদের সঙ্গে ভাগচাষীদের linkটা যেন কোথাও কীভাবে হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়—

ঘটক : না, হারায় নি। আর-একবার দেখলে বোধহয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ঢাকায় আমাকে এই প্রশ্নই করেছিল, আমি তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম। জিনিসটা কী? জিনিসটা হল একটা নদী তিতাস। নদীমাতৃক সভ্যতা আমাদের পুব বাংলা। তোমরা পুব বাংলার কতটা দেখেছ আমি জানি না, কতটা গভীরে ঢুকেছ তাও জানি না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষভাবে গভীরে ঢুকেছি। তিতাস একটা নদী— যে নদী হচ্ছে sustaining force। সেই নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে— তারপর একদিন সে নদী শুকিয়ে গেল। তখন নদীর মধ্যে যে জমিটা জেগে উঠল তা আর জেলেদের থাকল না, তখন চাষীরা fore-front-এ এসে গেল।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রশ্ন হল বাবুদের সঙ্গে মালোদের contradiction এবং সংঘাতের বিষয়টা নিয়ে ছবিতে গণ্ডগোল বেধেছে বলে মনে হয় এবং মনে হয় বলেই বাসন্তীদের সঙ্গে কাদের আলিদের মেলাতে পারি না। বাবুরা যে মালোদের সম্প্রদায়গত ভাবে উৎখাত করছে সেটা তো শুধু বাসন্তীদের মতো মেয়েদেব রূপ-যৌবনের জন্য নয়, তারও তো একটা economic base আছে, সেটা—

ঘটক : economic baseটা তো বার বার ছবিতে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ওই যে টাকা ধার দেওয়া, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ— তারপরে একদিন বাড়ি ঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া— economic base-টাই তো মূল ব্যাপার। ঐ so-called স্বাধীনতার আগের পুব-বাংলাকে তোমরা যদি জানতে তো বোধহয় এ প্রশ্ন করতে না। বাবুরা যে কী পরিমাণ অত্যাচার করেছে ওদের ওপর, ঐ তোমরা যাকে scheduled caste বলো তাদেব ওপর সে ভাবা যায় না। এবং সেকালেই thay all voted for Muslim League. এবং during partition এবং before partition they all sided with Muslim League. এবং after partition তারাই রয়ে গেছে। যতগুলো জমিদার, সবগুলো চোর almost all, very few হয়তো ভালো। ওইভাবে কতবার যে তারা কতলোককে কত সম্প্রদায়কে উৎখাত করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমি নিজে জমিদার বাড়ির ছেলে— আমার নিজের পরিবারে নিজের বাড়িতে আমি দেখেছি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কোনো ব্যাপার নয়, ঐ বাবুরা মুসলমান চাষীদের ওপর অত্যাচার করেছে, হিন্দু চাষীদের ওপরও অত্যাচার করেছে। ঐ so-called scheduled csste-দের ওপর।

প্রশ্ন : ছবির শেষ যেন সেই সুবর্ণরেখার মতো। একটা আশার প্রলেপ— আপনি যেন এটা খানিকটা impose করে দিয়েছেন যা রোম্যান্টিকতায় আচ্ছন্ন। ওখানে সীতা

এখানে বাসন্তী। সীতা-বাসন্তী যেন একাকার হয়ে গেছে।

ঘটক : আমি রোম্যান্টিক তো একটু বটেই— একনম্বর। আর দুনম্বর আমি যেটা বলতে চেয়েছি, তাকে romantic-ই বলো আর যে, language-ই use করো, সেটা হল সভ্যতার মৃত্যু নেই। অযান্ত্রিকের ভাঙা গাড়ি চুরমার করে জগদ্দলকে নিয়ে চলে গেল— বিমল দেখছে। যে শিশুটি বহুদিন ধরেই inquisitive ছিল, অযান্ত্রিকের গলা তার কাছে ফিরে আসছে, সে hornটা বাজাচ্ছে এবং লোকটা হাসছে। এই ব্যাপারটা আমার সমস্ত ছবিতেই থাকে। একে romanticism বলতে পারো— I may be romantic। সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতা পরিবর্তিত হয় কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। সেখানে তিতাসে ধানের খেত জন্মেছে, সেখানে আর-একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর. individual মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা থেকে আর-একটা ধাপে গিয়ে পৌঁছোয়, সেকথাটাই আম ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি। I can not end in a pessimistic mood, সেটা তা হলে মিথ্যা বলা হবে।

প্রশ্ন : পরের ছবি নিয়ে কি কিছু ভাবছেন?

ঘটক : ভাবছি, জানি না কী হবে— কী বলব, এখনো তো কিছু ঠিক হয় নি। বছর খানেক আগের একটা সত্য ঘটনা— নবদ্বীপের একটি মেয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া দারুণ contrast ঐ নবদ্বীপেই সেই নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া, তার অপরাধ সে রূপসী এবং গরীব ঘরের মেয়ে। কয়েকজন মস্তান তার পেছনে লাগে এবং সে আত্মহত্যা করে। এটুকুই কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু যেটা বেরোয় নি সেটা আমি একজন সাংবাদিকের কাছে জেনেছি, সে ওখানে থাকে, মেয়েটি মোটেই আত্মহত্যা করে নি, she was raped and burnt to death. এই আমার গল্প, এই আমার ছবি।

সাক্ষাৎকার

আপন চলচ্চিত্র

প্রবীর সেন : আপনি ছবি করেন কেন?

ঋত্বিক ঘটক : ছবি করি? এই মোটামুটি পাগল বলে তাই। ছবি না করে তো বাঁচতে পারি না। একটা কিছু করতে হবে তো? কাজেই এই ছবিই করি, আর কিছু না।

প্র : ছবি আপনি যখন তো করতে যান তখন বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় কোন্ ব্যাপারের দিকে নজর রাখেন?

ঋ : মানুষের দিকে। তাৎক্ষণিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কোন্‌দিকে যাচ্ছে সেটার দিকে তাকাই। এবং টু দি বেস্ট অব মাই এবিলিটি আমি সেটাকে বলার চেষ্টা করি। আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমার দেশের মানুষ। আমার আর কিস্যু নেই। সে, দেশের

মানুষ আমাকে গ্রহণ করুক, কি বর্জন করুক, যায় আসে না। কিন্তু আমার একমাত্র ঘটনা হচ্ছে আমার মানুষ। আবার আর কিছু কী আছে?

প্র : ছবি তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?

ঋ : ছবি তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভালো করা। মানুষকে ভালো না করতে পারলে কোনো শিল্পই শিল্প হয়ে দাঁড়ায় না। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে, শিল্পকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। এই সত্য মানুষের নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে আসে, কারণ সত্য কোনো সময়েই শাশ্বত নয়। এই পৃথিবী সব সময়ে অপেক্ষমাণ। প্রত্যেককে নিজস্ব সত্য জীবনের গভীরতা দিয়ে অর্জন করতে হয়। এটা অনুভব করে গ্রহণ করা উচিত। শিল্প এত সহজ জিনিস নয়।

প্র : ছবির ক্ষেত্রে কোন্‌টা বড়ো? সাহিত্যমূল্য না চলচ্চিত্রায়ণ?

ঋ : এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি বুঝতে পারি না। ঘটনাটা হচ্ছে, মানবজীবনের বিভিন্ন প্রকাশ। এর মধ্যে কোন্‌ মিডিয়ামকে আমি ব্যবহার করলাম, সেটা একদম কোনো বড়ো কথাই নয়। মানুষকে ভালোবাসাটাই বড়ো কথা। শুধু জীবনযাপনের, প্রাণধারণের গ্লানি— এটাই কি জীবন? ভালোবাসতে গেলে সেটা প্রাণ দিয়ে করতে হয়। এবং আমি জানি না আমি পেরেছি কি না।

প্র : আচ্ছা, 'মেঘে ঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা' এই ছবি তিনটির মধ্যে কোনো অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আছে কি? থাকলে একটু বিশদ করবেন।

ঋ : এর মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অন্তর্নিহিত সূত্র আছে। 'মেঘে ঢাকা তারা' ওয়াজ কমপ্লিটলি মাই... ইন মাই সাবকনশাস অ্যাফেয়ার। 'কোমল গান্ধার' ওয়াজ এ ভেরি কনশাস অ্যাফেয়ার। আমার এই মহিলার সঙ্গে বিবাহ-ব্যাপারটা তার সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে জড়িত। আর 'সুবর্ণরেখা' ইজ এ ভেরি সীরিয়াস ওয়র্ক। ওখানে খাটতে হয়েছে, হ্যাঁ, মানসিকভাবে... এ ওয়র্ক বিহাইণ্ড। দৈহিকভাবে খাটার ব্যাপার নয়, মানসিকভাবে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে এবং এটাকে আমাকে দাঁড় করাতে হয়েছে। কদ্দূর দাঁড়িয়েছে সে আমি জানি না, কিন্তু মিএগা কথা হইতেছে যে, খাটছি আমি।

প্র : যোগসূত্রটা কী তা তো বললেন না?

ঋ : যোগসূত্র এই তিনটার মধ্যে একই মাত্র। সেটা হচ্ছে দুই বাংলার মিলন। দুইডা বাংলারে আমি মিলাইতে চাইছি। দুইডারে আমি ভালোবাসি হেইডা কমু গিয়া মিএগা, এবং আমি আজীবন কইয়া যামু, যখন মৃত্যু পর্যন্ত আমি কইয়া যামু। আমি পরোয়াই [করি না], আমার পয়সার পরোয়াই [নাই]। আই ক্যান ফাইট দ্যাট আউট। ঋত্বিক ঘটক ক্যান ডু দ্যাট আউট হিয়ার অ্যান্ড ইন ঢাকা। আমারে কে মারব লাথি, মারুক গা যাক। বইয়া গ্যাছে গিয়া।

প্র : আপনার প্রায় অধিকাংশ ছবিতেই দুই বাংলার বিভাগজনিত যন্ত্রণার কথা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। দেশবিভাগ আমাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে কি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে?

ঋ : ভীষণভাবেই নিয়েছে। এবং দেশবিভাগটায় গোড়ার থেকেই আমার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। এবং সে আক্রমণ বোধহয় আমার শেষ ছবিতেও আছে। আমি, রাজনৈতিক

মিলনের কথাবার্তা... ও-সমস্তর মধ্যে আমি নেই। কারণ, আমি ওগুলি বুঝিও না, আর আমার দরকারও নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক মিলন— আমি দুই বাংলাতেই কাজ করেছি। এবং করছি এবং আমার থেকে বেশি কেউ করে নি। ও-বাংলার খবর আমার থেকে বেশি কেউ রাখে না। আমি যেভাবে গিয়ে ওখানে পড়ে কাজ করেছি এবং ঐ ছেলেমেয়েদের মধ্যে— বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে— আমি যা দেখেছি বা আমি যেভাবে মিশেছি, কেউ এখানকার বলতে পারবে না যে, সেভাবে যেতে পারবে। এবং কেউ গিয়ে ওখানে এভাবে লড়াই করতে পারবে। আমি হয়তো আবার যাব দিন কয়েক বাদে। কিন্তু সেটা পয়েন্ট নয়। কথা হচ্ছে যে, দুই বাংলার এই একটা গণ্ডগোল পাকানো— যেটা এই ছবিতেই বলা আছে আমার— ইট ইজ এ গ্রেট বিট্রেয়াল। বাংলাদেশ এক। এখানে একটা প্রীতির প্রশ্ন আছে। চেষ্টা করলে আমরা এই মুহূর্তে মিলিত হতে পারি। সেইটাকে কমপ্লিটলি ইন এ রাসকেলি ওয়ে কেটে ভাগ করা হয়েছে। এটা একটা অত্যন্ত আর্টিফিশিয়াল ব্যাপার। এবং এটাকে ক্ষমা করার কোনো কারো অধিকার নেই। এখন ঐতিহাসিকভাবে মানে পঁচিশ-সাতাশ বছর চলে গেছে। কাজেই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই উট কান্ট হেল্প ইট। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিদেরকে বদল করা সম্ভবপর নয়। সংস্কৃতি এক।

প্র : আপনাকে একবার বলতে শুনেছি যে, 'সুবর্ণরেখা'র শেষ দৃশ্যে বিনুর মামা যখন বিনকে নতুন পৃথিবীর কথা বলছিল সে আসলে মিথ্যা কথা বলছিল। প্রসঙ্গত আপনি বলেছিলেন আমরা নতুন পথের সন্ধান দিতে পারি না। কেননা, আমরা ফুরিয়ে গেছি। আপনার যদি এ-রকমই বিশ্বাস তবে আপনি ফিল্ম করেন কি কেবল নিজের আনন্দের জন্য? আপনার ছবি দেখে কিন্তু আমাদের অন্য ধারণা হয়েছে। কোন্‌টা ঠিক?

ঋ · রাইট... রাইট... দুটো প্রশ্নই ঠিক। সঠিকভাবে হচ্ছে কী, আমি আমার ছবি দেখে ভীষণ আনন্দিত। আনন্দ না করলে তো শিল্প-সৃষ্টি হয় না। সেখানে আমি নিজের আনন্দ পেয়েছি। দ্বিতীয় কথা যে, মানুষের ভালো করা— এটাকে তো ছেড়ে কাজকর্ম করা যায় না। মানুষকে না ভালোবেসে তুমি কী করে কাজ করবে? কাজ করতে হলে মানুষকে পাগলেব মতো ভালোবাসতে হবে। হ্যাঁ, সেটা একটা আরেকটা দিক। এ দুটোর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই। শিল্প-সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি ভালোবাসুম না ক্যান? (মানে) অ্যাট দি সেম টাইম হোয়াই ডোণ্ট আই লাভ ইউ। কাজেই এই দুটোর মধ্যে কোনো ইনহেরেন্ট কনট্রাডিকশন নেই।

প্র : আচ্ছা, ভারতীয় চলচ্চিত্রে আপনার প্রত্যেক ছবি এক-একটি ব্যতিক্রম মনে হয়। কিন্তু, নানা কারণে আপনার 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'কে সেই ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। আপনার কী মনে হয়?

ঋ : আমার কিসুই মনে হয় না। এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ অন্যদের মতামত। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি করেছি। যে, কী হয়েছে আর কী হয় নি, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমি কী করে বুঝব? শিল্পীর কাছে কখনো জিগ্যেস করবেন না তার কাজ সম্বন্ধে। কারণ সে অলওয়েজ বায়াস্‌ড। তাকে জিগেএস করে কোনো লাভ নেই। এটা আপনাদের রিঅ্যাকশন— কারুর কাছে ভালো লাগবে, কারুর কাছে খারাপ লাগবে,

কেউ চটবে, কেউ খুশি হবে। আমার কী? আমি যা করার করেছি।

প্র : কিন্তু এ ছবির ক্ষেত্রে ভঙ্গি আপনি পালটেছেন...

ঋ : প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম আলাদা। এখন প্রত্যেক শিল্পের যে ভঙ্গি সেটা জন্মগ্রহণ করে তার থীম থেকে, তার চিন্তাদর্শন থেকে। তা এই পার্টিকুলার ছবিতে আমার একটা-কিছু চিন্তা ছিল, তার উপযুক্ত বলে যাকে আমি মনে করেছি, সেইভাবে করেছি। কাজেই ভঙ্গি পাল্টানোর (প্রশ্নের) কোনো যুক্তি নেই। ওটা হচ্ছে... জন্মগ্রহণ করে চিন্তা থেকে। তা আমার কনটেন্ট যেটা ছিল, তাতে এই ফর্ম আমাকে ধরতে হয়েছে, আমি ধরেছি।

প্র : নায়কের চরিত্রে আপনার নিজের সিলেকশনটা কি ইনএভিটেবল ছিল?

ঋ : আমার মনে হয়, ছিল। কারণ, যে কথাগুলো বা যে চিন্তাগুলো আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম নায়কের চরিত্র থেকে, আমি কলকাতা শহরের কোনো ছেলের মধ্যে সে জিনিসটা দেকি নি। মানে আমি তো সবাইকেই চিনি... সবাই যারা মানে পার্টি-টার্টি করে। তাদের কেউই এটা ধরতে পারত না। যেমন মণিদি ছাড়া, মানে তৃপ্তি মিত্র ছাড়া, ঐ বউয়ের চরিত্র ওইভাবে পোর্ট্রে করতে কেউই পারত না। বহু মেয়ে আছে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে ব্যাপার। সীরিয়াস এর মধ্যে দুটোই রোল। এক হচ্ছে আমার, আর-একটা হচ্ছে মণিদির। এই দুটোকে... যদি পুরোনো কমিউনিস্ট না হয় এবং ঐ স্ট্রাগ্‌লের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে না এসে থাকে, তাদের পক্ষে পসিবল্‌ হচ্ছে না। এদের দিয়ে অ্যাক্‌টিং করানো যায়, (কিন্তু) ইট্‌'স ফেক। মাধবীকে নেব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু মাধবীর ক্ষমতা নেই বোঝে যে, মানে আমি কী ঠিক বলতে চাচ্ছি। মনিদির একটা মুখেই সেটা প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। কারণ, আমরা দুজনেই একই সঙ্গে পার্টিতে ঢুকেছি, এবং একই সঙ্গে পার্টি ছেড়েছি। এবং আমরা দুজনেই জানি যে, কী অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে আজকের বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছি। কাজেকাজেই আমার মনে হয় না যে, অন্য কেউ পারত।

প্র : আচ্ছা, 'মাই লেনিন' ছবিটা তো আমরা দেখতে পেলাম না, ওটা কি দেখানো যায় না?

ঋ : ওটা... অসুবিধে নানান ঘটে গেছে। সেটা হচ্ছে... বলছি। মোরারজী দেশাই। আমার এই ছবি 'মাই লেনিন' এখানে সেন্সর বোর্ড থেকে পাস করে এনে দিল্লীতে যায়। তখনো পর্যন্ত কংগ্রেস দুভাগ হয় নি। তো ছবি দেখলাম। তারপর পোলিশ কালচারাল অ্যাটাচি, সে তো পাগল। সে বাংলা অসম্ভব ভালো বোঝে। একেবারে ক্ষেপে গেল। তারপর রাশ্যা, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া... সব বিক্রি হবে, তারপরে আমি... মোরারজী হচ্চে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, সে কী একটা কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। ইন্দিরাদি আমাকে বকল যে, এ ছবি তো ব্যান্ড ঋত্বিক! আমি বললাম তুমি দিদি কিছু করো একটা! এটা কী? হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স! আমি বললাম তুমি দিদি কিছু করো একটা! এটা কী? হোয়াট ইজ দিস ননসেন্স? রিডিকিউলাস! তখন হাকসার সাহেব মানে যিনি অলমোস্ট মাই ফাদার, অসম্ভব ভালোবাসত আমাকে— হি ওয়াজ দেন চীফ সেক্রেটারি টু ইন্দিরা গান্ধী। হি টুক ইট টু মোরারজী। তখন এই মেয়েটা... হ্যাঁ, নন্দিনী— এখন গিয়েছে উড়িষ্যাতে, তখন ওখানে— আমাকে ডেকে বলে যে, ঋত্বিক আমি কী

করব? তুই কী কচ্ছিস কর। (আমি বললাম) হ্যাঁ, তুই ভাগ তো এখান থেকে...। হাকসার সাহেব বেরিয়ে এসে বললেন, ইসি মে কোই গড়বড় নেহি, হোয়াই ইজ রং উইথ ইট? তখন রাশ্যাতে বিক্রি হল। এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত সোশ্যালিস্ট কান্ট্রি কিনতে চেয়েছে। এবং টাকা সোজাসুজি পাওয়া যেত। এবং পেলে আমার বৌ-বাচ্চারা একটু খেয়ে বাঁচত। এই মোরারজী— করে এটা বন্ধ করে দিল। এনিওয়ে, হাকসার সাহেব এবং নন্দিনী মিলে ওই হাজার তিরিশেক না চল্লিশেক টাকা— অতটা আমার ঠিক মনে নেই— সামথিং লাইট দ্যাট, দে ম্যানেজ্ড। যাতে করে আমি তখন টাকা পাব এবং বদনাম কিনব, কিন্তু মাল খেতে পাব। আমার বৌ ক্ষেপে ব্যোম হয়ে যাবে তখন। ব্যাস। দিস ইজ পার্ট অব লাইফ, কাণ্ট বি হেল্প্ড। কিসু পয়সা ওড়াইসি, ওড়াইয়া-পোড়াইয়া গিয়া মিএরা ফ্লাই ব্যাক টু ক্যালকাটা। বৌটাগো কয়টা টাকা দেবার জন্য বাওয়া! মানে অন্ততপক্ষে ফর এ মান্থ, ডোন্ট ডিস্টার্ব। দীজ আর অকুপেশনাল হ্যাজার্ড্স।

প্র : আপনার পরের ছবি সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?

ঋ : হ্যাঁ ভেবেছি, তবে সেটা তো ব্যাবসা ; বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে খানিকটা ভেবেছি। বছর দেড়েক আগে, কি বছর খানেক আগে আমার ঠিক মনে নেই... আমি তখন হাসপাতালে, কাগজে পড়লাম নবদ্বীপের পাশে কোনো একটি মেয়ে তার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া...। তাকে পাড়ার ঐ ওয়াগন-ব্রেকার্স... যারা সব নয়া কংগ্রেস হয়েছেন... পাইপ গান ইত্যাদি... তারা চেজ করতে আরম্ভ করে... মেয়েটার দোষের মধ্যে দোষ যে, সে গরিব একটা বামুনের মেয়ে, কাজেই এই গ্রাম ছেড়ে যাবার উপায় নেই। দ্বিতীয় কথা সে দেখতে সুন্দরী। সুন্দরী মেয়ে এই এর আর-একটা দোষ। এই ছোঁড়াগুলো পেছনে লেগেছে...ঐ সব সাপোজ্ড টু বি নয়া কংগ্রেস... তো আল্টিমেটলি মেয়েটা— এইসব কাগজে বেরিয়েছে, সব কাগজেই আমি পড়েছি যে, এই ছোঁড়াগুলো চেজ করতে-করতে মেয়েটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যে মেয়েটা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা ভালো শাড়ি পরে আসি তারপর...। ভেতরে ঢুকে সে পেছনের ঘর দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করেছিল... তারপরে এই ছোঁড়ারা ধরে... অ্যান্ড দে এনজয়েড হার। পর পর চার পাঁচটা ছেলে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এরই মধ্যে এই 'সত্যযুগে'র রিপোর্টার ছেলেটা—সে ঐ গ্রামেরই ছেলে—সে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই শুনে এরা আগুন লাগিয়ে... মেয়েটাকে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। ঐটার ভিত্তিতে আমি একটা ছবি করব। (লোকেশ ঘটককে নির্দেশ ক'রে) ওকে দিয়েছি আমি লিখতে। দিস ইজ এ ফ্যাক্ট এবং সেটা কাগজেও বেরিয়েছে। 'সত্যযুগে' তো খুব ভালো করে বেরিয়েছে ঐটের ওপরে।

প্র : এর সঙ্গে অতীতের বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনো যোগাযোগ?

ঋ : হ্যাঁ, ন্যাচারালি। চৈতন্যদেবের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। তিনি সর্পদ্রংষ্টা হয়ে মারা যান। তারপর তার ছোটো বোনকে বিয়ে করেন... ঐখানেই চৈতন্যদেব। আর চৈতন্যদেব, অ্যাজ ইউ নো, যে, সারা বাংলায় তাঁর ইনফ্লুয়েন্স ফিফটিন্থ সেঞ্চুরিতে... তাঁর পাশে তো দাঁড়াবার কেউ ছিল না! তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। এবং অ্যাজ

লাক উড হ্যাভ ইট, ঠিক সেই গ্রামেই আর-একটা বিষ্ণুপ্রিয়া আজকে মারা গেল। যে গ্রাম, আপনারা... যে-কোনো গ্রামে যান শুনতে পাবেন যে, 'শচীমাতা গো আমি যুগে-যুগে হই জনম দুখিনী।' এটা আমার বাংলার যে-কোনো গ্রামে আপনি ঢুকলে পাবেন। ওটার সঙ্গে ক্রস রেফারেন্স আমি যেগুলো করব (লোকেশ ঘটককে নির্দেশ ক'রে) ও জানে না হয়তো। ওকে এমনি জাস্ট একটা রাফ স্কেচ করতে দিয়েছি। দেখুন, নব্যন্যায় তখন বাংলায় সবে জন্মগ্রহণ করছে। ঐ নবদ্বীপের ঘাটে। সেই সময়ে নবদ্বীপে ছিল একেবারে ব্রিলিয়ান্ট ইনটেলেকচুয়াল্‌স। একটা নয়, একশোটা। মহাপণ্ডিত, মহাশিক্ষিত। এঁরা ছিল তখন, ঐ নবদ্বীপের ঘাটে বসত। আলোচনাগুলো সব ঘাটে বসে হত। তার মধ্যে নিমাই সন্ন্যাসী একজন ছিল। হ্যাঁ, সে, জীবন... কানা রঘুমণি, তিনি স্মার্ত পণ্ডিতের শেষ... স্মৃতির শেষ কথা সে বলে গেছে। এই সমস্ত পার্টি... তো ঐগুলোকে ইন্টারকাট করব— আজকের এই জীবন আর তার সঙ্গে ঐ জীবন, দুটোকে আমি পাশাপাশি রাখব। এই মোটামুটি আমার মাথার মধ্যে আছে। লিখতে হবে ভাল করে। ন্যায়, নব্যন্যায়। যেটা একমাত্র বাংলার কন্ট্রিবিউশন। (কিন্তু) এবার সারা ভারতবর্ষে এখন চলেছে এসবগুলো .. এইসব আর কী! আর বেশি বলে লাভ কী?

প্র: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো কাহিনী কি আপনি কখনো চিত্ররূপ দেবার কথা ভেবেছেন?

ঋ : (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের) 'চিহ্ন' আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা। যদি পয়সাকড়ি পাই, কারণ ব্যাবসাদারদের ব্যাপার। 'চিহ্ন' কেউ মনেও রাখে না আজকের যুগে, কেউ মনেও রাখে না। আর বিভূতিবাবুর... সেটা অবিশ্যি একবার বহু আগে আমারই এক বন্ধু করেছিল এবং সুপার ফ্লপ করেছিল— তাই নাম আমি বলতে চাই না— (সেই) 'পুতুলনাচের ইতিকথা' করারও ইচ্ছে আছে...।

প্র : আপনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের...

ঋ : হ্যাঁ মানিকবাবুর, সরি ভুল করেছি। বিভূতিবাবুরও লেখা করার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। উনি যখন লিখেছিলেন এবং 'প্রবাসী'তে মাসের পর মাস ছাপা হয়ে বেরচ্ছিল, সেটা অন্য একজন লোক করে ফেলেছে— 'আরণ্যক'। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল যে, 'আরণ্যক' করি। বিভূতিবাবুর 'যাত্রাদল'। আপনারা কি পড়েছেন 'যাত্রাবদল'? ওটা একটা টেরিফিক। আমি পারব কি না কোনোদিন... কারণ, এই ব্যাবসাদার লোকগুলো মাঝখানে থাকে তো, তারা অসুবিধের সৃষ্টি করে। তারা তো বোঝেন না এসব জিনিসপত্তর!

প্র : রবীন্দ্রনাথের কোনো কাহিনী নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে?

ঋ : রবিবাবুর 'চতুরঙ্গ' নিয়ে সমস্ত লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ব্যাবসা হবার বিষয়। যে লোকটার সঙ্গে করলাম, আমার কপাল ঠিক,... 'চতুরঙ্গ' নিয়ে, আমার কপাল সব সময় খারাপ। আর, ওয়ান অব দি হায়েস্ট জেন্টল্‌মেন ইন ফিল্ম লাইন— এবং প্রচুর টাকাওয়ালা লোক— আমার সঙ্গে 'চতুরঙ্গে'র সমস্ত ফাইনাল হল বিষ্ণু দে মশায়— কবি বিষ্ণু দে, তিনি ব্যাপারটাকে পাকা করে দিলেন। কারণ, বিষ্ণু দেরই ছাত্র তিনি, হেমেন গাঙ্গুলী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত... আমি করতে পারি নি।

রবিবাবুর 'চতুরঙ্গ'টা আমার... রবিবাবুর প্রায় প্রত্যেকটা উপন্যাসই তো ন্যাকা-ন্যাকা উপন্যাস, মানে অত্যন্ত বাজে ক্লাসের, ভদ্রলোক তো উপন্যাস লিখতে জানতেন না। হ্যাঁ, কিন্তু ঐ 'চতুরঙ্গ'টা একটা ফাটিয়েছিলেন। মানে অনবদ্য বললে আর কী হবে? মানে, বাংলা ভাষায় (যে) মাত্র চারটে উপন্যাসের মধ্যে একটা, ঐ ঐটি। 'চতুরঙ্গ'র দামিনী, জ্যাঠামশাই, শ্রীবিলাস ইত্যাদি ইত্যাদি— এ মানে ভাবাই যায় না। তো ঐটে আমি লিখেফিকে রেডি করলাম (কিন্তু) হেমেনবাবু পটলিফায়েড, পটল প্লাক করলেন। কী করা যাবে আর!

প্র : আর তিনটে উপন্যাস কী?

ঋ : আমাদের বাংলাভাষায়? মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' আর রবিবাবু 'চতুরঙ্গ', বঙ্কিমবাবু 'রাজসিংহ' আর যাকে বলে সত্যিকারের উপন্যাস।

প্র : আর-একটা?

ঋ ।। আরেকটা হচ্ছে তারাশঙ্করদার—সে ভদ্রলোকও মারা গেছেন—'গণদেবতা'। এই কটা। আর বাংলাসাহিত্যে কোনো পদার্থ নেই। এইসব বেচছে, চলছে। চিরকাল যা মেয়েরা দুপুরবেলায়, গ্রীষ্মের দুপুরে, গা আদুড় করে, স্বামীকে বাজারে পাঠিয়ে কি অফিসে পাঠিয়ে, উপুড় হয়ে বালিশ নিয়ে দুপুরবেলা ঘুমুবার জন্যে পড়ে, এই মানে খাওয়াদাওয়ার পরে— এইতো এখনকার লেখা চলছে বাওয়া! (হাস্য) 'আরণ্যক' সেই লেভেল-এ (ঐ চারটে উপন্যাসের) পৌঁছয় নি। 'আরণ্যক' উচ্ছ্বাসে ভর্তি। গ্রেট লেখা, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে উচ্ছ্বাসে ভর্তি। এই চারটে উপন্যাস, রাইট মাপা ব্যাপার। মানে, সাহিত্যিক দিক থেকে এ চারটের ওপরে আর নেই।

প্র : এখন পর্যন্ত আপনি যা ছবি করলেন, সেসব করতে গিয়ে ভালোলাগা মন্দলাগার যেসব ব্যাপারগুলো ঘটেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

ঋ : আমার ছবি করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভালোলাগা এবং... এগুলো খুব বহুবার ঘটেছে ভাই। ওটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই, কারণ কাজকম্মো করতে গেলে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। তা আমি কী বলব? ওটা আমার আশেপাশে যারা ছিল তারা বলবে। কথা হচ্ছে যে মোটানুটিভাবে—এক কথায়—আমি বেঁচে গেছি। (চিৎকার করে) বেঁচে গেছি।

অনুপ্রেরণা

প্র : চলচ্চিত্রশিল্পে আপনি কি কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত? যদি হন, তবে সেই অনুপ্রেরণা বা প্রভাবটা আপনার মধ্যে কীবকমভাবে কাজ করেছে?

ঋ : চলচ্চিত্রশিল্পে আমি বলে নয়, যাঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে সিরিয়াস শিল্পী এবং আমার বাংলাদেশেও যারা সিরিয়াস কাজ করেন, যাদের নামটাম আপনারা শুনেছেন-টুনেছেন, প্রত্যেকেই একজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন সার্গেই আইজেনস্টাইন। আইজেনস্টাইন না থাকলে আমরা কাজকম্মোর 'ক'-ও শিখতাম না। উনি আমাদের বাবা। আমাদের পিতা। তাঁর লেখা, তাঁর থিসিস এবং তাঁর ছবি এগুলো

আমাদেরকে ছোটবেলায় পাগল করেছিল। এবং তখন ওগুলো আসত না। বহু কষ্টে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিয়ে আসা হত। এই আইজেনস্টাইন... সত্যজিৎ রায়কেও আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, হি উইল অ্যাডমিট, দ্যাট, হি ইজ দি ফাদার অব আস। আর (তাঁর থেকেই) আমরা ছবি কাটতে শিখেছি... ফিল্ম মেকিং-এ ওটা একটা ব্যাপার। তারপরে পুডভকিন সাহেব। পুডভাকন এসেছিলেন উনিশ শো উনপঞ্চাশ সালে। তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পার্টির তরফ থেকে... পার্টি আমাকে চাপিয়ে দিল যে, পুডভকিনের একটু পিছনে-পিছনে ঘোরো। এই পুডভকিন একটা কথা আমাকে বলে দিয়েছিলেন সেদিন, সেটা আমার শিক্ষার বেসিস। সেটা হচ্ছে যে, ফিল্ম ইজ নট মেড। ফিল্ম মেকিং কথাটা বাজে কথা। ফিল্ম ইজ বিল্ট্। ব্রিক টু ব্রিক যেরকমভাবে একটা বাড়ি তৈরি হয়, ফিল্ম তেমনি শট বাই শট কেটে কেটে তৈরি হয়। ইট ইজ বিল্ট্ ইটস নট মেড। এই দুজন ব্যক্তি, তারপরে কার্ল ড্রয়ের। কার্ল ড্রয়েরের ছবি আমি অনেকদিন আগে পুণায় দেখেছিলাম। প্যাশন অব জোন অব আর্ক। এই ছবি দেখে আমার মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গিছল। আর আমাকে গুরুজন বলে মানতো হলে একটু মানতে হয় বুনুয়েল সাহেবকে। লুই বুনুয়েল। এঁরা কজন আমার সত্যিকারের গুরু। প্লাস মিৎসোগুচি। এঁর 'উগেৎসু মনোগাতারি' দেখে আমি স্ট্যাগার্ড... মানে... মাথাফাতা খারাপ হয়ে গিছল। একেই বলে ছবি। ছবি কী, এই কটা লোক থেকে আমি পেয়েছি।

প্র : আপনার দেখা গোটাকয়েক শ্রেষ্ঠ ছবির নাম বলবেন?

ঋ : পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি, বসব সেটা?– 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিন'। তার ওপরে ছবি আজ পর্যন্ত হয় নি। তাতে ওডেসা স্টেপ্স সিকোয়েন্স– তার ওপরে ছবি কেউ কোনোদিন করতে পারবে না। কাটা কাকে বলে, মাল... ফিল্ম হচ্ছে কাটার ওপরে। কাঁচি হচ্ছে ফিল্ম, যে, ঠিক কটা ফ্রেম পরে ফেলে দেব। ওইটের ওপর সমস্ত ছবি। 'ব্যাটলশিপ পোটেমকিনে'র ওপরে কোনো ছবি আজ পর্যন্ত জন্মায় নি।

চলচ্চিত্রের সমস্যা ও সমালোচনা

প্র : আপনার অভিজ্ঞতায় চলচ্চিত্রের দুরূহতম দিক কোন্‌টি এবং কেন?

ঋ : আমার অভিজ্ঞতায় চলচ্চিত্রের দুরূহতম দিক একটিই এবং আর কিস্যু নেই। সেটা হচ্ছে পয়সা জোগাড় করা। ক্যাশ ম্যানেজ করা হচ্ছে একমাত্র দুরূহতম দিক। বাকি আমার দেশের টেকনিশিয়ানস, মাই ওয়র্কার্‌স, এরা... এবং মাই আর্টিস্ট্স এরা যে প্রাণ দিয়ে দেবে– একটা ভাল কাজ করার জন্য। কিন্তু ঐ ক্যাশ ম্যানেজ করা হচ্ছে পয়েন্ট। এ একমাত্র। নাথিং এল্‌স।

প্র : এটা দুরূহতম কেন সেটার বিষয়...

ঋ : সেটা আর কী, সমাজব্যবস্থা। সেটা বলতে গেলে আবার আপনার মার্ক্সিজম্ আওড়াতে হয়। এইসব– বাচ্চাগুলো, এরা ক্যাশ নিয়ে বসে আছে এবং যতরকমের বাঁদরামি, বদমাইসি, ইতরামি সমস্ত কিছু করছে। অ্যাঁ...এরাই হচ্ছে আসল পার্টি। এই পার্টিগুলোকে অফ্ করতে পারলেই হয়ে যায়। এবং এই ব্যবসাদারগুলো হচ্ছে... দেখুন

মশায়... আপনারাই বলুন... আমাদের এগারো হাজার কোটি টাকা হোয়াইট মুভ্ করছে এই ভারতবর্ষে। তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা ব্ল্যাকে মুভ্ করছে... আমাদের দেশে সমস্ত মুভ্‌মেন্টটা হচ্ছে ব্ল্যাকের ওপর লেভেলে।

প্র : ফিল্মের বলছেন?

ঋ : ফিল্ম নয়, সমস্ত... আমাদের সমস্ত সমাজ, আমাদের সমস্ত ইকনমি, এই ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সে, এই যে ব্ল্যাক-মানি, এ একেবারে ছেয়ে ফেলেছে আমাদেরকে। মানে, ফ্রম অল সাইডস্। এবং সেটা গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়াও অ্যাডমিট করছে। আজকে টাকার দাম নাবতে-নাবতে, চ্যবন বলেছে যে, ছত্রিশ পয়সায় নেবেছে। অ্যাকচ্যুয়ালি নেবেছে পঁচিশ পয়সায়। এক টাকার ভ্যালু ইজ টোয়েন্টি ফাইভ পয়সে ওনলি। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, এই যে দুর্ভিক্ষ... সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে যে, একটা বেয়ার-আপ করে দিয়েছে। আমি আর কী বলব? কাজেকাজেই ফিল্মটা একটা কোন পার্টিকুলার পয়েন্ট না। ও-ই হচ্ছে ঘটনা।

প্র : সার্থক সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়ণে শিল্পীকে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

ঋ : সার্থক সাহিত্য তো দেশে খুব বেশি হয় নি। তবে যেটুকু হয়েছে সেইগুলোকে শিল্পয়ান করতে গেলে একটা জিনিস মাথার মধ্যে রাখতে হয় যে, সাহিত্য একটা শিল্প আর ফিল্ম আর-একটা শিল্প। কাজেই সাহিত্যকে ফিল্মে রূপায়ণ করতে গেলে তখন ঐ সাহিত্যকে একেবারে বোবার মতো... যা এরা করে, মানে, লোকজন করে... এটা ঠিক না। কথা হচ্ছে যে, ছবি হচ্ছে প্রাথমিকভাবে দ্রষ্টব্য। এটা হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। এই কথাটা মনে রাখার একটা প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে, এটা শ্রব্যকাব্য। হ্যাঁ, কথা শোনার একটা ব্যাপার আছে। তার দ্বারা একটা এগুনোর প্রশ্ন ঘটে। এখন সাহিত্য হচ্ছে পড়ার। একটা সুন্দরতম সাহিত্য পড়লে... পড়তে গিয়ে একটা আনন্দ, একটা রুচিবোধ, একটা ঘটনা জন্মায়। কিন্তু ফিল্ম ইজ এ পারফর্মিং আর্ট। এখানে চোখে দেখার একটা ব্যাপার আছে, কানে শোনার ব্যাপার আছে। এ দুটোর মধ্যে আকাশপাতাল তফাত আছে। কাজেই করতে গেলে বদল করতেই হয়। তাতে যদি সাহিত্যিকেরা চটে যান—তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তাঁরা নিশ্চয় বোঝবার চেষ্টা করবেন যে, একটা মিডিয়াম থেকে আর-একটা মিডিয়ামে ট্রানস্লেট করতে গেলে খানিকটা ঘটনা ঘটাতেই হয়।

প্র : সাধারণের বোধ্যতা এবং শৈল্পিক ঔৎকর্ষের ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে ব্যবধান লক্ষিত. সামগ্রিক বিচারে তাকে আপনি কাম্য মনে করেন?

ঋ : না, না। এইসব ধরনের প্রশ্নাবলীর কোনো অবকাশ নাই।

প্র : এটা বলছেন কেন? যেখানে ধরুন, কিছু কিছু ভালো কাজ তো আপনারা করছেন? অথচ অধিকাংশ লোক তা বুঝতে পারছে না। সেখানে সেটা, কীভাবে সেই কমিউনিকেশনটা হতে পারে সেটার জন্যেও তো এটা... এই চিন্তাটা...। লোকে ভাববে, আসবে মাথায়...

ঋ : আমার প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ বয়ে গেছে। এক, আমার কথা কে গ্রহণ করল

আর করল না, তার ভিত্তিতে আমার জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না, এবং এইসব ধরনের প্রশ্নের কোনো মূল্য নাই। দয়া কইর‍্যা ভদ্র ধরনের প্রশ্ন করবেন।

প্র : চলচ্চিত্র বোঝবার পক্ষে সমালোচনার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কী মত? এবং এখানে সমালোচকরা...

ঋ : সমালোচনার ভূমিকা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট। ভীষণভাবে। সমালোচকটা কে? সমালোচক তো নয়– এ হচ্ছে দর্শক আর সৃষ্টিকর্তা তার মাঝখানের সেতু। কিন্তু আমাদের দেশে সেরকম সমালোচক কেউ নেই। যারা দু একজন আছেন তাঁরাও হচ্ছেন বিক্রীত। কারণ, এসব ব্যবসাদার কাগজওয়ালা এখানে... হ্যাঁ, তারা তাদের কিনে রেখে দিয়েছে। কাজেই তাঁরা ভয়ের চোটে লিখতে পারেন না। তাঁদেরকে প্রতি মুহূর্তে এইসব কথা শুনতে হয়। আর সমালোচনার মূল্য যে কী আছে, সেটা আপনাদেরকে আমি বোঝাতে পারব না। দেখুন একটা কথা বলি, জর্জ বার্নার্ড শ এইটটিন নাইটিএইটে সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন নাটকের। তখন তিনি নাট্যকার ছিলেন না। ওঁর লেখায় সমস্ত লন্ডন শহর সম্পূর্ণভাবে ঘুরে গিয়েছিল। ওই হচ্ছে লেখা। এখানে লিখতে সাহস পায় না কেউ। যারা পেত, পারত, আমি যতখানি জানি... মাত্র দুজনের কথা। সরোজ সেনগুপ্ত. ও সিরিয়াসলি লিখত। ওকে তাড়িয়েছে। আর জানি যে,... কী বলে... ঐ যে 'আনন্দবাজাবে'...

প্র : জ্যোতির্ময়?

ঋ : না, না, না...

প্র : এন. কে. জি.?

ঋ : না, না, এন কে. জি. নয়। এই যে ঐ ভদ্রলোক। মানে, জাস্ট নাউ আই অ্যাম মিসিং দি নেম। ঠিক আছে, মনে পড়লে আমি বলব। দীজ আর দি টু ক্রিটিক্স। আর শ্যামলাল যে 'টাইম্‌স অব ইন্ডিয়া'র এডিটর এখন। সে প্রথমে ফিল্ম ক্রিটিক ছিল। এখন ওকে সরিয়ে দিয়ে এডিটর করে বসিয়ে দিয়েছে। দ্যাট রেজালটিং ইন্টু যে, ওকে এখন এডিটোরিয়াল লিখতে হচ্ছে। শ্যামলাল এ বছর পদ্মশ্রী না কী একটা পেল। এরা আমার বন্ধু। তো এই হচ্ছে ঘটনা। এদেশের সমালোচকদেরকে শ্রদ্ধাভক্তি করার কোনো লোক নেই। যা দু-চারটে লোক ভদ্রভাবে সত্যিকারের কাজ করার চেষ্টা করেন তাঁদেরকে কীভাবে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া যায় এই হচ্ছে একমাত্র চিন্তা। আর বাকি সম্পর্কে আমার বলে লাভ আছে কী? ফিল্ম ক্রিটিসিজমে ফিল্ম বোঝার একটা ব্যাপার থাকে। ফিল্মের ডিফারেন্ট আসপেক্টস্, তার টেকনিক্যাল ডিটেল্‌স বোঝার ক্ষমতার একটা ব্যাপার থাকে তো? এঁদের সেসব কতখানি আছে তা ওঁরাই জানেন। আমার বলার দরকার নেই। আমি নট গোইং টু বি ইনভলভ্‌ড ইন্টু এনি প্রব্লেম। কিন্তু, ফয়েন্ট ইজ দ্যাট, আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দিস। ওটা কোনো... সেই ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে গেলাম, হি ইজ দি বেস্ট ইন ইন্ডিয়া... আরে 'আনন্দবাজারে'...এখন 'দেশে' বসিয়ে রেখেছে ওকে।

প্র : সেবাব্রত কি?

ঋ : না, না, সেবাব্রত না। কী আশ্চর্য! নামটাম আমার মিস হয় মাঝে মাঝে।

প্র : আচ্ছা, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ছবি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম?

ঋ : ছবি, আমার মতে গুরুত্বতম মাধ্যম। কিন্তু সেটাকে সেইভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি? যা হচ্ছে, সেটা আপনারা সকলেই জানেন। এ নিয়ে আলোচনা করার কোনো বিশেষ অবকাশ নেই। ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের, এদেশের, সবচেয়ে সস্তা আমোদের উপকরণ। কাজেই, এদেশে ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত। কী হবে, আমি নিজে বলতে পারি না।

প্র : ইন্ড্রাস্ট্রি হিসেবে চলচ্চিত্র পুঁজিনির্ভর। সেক্ষেত্রে চলচ্চিত্র কতটা প্রতিবাদী হতে পারে?

ঋ : পরিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু নির্ভর করছে যে-ব্যক্তি ছবি করছে তার ওপরে। তার যদি শিরদাঁড়া খাড়া থাকে— সে সব-কিছু করতে পারে। মানবজগতের সমস্ত সমস্যাবলী শিল্পী ছবির সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সে যদি না করে, তা হলে করণীয়টা কী? এটা করা হয় না সাধারণভাবে, কাজেই আমাদের ছবি এত হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিমল রায়ের স্মৃতি

প্র : চলচ্চিত্রে প্রথম জীবনে আপনি তো অনেকদিন বোম্বে ফিল্মের সঙ্গে ছিলেন, নানাভাবে, সে অভিজ্ঞতা কিছু বলবেন?

ঋ : এই ট্রেডের কোন্‌দিকটা আপনারা জানতে চান?

প্র : বিমল রায়ের সঙ্গে আপনার যে যোগাযোগ, সেই অভিজ্ঞতাটা আমরা বিশেষ করে জানতে চাই।

ঋ : বিমল রায় সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাকে পুজো করতে হয়। বিমল রায় কী রকম ছবি-করিয়ে ছিলেন, সেটা বড়ো কথা নয়। তিনি কী রকম মানুষ ছিলেন সেইটে আমার কাছে বড় কথা। দেখুন, বিমল রায়... আমার রাঙাদা সুদীশ ঘটক তাঁকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসেন। থার্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে। তখন আমরা ছাত্র, মানে জানিই না, ফিল্ম লাইন সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তখন নেই। তারপরে এই বিমলদা আমাকে কোলে করে নিয়ে নিউ থিয়েটার্সে... তখন দরজা খোলা যেত না। দারোয়ানরা মানে এখনো তাই করে, তখনো তাই করত, যে সেটে... মানে ঢুকতেই দেবে না। হ্যাঁ, সেই সময়ে বিমলদার সঙ্গে আমি কাজ করেছি। আই হ্যাভ ওয়র্কড। তারপরে এন. টি. ভেঙে গেল। তারপর ভারতলক্ষ্মীতে 'তথাপি' 'বলে একটা ছবি, সেটা বিমলদা করলেন (তত্ত্বাবধান), আমাকে চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট... তার আগে 'বেদেনী'। তার আগে বিমলদা যখন ক্যামেরা থেকে সরে এসে প্রথম কাজ পেলেন... ঐ যে সব হিট-ফিট করল না? 'উদয়ের পথে'। বিমলদা কোলে করে আমাকে, মানে ভালোবাসার কোনো সীমা সংখ্যা নেই। মানে, আমি বলতেই পারি না যে, মানুষটা যে কী ছিল। তা আপনারা তাঁকে... তাঁর ছবিটবি সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু মানুষ কী ছিল সেটা আমি প্রাণ দিয়ে জানি। 'অঞ্জনগড়' তারপরে। ইত্যাকার ঘটনা। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি বিমলদার। প্রাণ ভরে খেটেছি। কাজেই আমার

বলার কিচ্ছু নেই। বিমলদা যে আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। কাজেই, বিমলদাকে নিয়ে কী কথা বলব? আমি যা বলব সমস্তগুলো বায়াসড কথা হবে। কারণ ও লোকটা সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের পারিবারিক, মানে, এক্কেবারে আমাদের নিজেদের ইতিহাসই [বলতে হবে]।

প্র : 'উদয়ের পথে' ছবিটা সামগ্রিকভাবে তখনকার দিনের বাংলা ছবিকে কীভাবে মোড় ঘোরাতে সাহায্য করেছিল?

ঋ : 'উদয়ের পথে', আমি যদি সমালোচনা করি... বলছি। প্রাথমিক হচ্ছে যে, তখন পর্যন্ত বাংলা ছবি যে লেভেলে মুভ করছিল সেখান থেকে বিমলদা তাকে, মানে বাংলা ছবিকে, মোটামুটিভাবে হেঁচড়ে বের করেছেন— এক। দুনম্বর হচ্ছে ওর কথাবার্তা। ডায়ালগগুলো আজকে শুনলে হাসি পাবে। এবং অত্যন্ত বাজে ক্লাসের। সেটা জ্যোতির্ময়ই প্রভৃত হাবিজাবি ভাষা ব্যবহার করে নষ্ট করেছে। বিমলদা খাটলে আরো ভালো করতে পারতেন এবং যেমন আমি বলছি ; যে 'ছোট্ট একটা ছুঁচের দ্বারা...'।

প্র : 'দারিদ্র্যের মতো দৈত্যের সঙ্গে...'

ঋ : হ্যাঁ দারিদ্র্যের সঙ্গে... এই ধরনের কথা ; একেবারে রাবিশ। অ্যাবসোলিউটলি রাবিশ! এটা জ্যোতির্ময় রাস্কেল কেটেকুটে করে দিয়েছিল।

প্র : রাস্কেল-ফাস্কেল বলছেন কেন!

ঋ : (হাস্য) মিএল, এরা সবাই আমার বন্ধু। এরা সত্যিকাবের বঞ্চিত লোক।

ভারতীয় চলচ্চিত্র : নানা প্রসঙ্গ

প্র : 'সুবর্ণরেখা' থেকে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র মধ্যে যে দীর্ঘ ব্যবধান সেই দুই সময়ের ছবির জগতের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক আলোচনা করবেন?

ঋ : এটা আমি পারব না। কারণ, আমি ছবি দেখি না। তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে এইটুকুই বলতে পারি, যেটা আমার 'যুক্তিতক্কে'ই বলা আছে, ক্রমশ সীমিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে (হাস্য)। এর বেশি আমার আর কিস্যু বলার নেই।

প্র : সাম্প্রতিককালে ভারতীয় চলচ্চিত্রে যথার্থ প্রতিবাদ আছে কি?

ঋ : ভারতীয় কোনো ছবিতে কোনো প্রতিবাদ আছে কি নেই, প্রাথনিকভাবে এটা আমার জানা সম্ভব নয়। কারণ, (আগেই বলেছি) আমি ভারতীয় ছবি একদম দেখি না। আর যেটুকু শুনেছি, মানুষের কাছ থেকে, তাতে আমার ধারণা যে, কোনো প্রতিবাদ নেই। এরা মানুষকে মোটামুটিভাবে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায়। মুনস্টেরবার্গ... [ওর] বইটা আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না। আমি আপনাদের অনুরোধ করব পড়তে। ড্রিম ফ্যাক্টরেব মানে, সম্পূর্ণ সাপোর্টে এরকম, মুনস্টেরবার্গ লেখার মতো এত ভালো লেখা আর কোথাও নেই। 'থট্‌স অন ফিল্ম' বইটা। আপনারা পড়ুন থট্‌স অন ফিল্ম। এ চূড়ান্ত বদমাইসির শেষকথা। আমাদের দেশে— আমি কারো নাম বলতে চাই না— কিন্তু মোটামুটিভাবে এর বই এরা কেউ পড়েও নি বোধহয়। আমি পড়েছি কারণ, আমাকে পড়তে হয়। এরা সব ঐ লেভেলে মুভ করছে। আমাদের দেশে প্রতিবাদ-

ফ্রুতিবাদের কথা বলার সাহস কারোই নেই। এক মৃণাল সেন খানিকটা চেষ্টাচরিত্তির করছে-টরছে। এবং সেগুলোও আমার কাছে মনে হয় না যে, কোনো গভীরে পৌঁছেছে। কারণ, আমাদের দেশের মানুষের যে দুঃখদুর্দশা, ছবির কাজ হচ্ছে— ছবি কেন সব শিল্পের কাজ হচ্ছে— সেইটেকে তুলে ধরা। সেটা মৃণাল কতখানি তুলতে পেরেছে জানি না। আমার বলার কোনো অধিকার নেই, কারণ এরা প্রত্যেকেই আমার বন্ধু। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, আর এ কাজে আর-একটা লোকেরও নাম আমি করতে পারছি না— যে কিছু করতে পেরেছে। এই হলো কথা। আমিও নিজে বেশ কয়েকদিন কাজকম্মো করি নি। এখন করছি। এর চেয়ে বেশি বলার অবকাশ আমার নেই।

প্র : আপনার মতে এফ. এফ. সি.-র লোন দেবার নীতিটা কী হওয়া উচিত? অর্থাৎ, নতুন পরিচালকরা পারে, না পুরোনো পরিচালকরা যাঁরা ভালো ছবি করার টাকা পাচ্ছেন?

ঋ : আমি মনে করি যে, দুটোকে একটা মিশ্রণের প্রশ্ন আছে। নতুন ছেলেপুলেকে কাজকম্মো দিতেই হবে এবং তার জন্য এফ. এফ. সি.-র টাকা যেটুকু সম্ভবপর সব সময় দেওয়া উচিত। দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট। কিন্তু পুরোনো যারা কাজকম্মো সিরিয়াসলি করতে চায় তাদেরকেও সাহায্য করা উচিত। দুটোই এক—এটাকেও তো মানে গুলিয়ে ফেললে চলবে না!

প্র : প্রোডাকশনের ব্যাপারটা আমাদের ফিল্মকে কীভাবে আঘাত করছে, এটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই।

ঋ : ডিস্ট্রিবিউশন এবং প্রোডাকশন আঘাত করছে না। করছে এক্‌জিবিশন। আপনাদের এক্‌জিবিশন সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে এক্‌জিবিশন ট্রেড, এটা যে কী জঘন্য মানে, কী ধরনের ইতর ব্যাপার, এটা আপনারা দয়া করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি এই কথা বহুবার বিভিন্ন জায়গায় এবং ভারতবর্ষে সরকারি চাকরিতে যারা আছে, বড়ো থেকে আরম্ভ করে সব্বাইকে বলে এসেছি যে, এক্‌জিবিশন ট্রেড যাকে ম্যানেজ করতে হবে। এরা যে কী ধরনের পাজি, কীরকম বদমাইস সে আপনারা জানেন না এবং সে-সমস্ত ঘটনা বলে কোনো লাভ নেই। কারণ, এতে কিছু হবার নয়। ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যেও বদমাইসি আছে, প্রোডাকশন ট্রেডে এতখানি নেই। কিন্তু সব নিলিয়ে মশায় আসল কথা যে এই এক্‌জিবিশন। যে কী মানে, কীভাবে মানুষে মানুষ খুন করে যাচ্ছে, সেটা আপনাদের ভালো করে বোঝা উচিত। শিল্প, আর অমুক আর তমুক ওগুলো কাজের কথাই নয়। এক্‌জিবিশন ট্রেড সারা ভারতবর্ষকে চুরমার করে দিয়েছে।

প্র : বাংলা ছবির বর্তমানকে কি আপনি আশাপ্রদ মনে করেন, আর্টের বিচারে?

ঋ : এই একটা মহামুশকিলের প্রশ্ন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া খুব সোজাভাবে সম্ভবপর নয়। কারণ, বাংলা ছবির আমি যেটুকু জানি বা আমার যেটুকু জ্ঞান তার থেকে বলছি যে, ছোটো-ছোটো ছেলেরা আছে যারা কাজ করতে চায় সিরিয়াসলি। কিন্তু তাদেরকে কেউ কাজ দেবে না, কারণ, তাদের কেউ মাইনে দেবে না। আর, আমাদের লাইনটা এমন, এখানে লাখ-লাখ টাকা না থাকলে কোনো কাজ করা যায়

না। আমরা পারি ; নানারকম বাঁদরামি করে, বদমাইসি করে, দুষ্টুমি করে। সামহাউ আর আদার উই ম্যানেজ। কিন্তু দীজ কিড্স— এদের কম্মো না। বুঝতে পেরেছেন (হাস্য) এদের মধ্যে থেকে কে বেরোবে, কে বেরোবে না, আমি জানি না। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ভরসা আছে। কারণ, আমি ভয়ংকরভাবে ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি। আমার এই ছেলেপুলেগুলোর মধ্য থেকে কেউ-না-কেউ আমার থেকেও বড়ো হবে— আমি ভীষণভাবে এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু এদেরকে তো কেউ কাজ দিচ্ছে না! এরা খেতে পাচ্ছে না, এরা না খেয়ে ঘুরছে। স্টুডিয়ো-পাড়ায় আপনি আমার সঙ্গে চলুন, দেখবেন যে, এইসব বাচ্চাগুলো কী অভাবগ্রস্ত। যে, দুবেলা দুমুঠো ভাত খাবার পয়সা পর্যন্ত নেই। এরা ছবি করবে কী করে আমি জানি না। তবে করতে যদি পারে, এদের মধ্যে থেকে কেউ-না-কেউ— টেনে বেরিয়ে যাবে মশায় এবং আমাদেরকে হারিয়ে দেবে। আমি, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এসব, সব হেরে যাব। এবং হারতে চাই আমি। এরা করুক, এই বাচ্চারা করুক।

প্র : সাধারণভাবে বিদেশি ছবির যে বৈচিত্র্য তা আমাদের ছবিতে দুঃখজনকভাবে অনুপস্থিত। এ সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

ঋ : সাধারণভাবে বিদেশি ছবি আর এদেশের ছবির মধ্যে খুব বেশি তফাত আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু মিৎসোগুচির ছবি, ওজাব (ওজু) ছবি, তারকোভস্কির ছবি কিংবা কাকোয়ানিসের ছবি— এগুলো আমাকে পাগল করে তোলে। কার্ল ড্রয়ের, লিওপোল্ডো তোরে নিলসন এরা আমাকে ক্ষেপিয়ে দেয়। কুরোসাওয়ার কথা আমি বলতে চাই না। কারণ, সে এখন বিক্রি হয়ে গেছে। ইতালীয়ান পরিচালকদের মধ্যে চারজনকে আমি শ্রদ্ধা করি— আন্তোনিয়নি, বিশেষ করে ফেলিনি, ভিসকন্তি আর রসেলিনি। কিন্তু বর্তমান জীবিত পরিচালকদের মধ্যে লুই বুনুয়েল আমার পূজ্য।

রাশ্যাতে কিছু কাজের লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোজিন্‌ৎসেভ অমর কাজ করে গেছেন। গ্রিগরি কোজিন্‌ৎসেভ। 'হ্যামলেট' ভাবা যায়? আর শেষ আমি দেখেছি আন্দ্রেই তারকোভ্‌স্কি— তাঁর 'চাইল্ডহুড অব ইভান'— আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। প্রথম-দৃশ্যে ঐ মায়ের মুখ, আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তারপর ক্যামেরার ব্যবহার আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ঐ যে স্লো মোশন, যে-জুডিশাস্‌লি ব্যবহার করা হয়েছে, আমি এত সুন্দর কাজ খুব কম দেখেছি।

আরো অনেককিছু বলার ছিল, এই অবসরে এতখানি বলা যাবে না। বুনুয়েল সাহেবের 'ভিরিদিয়ানা' ছবিতে একটা লাস্ট সাপার-এর সীন-এর ওপরে যে-স্যাটায়ার আছে—আমি বাপের জন্মে ভুলব না। সেখানে হিরোইন মেয়েটি কতকগুলো Rogue-কে নিয়ে এসে সাপার খাওয়াচ্ছে, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির বিখ্যাত লাস্ট সাপার ছবির ফ্রেমিং, হঠাৎ ফিউজ করে দিল। মানুষকে বুঝিয়ে দিল যে, এন্টায়ার রোমান-ক্যাথলিক ডগমা ইজ বোগাস। দিস ইজ বুনুয়েল। ওঁর থেকে বড়ো ছবির শিল্পী আমার মতে কেউ নেই বর্তমানে।

প্র : সংগীতের যতখানি প্রয়োগের সুযোগ ভারতীয় ছবিতে ছিল, তার কতটুকু পূর্ণতা দেখেছেন?

ঋ : সংগীতের প্রয়োগে আমাকে প্রথম যে-ছবি মুভ করেছে : শান্তারামের 'শকুন্তলা'। তারপরে 'কাদম্বরী'। বাংলা ছবিতে আমাকে যথেষ্ট আচ্ছন্ন করেছে দেবকীবাবুর কয়েকটি ছবি 'পথের পাঁচালী'র সংগীত খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু তার থীম মিউজিকটা (রবিশংকর) সোয়ান'স রিভার (নামে) একটি আমেরিকান নিগ্রো ফোক-সং থেকে তুলে নিয়েছিলেন। আদারওয়াইজ ভদ্রলোকের কাজকর্ম 'পথের পাঁচালী'তে খুবই ভালো হয়েছিল।

আমি বিশেষ ছবি দেখি না, বেশি বাংলা এবং হিন্দী। কাজেই আমি জানি না এখন কীসব হচ্ছে-টচ্ছে। আমার নিজের ছবি সম্পর্কে বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

আমার ছবির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আনন্দ দান করেছে— সংগীতের দিক থেকে— সেটা হল 'কোমল গান্ধার'। এতে বাংলার, মানে দুই বাংলার, লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয়সংগীত এবং ইউরোপের উচ্চাঙ্গসংগীত ব্যবহার করেছিলেন আমার সংগীত পরিচালক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এবং সেটা অত্যন্ত মরমীভাবে। ও ছবি চোখ বুজেও আমি দেখতে পারি। এত ভালো সংগীত তিনি করেছিলেন।

প্র ।। বাংলা চলচ্চিত্রে প্রমথেশ বড়ুয়ার অবদান সম্পর্কে কিছু বলুন।

ঋ : প্রমথেশ উনিশশো আটাশ সালে বড়ুয়া-স্টুডিও খুলেছিলেন। তারপর তিনি বি. এন. সরকার সাহেবের সঙ্গে মিলে নিউ থিয়েটার্স চালু করেন। এবং তারপরে একটার পর একটা ছবি করে যান। যার মধ্যে অনেকগুলো তখনকার যুগের হিসেবে অনবদ্য। তার মধ্যে কিছু ছবি প্রচণ্ড পয়সা পায়, কিছু ছবি প্রচণ্ড মার খায়। এটা যে-কোনো শিল্পীর ভাগ্যে অবধারিত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি 'গৃহদাহ'। আমার মনে আছে, 'চিত্রা সিনেমায় তিনদিনের মাথায় দর্শকরা স্ক্রীন ছিঁড়ে দেয়। ওখানে অচলার ট্র্যানজিশন ফ্রম টাউন টু ভিলেজ যে-মন্তাজের দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তখন তা অভাবনীয়। সাবজেকটিভ ক্যামেরার ইউজ ভারতে তিনি প্রথম প্রচলন করেন। তাঁর 'উত্তরায়ণ' ছবি দেখলে সেটা বোঝা যাবে। এসব ছবি আজকের লোকে মনে রাখে না। রাখে 'মুক্তি', 'দেবদাস' ইত্যাকার অনন্ত সেন্টিমেন্টাল চিপ ছবি।

এখন কিছু-কিছু ব্যক্তি তাঁকে প্রিন্স পি. সি. বড়ুয়া বলে বিদ্রূপ করাব চেষ্টা করছেন। তাঁদের জানা উচিত সেই বন্ধ-জানলার যুগে এই লোকটা কিছু করার চেষ্টা করেছেন। পূর্বসূরীদের অস্বীকার করে নিজের মাহাত্ম্য বাড়ানো যায় না।

•

ডকুমেন্টারি

প্র : তথ্যচিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন।

ঋ : তথ্যচিত্র মোটামুটিভাবে দুটো ধারাকে অনুসরণ করেছে। একটি হচ্ছে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির— যাঁর 'নানুক অব দি নর্থ'— এস্কিমোদের জীবন। আর-একটা হচ্ছে লন্ডনের সেনট্রাল ফিল্ম ইন্সটিটিউটের। যেটার গুরু হচ্ছেন জন গ্রিয়ারসন। এই দুজনের অধীনের ডকুমেন্টারি ছবি কাকে বলে, সেটা সারা পৃথিবী দেখেছে। 'মোয়ানা', 'লুইসিয়ানা স্টোরি', 'এলিফ্যান্ট বয়'— ফ্ল্যাহার্টির একদিকে এই সমস্ত কাজ, অন্যদিকে ব্রিটিশ ফিল্ম

বোর্ডের 'নাইট মেল', 'সং অব সিলোন' ; তারপরে যে-সমস্ত কাজ আধুনিক (কয়েকজন) করেছেন সেগুলো আমাদের প্রণম্য।

লেনি রাইফেনস্টল হিটলারের যুগে যে-কাণ্ড করে গেছেন, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে প্রচণ্ড মানসিক আক্রমণ থাকতে পারে বটেই, কিন্তু শৈল্পিক দিক থেকে তাঁর গুণকে অস্বীকারের ক্ষমতা কোনো শিল্পীর নেই। উনিশশো ছত্রিশ সালে বের্লিন ওলিম্পিককে হিটলারের বদমাইসি সত্ত্বেও তিনি, এই মেয়েটি, ছত্রিশ জন ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে যা কভার করেছিলেন, আমি মনে করি না কোনো ডকুমেন্টারি ফিল্ম মেকার ঐ ধরনের কাজ গুছিয়ে তুলতে পেরেছেন।

প্র : তথ্যচিত্র নির্মাণে আপনি কি বিশেষ কোনো নীতি অনুসরণ করেন?

ঋ : সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাহার্টি এবং গ্রিয়ারসনের একত্র ঘটনা। যেটা বেসিল রাইট 'নাইট মেল' থেকে আরম্ভ করে 'সং অব সিলোন'-এ— ব্যাপারটাকে— জমিয়ে দিলেন।

ঐ ব্যক্তিটিকে আমি পূজো করি। দেখুন, ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র করতে গেলে অনেক বেশি ভালোবাসার প্রয়োজন। মানুষকে না ভালোবাসলে কাজকম্মো হয় না। আপনারা ভাবেন, আমি ফীচার ফিল্ম মেকার। কিন্তু একবার অ্যানালাইজ করে দেখুন তো, আমি কি মানুষের বাইরে কখনো গেছি? স্টুডিওর অভ্যন্তরে আমার ছবি কোনোটা হয়েছে?

আমার ফীচার ফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি এ দুটোতে কোনো তফাৎ নেই। আমি মনে করি না যে, ডকুমেন্টারি বলে কোনো বিশেষ পদার্থ আছে। ডকুমেন্টারি হচ্ছে মানবজীবনের ডকুমেন্ট। মানুষকে ভালোবাসলে ও দুটোর ভেদাভেদ থাকে না।

আমি তথ্যচিত্র সম্পর্কে খুব বেশি অবহতি নই। বেশ-কয়েকটা করেছি বটে, কিন্তু সেগুলো পেটের দায়ে। তথ্যচিত্র করতে হলে একটা বিশেষ মানসিকতা লাগে, যেটা আমার নেই। কাজেই আমার তথ্যচিত্রগুলো প্রায় প্রত্যেকটাই সম্পূর্ণ নিস্ফল। কাজেই আপনাদের তথ্যচিত্র সম্বন্ধে কিছু বলার আমার ধৃষ্টতা হবে।

প্র : আপনার ডকুমেন্টারি 'পুরুলিয়ার ছৌ' আমাদের খুব ভালো লাগল। 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পোতে'ও ছৌ নাচের বিশেষ অর্থবহ ব্যবহার দেখলাম। ছৌ-নাচ সম্পর্কে আপনার বিশেষ আগ্রহের কারণ কী?

ঋ : দেখুন, ছৌ আমাদের পুরুলিয়ার মানুষের একটা গভীরত্বের প্রশ্ন। আপনারা যদি পুরুলিয়ায় যান, যে জেলাটা দরিদ্রতম, পশ্চিম বাংলায়, তাদের গাঁয়ের মধ্যে ঢোকেন, দেখতে পাবেন মানুষ শিল্পকে কীভাবে ভালোবাসে। এদের মধ্যে গিয়ে আমি প্রেমে পড়ে গেলাম। এইসব মানুষজন কীভাবে নাচকে ভালোবাসে, এই মুখোশগুলো তৈরি করে, দেখে আমি হতহারা হয়ে গেলাম। এদের ভালোবাসতে বাসতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমি তিনবার পুরুলিয়ায় কাজ করেছি। প্রাথমিকভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য একটা ডকুটেন্টারি করতে হল। তারপরে পারী থেকে ফিলিপ প্যার্‍্যা এল। তখন রঙের ছবি একটা করতে হল। তারপরে এই ছবিতে আমাকে খাটতে হল।

ঘটনাটা হচ্ছে— আমার মাথার মধ্যে সব সময়ে একটা মাতৃমূর্তি কাজ করে। কোনো এক বন্ধু বলেছেন— যে, 'আপনাকে মা'য়ে খেয়েছে'। সেটা সত্যি। মা'য়ে আমাকে সত্যিই খেয়ে ফেলেছে। ছৌ-এর শেষটা দেখবেন যে, তাতে এই কথাটাই বলা হয়েছে।

ওপার বাংলা

প্র : আচ্ছা, বাংলাদেশে ছবি তৈরির ক্ষেত্রে সুবিধে-অসুবিধের বিষয় কিছু বলুন।

ঋ : সব্বোনাশ করেছে! বাংলাদেশে ছবি তৈরির বিষয় কিছু বলতে গেলে আমাকে ডিপ্লোম্যাট হতে হবে। দু দেশের ব্যাপার এবং অত্যন্ত টাচি ব্যাপার! অর্থাৎ কিনা আমি যদি কিছু খারাপ বলতে যাই, তা হলে, সেটা আঘাত করবে তাদেরকে। এবং তার ফলে আরো বেশি একটু মন্দ সম্পর্ক হয়ে যাবে। কাজেই বলতে চাই না। বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে যেগুলো গুড পয়েন্টস, সেগুলো আমি বলতে পারি। নট দি ব্যাড পয়েন্টস। বাংলাদেশে ছবি করার সুবিধে-অসুবিধের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী যে সমস্ত ছেলেমেয়ে তাদের কোনো তুলনা নেই। তারা আপনার জন্যে প্রাণ দিয়ে যাবে। টেকনিশিয়ানদের মধ্যেও বেশির ভাগ আপানর জন্য উন্মাদের মতো খাটবে। কারণ, একটা জিনিস ওদের— সেটা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের মানুষ ভীষণ ভাবপ্রবণ। যাকে নেয়, প্রাণ ভরে নেয়। আর, যাকে নেয় না, তাকে একদম নেয় না। কাজেই এই হচ্ছে মোটামুটি ঘটনা। যন্তরপাতির অবস্থা বলে লাভ নেই— যাকে বলে একেবারে জঘন্য। এমন সমস্ত যন্তরপাতি আছে ওখানে যা কলকাতায় নেই, বম্বেতে নেই, পুনায় নেই। এত ভালো! কিন্তু সেইগুলোকে এমনভাবে ধেড়িয়েছে, মানে, চুরমার করেছে একেবারে। সেগুলোকে সারাতে-সারাতে আমার জান কয়লা হয়ে গিয়েছিল। আমাকেই মিস্ত্রি হতে হয়েছিল! কী করব?

প্র : সেগুলো নষ্ট হয়েছে কি অজ্ঞানতার ফলে, না ইচ্ছে করেই নষ্ট করেছে?

ঋ : সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার ফলে—এক। দুই হচ্ছে, ঘুষ খাবার টেন্ডেন্সি। আর তিন হচ্ছে কমপ্লিট কেয়ারলেসনেস। আমি যেমন একটা জায়গা—ঢাকা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে, শুটিং করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি যখন সব তৈরি করছি, তখন আমার ক্যামেরাম্যান এসে বলল, 'দাদা এ ক্যামেরাটা ওয়র্ক করছে না। শাটার-প্লেট মুভ করছে না কী হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না।' আমি গেলাম। যে-ছোঁড়াটা কেয়ারটেকার হয়ে এসেছে, তার তো দায়িত্ব ছিল ক্যামেরাটাকে চেক-আপ করে স্টুডিও থেকে নিয়ে আসা? এতদূর এসেছি, এতোগুলো লোককে নিয়ে। এতগুলো পয়সা নষ্ট হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখি. . খোল। খুলে দেখি— ক্যামেরার মাঝখানে এক পিন থাকে. সে পিনটা গেছে বেঁকে। যার ফলে শাটার-প্লেট আটকে গেছে। সেটাকে ঠুকে-ঠুকে ঠিক করে আমি শুটিং করলাম। আবার একদিন একটা আরেক জায়গাতে, সেটা থার্টি মাইলস অ্যাওয়ে ফ্রম ঢাকা, ক্যামেরা নিয়ে গেছি। একটা ক্যামেরার মধ্যে নানারকম থাকে : টাইপ-টু অ্যারিফ্লেক্স যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ভ্যারিয়েবল শাটার ; আর টাইপ-ওয়ানগুলো হচ্ছে ফিক্সড শাটার। এখন আমি একশো আশি ডিগ্রি চাই, ওটা ওয়ান-টোয়েন্টিতে আটকে গেছে। আমার ক্যামেরাম্যান আবার এসে আমায় বলছে, 'দাদা এটা কি আপনি চাচ্ছেন ভ্যারিয়েট করতে? এটা ভ্যারিয়েট করা যাবে না।' আমি কেয়ারটেকারকে জিগ্যেস করলাম যে, 'এরে ব্যাটা কী ব্যাপার এটা?' বললে, 'এটা ওয়ান টোয়েন্টি তো, ফিক্সড শাটার।' আমি বললুম, 'শালা, এটা টাইপ টু বি বেস্ট

ক্যামেরা।' খুললাম— জ্যাম করে রেখে দিয়েছে— মানে, হয়ে গিয়েছে আর কি। মানে, ওভারল করে নি, মানে, কীপ-আপ একদম করে নি। তা, আই হ্যাভ টু কারেক্ট, দেন শুট। তা এরকম ঝামেলা। আর সাউন্ড সিস্টেম? সে হরিবল্। সে ভাবা যায় না। সে মানে, হাত দিলে ভেঙে পড়ে। সে-সব মাল দিয়ে আমাকে সাউন্ডের কাজ করতে হয়েছে। এনিওয়ে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ অসম্ভব ভালো। এই হচ্ছে ঢাকার অবস্থা।

প্র : বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ হল— স্বাধীনতার আন্দোলন— এটা আপনার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল?

ঋ : আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। কিন্তু, এখন যা দেখছি একেবারে উল্টো হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ যত বেশি, আমার মনে হয় (তত বেশি) আর কারোরই নেই। কারণ, আমি ভীষণভাবে পরিচিত এবং তাদের সঙ্গে মিশেছি। এই মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলো এখন গুণ্ডায় পরিণত হয়েছে। এরা গুণ্ডা শুধু নয়, ডাকাত। মানে, ঘরে-ঘরে তো স্টেনগান... এল. এম. জি... রিভলবার। এরা এখন একেবারে পাল্টে গেছে। এটা কলকাতার কাগজে বেরোয় না। কিন্তু এগুলো, আমি তো যাই, আমি জানি। যে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসতাম তারাই এখন এতে পরিণত হয়েছে। আর যারা তাদের মধ্যে গুড এলিমেন্টস তারা কমপ্লিটলি ফ্রাসট্রেটেড— যে, এই কি আমাদের স্বাধীনতা? এর জন্যেই কি আমাদের মানুষ, আমাদের তিরিশ লাখ লোক মারা গেল? দুটোই এক। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা অসম্ভব উদ্দীপনা এসেছিল, উদ্দামতা এসেছিল এবং সে সময়েও আমি ভেতরে ঢুকেছি। ছবিও করেছি ওরই মধ্যে। পাক সেনাদের সামনে। তখন দেখেছি তাদের যে বীরত্ব। কিন্তু এখন হচ্ছে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে (ঐ) কমপ্লিট ফ্রাসট্রেশন যে এটা কী স্বাধীনতা? এইজন্যেই কি আমরা লড়াই করলাম? আর-এক দল একেবারে কমপ্লিট গুণ্ডা।

প্র : আপনি যে বাংলাদেশে ছবি করতে গিয়ে 'তিতাস' করলেন এটা কি নেহাতই কো-ইন্সিডেন্স?

ঋ : না। মোটেই কো-ইন্সিডেন্স নয়। আমাদের যে পূর্ববাংলার... আমাদের দেশটা তো রিভেরাইন কান্ট্রি নদী-মাতৃক দেশ। তার ওপরে দুটো মাত্র উপন্যাস আছে। মানিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি' আর এই অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস'। ব্যাপারটা হচ্ছে, মানিকবাবুর কথা তো বলে কোনো লাভ নেই... মানে ওঁর লেখনী একটা তীক্ষ্ণতম ব্যাপার। কাজেই অত্যন্ত টাইট। অত্যন্ত কমের মধ্যে অনেকবেশি-বলা উনি বলেছেন। কিন্তু উনি দেখেছেন এই জেলেদেরকে— বাবুদের চোখ থেকে। তিনি ভদ্রলোকের ছেলে, তিনি কিছুতেই...ঐ যে... একটা জায়গায় গণ্ডগোলটা আছে আর কী। আর এই অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে একজন মালো, নিজে একজন জেলে। সে একটা মানে, ব্লা... ব্লা করে গেছে। মানে, গুচ্ছের অকারণ কথা আছে। কিন্তু ফ্রম ইনসাইড... একেবারে ওদের গভীর থেকে দেখা। সে নিজে যে মালোর ছেলে। এবং ঐ গোকর্ণ গ্রামে তার বাড়ি। যেখানে এবারে আমি ছবি করলাম আর কি। সেই গ্রামের একমাত্র গ্র্যাজুয়েট। মানে, এই মালোদের মধ্যে। তা কাজেই তার লেখা... সুখদুঃখ... এগুলো অন্য লেভেলে চলে গেছে। ওটাকে এডিট করার প্রশ্ন ছিল। সেটা বোধহয় আমি করতে পেরেছি। আমি

জানি না করতে পেরেছি কি না। 'তিতাস' প্রথমেই পড়ে আমি... যখন প্রথম এটা বেরলো... অদ্বৈত তো তখন টি.বি. হয়ে মারা গেল। আমার বন্ধু ছিল। তখন থেকে আমার মাথায় যে, এটা আমি ছবি করব। এটা আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে, ওদেশে আমাকে যেতে দেবে না, তখন আয়ুব খাঁর দেশ। আমি কমিউনিস্ট, আমাকে ভিসা দেবে না কিছুতেই। কাজেই আই কুড নট ডু। এবং আমাকে বহুবার বহুলোক এখানে বলেছে যে, এখানে করো। আমি বলেছি এখানে হয় না। ঐ নদী, ঐ জমি, ঐ নৌকো, ঐ মুখ এদেশে পাওয়া যাবে না। তখন থেকে মাথায় ঘুরছে। কাজেই প্রথম (থেকেই)...। আমার বোন কুমিল্লায় থাকে এখন। আমারই যমজ বোন। তার বাড়িতে আমি গেছলাম। আমি স্টেট-গেস্ট হয়ে গেছলাম ঐ সময়, বাহাত্তরের গোড়ায়, একুশে ফেব্রুয়ারি। ঐ বাংলাভাষা-দিবস। আমি আর সত্যজিৎ গিয়েছিলাম। তখনই আমার বোনের কাজে গেছলাম কুমিল্লায়— ঐ ফাংশন-টাংশন শেষ করে। ফেরার পথে আমার বোনের এক বন্ধু, একটি মুসলমান ছেলে, সে আমায় বললে যে, আপনি 'তিতাস' কেন করছেন না? আমি বললুম ইয়েস, এইটেই করব। কাজেই আমার এটা ফট্ করে ইচ্ছে নয়। বহুদিন থেকে মাথার মধ্যে ছিল— সুযোগ পেলাম, করলাম।

রাজনৈতিক অতীত, গণনাট্য-সংঘ

প্র : এবারে একটু আপনার ব্যক্তিগত অতীতের দিকে যাচ্ছি। আপনি কীভাবে এবং কখন মার্ক্সবাদী রাজনীতির দিকে এলেন?

ঋ : আমি যখন ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে পড়তাম তখন আমি একটু আর. এস. পি.-র দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম। তারপরে আই. ই. পি.-এর ইনফ্লুয়েন্স আমার উপর এসে পড়ল। আমি ঐদিক থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ মার্ক্সিস্ট পড়াশুনো আরম্ভ করলাম। মার্ক্সিজমের বইপত্র পড়া, লেখা এবং অভিনয় করা এই সমস্তগুলোই করতাম সেই সময়। এই চুয়াল্লিশ সালটাল হবে। ঐরকম অর কী। একজ্যাক্ট ডেটটা আমি বলতে পারব না।

প্র : ঐ সময় থেকেই গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হলেন?

ঋ : তখন থেকেই আমি গণনাট্যে আসি। ছিলাম।

প্র : কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে চলে গেলেন সেটা কীরকম সময়ে? সেক্রেটারি হলেন?

ঋ : সেটা আমি হলাম ফর্টিএইটে। ফর্টিএইটে হলাম ফিফটিথ্রিতে আমি ছেড়ে দিলাম।

প্র : পার্টি ব্যান্ড হবার একটু আগে?

ঋ : হ্যাঁ, পার্টি ব্যান্ড হবার একটু আগে।

প্র : গণনাট্য-সংঘে থাকাকালীন আপনার কী-কী নাটক অভিনীত হয়েছিল? এবং সেগুলোর পরিচালক কারা ছিলেন?

ঋ : সবকটাতেই পরিচালক আমি ছিলাম। আমার নাটকের মধ্যে তখন 'জ্বালা', 'দলিল'— 'দলিল'টা প্রথম—'অফিসার', 'ভাঙা-বন্দর' এই চারটেই আমার মনে পড়ছে...।

প্র : 'সাঁকো'—

ঋ : হ্যাঁ, 'সাঁকো'। আরো কিছু-কিছু আছে, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

প্র : 'জ্বালা' এবং 'দলিল' এই নাটক দুটো লিখবার মূল প্রেরণা সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

ঋ : 'দলিল'? উনিশশো আটচল্লিশ সালে আমি রাজসাহী থেকে কলকাতায় এলাম। থাকগে সে নানারকম কথা। কথা হচ্ছে যে, সংক্ষেপে. মাকে নিয়ে আমায় আসতে হল। তখন চোখের সামনে দেখে... এ 'বাস্তুহারা' এই ব্যাপারটাই, এই ভাষাটাই প্রথমত আমার অসহ্য লাগে। এই 'শরণার্থী', 'বাস্তুহারা' এসব কথাগুলো শুনলে গা ঘিনঘিন করে। হ্যাঁ, মোস্ট... অ্যাফেয়ার। থাকগে। 'দলিল' আমি লিখলাম। তখন আমি আই. পি. টি. এ.-র সেক্রেটারি ছিলাম। এবং সেন্ট্রাল-স্কোয়াডের ডিরেক্টর ছিলাম। নাটক করাই তখন আমার কাজ ছিল। করা গেল। ওটা অল ইন্ডিয়ার ফার্স্ট প্রাইজও পেল। আমি তখন অ্যাক্টিংও করতাম ইত্যাদি। তারপরে পি. সি. যোশী আমাকে—তখন পি. সি. যোশী এলাহাবাদে—একটা চিঠি লিখল। আমার সেজদার বাড়িতে আমি তখন থাকতাম। সেটা হচ্চে ঐ হরিশ মুখুজ্জে রোড। তখন নাইন্টিনফিফটিওয়ান। তখন ঐ 'ইন্ডিয়ান ওয়ে' বলে একটা কাগজ (বেরোত)। এডিটর ছিলেন পি. সি. যোশী, আপনারা জানেন, জেনারেল সেক্রেটারি ছিল তার আগে। তারপর মাঝখানে বি. টি. আর. এল. রনদিভে—যার ফলে আমাদের, আমার ও আমার বৌয়ের বারোটা বাজল। এনিওয়ে... ড্যাম ইট। সেসব আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। এখনকার ছেলেপুলেরা জানবেও না, বুঝবেও না। কাজেই ঐ সমস্ত কথার দরকার নেই। পি. সি. কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি, সে আমাকে (বলল) 'ইউ টেক ওভার দি চার্জ অব বেংগল।' করেসপন্ডেন্ট আর কী। সে সময় আমি একতিরিশটা সুইসাইড... মানে, অ্যাজ এ করেসপন্ডেন্ট, অ্যাজ এ জার্নালিস্ট, আমাকে এই সমস্তগুলো কভার করতে হল। তো একতিরিশটা সুইসাইড দেখে— তার ওপরে আমি 'সুইসাইড ওয়েভ ইন ক্যালকাটা' বলে পাঠালাম। সেটা বেরোল-- এবং খুব নামধাম (হলো)। তা আমি ভাবলাম কী, এতে তো জমবে না মাল। আরো রাগ প্রকাশ করার একটা ব্যাপার আছে। তখন আমি ফিল্মে এনক্রোচ করি নি অ্যাট-অল। এই 'জ্বালা' নাটকে তার থেকে সিলেক্ট করে ছটা চরিত্র— ইচ ওয়ান ইজ এ ট্রু ক্যারেক্টার। 'জ্বালা' ইজ এ ডকুমেন্টারি। এই নাটক লিখলাম এবং অ্যাক্টিং করলাম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করলাম। তারপরে এখন বিভিন্ন জায়গায় প্রিভিলেজ দিল। কিন্তু সেই সময়কার কলকাতা...। এই যে এখন আরো হরিবল্ মানে, এখন তো একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যাট দ্যাট টাইম ইট ওয়াজ মোর অর লেস এ মাচ বেটার সিটি।

প্র : 'জ্বালা'তে আপনার সঙ্গে আর কে কে অভিনয় করেছিলেন?

ঋ : কালী বাঁড়ুজ্জে, গীতা দে, মমতাজ, ঐ একটা মমতা বলে মেয়ে ছিল সে...

প্র : চট্টোপাধ্যায়?

ঋ : হ্যাঁ, ঐ। আর একটা বাচ্চাকে নিয়েছিলাম। এই... জ্ঞানেশ ইত্যাদি।

প্র : বিজনবাবু তখন ছিলেন না?

ঋ : না, বিজনবাবু ছিলেন না। সে একান্ন সালের কথা বাবা— একান্না সাল বাহান্ন সালের কাজ। তারপরে আমি নাবিও নি কিছুতে। তারপরে আমাকে বহুদিন পরে টাইনি

চ্যাটার্জী—এখন যে ডিরেক্টর জেনারেল, রেডিও, সে তখন এখানে ডিরেক্টর ছিল—সে আমাকে ধরে। 'জ্বালা'টা আমি ডাইরেক্ট করে দিয়েছি খালি, আমি নাবি নি। মানে, আমি গলা দিই নি। তারপরে আমার ভাইপো ফন্টু সে পাটনায় এটা (করে) হিন্দীতে। ফণীশ্বর রেণু, এই যে রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছে সে হিন্দীতে অনুবাদ করে। তার বৌটা আবার বাঙালি। এ ছোঁড়াও মুঙ্গেরের, তার মানে পুরো বাঙালি। বাংলা জানে। আমার ভাইপো আর ফণীশ্বর পাশাপাশি থাকে। এদের একটা থিয়েটার গ্রুপ আছে। এটা অনুবাদ করে পাটনা রেডিও থেকে আবার [প্রচার] করে থাকে। তারপর দিল্লী রেডিও থেকেও হল। ছেড়ে দাও। এখন তো এটা অ্যাক্সেপ্টেবল্। তখন ইট ওয়াজ নট টেক্ন ইন। গ্রহণ করার পক্ষে, ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। কিন্তু এখন থিংস্, হ্যাভ বিকাম মাচ মোর...।

প্র : আপনি 'জ্বালা'র কিছুদিন আগে, অনেকদিন আগে, বলেছিলেন 'তৃষ্ণা' বইটা করব?

ঋ : বাবা, আমাকে জ্বালিও না। আমি মদ খাই। মদ খেয়ে যাব।

প্র : আর নাটক লিখছেন না কেন?

ঋ : ইচ্ছে নেই। দেখুন মশাই, লেখার ইচ্ছে নেই।

প্র : আচ্ছা, গণনাট্য-সংঘ থেকে আপনার বিদায় গ্রহণ কি স্বেচ্ছাকৃত?

ঋ : সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত।

প্র : ফ্যাসি-বিরোধী লেখক সংঘ এবং ভারতীয় গণনাট্যসংঘ ধরনের সংস্থার ভূমিকা এই মুহূর্তে আমরা খুব বোধ করছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো আর গড়ে উঠছে...

ঋ : আমি কী বলব! যখন ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল... একটা... একই সংগে ছিল। অ্যান্ড পি. ডব্লিউ. এ. : প্রোগেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন। মানে, গণনাট্য-সংঘের জন্মগ্রহণ হয় কিন্তু আমাদের পি. ডব্লিউ. এ.-র আন্ডারে। তারপরে আস্তে-আস্তে আমরা দুটো ইয়েতে যাই। মানে, একই জায়গায়, একই বাড়িতে। ঐ ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রীটে। একই জায়গায় কাজ করি আমরা। সেই সময় এই ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন এবং এইগুলো আমাদের কাছে একটা ভয়ংকর প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। আজকে এধরনের আন্দোলন হওয়া অসম্ভব প্রয়োজন। কারণ, আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি, কাবণ, (আমার) মোটামুটিভাবে দিল্লীর সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। আমি নাম করব না, একটা ফ্যাসিস্ট চেহারা নেবার চেষ্টা এখানে আবার আরম্ভ হয়েছে। কাজেই অসম্ভব প্রয়োজন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকালকার ছেলেপুলেদের মনোবৃত্তি আমি জানি না— কতখানি প্রিন্সিপ্ল্ড। সেরকম ছেলেপুলেরা যদি থাকে তাদের উচিত— মানে আই অ্যাম হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর— এ সমস্ত জিনিস (করা)। কারণ সি. আই. এ. অ্যান্ড এট্সেট্রা যা করে বেড়াচ্ছে দিল্লীতে। এগুলো আমি নাম একদম করতে চাই না-- খুব নামকরা লোকরা তার মধ্যে রয়েছে। এবং তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। আজকালকার ছেলেপুলেদের এগুলো করা উচিত। কিন্তু আজকালকার ছেলেপুলেদের, আনফরচ্যুনেটলি আমি দেখছি যে, এদের মধ্যে এ সমস্ত মনোবৃত্তি থাকলে... একমাত্র নকশালবাদী ছেলেরা ছাড়া— আর কারো মধ্যে কিস্যু নেই।

প্র : আচ্ছা, আপনি ওদের প্রতি একটু বেশি স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়েছেন কি?

ঋ : কাদের প্রতি?

প্র : নকশালদের সম্বন্ধে?

ঋ : স্নেহপ্রবণ তো হতে বাধ্য আমি।

প্র : সেটা হিসেবের বাইরে হয়ে যাচ্ছে কি না...

ঋ : না, না, হিসেবের বাইরে কেন? আমি তাদের সঙ্গে, তাদের মতামত এবং তাদের আদর্শের সঙ্গে একদম একমত নই। কিন্তু তাদের সত্যতা। সেটাকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর তো কাউকে দেখি না। এই বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলো—এদের আর কিছু নয়—এরা সম্পূর্ণ মিসগাইডেড। যেটা আমার ছবিতেও আমি বলেছি। কিন্তু এদের সততার কোনো তুলনা নেই। এরা নিজেদের জন্য কিচ্ছু চায় না, এরা দেশের জন্য চায়। সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করব না? সেটাকে আমি পূজো করব না? করতেই হবে!

শিল্পীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব

প্র : সাধারণত শিল্পীদের বিশেষ রকমে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক হতে দেখা যায়—এর কারণ আপনার কী মনে হয়েছে?

ঋ : শিল্পীরা ভীষণভাবে ব্যক্তিগত হয়ে পড়েন, যেটা এই যুগে উপযুক্ত নয়। তারা একটু বেশি... (তাদের) একটু সমাজ-সচেতন হওয়া উচিত। কিন্তু আজকালকার শিল্পীরা, এরা কেন যে ক্ষেপে যান, আমি ঠিক... আমার চৌহদ্দীর থেকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এরা কেন এত...। ডেমক্র্যাটিক হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। সেটাই এরা হন না। আমি তো সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছি... আমি দেখছি যে, এইসব ছেলেমেয়েগুলো, এরা ঐ ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ মানে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্র : নিজেকে আপনার কখনো ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক মনে হয়েছে?

ঋ : আমি? আমার কখনো এ প্রশ্ন মনে হয় নি। আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক। আমার ইন্ডিভিজুয়ালিজম ওটা একটা ঘটনা। কিন্তু সেটা কারোরই বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা না। আমি কন্টিনিউয়াসলি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক! তাতে কী হয়েছে? মিএগ্রাজান, হইসে কী তাতে? লাইফ ইজ লাইক দ্যাট! আমি অনেক গণ্ডগোল করেছি, কিন্তু আমি কারো কখনো ক্ষতি করি নাই। বুঝছেন নি মিএগ্রা?

প্র : আচ্ছা, শিল্পীর কতখানি রাজনীতি-সম্পৃক্ত হওয়া উচিত?

ঋ : রাজনীতি সম্পর্কিত হওয়া মানে, শিল্পীটিল্পি নয়, যে-কোনো মানুষকে এই সমাজে, এই শ্রেণীসমাজে, রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে হয়। এটা শিল্পী শুধু নয়, সব্বাইকেই হওয়া উচিত। তবে, তাই বলে, স্লোগান-মংগারিং শিল্পীর কাজ না। এই চীপ স্লোগান দিয়ে শিল্পী হয় না, শিল্পীকে কাজ করতে হয় মানুষের গভীরে। রাজনীতিকরা কাজ করেন ওপরতলায়— মানে চ্যাচামেচি, হট্টগোল, চীপ স্লোগান, একটা শর্ট স্লোগান— এইসব। শিল্পী এইগুলো করলে, আমি মনে করি, সেটা শিল্প আর থাকে না।

প্র : শিল্পীর কোনো সামাজিক দায়িত্ব আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

ঋ : সম্পূর্ণ আছে। সামাজিক দায়িত্ব যারা অ্যাভয়েড করে তারাও সামাজিক দায়িত্বই পালন করছে। অর্থাৎ, তারা ওপরতলার শুয়োরের-বাচ্ছাদেরকে সাহায্য করছে। সামাজিক দায়িত্ব প্রত্যেকেই পালন করছে।

প্র : আমাদের দেশের শিল্পীদের প্রাথমিক কী, এই নিরিখে?

ঋ : মানুষকে সেরা করা। আবার, প্রাথমিক দায়িত্ব আর আস্তিক দায়িত্ব দুটোই তো এক। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষকে সেবা করা, মানুষের জন্য কথা বলা— সেটা শিল্পসম্মত হওয়া উচিত, এই অব্দি। স্লোগান-মংগারিং নয়।

প্র : শিল্পীদের কাজকর্মের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা রাজনীতি থেকে খুবই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন—এটা পেছনকার ব্যাপার, বা...

ঋ : এরা কেউই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন না। আগেই উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। এরা রাজনীতিতে একটা পক্ষ নিয়ে বসে আছেন, সেটার পোজ হচ্ছে... আমার... এই অ্যাম নট কমিটেড। ওয়ান ক্যান-নট বি নন-কমিটেড। ইউ আর আইদার ফর দিস অর ফর দ্যাট। কাজেই এরা কেউ বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না। এরা মানুষের সব্বোনাশ করার চেষ্টা করছেন।

প্র : তিরিশ বছর আগেও শিল্পীদের মধ্যে এই কমিটমেন্ট, আপনি একটু আগে যেটা বললেন, এই কমিটমেন্টের ভাবটা যেরকম ব্যাপকভাবে কাজ করত, আজকাল সেটা খুব ফিকে হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি ; একদম নেই। এ-ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে চাই।

ঋ : আমার প্রতিক্রিয়া তীব্র। এরা হয়েছেন কেননা, সস্তায় বাজীমাৎ করার একটা চেষ্টা চালু হয়েছে এখন। আমি তো বললাম (রাস্তায়) আসতে-আসতে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'র ওপরে লেখাটা পড়েন— 'সংকলনে' আছে— সেখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বললেন যে, 'সময় তাহার পর হইতে কেমন যেন ইতর হইয়া আসিয়াছে।' তো সময় ক্রমশ ইতর হয়ে এসেছে। ছেলেপুলেরা কীরকম ইর্‌রেসপন্সিবল। তার মানে হচ্ছে যে, আস্তে-আস্তে একটা মরালিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা হচ্ছে ভাঙনের লক্ষণ। সম্পূর্ণ ভাঙছে। ভেঙে একটা নতুন কিছু হবেই আমি জানি। সেটা হয়তো আমার ছেলের সময়ে হবে, নইলে, আমার নাতির সময়ে হবে। আমাদের সময়ে হবে বলে আমি আর আশা করি না। কাজেই শিল্পীদের আলাদা করে ইয়ে করার কোনো দরকার নেই, তারই লক্ষণ।

প্র : কমিটমেন্টটা নষ্ট হবার পেছনে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা যাঁরা, তাঁদের দায়িত্ব কতোটা?

ঋ : তাঁদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ ছিল ; কিন্তু এঁরা কেউই বামে নেই। এঁরা সব দক্ষিণে চলে গেছেন। কোনো উপায় নেই। একটা নেতা নেই, যাকে বলা যায় সত্যিকারের বামপন্থী নেতা। কাজেই বামপন্থী নেতা... ঐ... তাদের দায়িত্ব কী? তারা তো কেউ নেই-ই। মানে, সব দক্ষিণপন্থী এখন। কী করে নিজের পকেটে কিছু টাকা ঢোকানো যায়, কী করে আমার একটা নাম করা যায়, কী করে খবরের কাগজে আমার নামটা

ছাপা হবে, এই হচ্ছে একমাত্র চেষ্টা। দেশের মানুষের ভালো করার চেষ্টা কারোরই নেই। কাজেই তাদের দায়িত্ব আসে কোত্থেকে, মানে, বলি কোত্থেকে? পাচ্ছি না তো! বললামই তো আগে যে, নকশালবাদী ছেলেগুলোর মধ্যে থেকে যদি বেরোয়...

প্র : মানে, আমি বলছি কিছুকাল অতীত, বিশ বছর আগে বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কিছু ভুল হয়েছে কি? যার ফলে এই কমিটমেন্টটা নষ্ট হয়েছে...

ঋ : সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। যার জন্য আমি পার্টি ছেড়েছি। পি. সি. যোশীর অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু পি. সি. যোশী এই জিনিসগুলো অসম্ভবভাবে বুঝতেন। এবং প্রত্যেককে নালিশ করতেন, এবং ইন্ডিভিজুয়াল কমরেডদের... কবে আমার বৌ লক্ষ্মী পার্টি কমরেড ছিল... শিলং কমিটির উচ্চতর কমিটির সভ্য ছিল আমার বৌ... ভুলে যাওয়া উচিত... ও শালা ওইখান থেকে, দিল্লী থেকে।— মারা যাবে এখন, মানে, শেষ হয়ে এসেছে— এই কয়েকদিন আগেও চিঠি লিখেছে। আমি গেলে দিল্লীতে আমাকে ফার্স্ট ডেকে পাঠায় যে, কাম। মানে, আমি বা লক্ষ্মী বলে নয়, মানে, লোকটার ছিল প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কমরেডকে খোঁজ নেওয়া, খবর নেওয়া! এই ছিল অবস্থা। এবং এই লোকটা থাকলে... এবং এ গান্ধীকে এলাহাবাদ কনফারেন্সে শুইয়ে দিয়েছিল। মানে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওয়াজ কমপ্লিটলি আপ বাই পি. সি. যোশী। তাঁকে এরা—আমি নাম বলব না কমরেডদের—পার্টি থেকে ক্লিপ করে তাড়ালো। এই যেদিন তাড়ালো, দ্যাট ইজ হন ফর্টিএইট আগস্ট, ওয়েলিংটন কনফারেন্সে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কনফারেন্স হয়— সেকেন্ড কংগ্রেস নামে। সেই সময় থেকে এরা দায়িত্ব-ফায়িত্ব সব অফ করে দিয়েছে। এবং তারা যা ধেড়িয়েছে সেসব বলে আর লাভ নেই।

প্র : এখন যে-বিশেষ দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তা সত্ত্বেও আমাদের যে রিঅ্যাকশনগুলো... ঠিক তার বিরুদ্ধে যেভাবে দাঁড়ানো দরকার, কিছুতে দাঁড়াচ্ছি না, এটার বিষয়ে আপনি কী মনে করেন?

ঋ : আমার আর মনে করার কী আছে? এটা দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত চলছে এবং সেটা কী চলছে আপনাদের ধারণা নেই। আমি ছবি করতে গিয়ে দেখেছি। এবং আমার কনট্যাক্ট রয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমার করার কী আছে? আমার ব্যক্তিগত ছোট্টখাট্টোভাবে আমি করছি। কারণ, আমি রাজনীতিক নই, কাজেই আমি তো আর অর্গানাইজ করতে পারব না? কিন্তু আমি যেটুপু পারি সেটাতে কিছুই কাজ হবে না। শিল্প দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

প্র : এই মুহূর্তে যে-অপসংস্কৃতি চলছে ব্যাপকভাবে, তা রোধের উপায় আপনি কী মনে করেন?

ঋ : অপসংস্কৃতি কথাটাই আমার কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক লাগে— এক। আর এই ছোঁড়াগুলো যা করে বেড়াচ্ছে তাদের কোনো দোষ নেই। সমাজব্যবস্থা ভাঙতে-ভাঙতে—আগেই আমি বলেছি—এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে, একে রোধ করার কোনো উপায় আপনার আমার নেই। কারোরই নেই। কারণ, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ শ্রেণীসমাজের আর্থিক অবস্থা। আজকের ছেলেমেয়েরা চাকরি পায় না। সত্তর হাজার

ইঞ্জিনিয়ার কলকাতার শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে, তারা কাজ পায় না। তারা রকবাজি করবে না কেন? এর কোনো উপায় নেই! তারপরে ফ্যামিলি-সিস্টেম ভেঙে যাচ্ছে। আগে বাবা-মার ওপরে একটা প্রেম, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা বা যা-কিছু (একটা) ছিল। এখন আপনি দেখবেন, সেসবগুলো আস্তে-আস্তে ভাঙছে, সমস্ত জিনিসটাই তো ভাঙছে, মানে, মানবিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। তা এরা রকবাজি করবেই, বদমাইসি করবেই এরা, রাস্তাঘাটে মস্তানি করে বেড়াবে। দিস ইজ এভিটেবল। একটা সমাজ যখন চুরমার হয়— তখন এইভাবেই হয়। কাজেই এর বিরুদ্ধে কিছু করা এখন, এই মুহূর্তে... আমরা দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারি, কিন্তু তার দ্বারা কম্মো হবে বলে আমি মনে করি না।

প্র : আচ্ছা, আপনারা 'আই. পি. টি. এ.'-তে একদা যেমন সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা সূত্রপাত করেছিলেন, আজকে সেটা কি নতুন করে আরম্ভ করা যায়?

ঋ : যায়— যদি ছেলেপুলে পাওয়া যায়। যাবে না কেন? কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ছেলেপুলের তো দরকার! আমরা ক্রমশ বুড়ো হয়ে গেছি। আমরা আর এখন কর্মক্ষম নই। শিশুদের দরকার।

প্র : প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন যে, 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে আমরা দেখেছি, সেখানে আপনি একজায়গায় বলেছেন : 'সাতচল্লিশের স্বাধীনতা? ফুঃ!' এই সংলাপ প্রয়োগের তাৎপর্য কী?

ঋ : সেই সংলাপ ব্যবহারের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তখন ব্রিটিশদের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল কাহিল। আপনারা কতখানি জানেন আমি জানি না, কিন্তু আমি সমস্তই জানি। একে তো সমস্ত ইকনমি কোলাপস্ করেছিল এই যুদ্ধ করতে গিয়ে। আমেরিকানরা না থাকলে ওদের হয়ে গিয়েছিল। ওই চার্চিল-ফার্চিল অল দোজ হিরোজ কাত। তারপরে এখানে একদিক থেকে সুভাষ বোসের ব্যাপারটা। সেটাতে একটা পাবলিসিটি হয় লোকের মনে। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ... আমি যেসব জায়গায় ঘুরেছি আর কি তখন,... বাংলাদেশ বাদ দিচ্ছি মানে, ওয়েস্ট-বেঙ্গল মানে, বেঙ্গল বাদ দিচ্ছি... মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত সমস্ত এরিয়াটা সুভাষবাবুর ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ইনি কী করতে পেরেছেন কী করতে পারেন নি সেটা আলাদা কথা। কিন্তু তাঁর ইমেজটা প্রচণ্ডভাবে কাজ করেছিল। নাগপুর, রায়পুর এসব জায়গায় আমি তখন গেছি। একেবারে মানুষ ক্ষেপে ব্যোম। তারপরে, ফর্টিটু আগস্ট মুভমেন্ট। সেটা শেক করেছিল। তারপরে ন্যাভাল মিউটনি বোম্বেতে। তারপরে মাদ্রাজে এয়ার-ফোর্সের মিউটিনি। সেটা কেউ জানে না। চাপা, একেবারে চেপে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। ওদের একেবারে কমপ্লিট শেকিং কণ্ডিশন ছিল তখন। আমরা যদি আর কয়েকদিন লড়াই করতে পারতাম, চ্যাচামেচি করতে পারতাম এবং কয়েকটা প্রাণ দিতে পারতাম, এরা এমনি ছাড়তে বাধ্য হত। কিন্তু এই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে ইয়ে করে যে গদি পাওয়া, মানে, একটা, নিজেদের মধ্যে একটা প্যাক্ট করে, এই কান্ট্রির সমস্ত ন্যাশনাল লিবারেশন স্ট্রাগলটাকে বিট্রে করল। গান্ধী ওয়াজ এগেনস্ট ইট। (কিন্তু) আমাদের ন্যাশনাল লিবারেশন স্ট্রাগলের

হায়ার গ্রুপ ইন্ডিপেন্ডেন্সের নাম করে গদিতে বসে গেল। সেইটেই বলেছি। এটা আগেও বলেছি, আজও বলছি। এবং চেঁচিয়ে বলি, সব জায়গাতে বলি।

শান্তিনিকেতন, জাতীয় চেতনায় রবীন্দ্রনাথ

প্র : আপনার শান্তিনিকেতনের অভিজ্ঞতার কিছু শুনতে চাই।

ঋ : আমার ওখানকার প্রধান অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটি ব্যক্তির সঙ্গে— তার নাম হচ্ছে রামকিংকর বেইজ। এই দুজনে মিলে আমরা যে-সমস্ত মাতলামি করে বেড়িয়েছি এবং যেভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে-পড়তে পালিয়েছি, এগুলো লেখার খুব দরকার নেই।

প্র : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কোনো ইয়ে হয় নি আপনার?

ঋ : রবিবাবু সকালবেলায় আসতেন আম্রকুঞ্জে। সেখানে প্রতিদিন সকালবেলায় উনি যে ভাষণগুলো দিতেন, সেগুলো কেন যে ছাপা হয় নি, আমি জানি না। এবং ওরকম একটা চেহারা দেখা যায় না। আর ঐ যে ভাষণগুলো দিতেন সে ভাবা যায় না। কিন্তু ওর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।

প্র : আচ্ছা, আপনি কি ওঁর অন্তিম যাত্রায় ছিলেন?

ঋ : উনি যেদিন মারা গেছেন—তখন আমি—আমাদের বাড়ি ছিল এই বকুলবাগানে। আমার বোন পড়ত বেলতলা গার্লস স্কুলে। ঐখানে খবর পেলাম যে, উনি মারা গেছেন। তখন ছুটলাম এবং প্রচণ্ড ভিড়। পেছন পেছন গেছি। এই অব্দি।

প্র : জাতীয় স্তরে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি সম্পর্কে আপনি কী অনুভব করেন? প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এখনও কী পেতে পারেন?

ঋ : সব-কিছু। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রগুপ্ত নাম দিয়ে— আমি নাম বলব না— আমাদের একটা কমরেড 'মার্কসবাদী' মাসিকে... ইফ ইউ রিমেম্বার যে, রবীন্দ্রনাথকে ডিক্রাই করা—। ওটা হচ্ছে বি. টি. রণদিভের পিরিয়ডে। আমাদেরকে, প্রত্যেক পার্টি কমরেডকে বারণ করে দিয়েছিল... এবং যাচ্ছেতাই গালগাল রবীন্দ্রনাথকে— যে, বুর্জোয়া... দিস অ্যান্ড দ্যাট। সেদিন আমি একটি মেয়েকে পড়াতুম, শোভা সেনের ছোট বোন ইলা। মানে ও আই. এ. পড়ত, আমি টিচারি করতুম। ইলার কাছে আমি বলতে গেছি এই রবীন্দ্রগুপ্তের নাম্বার ফাইভ 'মার্কসবাদী'। মেয়েটা ক্ষেপে বোম হয়ে গেল। রবিবাবু আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে আছেন। রবিবাবু ছাড়া কোনো দিকে যাওয়া যায় না। শিল্পের যেদিকে যাবেন আপনারা—। এই (যে) মেয়েটা একেবারে ক্ষেপে বোম হয়ে গেল মানে দ্যাট ইজ দি রিঅ্যাকশন। রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে বাঙালিরা বাঁচতে পারে না। কাজেই ওটা কোনো আলোচ্যই নয়, যে-কোনো শিল্পী, বাঙালি শিল্পী...

প্র : এখনো তো সেই এ-টা আছে, এখনো অস্বীকারের একটা প্রবণতা নানা সূত্রে দেখা যায়, সেইজন্যই আপনি যদি কিছু উদাহরণ অন্তত দেখিয়ে দিতেন ওঁর সৃষ্টি থেকে তা, হলে ব্যাপারটা...

ঋ : গুচ্ছের দেখাতে পারি এক্ষুনি। এখানে বসেই। হাতের কাছে কোনো বইটই নেই তবু আমি দেখাতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ দেখিয়ে আজকের লোকেরা কাছে আমাকে কনভিন্স করানো এটা অত্যন্ত লজ্জাকর এবং নীচু ধরনের কাজ। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীতে এত বড়ো শিল্পী, মানে তিন-চারটে জন্মেছে। কাজেই তাঁর তো চিন্তা কত দিকে। তাঁর মরার সময় শেষ যে লেখা 'সভ্যতার সংকট' ওটা আপনারা পড়ুন তাহলেই বুঝতে পারবেন যে যারা এ সমস্ত— যদি কেউ বাঁদরামি করে সে বাঁদরামিগুলোর কোনো মূল্য নেই। শেষ অব্দি একটি কথাই, এটা একেবারে মানে, আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে যে, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।" কাজেই আমি বিশ্বাস হারাব না। অর্থাৎ বিশ্বেস হারানোর সমস্ত সুযোগ ঘটে গেছে। কিন্তু ইট ইজ আ ক্রাইম, তাই আমি বিশ্বেস হারাব না। 'ক্রাইসিস অব সিভিলাইজেশন' ইংরেজিতে ট্রান্সগ্রেশন আছে ওঁর, এগুলো তো...কাজেই কী বলব! রবীন্দ্রনাথ ইজ এ ভাস্ট ওসেন... মহাসমুদ্র। তাঁকে তো এক কথায় ছোট্ট করে কিছু বলা যাবে না। এবং যদি কেউ কিছু (বাঁদরামি) করার চেষ্টা করে, তাদেরকে আমার হয়ে বলে দেবেন যে তাদেরকে আমি ধরে— পেলে— জুতিয়ে খাল খেঁচে দেব।

সাংগীতিকী

প্র : উচ্চাঙ্গ সংগীতের ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে কোন্ গুণী আপনাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছেন? এই সূত্রে তাঁর প্রসঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত বিশেষ স্মৃতির কথা বলবেন কি?

ঋ : (সে) ব্যক্তিটি ছিল পাগল। আমার গুরু, তাঁর কাছে নাড়া বাঁধা, তাঁর কাছে আমি সরোদ শিখেছি। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি মাইহারে কাজ করতেন। অর্থাৎ মাইহারের মহারাজার দরবারি বাদক ছিলেন। আমি একটা ডকুমেন্টারি ছবি— আমাদের সংগীত-নাটক অ্যাকডেমির হয়ে করতে যাই। সেসব ব্যাপারে অনেক জিনিস শুনেছি। সেগুলো স্মৃতিচারণা হিসেবে বলা যেতে পারে। উনি ছোটোবেলায় আট বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালান। ওঁর দাদা ছিলেন আফ্‌তাবউদ্দীন সাহেব। অসম্ভব ভালো বাঁশি বাজাতেন। এবং ছিলেন বাউল এবং কালীভক্ত একসঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা। তা এ অলাউদ্দীন সাহেব আমাকে যেগুলো বলেছেন আর কি। তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ছোটোবেলায় মক্তবে পড়তে যেতেন। পথে একটা কালীবাড়ি পড়ে। তো উনি গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতগুলো মুসলমান বলে ঢুকতে দিত না, মারত। আর আফ্‌তাবউদ্দীন সাহেব পা'য়ে দড়ি বেঁধে গোয়াল ঘরে— ওদের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গ্রাম্য দেশ তো—খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখত (তাকে)। সেই ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছেন। এসে, নিমতলা ঘাটে শুয়ে থাকতেন। আট বছর বয়স। সেই সময় একটা সুযোগ পেয়ে (যান) স্টার থিয়েটারে—তখন এই সমস্ত বেশ্যারা অভিনয় করত আর নাচত। নাচ-ফাচের ব্যাপার-ট্যাপার ছিল। সেইখানে বাঁশি বাজানোর কাজ পাঁচটাকায়। মাসকাবারে পাঁচ টাকা মাইনে। এই বাঁশি বাজানোর কাজ দিয়ে আরম্ভ করলেন। তারপরে উনি চলে গেলেন উদয়পুর। উদয়পুরে গিয়ে, সেখানে তখন সবচেয়ে

বড়ো ওস্তাদ যে ছিলেন উজীর খান, সরোদের, তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছেন। করে শিখতে হবে। উজীর খান তাকে পাত্তাই দেয় না। তখনকার যুগের ব্যাপারটা তো অন্যরকম ছিল, আজকে থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা বলছি। পাত্তাই দেয় না। শেষে তিনি করলেন কী—যে, রোজ দরবারে উজীর খান যান আর ফেরেন ঘোড়ায় চড়ে—উনি রাস্তায় শুয়ে পড়লেন। যে, আমি আপনাকে যেতে দোব না, আমাকে কাজ শেখাতেই হবে। সংগীত আমাকে দিতেই হবে। তখন সংগীত ছিল একটা সিক্রেট। কেউ কাউকে দিত না। সেসব যুগগুলো আপনারা কতখানি দেখেছেন আমি জানি না, আমার খানিকটা দেখা আছে, সামান্য। (উজীর খান বললেন) তবে ঠিক হ্যায়, তুই আমার বাড়িতে চাকর হয়ে থাক। আলাউদ্দীন খাঁ বাসন মাজেন, রান্না করেন আর জুতো খান। আর উজীর খাঁ যখন রেওয়াজ করেন, সেইটে শোনেন। হাতে যন্ত্রটি দিতেন না। দুটি বছর এই করার পরে উজীর খাঁ বললেন, হ্যাঁ, তুই আমার শিষ্য হবোর উপযুক্ত— মোটামুটি এই (কথাই) আর কী হিন্দিতে মানে উর্দুতে। একই কথা। তখন শেখার ব্যাপার। চোদ্দা বছর শিখলেন। উজীর খাঁ তারপরে...। কোনো ওস্তাদরা... আমাদের ওস্তাদরা... যেমন আমাকে হুকুম দিয়ে যান নি যে বাইরে বাজাও। ওস্তাদরা টাইম হলে তখন বলে, যে, এখন বাইরে যা, বাজা। তৎপূর্বে কোথাও বাজাবি না। মানে ইউ আর নট অ্যালাউড্। যেমন আই অ্যাম নট অ্যালাউড্। উনি মারা গেছেন— আমাকে হুকুম দেননি কাজেই আমি বাজাই না। আমি বাজাই আমার বৌ-বাচ্ছার কাছে। আর কোথাও না। সেই সরোদও আমি ছেড়ে দিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি অন্য জায়গায়, যাক্গে। (উজীর খান) ঐ যখন হুকুম দিলেন চোদ্দা বছর পরে যে, তুই বাজাতে পারিস বাইরে এখন, তখন উনি আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে গেছেন। এবং সেখানে গিয়ে— একটা মহ্জিদ মানে মসজিদ যাকে বলে আমাদের ভাষায়— ওই তো পাশে তিতাসের ধারে— ওর পাশে বাচ্ছারা খেলা করছে একটা বল নিয়ে— করতে-করতে একটা বল ঐ মহ্জিদের কার্নিশের ওপরে পড়ে গেল। বাচ্ছাদের খেলা বন্ধ। তো আলাউদ্দীন খান সাব বললেন যে, আচ্ছা, আমি ওটা নাবিয়ে দিচ্ছি। বলে নাবাতে গেলেন, ওটা গেল ভেঙে। পড়লেন এবং হাতটি পুরো ভাঙল। সে ভাঙা হাত— ওখানে কোনো কিওর করার রাস্তা নেই— তখন এলেন কলকাতায়— ওকে পাঠানো হল মেডিকেল কলেজে— তারা বলে এ হাত কখনও সারবে না, এ একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। উনি তখন এই মাইহারের মহারাজার স্টেট মিউজিশিয়ান। সেইখানে ফিরে গিয়ে— ওখানে প্রচণ্ড নামকরা মন্দির আছে পাহাড়ের ওপরে, সেখানে গিয়ে না খেয়ে শুয়ে থাকলেন— যে, মা আমার হাত ঠিক করে দে। মানে চামুণ্ডা আর কি। কালী। সেইখানে শুয়ে থেকে হাত কী করে সেরে গেল, উনি নিজেই জানেন না। মানে উনি নিজে বলেন, মানে বলতেন। আমাকে এগুলো সমস্ত বলেছেন ডিটেল্স অব হিজ লাইফ। কিন্তু হাতটা তো জখম হয়ে রইল। ডান হাতে বাজাতে হবে সরোদ, (কেননা) এতদিন শিখেছেন বাঁ হাতে। সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে। মানে কতখানি মনের জোর! এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মিউজিশিয়ান হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, দিস ওয়াজ আলাউদ্দীন খাঁ। আলাউদ্দীন খাঁ সম্বন্ধে বলতে গেলে তো লক্ষ লক্ষ কথা বলতে হয়। মানে অ্যাতো বলতে হয় যে

সীমা নেই। কারণ সে আমার গুরু এবং আমি...। হাফিজ আলি খান সাহাব আর-একজন গ্রেট সরোদীয়া। বিলায়েতের কোনো তুলনা নেই। বিলায়েতের মুড যখন চাপে তখন সেখানে একমাত্র আলি আকবর যখন মুডে থাকে তাঁর সঙ্গে বসতে পারে। রবিশংকর-টবিশংকররা হচ্ছে অনেক বেশি বাজাইরা। এরা হচ্ছে রিয়াল মিউজিশিয়ান্স। আর এখন যারা বেঁচে আছে তাদের মধ্যে— এক গাইয়েদের মধ্যে— গলার দিক থেকে বলছি, ভীমসেন যোশীকে আমার খুব ভালো লাগে।

ফিল্ম সোসাইটির দর্শক

প্র : ফিল্ম সোসাইটিগুলির দর্শকদের একটা বৃহত্তর অংশের মধ্যে শুধুমাত্র আনসেনসর্ড ছবি দেখার উন্মত্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিকৃত রুচি প্রকৃতপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের যে ক্ষতি সাধন করছে আপনার মতে সেটাকে কীভাবে রোধ করা যায়, যাতে এই আন্দোলন তার প্রকৃত লক্ষ্যপথে পৌঁছতে পারে?

ঋ : এগুলো কোনোটাই করা সম্ভবপর নয়। কারণ, এইসব বাঁদরগুলো, কিছু মনে করবেন না আমার ভাষা, এরা অভদ্র ছবি দেখারই জন্য প্রস্তুত। আমাদের যুগে যে-ধরনের ছেলেপিলে ছিল এখন সেই চরিত্রের ছেলেপিলে নেই। এরা আপনাদের কাছ থেকে অভদ্র ছবি দেখারই চেষ্টা করবে। এবং আপনারা দেখাবেন। কারণ, আপনারা তো ঐ থেকেই আপনাদের তো ব্যবসা করতে হবে। এখন তো ফিল্ম সোসাইটি হ্যাজ বিকাম এ বিজ্নেস। যেটা আপনাদের ডিক্রাই করা উচিত। আপনাদের তো ঘৃণা করা উচিত। সেটা আপনারা করেন না, বুঝেছেন কমরেড? দেশটাকে উচ্ছন্নে দেবার যা যা চেষ্টা সব-কটা সবদিক থেকে হচ্ছে। আমি না হয় মদ খেয়ে মদ্যপি হয়েছি। এবং কিছু কিছু লোক জানে যে আমি মদ খাই। এবং আমি লুকিয়ে-চুবিয়ে কোথাও খাই না। কিন্তু আপনাদের উচিত হচ্ছে আক্রমণ করা। দেখুন, আমি এবং সত্যজিৎ... আপনাদের এই ফিল্ম সোসাইটি... আমরা দেখতে যাই না। আমরা দেখতে যাই-ই না। কারণ, এখন যে-সমস্ত ছবি দেখানো হচ্ছে এগুলে কোনো ভদ্রলোককে দেখানো যায় না। আমি আমার মেয়ে, আমার বৌকে দেখাতে চাই না। আপনাদের লড়াই করতে হবে। যাক, আমি পার্বি না। আমি তো স্ট্রেট-কাট আউট করেছি। যেটা আমার হাতে আছে, দ্যাট ইউ নো। দ্যাট মাচ্ আই ক্যান ডু। কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনারা তো ঐসব জায়গায়...

প্র : আমরা আপনার কাছে ব্যাপারটা বুঝতে চাচ্ছি এ ধরনের কেন হচ্ছে...

ঋ : বোঝাটোঝার কিছু নেই, সোজা বন্ধ করার ব্যাপার। আপনারা ভেবেছেনটা কী?

প্র : তা হলে ফিল্ম সোসাইটিগুলোর বিকল্প কর্মসূচী কী হতে পারে আপনার মতে?

ঋ ।। আলোচনা, সভা, কথাবার্তা সব বলা, এবং মানুষকে রুচি জাগ্রত করা এটাও একটা ব্যাপার আছে। এই। দ্যাট ইজ অল। (কিন্তু) ঐ সমস্ত হরিব্ল্ জিনিসপত্তর দেখার কোনো মানেই আমি বুঝি না। প্রাথমিক ভাবে মিৎসোগুচি, ওঁর প্রিন্ট আনা (প্রয়োজন)।

তারপরে, ইটালি থেকে...ফ্রান্স থেকে...। এখন ইংল্যান্ডেও ঐ লিন্ডসে ফিন্ডসে কিছু কাজ করছে, সেগুলো। রাশ্যা থেকে তার্কভস্কির কাজ... পোল্যান্ড থেকে আন্দ্রে ভাইদার... ওঁর ছবি। আমেরিকা থেকে শার্লি ক্লার্ক...ওদের কিছু কাজ। ইট উইল রান ফর এ ইয়ার।

সাক্ষাৎকার

ঋত্বিক : সে সময়টা ভাবতে ভালো লাগে, কম বয়স, লেখার চেষ্টা করছি— হ্যাঁ, নাটকও পাশাপাশি চলছে। অনুশীলন পর্বে কিছুটা এগিয়ে মনে হল শিল্পের অভ্যুত্থান রাজনীতির মধ্যে। জীবনটাও শুরু করলাম। গল্প লেখা থেকে নাটক। তারপর ওই জনগণের বড়ো কাছাকাছি যেতে ইচ্ছা হল। অতএব film। এই তো, এই ইতিহাস আর কি!

সমর : আচ্ছা সামাজিক অবস্থান নিশ্চয়ই তো Marxist শিল্প তা কি আপনার ফিল্মে স্পষ্ট?

ঋত্বিক : কেন নয়? দ্যাখ Social Being ব্যাপারটা সোজা নয়। 'সামাজিক' ব্যাপাটা ছোটো নয়। এর মধ্যে সংস্কৃতিটাও জড়িত। হ্যাঁ, 'নাগরিক'— যার মধ্যে এই সামাজিক ব্যাপারটা আছে। আর 'কোমলগান্ধার'- এ শেষে করলাম সাংস্কৃতিক অবস্থান ও তার টানাপোড়েন। আসলে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা এ- সব মাথায় ঢোকায় না। তবে কাজ তো করতে হবে, চাকর হলে চলবে না। পয়সা- বাড়ি- গাড়ি আর খ্যাতির জন্য সব শালা চাকরামি- ই পেশা করে নিয়েছে। এরা আসল ব্যাপারের ধারেকাছেই নেই। তবেই বিপদ।

সমর : আপনি দুই বাংলার ভাগ নিয়ে এত মাতামাতি...

ঋত্বিক : তার মানে! মাতামাতি নয়, বুঝলে। তোমরা বোঝ না তাই এ ধরনের কথা বল। দু'বাংলা ভেঙে চুরমার করে দিল। এটা বদমাইসি। সমস্ত অর্থনীতি আর রাজনীতিতে যে ভাঙন শুরু হয়েছে, তার উৎস ওই বাংলাদেশ ভাগ। ...আমি এই...চাই, খুব বেশি করে চাই দু'বাংলার সংস্কৃতিকে এক ফ্রেমে আঁটতে। তাতে তোমরা মার্কসবাদীই বলো আর যাই বলো। প্রতিবাদ করাটা দরকার-- কিন্তু শালা বুঝল না কেউ। আর এটাও ঠিক যে প্রতিবাদের এক- একজন এক- একটা সূত্র ধরে, তাই আমি মনে করেছি যে এই বাংলাদেশ ভাগ এটাই সবচেয়ে জরুরি। এর মধ্যে emotion- এর কিছু নেই।

সমর : আচ্ছা আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যদি কিছু...

ঋত্বিক : সব অশিক্ষিতের দল। কেউ কিছু বোঝে না। কেউ টাকা ও বিদেশ ঘোরার জন্য পার্টি করবে, কেউ out of line। কেউ আবার কিছু করার নেই তাই করে। আর এরা Mass- কেও শিক্ষিত করার দায়িত্ব নেয় না। মাও- সে- তুঙের একটা কথা আছে 'An army without culture is a dull witted army, and a dull

witted army cannot defeat the enemy'— আর এটাই এদের মাথায় নেই। সুতরাং ওই বিপ্লব-টিপ্লব অনেক দূরের। আর এখন তো প্রতি পার্টির ভেতরেই কমবেশি অসৎ আছে। আমরা যখন করতাম, তখন কিন্তু এ-সবের বালাই ছিল না। একটা charm ছিল। অবশ্য এ-সব তো থাকবেই। কিন্তু মাঝে মধ্যে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে Inner Party Struggle-ও হয় না। সুতরাং আমাদের দেশে এখন মিথ্যে কথা বেচে খাওয়াই অধিকাংশের উদ্দেশ্য। সে রাজনীতিবিদই বলো, আর বুদ্ধিজীবীই বলো।

[টেপ ঘুরে চলল।...]

ঋত্বিক : হ্যাঁ ঘাটের মড়া। বর্তমান বাংলা Film Industry- র অবস্থা সত্যিই খারাপ। তবে ভবিষ্যতে যন্ত্রপাতির উন্নতি ঘটবে। এবং সেটা আরো খারাপ। কারণ এই উন্নতিটি করবেন আমাদের দেশের মনোপলি বিজনেসম্যানরা। এদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা মনে রেখেই বোঝা যায় যে ওরা বসে নেই। কেননা পুঁজিবাদী দার্শনিকদের মতে পুঁজিবাদ চরম অবক্ষয় আর এটা প্রমাণ করতেই তো অনেক ঝামেলা করতে হয়। এরা রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম থেকে শিক্ষা নিয়েছে। সুতরাং সব কিনে ফেলবে। আর আমরা যা চাকর! ডাকতে হবে না, আগেই যাব। বাংলা সিনেমা যা হয় তা দেখি না। ওই প্যানপ্যানানি অর্ডারি মাল আর ভালো লাগে না। বস্তুকেন্দ্রিক যে জীবন তার দিকে এরা চোখ ফেরায় না। বিদেশী বুর্জোয়া Film maker- দের ছবি তবু দেখা যায়। কেননা বুদ্ধির ছাপটা অন্তত আছে। আর এরা একেবারে পাঁঠা। আমরা যারা দু- চারজন অন্যভাবে ভাবছি, তারাও ফুরিয়ে যাব। এভাবে বেশিদিন চলতে পারে না।

আমি নতি স্বীকার করি না

প্রশ্ন : "আপনার ছবি সম্পর্কে কিছু জানতে এসেছি।" বললাম আমি।

— "ছবির কাস্টিং, এডিটিং ও ডাবিং প্রায় শেষ। রিরেকর্ডিং শেষ হয় নি এখনো" বললেন ঋত্বিকবাবু।

প্রশ্ন : এ ছবিতে কী বক্তব্য আপনি তুলে ধরতে চাইছেন? আবার প্রশ্ন করলাম।

উত্তর দিতে গিয়ে ঋত্বিকবাবু ছবির কাহিনী মোটামুটি সংক্ষেপে ব্যক্ত করলেন।

তিতাস এবং তিতাসের তীরবর্তী একটি জেলেগ্রামের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এ ছবির কাহিনী। তিতাস একটি বহমান নদী। তার তীরবর্তী গ্রামের জেলেদের ভাগ্যও তিতাসের সঙ্গে জড়িত। তিতাসকে কেন্দ্র করেই তার তীরে গড়ে উঠেছে একটা সভ্যতা একটা সংস্কৃতি। ধীরে ধীরে সে তিতাস একদিন শীর্ণ হয়ে গেল। জেলেদের জীবনে নেমে এল অর্থনৈতিক বিপর্যয়। তিতাসের তীরে গড়ে উঠেছিল যে সভ্যতা নদী শুকিয়ে

যাওয়ার সাথে সাথে সেটাও ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে লাগল।

নদী শুকাচ্ছে। চর জেগে উঠেছে। সেই চরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পড়ে পুঁজিপতি ভূস্বামীদের। তারা চক্রান্ত করে জেলেদের সেখান থেকে উৎখাত করে সে চর দখল করার জন্যে। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিলেও ছেলেদেরও ঐক্য অটুট। উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মহাজনেরা নতুন ফন্দি বের করে। জেলেদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে হলে তাদেরকে দুর্নীতি-পরায়ণ করে তুলতে হবে মহাজনরা তাই যথাচিতভাবে টাকা ছড়ায়। টাকা নিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে বহুদূরে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তারা এখন বাবুদের গুণগানও গায়। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের ঐক্যে ফাটল ধরে। একে একে সবাই গ্রাম ছেড়ে দূরে বহু দূরে চলে যায়। তিতাস মরে যাওয়ার সাথে সাথে তার তীরবর্তী গ্রামের সভ্যতাও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু সভ্যতা কি সত্য নিশ্চিহ্ন হয়? সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয় না— তার রূপান্তর ঘটে। ছবিতে এ বক্তব্যকে আমি তুলে ধরতে চেয়েছি। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখা যাবে মৃত তিতাসের বুকে যে চর গজিয়ে উঠেছে তাতে জেগে উঠেছে সবুজ ঘাসের ক্ষেত। একটা উলঙ্গ শিশু হেঁটে যাচ্ছে তার বুক চিরে। সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয় না— তার রূপান্তর ঘটে এ দৃশ্যের মাধ্যমেই তার ইঙ্গিত ফুটে উঠবে।

প্রশ্ন : এ কাহিনী আপনাকে আকৃষ্ট করল কেন?

উত্তর : ঋত্বিকবাবু জানালেন কাহিনীর সততা ও আন্তরিকতা তাঁকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। কাহিনীকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছিলেন জেলে পরিবারেই ছেলে। তবে জেলে পরিবারের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও তিনি তিনি বি.এ. পাস করে। তিনি সাংবাদিকতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সাতচল্লিশ, আটচল্লিশের দিকে তিনি কোলকাতার এক খালাসি পাড়ায় থাকতেন। সে সময় কোলকাতার আশেপাশে জেলেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। এত মর্মান্তিক বিপর্যয় যে তাদের অন্ন সংস্থানের সুযোগও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিজে জেলে পরিবারের ছেলে... তাই জেলেদের দুঃখে কেঁদে উঠেছিল তার মন। তাদেরকে সাহায্য করার জন্য অদ্বৈত মল্লবর্মণ তিন- চারটে চাকরী শুরু করলেন। যা রোজগার করতেন তা সবই বিলিয়ে দিতেন ছেলেদের মাঝে। শেষে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিলেন এভাবে কোনো সাহায্য করা হয় না। তার চেয়ে বরং বই লেখো। বই লিখে টাকা বেশি পাবে, সেটা জেলেদের মাঝ বিলিয়ে দিযো। বন্ধুর পরামর্শ মনঃপূত হলো তাঁর। তখন জেলে জীবনেব কাহিনী নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর লেখার কাজ শেষ হলো। কিন্তু সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যেদিন তিনি প্রকাশকের কাছে যাচ্ছেন সেদিন মনের ভুলে সেটা দোতলা বাসে রেখে দিয়ে বাস থেকে নেমে পড়লেন তিনি। এত দিনের পরিশ্রম সবই বৃথা হয়ে গেল। তবে হাল ছাড়লেন না তিনি, আবার নতুন করে লিখতে লাগলেন সে কাহিনী। এ যে কত দুরূহ কাজ সেটা যাঁরা লেখেন তারা অনুভব করতে পারবেন। যাই হোক, দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে দ্বিতীয় বারের লেখাও সমাপ্ত করলেন তিনি। বইটি প্রকাশকের কাছে দেবার পরই আক্রান্ত হলেন যক্ষ্মায়। ব্যারাকপুরের এক ক্লিনিকে ভর্তি করা হল তাঁকে। তবে শেষ পর্যন্ত বইটি তিনি দেখে যেতে পারেননি। বই প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন। বইটি প্রকাশিত হবার পর প্রচণ্ড সাড়া তোলে। আমি এ কাহিনী

পড়ে একেবারে অভিভূত হয়ে যাই। এবং তখনই স্থির করি যে, বইটি নিয়ে ছবি করব। জেলে জীবনের কাহিনী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন 'পদ্মা নদীর মাঝি'। সে কাহিনীও অনবদ্য। তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কাহিনী তার চেয়েও বেশি সততা, বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতাপূর্ণ। জেলে জীবনকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন 'বাবুর চোখ' থেকে। আর অদ্বৈত মল্লবর্মণ দেখেছেন একেবারে ভেতর থেকে। কাহিনীর এই সততা এবং আন্তরিকতাই আমাকে এর প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, কোলকাতার আশেপাশে জেলে গ্রাম এবং নদী'গুলোকে আমার কাছে ঠিক এ-কাহিনী চিত্রায়নের জন্য উপযুক্ত পটভূমি বলে মনে হয় নি। তাই এতদিন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি ''তিতাস একটি নদীর নাম''- এর চলচ্চিত্রায়ন থেকে বিরত ছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশে এ ছবি করব। আজ সুযোগ পেয়েছি। তাই তার সদ্ব্যবহার করেছি।

প্রশ্ন : এ ছবি করতে গিয়ে আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি?

উত্তর : আর সবাইকে সকল সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। আমাকেও তাই করতে হয়েছে। আমার ছবিতে ইনডোরের কাজ নেই। তাই সেই সংক্রান্ত ঝামেলা আমাকে পোহাতে হয়। তবে শিল্পীব ডেট, যন্ত্রপাতির এসব অঙ্ক করার ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। ঋত্বিকবাবু আরও জানালেন অবশ্য এটা স্বাভাবিকই। কারণ এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের এখন যা অবস্থা তাতে যে এ দেশে ছবি তৈরি হচ্ছে সেটাই তো বেশি।'' তিনি বললেন স্যুটিং করার খরচাপাতির ব্যাপারে কোনো সমস্যা আমাকে পোহাতে হয়নি। ছবির প্রযোজকরা আমার চাহিদানুযায়ী সব-কিছু জোগাড় করে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি কোলকাতায় আমি ছবি তৈরি করছি প্রায় সাতাশ বছর ধরে। তবে এরকম উদ্যোগী প্রযোজকের দেখা সেখানে বড়ো একটা পাই নি।

প্রশ্ন : এ ছবিতে বাংলাদেশেব শিল্পী ও কুশলীদের নিয়ে আপনি কাজ করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর : কোলকাতায় শিল্পী ও কুশলীদের চেযে বাংলাদেশেব শিল্পী ও কুশলীদের গুণগত মান কোনো অংশেই খারাপ নয়। ভাঙা যন্ত্রপতি নিয়ে এখানকার কুশলীরা যা করছেন তা বলতে গেলে একটা 'মিরাকল'। শিল্পীদেরকেও লক্ষ্য করে দেখেছি যে, জানার জন্য, শেখার জন্য তারা ব্যাকুল। খাটতে তারা প্রাণপণ প্রস্তুত। তবে বাজারী ছবির চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাদের কান্না, হাসি, কথা বলার ঢঙ ইত্যাদি একটা বিশেষ সুরে বাঁধা হয়ে গেছে। তবে এর জন্য সবটুকু দোষ তাদেরকে দেওয়া যায় না। এখানকার শিল্পীরা অভিনয় করতে জানেন না এটা আমি স্বীকার করি না। শিল্পীদের দোষ না দিয়ে কর্তা ব্যক্তিদের উচিত তাদের ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং কী করতে হবে সেটা বলে দেওয়া।...

সাক্ষাৎকার : বাংলা ছবির বিষয়ে

"গত তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলা ছবির দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ- কিছু রদ- বদল হয়েছে এ- কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সব পরিবর্তনই যে সব সময়ে ভালোর দিকে হয়েছে তা বলা চলে না। যুগপ্রবর্তনকারীদের ভেতর প্রথম পথিকৃৎ হলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। 'অধিকার', 'গৃহদাহ' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে তিনি যে শুধু বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়— একটা বিরাট সম্ভাবনার পথনির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে সে পথচিহ্নকে অনুসরণ করবার মতো পরিচালকের অভাবে সে সুযোগ প্রায় নষ্টই হয়ে গেল বলা চলে। বিমল রায় অবশ্যি 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়' ইত্যাদির মারফত সেই হারানো পথটা আবার খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন— কিছুটা সার্থকও হয়েছিলেন এ কথা নিশ্চিত। এর পর থেকেই বাংলা ছবির একটানা অবনতি শুরু।

"বেশ-কিছুদিন এভাবেই কেটে গেল। ১৯৫৬ সালে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালীর' আবির্ভাব হল। শুরু হলো আর এক অধ্যায়। সত্যাজিৎবাবু এবং আরো কয়েকজন আদর্শবাদী পরিচালক বাংলা চিত্রজগতে এক নতুন ধারা এবং প্রাণসঞ্চাব করবার চেষ্টা করলেন। তার ফলে কিছু কিছু কাজ হল। পৃথিবীর বর্ত;মান ছবির জগতের দিকে তাহাকে বা তুলনা করলে সেটা নগণ্যই বলা চলে। মিছামিছি নাচানাচি করবার মতো কিছুই ঘটে নি। তবুও তাই নিয়ে কত না চায়ের কাপে তুফান উঠল। অবিশ্যি এ কথা মানতেই হবে যে আমাদের দেশের তুলনায় এ সময়ে কিছুটা কাজকর্ম হয়েছে বৈকি।"

কথাগুলো বলছিলেন বাংলা দেশের অন্যতম সার্থকনামা পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। মুগ্ধ হয়েই কথাগুলি শুনছিলাম। গতিভঙ্গ হল চায়ের কাপের আবির্ভাবে। এক চুমুক দিয়েই প্রশ্ন করলাম, তারপর?

উত্তর : এরপর বাংলা ছবি ক্রমশই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। জানি না এই নিম্নগতি শেষ হবে কবে। কোথাও এতটুকু আশার আলো দেখছি না। শক্ত মেরুদণ্ডওয়ালা একটি ছেলেও দেখছি না, যে এসে বুক পেতে দাঁড়াবে প্রতিরোধের ভঙ্গিমায়। এর চাইতেও বড়ো হতাশা বড়ো ট্রাজেডি হচ্ছে এই যে, যাঁরা একদিন বুক ঠুকে পাঁয়তারা মেরে বলেছিলেন যা কিছু জীর্ণ দীর্ণ যা কিছু সনাতন পুরাতন সংস্কার আমাদের অগ্রগতির পথরোধ করে বসে আছে তার বিরুদ্ধেই আমাদের আপসহীন সংগ্রাম এর জন্য যা-কিছু মূল্য দিতে হয়— দেব'। চোখের সামনে দেখলাম তাঁরা একে একে নিজেদের বিক্রি করে দিলেন সনাতনী গতানুগতিকতার কাছে। নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়ে জোর গেলায় জাহির করে বেড়াচ্ছেন— এটাই নাকি বিধিলিপি।.

প্রশ্ন : আপিনিও তো তাদের ভেতর একজন ছিলেন। আপনিও কি আজ তাঁদের মতো রণক্লান্ত— সন্ধিপ্রয়াসী?

উত্তর : না। বরং এমনতর হারের খেলায় তাদের সঙ্গে যোগ দিই নি বলে আজ

আমি অপাঙ্‌ক্তেয়— আজ আমি তাঁদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা।"

প্রশ্ন : বিচ্ছেদটা কেন হল? সেটা কি এতই দুরতিক্রম্য?

উত্তর : "হ্যাঁ। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে আমার সমস্ত বিশ্বাসের মূল উপড়ে ফেলতে হবে। বিশেষ করে আমার নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিকে অস্বকার করতে হবে। আমি জগৎটাকে দেখি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার সঙ্গে সবাই যে একমত হবেন সে আশাও করি না— প্রয়োজনও বোধ করি না। তাঁরা তাদের চিন্তা নিয়ে থাকুন, আমি আমার চিন্তা নিয়ে থাকব। কিন্তু শত্রু হোক মিত্র হোক, এমন- কি, তৃতীয় পক্ষও যদি হয়, একটি বিষয়ে আমি বড় নির্দয়— সেটি হচ্ছে 'মানুযের' বিষয়ে ভাবনা চিন্তা। যখন ছবি দেখে বুঝতে পারি লোকটা মানুষকে ভালোবাসে না— মিথ্যে অভিনয় করে আসর মাত করছে সে ক্ষেত্রে ক্ষমা করা দূরে থাক্— কোনোরকম আপসপন্থী মনোভাব প্রদর্শনেও আমি নারাজ। কিছু কিছু শক্তিশালী কর্মী এখন তাঁদের শক্তিকে ব্যবহার করছেন মানুষের বিরুদ্ধে এমন সন্দেহও আমার আছে তাঁদের সম্পর্কে।

প্রশ্ন : যে মানুষের কথা ভেবে আপনি উত্তেজিত সেই মানুষের দলই কি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে না? আপনার ছবির সম্পর্কে শোনা যায়, যে বেশির ভাগ ছবিই অর্থনৈতিক সাফল্যলাভ করে নি। অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখার মতো ছবি যে- পরিচালক উপহার দিয়েছেন তাঁর তো ইতিমধ্যে আরো অনেক ছবি তৈরি করার সুযোগ ছিল। সেই হিসেবে তো আপনার কাজ হচ্ছে না।

উত্তর : অস্বীকার করব না যে ইতিমধ্যে গড়পড়তা যতগুলি ছবি তৈরি করা আমার উচিত ছিল— তা করে উঠতে পারি নি। অর্থনৈতিক সাফল্যের অভাব কিছুটা দায়ী হলেও আসল কারণ সম্পূর্ণ অন্য এর সঙ্গে অনেক সমস্যা জড়িত আছে। তবুও প্রতি পদে পদে যে সমস্যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছি সেটা হচ্ছে চিত্র-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী বেশ- কিছু সংখ্যক ব্যক্তিব আমার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ। কারণ অন্যান্য অনেক পরিচালকের মতো আমি আমার কাজের ব্যাপারে কারো হুকুম মেনে চলি না। কিংবা কারো কাছে নতিও স্বীকার করি না। তাই অম্যাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে তোলাব ব্যাপারে এদের কারসাজির সীমা নেই। আবো মজার ব্যাপাব এই এঁদেব সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমার এমন কয়েকজন সহকর্মী যাঁদের সঙ্গে মিলে আমরা এক সংগ্রামে নেমেছিলাম।

প্রশ্ন : এটা কেন হল? এই ধরনের মনোবৃত্তির মূলে একমাত্র হিংসা ছাড়া আর কিছুই তো আমি দেখি না।

উত্তর : কিছুটা যে তা নয় এ কথা বলা চলে না। তবে তাব চাইতে বেশি যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে তাঁদের নিজেদের আত্মগ্লানির প্রধান দর্শক আমি। তাঁদের সঙ্গে মিলে আমিও কেন নিজের ল্যাজ মুড়িয়ে দলে ভিড়লাম না— এটাই হচ্ছে আমার প্রতি তাঁদের বিদ্বেষের কারণ।

প্রশ্ন : আপনার অভিযোগটা যে নিছক কল্পনা নয়— এ সম্পর্কে আপনি কি নিশ্চিত?

উত্তর : হ্যাঁ, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে, আমি যাতে কোনো ছবিব পরিচালনা না পাই তা নিয়ে তাঁদের গোপন কার্যকলাপের শেষ নেই। আমার প্রতিটি কার্যসূচী—

প্রতিটি পদক্ষেপকে এঁরা নজরে রাখেন। এবং আমার অবর্তমানে ছবির প্রযোজক বা ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে এমন সমস্ত অভিযোগ করে আসেন যাতে আমার সব পরিকল্পনা ভেসে যায়।

প্রশ্ন : আপনার বিরুদ্ধে কী ধরনের অভিযোগ সাধারণত এঁরা প্রচার করেন?

উত্তর : আমি নাকি মাতাল। চব্বিশ ঘণ্টাই মদে ডুবে আছি— তাই ছবি হাতে নিয়ে সে ছবি শেষ করার মতো ধৈর্য বা ক্ষমতা আমার নেই। হাসিও পায় লজ্জাও করে। আমার বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ করেন আর যাঁরা সে অভিযোগ সত্যি বলে মেনে নেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁদের সঙ্গে আমার তফাতটা হচ্ছে— আমি খোলাখুলি ভাবে চলি, আর তাঁরা চরিত্রবান পুরুষ তাই তাদের সব- কিছুই অপ্রকাশ্য। তা ছাড়া সাধারণ দর্শকের রুচি বা চাহিদা অনুযায়ী ছবি করার লোক আমি নই। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাফল্যলাভের ফর্মুলা মাফিক ছবি আমি করতে অক্ষম— এ অভিযোগটাই বেশি শোনা যায়।

(আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে আসছে দেখে অন্য প্রসঙ্গ অবতারণা করলাম।)

প্রশ্ন : আচ্ছা বর্তমান বাংলা ছবির মধ্যে আপনি কি কোনো আশাবাদ বা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব দেখতে পান?

উত্তর : উল্লেখযোগ্য কি না বলতে পারছি না তবে আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপদ মনে হচ্ছে একটি বিষয়।

প্রশ্ন : যথা।

উত্তর : এই ধরুন না বর্তমানে চিত্র- পরিচালকেদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে মিউজিক— ডাইরেক্টর হবার। ভাবতে অবাক লাগে কী করে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন চিত্রনাট্য- পরিচালনা - সম্পাদনা এই তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রতি পরিচালকদের সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখতেই হয়। এর উপরে অতিরিক্ত সংগীতের দায়িত্বকেও নিজের বলে গ্রহণ করা উচিত কি না সে প্রশ্নের উত্তর খুব অল্পদিনের ভেতরেই পাওয়া যাবে।"

প্রশ্ন : হয়তো উপযুক্ত সঙ্গীত-পরিচালকের অভাব চিত্র-পরিচালকেরা বড়ো বেশি বোধ করছেন।

উত্তর : কথাটার ভেতর কিছুটা সত্যি আছে আমি মানছি। চলচ্চিত্র সংগীতের নিজস্ব একটা ভঙ্গি আছে— সাধারণ পায়ে-চলার পথে তার আনাগোনা নয়। চলচ্চিত্রে সংগীত নিয়ে আমাদেব দেশে গভীরভাবে অনুধাবন মোটেই হয় নি। বা অনুধাবন করবার মতো সুযোগ— প্রবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন লোকের আগমন ঘটে নি। প্রায় সমস্ত সংগীত-পরিচালকই সস্তায় কিস্তিমাতের পক্ষপাতী। চলচ্চিত্র- সংগীতের যে একটা নিজস্ব দাবি আছে, তাই নিয়ে কেউ মাথা ঘামান নি বা ঘামাতে রাজি নন। এর ফলে সার্থকনামা সংগীত- পরিচালক সৃষ্টি আজও সম্ভব হয় নি। চিত্র পরিচালকদের উপরেই সংগীতের ব্যবহার নির্ভর করে। তাই যখন উপযুক্ত সংগীতি- পরিচালকের অভাব দেখা দিল— অতিরিক্ত বাহাদুরী পাবার লোভ সামলানো পরিচালকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

প্রশ্ন : এমন তো হতে পারে যে সে বিষয়ে তাঁরা অনভিজ্ঞ নন। শুনেছি এঁদের

ভেতর অনেকেই সংগীতের গভীরতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

উত্তর : চিত্র-সংগীতের নামে তাঁরা যা করেন সেটা কহতব্যও নয় প্রকাশিতব্যও নয়। চিত্র- সংগীতের দাবিকে মেটানো বর্তমানের অনেক পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব নয়। অবিশ্যি এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এই বিষয়ে অনেকেই বিরুদ্ধমতও পোষণ করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় এটা এক ধরনের বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্ন : মতামতটা একটু তীব্র হয়ে যাচ্ছে না কি?

উত্তর : বাইরে থেকে হয়তো তাই মনে হবে। কিন্তু ভেতরকার অনেক ব্যাপার আমার জানা আছে বলেই সে বিষয়ে তীব্র হতে দ্বিধা করছি না।

প্রশ্ন : যদি কেউ প্রমাণ দাবি করেন?

উত্তর : সেই চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত উত্তর দেবার মতো মাল- মশলা আমার মজুত আছে বৈকি। থাকগে সে সব কথা। আসল কথাটা হচ্ছে এই চিত্র- সংগীত সম্পর্কে খাটাখাটুনি পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। সেটা একেবারেই হয় নি বা এখনও হচ্ছে না। যেদিন সেটা আন্তরিকতা নিয়ে আরম্ভ হবে সেদিনই জানবেন বাংলা ছবির বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিকের মোহমুক্তি ঘটেছে।

প্রশ্ন : প্রসঙ্গগুলিকে একটু হালকা করবার ইচ্ছেয় কথার মোড় ফেরালাম। জানতে চাইলাম বম্বের চাকরি জীবনের কথা— পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের কথা। একটুখানি বিষাদের হাসি্ হেসে উত্তর দিলেন ঋত্বিকবাবু।

উত্তর : আমি জানি আপনার প্রশ্নের আড়ালে আবো একটি প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। আপনি তো জানেন আমি ছোটোবেলা থেকেই অস্থিরমতি। কোনো একটা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকব সে আমার কপালে লেখা নেই। তাই বাঁধাধবা চাকুবি যখনই কবতে গেছি তখনই কিছুদিনের ভেতর হাঁপিয়ে উঠেছি। মুক্তি চেয়েছি— মুক্তি পেতে গিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। প্রচুর ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছি নানা ভাবে। তবুও সেই সর্বনাশা উপগ্রহের হাত থেকে মুক্তি পেলাম না।

প্রশ্ন · কী সে উপগ্রহ?

উত্তর : অস্থিরতা। কিছুতেই পারলাম না নিজেকে একটা বাঁধা- ধরা চলতি পথের যাত্রী করতে। লোকে বলে আমার চরিত্রে নাকি সেটাই প্রধান দোয। এটা কাটিয়ে উঠতে পারলে নাকি বিরাট কিছু একটা করবার সম্ভাবনা এখনও আমার আছে।

প্রশ্ন : আমারও তাই ধারণা আপনি পারবেন— নিশ্চয়ই পারবেন এ বিশ্বাস আমার আছে, শুধু যদি একটু সামলে চলেন।'

আমার ইঙ্গিতটা বুঝতে বুঝতে ওঁর দেরি হল না। ছেলেমানুষের মতো প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। হাসির ঘোর খানিকটা কাটিয়ে নিয়ে বললেন—

উত্তর : বাঁচব কী নিয়ে, চারদিকে শুধু হতাশা— বিদ্বেষ প্রতারণা, বঞ্চনা। যে প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে মহান সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম— তাঁরা যে শুধু আমাকে নিরাশই করেছেন তা নয় তাঁরা আজ শত্রুতাও করেছেন।

উঠে দাঁড়ালেন ঋত্বিক ঘটক। বললেন, আমি আমাব দোষ- গুণেব কথা আমি জানি

আমার অপবাদের কথা। তবুও একটা কথা আজ আপনাকে জানিয়ে রাখি আমি আজও মরে যাই নি— আমি আজও হার স্বীকার করি নি। আমি নীরবে সে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। আজ না পারি কাল— কাল না পারি পরশু— আমি প্রমাণ করে দেব আজও আমি সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখি। তাদের আমি ভুলে যাই নি। অভাব- অনটন, অপবাদ কিছুই আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না— তার জন্যে যে মূল্য দিতে হয় আমি দিতে প্রস্তুত। মরবার আগে আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাব আমার চারপাশের জনতার চাইতে আমি অন্যরকম।

'শিল্প মানেই লড়াই'...

প্রশ্ন : একাত্তর-পরবর্তী ঢাকা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী?

উত্তর : ঢাকায় এখন আগেরকার সরলতা খুঁজে পাচ্ছি না। এখন দেখছি আভিজাত্য চারদিক জাঁকিয়ে বসেছে। জীবন যখন বদলায়, মানুষও বদলায়। জীবন হচ্ছে বহতা নদীর মতো।

প্রশ্ন : নবজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে ঋত্বিকবাবু বলেছিলেন—

উত্তর : বিহারী, পাঞ্জাবীরা আগে ডমিনেট করেছিল, বাঙালিরা সেই শেকড় এবং শেকল ভেঙেছে, কিন্তু আজো আমি ভিখিরি দেখেছি। ওরা হাত পাতে। তবে সমস্যা এখন অনেক সহজ। আপনাদের হাতে এবং সরকারের হাতে তা নিশ্চয়ই নির্মূল হবে। সমস্যা নেই, বাংলাদেশ স্বর্গে পরিণত হয়েছে, এমন ধারণা আমার অত্যন্ত কম। ঋত্বিকবাবু সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন। সমস্যা কোথায় নেই বলুন তো? কাজেই আপনারা আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন না করে ফিল্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের চলচ্চিত সম্পর্কে তাঁর মতামত কী?

উত্তর : বাংলাদেশের ছবি আমি তেমন দেখিনি। জাহির রায়হানের জীবন থেকে নেওয়া, স্টপ জেনোসাইড এবং সুভাষ দত্তের আয়না ছবি তিনটি আমি দেখেছি। একটা হাতে গোনা ছবি দেখে তো আর মন্তব্য করা যায় না। তবে একটা জিনিস আমি বুঝেছি, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখানকার তরুণদের দিয়ে কিছু হবে। কিন্তু আমরা? আমরা সবাই ডুবে যাচ্ছি। বসে যাচ্ছি।

প্রশ্ন : আমাদের সংক্রামিত হওয়াটার আশঙ্কা নেই তো?

উত্তর : সেটা আপনাদের হাতে। এখানে উপকরণ আছে। সম্ভাবনাও আছে। শিল্পের ব্যাপারে আমি হাততালি চাই না। বাঙালি জাতি মরে গেছে ভাবতে বাঁচতে ইচ্ছে করে না। বাঙালির হৃদয়ে নবতর জাগৃতির জন্ম হয়েছে। দুঃখ- দুর্দশা থাকবে। থাকবে অভিযোগ। গ্রামে গঞ্জে রটে গেছে বাঙালি বলে একটা জাতি আছে। কলকাতার রকের

ভাষায় 'কাটেমচাস কারবার' করেছে বাঙালি। আমার বিশ্বাস, এপারের সংস্কৃতি, ওপারের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নতুন ভাবে মোড় নেবে।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু ভাবছেন?

উত্তর : ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছুই ভাবছি, এ বাংলায় আমি কিছু করতে পারব কি না জানি না। আমি মনে করি, মানুষকে জানতে হলে জাগাতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ছবির মধ্যে কোনো চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে কি না?

উত্তর : সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং তপন সিংহের ছবি সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে। আর এপার বাংলা ছবি অত্যন্ত কাঁচা। তবে চিন্তাধারা স্বচ্ছ। এখানকার চিত্রনির্মাতাদের মনে শুভ ইচ্ছে রয়েছে তা বোঝা যায়। চলচ্চিত্র নির্মাদের ব্যাপারে টেকনিকটা হচ্ছে ভীষণ মূল্যবান। শুধু চিন্তাধারা দিয়ে তো আর ছবি হয় না। টাইম এবং কনটেন্ট সম্পর্কে চিত্রনির্মাতাকে সদাসচেতন থাকতে হবে।

প্রশ্ন : এপার বাংলায় ওপার বাংলার ছায়াছবির বাজার সম্প্রসারণ কি সম্ভব?

উত্তর : বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কে আমার ভাবনার কোনো মূল্য নেই। আমি আমার মাতৃভূমিতে বেড়াতে এসেছি। দেখতে এসেছি।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র আপনি কাদের জন্য নির্মাণ করেন?

উত্তর : আমি মানুষের জন্যে চলচ্চিত্র নির্মাল করি। আইজেনস্টাইন, পুদভকিনও তাই করতেন। চলচ্চিত্রকে সাধারণ মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দিতে হবে। ভ্যানে করে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ছবি দেখানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। বাংলাদেশের মা-বোনেরা যাত্রাপালা পার্বণ দেখতে অভ্যস্ত। এক সময় যাত্রার মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। এখন যাত্রার কর্মটাকে হৃদয়গম করতে হবে এবং সাধারণ মানুষেব নাড়ী বুঝে চরিত্র সৃষ্টি করতে হবে। গ্রামে গ্রামান্তরে ফ্যামিলি প্ল্যানিং কিংবা সরকারি প্ররোচণামূলক ছবি দেখালে চলচ্চিত্র শিল্পের কোনো উন্নতি হবে না। মশাই স্কুলে কি কবিতাশেখানো যায়? ভ্রাম্যমাণ ভ্যানের সাহায্যে চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় শুধু নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অভ্যস্ত জীবনের ছবি আমি আমার সবগুলো ছবিতে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি। আমি ছবি করে অর্থ বানাতে চাই না। আমি ইমিডিয়েট সাকসেস শিল্পের শেষ কথা নয়। কোন্ ছবি অর্থ দেবে, কোন্ ছবি অর্থ দেবে না, তা নির্ণয়ের জন্যে কোনো ফিল্মের ডাক্তার পাওয়া যায় না। আমি ছবি করছি আমার মানুষের জন্য। সংগ্রামে আমি বিশ্বাস করি। শিল্প মানে লড়াই।

ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রপঞ্জি

ঋত্বিককুমার ঘটকের চলচ্চিত্রপঞ্জি

বেদেনী/অরূপকথা ১৯৫১-৫২ অসম্পূর্ণ

(Bedeni/Arup Katha)

প্রযোজনা	সুনীলকৃষ্ণ রায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আলোকচিত্র	শচীন দাশগুপ্ত

অভিনয় : শাপলা—প্রভা দেবী, পিঙ্গলা—শোভা সেন, চিতি—কেতকী দত্ত, গোখরী—নিতা চ্যাটার্জি, ধনা—অভি ভট্টাচার্য, সর্দার—মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এ ছাড়া বিজন ভট্টাচার্য, মমতাজ আহমেদ্ খান, পারিজাত বোস, কেষ্ট মুখার্জি প্রমুখরাও অভিনয় করেছিলেন।

।'নাগিনী কন্যার কাহিনী' নামের ছোট গল্প হল 'বেদেনী'র মূল কাহিনী। ১৯৫০ সালে অর্থাৎ প্রথমে এই ছবির পরিচালক ছিলেন নির্মল দে। শুটিং দে। শুটিং হয় পার্কসার্কাসের রূপশ্রী স্টুডিয়োতে। সেটি আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরে ইন্দ্রলোক স্টুডিয়োয়। অর্থাভাবে ছবির কাজ বন্ধ হয়। ১৯৫১ সালে ছবিটি সম্পূর্ণ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত হন শ্রীঘটক। কাহিনী পরিবর্ধন এবং নতুন করে চিত্রনাট্য লিখে তিনি ছবির নাম দেন 'অরূপকথা'। কানু মুখার্জি এবং শিশির বটব্যালের পরিবর্তে আসেন— যথাক্রমে বিজন ভট্টাচার্য এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৫২ সালের শুরুতে বোলপুরে এবং ঘাটশিলার সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সর্বমোট কুড়ি দিনের আউটডোর শুটিং হয়। কিন্তু ক্যামেরায় ত্রুটি থাকায় ফিল্ম এক্সপোজড হয় না। ফলত ছবিটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় মধ্যপথে পরিত্যক্ত হয়। পানু পাল, শম্ভু ভট্টাচার্য ও বটু পাল এই ছবিব নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন। জ্যোতি লাহা ছিলেন সহকারী ক্যামেরাম্যান।।

নাগরিক ১৯৫২-৫৩ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১২৫ মিনিট

(The Citizen)

প্রযোজনা	ফিল্ম গিল্ড, প্রমোদ সেনগুপ্ত, ভূপতি নন্দী ও ঋত্বিক ঘটক
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	রামানন্দ সেনগুপ্ত
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	হরিপ্রসন্ন দাস

গীতিকার	গোবিন্দ মুনিশ
রূপসজ্জা	গণেশ দাস
ধারাভাষ্য	ঋত্বিককুমার ঘটক
শিল্প নির্দেশনা	ভূপেন মজুমদার
প্রচার পরিকল্পনা	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

গান (১) মাঝ য়ে তো মাঝধার...।
(২) মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর...।

অভিনয় : মা—প্রভা দেবী, সীতা—শোভা সেন, উমা—কেতকী চ্যাটার্জি, শেফালী—গীতা সোম, রামু—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সাগর—অজিত ব্যানার্জি, বাবা—কালী ব্যানার্জি, যতীন- কেষ্ট মুখার্জি, বাড়িওলা—গঙ্গাপদ বসু, পিণ্টু—শ্রীমান পিণ্টু, বেহালাবাদক—পারিজাত বোস, সুশান্ত—মমতাজ আহমেদ খান এবং অনিল চট্টোপাধ্যায়, উমানাথ ভট্টাচার্য, অনিল ঘোষ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মুক্তির তারিখ : ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

প্রেক্ষাগৃহ : নিউ এম্পায়ার, কলকাতা

।পরিচালকের জীবদ্দশায় এ ছবি মুক্তিলাভ করেনি। জীবনের প্রথম সম্পূর্ণ ছবি মুক্তি পায় মৃত্যুর দেড় বছর পরে। শ্রী ব্রহ্মা সিং ও শ্রী রমেশ যোশী ফিল্মটির positive একটি প্রিন্ট উদ্ধার করেন বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরি থেকে। মূল নেগেটিভ হারিয়ে গেছে। সময়ের ক্ষতচিহ্ন (এই প্রিন্টটা ১৯৫৩-এ করা গুটিকতকের একটি) ছিল এর সর্বাঙ্গেই প্রায়। পুনা এন.এফ্.আই-এর কিউরেটর শ্রী পি.কে. নায়ার ছবিটির একটি ডুপ্লিকেট নেগেটিভ করে ১৯৫৩ সনে ছবির প্রিন্ট তৈরি করেন। ছবিটি পঁচিশ বছর পরে মুক্তি পায়। তবে ১৯৫৩ সাল নাগাদ হাওড়া জেলার একটি মফস্‌সল প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি কয়েকদিন চলে এবং আইনগত কারণে প্রদর্শন বন্ধও হয়ে যায়।। ইউনাইটেড সিনেল্যাবে পরিস্ফুটন হয়।

আদিবাসীওঁ কা জীবনস্রোত ১৯৫৫ হিন্দি তথ্যচিত্র সাদা কালো ১৫ মিনিট

(Life of the Adivasis)

প্রযোজনা	বিহার সরকার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
ফিল্ম ইউনিট	আরোরা সিনেমা কোম্পানি

বিহার থেকে দর্শনীয় স্থান ১৯৫৫ হিন্দি তথ্যচিত্র সাদা-কালো ১৬ মিনিট

(Historic Places in Bihar)

প্রযোজনা	বিহার সরকার
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
ফিল্ম ইউনিট	অরোরা সিনেমা কোম্পানি

ওরাওঁ (Oraon) ১৯৫৭

[রাঁচি অঞ্চলের আদিবাসী এবং রানি খাটাঙ্গা গ্রামের ওরাওঁ-দের জীবনকে ভিত্তি করে যে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মিত হবার কথা ছিল এটা তার একেবারে প্রাথমিক বা প্রস্তুতিপর্বের কাজ।]

অযান্ত্রিক ১৯৫৭-৫৮ সাদা-কালো ৩৫ মিমি ১২০ মিনিট

It's not a machine

প্রযোজনা	এল. বি. ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমাব ঘটক
কাহিনী	সুবোধ ঘোষ
আলোকচিত্র	দীনেন গুপ্ত
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	আলি আকবর খান
শব্দগ্রহণ	মৃণাল গুহ ঠাকুরতা ও সত্যেন চ্যাটার্জি
রূপসজ্জা	শক্তি সেন
নৃত্য ও লোকগান	ধুমকুড়িয়ার (রাঁচি) আদিবাসীবৃন্দ রানি খাটাঙ্গা গ্রামের ওরাওঁ গ্রামবাসীরা
সেতার বাদন	নিখিল ব্যানার্জি
বেহালা বাদন	শিশিরকণা ধর চৌধুরী
আদিবাসী-বিষয়ক উপদেষ্টা	জুলিয়াস টিগা
প্রচার পরিকল্পনা	খালেদ চৌধুরী

অভিনয় : জগদ্দল—শেভ্রলে (১৯২০ মডেল) বিমল—কালী ব্যানার্জি, হাসি—কাজল চ্যাটার্জি, সুলতান—শ্রীমান দীপক, গৌর—জ্ঞানেশ মুখার্জি, বুলাকি—কেষ্ট মুখার্জি, মামা—গঙ্গাপদ বসু, তরণী—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসী—তুলসী চক্রবর্তী, বচন সিং—পিয়ারা সিং, প্রসাদী—ঝুর্নি। এ ছাড়া অনিল চ্যাটার্জি, সীতা মুখার্জি, দেবী নিয়োগী, সুশীল রায়, লুথার টিগা ইত্যাদি।

মুক্তির তারিখ ২৩ মে, ১৯৫৮

প্রেক্ষাগৃহ বীণা, বসুশ্রী, অঞ্জন, সীরশ্রী এবং আলোছায়া।

[সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প 'অযান্ত্রিক'-কে সম্প্রসারিত করে রচিত হয় এই ছবির চিত্রনাট্য। ঋত্বিকের জীবনে প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হল অযান্ত্রিক। এর অন্তর্দৃশ্য টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে গৃহীত।] CHEVROLET-এর '1920' মডেলটি ব্যবহৃত হয়েছিল 'জগদ্দল'-এর ভূমিকায়। ১৯৫৯-এ ছবিটি ভেনিসে স্পেশাল এনট্রি হিসেবে প্রদর্শিত হয় noncompetitive section-এ]

বাড়ি থেকে পালিয়ে ১৯৫৯ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১২৪ মিনিট

(The Runaway)

প্রযোজনা	এল. বি. ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	দীনেন গুপ্ত
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
গীতরচনা ও সংগীত	সলিল চৌধুরী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
শব্দ	মৃণাল গুহ ঠাকুরতা (গ্রহণ) ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় (পুনর্লিখন)
প্রচার পরিকল্পনা	খালেদ চৌধুরী
কণ্ঠ সংগীত	হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সবিতা চৌধুরী
নেপথ্যে-কণ্ঠ	গীতা দে

গান: (১) ওরে-ওরে, নরে-নরে, শংকুরে...বুলবুল ভাজা।
(২) ও-আমি অনেক, ঘুরিয়া...কইলকাত্তা।
(৩) মাগো আমায় ডেকোনাকো আর।...

অভিনয় : হরিদাস—কালী ব্যানার্জি, বাবা—জ্ঞানেশ মুখার্জি, মা—পদ্মা দেবী, কাঞ্চন—শ্রীমান পরমভট্টারক লাহিড়ী, জাদুকর—কেষ্ট মুখার্জি, ট্রাফিক পুলিশ—জহর রায়, চন্দন—শ্রীমান দীপক, মিনির বাবা—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, মিনির মা—নিতি পণ্ডিত, ফেরিওয়ালা—নৃপতি চ্যাটার্জি, মিনি—শ্রীমতী কৃষ্ণজয়া, নন্দ—শৈলেন ঘোষ; এ ছাড়া মহম্মদ ইজরায়েল, মণি শ্রীমানি, বিজন ভট্টাচার্য, সীতা মুখার্জি, গুপী ব্যানার্জি, বেচু সিংহ, গোপাল চ্যাটার্জি। শক্তি সেন, সত্য মজুমদার এবং সজল রক্ষিত।

মুক্তির তারিখ : ২৪ জুলাই ১৯৫৯।

প্রেক্ষাগৃহ : মিনার, বিজলী, ছবিঘর।

[অন্তর্দৃশ্য নিউ থিয়েটার্স-এ এবং বহির্দৃশ্য সূর্যপুর ও কলকাতা শহরে গৃহীত। ছবিটির পরিস্ফুটন হয় বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে। ১৯৬০ সালে এই ছবিটি ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে Information section-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রদর্শিত হয়।]

কত অজানারে ১৯৫৯ অসম্পূর্ণ

(Kato Ajanare)

প্রযোজনা	মিহির লাহা
চিত্রনাট্য	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	শঙ্কর
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা	রমেশ যোশী

অভিনয় : শঙ্কর—অনিল চ্যাটার্জি, রেম্পিনী—ছবি বিশ্বাস, বারওয়েল—কালী

ব্যানার্জি, ডাচ নাবিক—উৎপল দত্ত; এ ছাড়াও অসীমকুমার, করুণা ব্যানার্জি, গীতা দে প্রমুখরা ছিলেন।

[ছবিটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত। তবে ছবিটির অধিকাংশ চিত্রগ্রহণই প্রায় হয়ে গিয়েছিল। টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিয়োয় অন্তর্দৃশ্য এবং হাইকোর্ট (ভেতরে এবং বাইরে) এলাকায় বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছিল। সব মিলিয়ে প্রায় কুড়ি দিনের মতো চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছিল, কোর্টের দৃশ্যটা বাকি ছিল। যা থেকে প্রায় সাত রিল সম্পাদিত ছবি পাওয়া যায়।]

মেঘে ঢাকা তারা ১৯৬০ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১২৬ মিনিট

(The cloud-capped star)

প্রযোজনা	চিত্রকল্প
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনী	শক্তিপদ রাজগুরু
আলোকচিত্র	দীনেন গুপ্ত
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
রূপসজ্জা	শক্তি সেন
শব্দ	সত্যেন চ্যাটার্জি ও মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
প্রচার পরিকল্পনা	রঞ্জিৎকুমার মিত্র
নেপথ্যে কণ্ঠ	এ. টি. কানন, দেবব্রত বিশ্বাস, রণেন রায়চৌধুরী এবং গীতা ঘটক
আবহ সংগীত	বাহাদুর হুসেন খাঁ, লক্ষ্মী ত্যাগরাজন এবং মহাপুরুষ মিশ্র

গান : (১) জয় মাত বিলম তজত...লাগি পতি সখি সন। [সংগ্রহ]
(২) করিম নাম তেরো...। [সংগ্রহ]
(৩) আয় গো উমা কোলে লই...। [সংগ্রহ]
(৪) নিদিয়া ন জগাও রাজা, গারি দুঙ্গী।
(৫) কান্দিয়া আকুল হইলাম...। [সংগ্রহ]
(৬) যে রাতে মোর...। [রবীন্দ্রসংগীত]

অভিনয় : নীতা—সুপ্রিয়া চৌধুরী, শঙ্কর—অনিল চ্যাটার্জি, বংশী দত্ত—জ্ঞানেশ মুখার্জি, তারণ মাস্টার—বিজন ভট্টাচার্য, মা—গীতা দে, গীতা—গীতা ঘটক, মন্টু—দ্বিজু ভাওয়াল, সনৎ—নিরঞ্জন রায়, বাউল—রণেন রায় চৌধুরী। এ ছাড়াও সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, নারায়ণ ধর, কামিনী চক্রবর্তী, আরতি দাস, শক্তি সেন, সুরেশ চ্যাটার্জি, সনৎ দত্ত, দেবী নিয়োগী, মিসেস বোস, মধু ও চন্দন।

মুক্তির তারিখ : ১৪ এপ্রিল ১৯৬০।

প্রেক্ষাগৃহ : শ্রী, প্রাচী ও ইন্দিরা।

কোমল গান্ধার ১৯৬১ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১৩৩ মিনিট

(E Flat)

প্রযোজনা	চিত্রকল্প
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিক ঘটক
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
সংগীত	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
শব্দ	মৃণাল গুহ ঠাকুরতা, সুজিত সরকার, দেবেশ ঘোষ (অন্তর্দৃশ্য) এবং সত্যেন চ্যাটার্জী (পুনর্লিখন)
প্রচার পরিচালনা	রঞ্জিৎকুমার মিত্র
গীত রচনা	জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সলিল চৌধুরী, বিজন ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্য
লোকসংগীত সংগ্রাহক	হেমাঙ্গ বিশ্বাস, রণেন রায়চৌধুরী
নেপথ্যে কণ্ঠ	দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, প্রীতি ব্যানার্জি, সুমিত্রা সেন, বিজন ভট্টাচার্য, মণ্টু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রত্না সরকার, শ্রীজাতা চক্রবর্তী, চিত্রা মণ্ডল এবং রণেন রায়চৌধুরী
সরোদ বাদন	ওস্তাদ বাহাদুর খান

গান রেকর্ডিং

(১) হেইও হো হেঁইও হো...বদর বদর। কথা ও সুর :

(২) এসো মুক্ত করো...এ অন্ধকার। কথা ও সুর :

(৩) মিস্তিরি বানাইছে পিঁড়ি. .সীতার বিয়া। সংগ্রহ

(৪) আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর...দিয়া। সংগ্রহ

(৫) এপার পদ্মা ওপার...শিব সদাগর। কথা ও সুর : হেমাঙ্গ বিশ্বাস

(৬) প্রাণবন্ধু কই বল গো...আমারে। সংগ্রহ

(৭) আকাশ ভরা সূর্যতারা...আমার গান। রবীন্দ্রসংগীত

(৮) (ভাই সব) ঘুরঘুট্টি আন্ধার রাতে...রাতে। কথা ও সুর : বিজন ভট্টাচার্য

(৯) (হায় হায়) নিস লো চেয়ে...না করে। কথা ও সুর : বিজন ভট্টাচার্য

(১০) ওই বুঝি প্রভাতের প্রথম...দেখা যায়। কথা ও সুর : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

(১১) এই তো ভালো লেগেছিল...আরো বড়ো। রবীন্দ্রসংগীত

(১২) আজ, জ্যোৎস্নারাতে...তাহার মনে। রবীন্দ্রসংগীত

(১৩) অবাক পৃথিবী...সেলাম। কথা : সুকান্ত ভট্টাচার্য সুর : সলিল চৌধুরী।

(১৪) আমি ঝড়ের কাছে...নিশানা। কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী।

অভিনয় : অনসূয়া—সুপ্রিয়া চৌধুরী, জয়া—চিত্রা মণ্ডল, শান্তা—গীতা দে, ভৃগু—অবনীশ ব্যানার্জি, ঋষি—অনিল চ্যাটার্জি, শিবনাথ—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, গগন—বিজন ভট্টাচার্য, স্পিকার—মণি শ্রীমানী, প্রভাত—সত্যব্রত চ্যাটার্জি, দেবু বোস—জ্ঞানেশ মুখার্জি, পাখি—সুনীল ভট্টাচার্য; এ ছাড়াও মণ্টু ঘোষ, দ্বিজু ভাওয়াল. নির্মল ঘোষ, তিলোত্তমা ব্যানার্জি, দেবী নিয়োগী, মহম্মদ ইসরাইল, কেতকী দেবী, নৃপেন চ্যাটার্জি এবং দেবব্রত বিশ্বাস।

মুক্তির তারিখ : ৩১ মার্চ ১৯৬১

প্রেক্ষাগৃহ : রাধা, পূর্ণ, লোটাস এবং পূরবী

[অন্তর্দৃশ্য টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত]

সুবর্ণরেখা ১৯৬২ সাদা-কালো ৩৫ মি.মি. ১৩৯ মিনিট

(The Golden Thread)

প্রযোজনা	জে. জে. ফিল্মস কর্পোরেশন
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
মূল কাহিনী	রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালা
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
রূপসজ্জা	মনতোষ রায়
সংগীত	ওস্তাদ বাহাদুর খান
শব্দ	সত্যেন চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর ঘোষ এবং জ্যোতি চ্যাটার্জি (নেপথ্যে শব্দ লেখনী)
প্রচার পরিকল্পনা	বাগীশ্বর ঝা ও খালেদ চৌধুরী (টাইট্‌ল লিখন)
নেপথ্যে কণ্ঠ :	আরতি মুখার্জি এবং রণেন রায়চৌধুরী

গান :
(১) আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র...সকাল বেলা। রবীন্দ্রসংগীত
(২) আলী, দেখা ভোর ভই...কাঁহা জাগে। প্রাচীন ধ্রুপদ সংগ্রহ।
(৩) আজ কী আনন্দ, আজ কী আনন্দ ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ। প্রাচীন রাজপুত সংগ্রহ।
(৪) মোর দুখুয়া কা সে কহুঁ...আজ। প্রাচীন সংগ্রহ।
(৫) খেলন আযে হোরী...কুহার ফুহার। প্রাচীন হোরী সংগ্রহ।

অভিনয় : ঈশ্বর—অভি ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ—বিজন ভট্টাচার্য, সীতা (ছোট)—ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, কৌশল্যা (বাগদি বউ)—গীতা দে, অভিরাম (ছোট)—শ্রীমান অরুণ, বাউল—রণেন রায়চৌধুরী, হরিবাবু—অবনীশ ব্যানার্জি, ম্যানেজার—রাধাগোবিন্দ ঘোষ, সংগীতশিক্ষক—ঋত্বিক ঘটক, সীতা—মাধবী মুখার্জি, অভিরাম—সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, ফোরমান মুখার্জি—জহর রায়, অখিলবাবু—উমানাথ ভট্টাচার্য, কাজল দিদি—সীতা মুখার্জি, রামবিলাস—পীতাম্বর, গুরুদেব—অরুণ চৌধুরী, বেণীমাধব—শ্যামল ঘোষাল,

বিনু—শ্রীমান অশোক ভট্টাচার্য; এ ছাড়া বাহাদুর খাঁ, সেকেন্দার আজম, নারায়ণ ধর, রবি চ্যাটার্জি, অজিত লাহিড়ী, পীযূষ গাঙ্গুলী, কল্পনা জানা ও রুবি মিত্র।

মুক্তির তারিখ : ১ অক্টোবর, ১৯৬৫।

প্রেক্ষাগৃহ : বসুশ্রী, বীণা, লোটাস।

[১৯৬২ সালে নির্মিত হলেও নানা রকম বাধা-বিপত্তির দরুন মুক্তি পেতে তিন বছর সময় লাগে।] রাজশ্রী পিকচার্স মাত্র ৬৫,০০০ টাকায় এই ছবির স্বত্ব কিনে নেয় এবং পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ছবির অন্তর্দৃশ্য টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে গৃহীত এবং ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।

সিজারস্ ১৯৬২ বিজ্ঞাপন চিত্র

(Scissors)

প্রযোজনা	ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানি
পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	মহেন্দ্র কুমার

[সুবর্ণরেখা ছবিটি সম্পূর্ণ করার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই ছবিটি নির্মিত হয়।]

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান

(Ustad Allauddin Khan)

প্রযোজনা	হরিসাধন দাশগুপ্ত
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক

[প্রায় সমগ্র ছবিটির চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হবার পরে প্রযোজক বলেন আর কাজ করাবেন না। হরিসাধন নিজে একটি ছবি তৈরি করেন, সেইটি পরে মুক্তি লাভ করে।]

বগলার বঙ্গদর্শন ১৯৬৪ অসম্পূর্ণ কাহিনীচিত্র

(Bagalar Banga Darshan)

প্রযোজনা	রমনলাল মাহেশ্বরী
কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
কাহিনীসূত্র	ইতালির ব্রাসেত্তি'র লেখা একটি চলচ্চিত্র।
আলোকচিত্র	দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
সম্পাদনা	রমেন যোশী
সংগীত	হৃদয়রঞ্জন কুশারী
শিল্প নির্দেশনা	রবি চ্যাটার্জি
স্থির চিত্র	মহেন্দ্র কুমার
নেপথ্যে কণ্ঠ	প্রতিমা বড়ুয়া, আরতি মুখার্জি

অভিনয় : বগলা—সুনীল ভট্টাচার্য, কাঞ্চনমালা—ইন্দ্রাণী মুখার্জি ; এ ছাড়াও ছিলেন

পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, জহর রায়, মমতাজ আহমেদ খান, কেষ্ট মুখার্জি, তরুণ ঘোষ, শ্রীমান দীপক।

[ছবিটির চিত্রগ্রহণের কাজ হয়েছিল মাত্র এক সপ্তাহের জন্য। তারপর ছবিটি অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। সম্প্রতি ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে ছবিটি একটি অবয়ব পেয়েছে। এই সংস্করণটিতে ছবিটির মূল কাহিনী ইংরাজিতে অনুবাদ করে ও সম্পাদনার পরে শ্যুটিং-কৃত অংশ ছয়টি গান (যা আগেই গৃহীত হয়েছিল এই ছবির জন্য) সংযোজন করে ছবিটি চার রিল করা হয়েছে। এই সংস্করণটি এখন প্রদর্শনযোগ্য অবস্থায় বর্তমান।]

ফিয়ার ১৯৬৫ স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র কালো-সাদা ৩৫ মি.মি. হিন্দি

(Fear)

প্রযোজনা — ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, পুনে
কাহিনী চিত্রনাট্য, সংগীত ও
পরিচালনা — ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র — লাল জসোয়ানী
সম্পাদনা — ভিশ্রাম রেবঙ্কর

অভিনয়: বিজ্ঞানের ছাত্র—সুভাষ ঘাই, তার স্ত্রী—সুধা রানী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মেয়েটি—উর্বশী দত্ত, ধনী লোকটি—গোবর্ধন শর্মা, গ্রামের মেয়েটি—প্রতিমা নায়ক, শান্ত লোকটি—আসরানি, মিউজিশিয়ান—এস শাহ, পকেটমার – এস দেশাই, বৈজ্ঞানিক—ডি. কে মালহোত্রা, কর্নেল—এ. উমারানী, ক্যাপ্টেন—রণজিৎ কাণ্ডে, মাতাল লোকটি—নুরউদ্দীন।

[এই শর্ট ফিল্ম ১৯৬৪-৬৫ সালের—'অভিনয় শিক্ষা' বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তৈরি করা হয়। পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরাই ছিলেন এর অভিনেতা-অভিনেত্রী।]

রাঁদেভু ১৯৬৫ স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চিত্র সাদা-কালো ৩৪ মি. মি. হিন্দি

(Rendezvous)

প্রযোজনা — ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, পুনে
পরিচালনা — রাজিন্দর নাথ শুক্লা
আলোকচিত্র — অমরজিৎ
সংগীত — রামকদম
সম্পাদনা — বিক্রম রাজপুত
অভিনয় — সুধারানী শর্মা, এস দিনকর এবং গোবর্ধন লাল প্রমুখ
তত্ত্বাবধায়ক — ঋত্বিককুমার ঘটক

[১৯৬৫ সালে পুনায় ভাইস প্রিন্সিপাল থাকার সময় ঋত্বিক ঘটকের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা এই ডিপ্লোমা ফিল্মটি তৈরি করেন।]

সিভিল ডিফেন্স ১৯৬৫

(Civil Difence)

প্রযোজনা	ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট পুনা
পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক

(ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তৈরি হয়)।

সায়েন্টিস্টস্ অফ টুমরো ১৯৬৭ সাদা-কালো তথ্যচিত্র

(Scientists of Tomorrow)

প্রযোজনা	ফিল্ম ডিভিশন
কাহিনী, চিত্রনাট্য সংগীত ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	অমরজিৎ
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
ধারাভাষ্য রচনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
ধারাভাষ্য পাঠ	বিজয় মেনন

রঙের গোলাম ১৯৬৮ সাদা-কালো অসম্পূর্ণ কাহিনীচিত্র

(Ranger Golam)

কাহিনী	প্রবোধকুমার সান্যাল
প্রযোজনা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	মহেন্দ্র কুমার
অভিনয়	অনিল চ্যাটার্জি, সীতা মুখার্জি, জহর রায়, শর্বাণী এবং মণি শ্রীমানী

[অতি দ্রুত প্রায় এক সপ্তাহ চিত্রগ্রহণের কাজ হয় বোলপুরের কাছে। ছবিটির এক-চতুর্থাংশ কাজও প্রায় শেষ হয়েছিল। অর্থাভাব এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ঋত্বিক ঘটক ছবিটির কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হন।]

পুরুলিয়ার ছৌ ১৯৭০ সাদা-কালো তথ্যচিত্র ৩৪ মি.মি.

(Chhou Dance of Purulia)

প্রযোজনা	সুমনা ফিল্মস
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা	ঋত্বিককুমার ঘটক
আলোকচিত্র	ধ্রুবজ্যোতি বসু, দীপক বসু ও দীপক দাস
সম্পাদনা	রমেশ যোশী
সংগীত	বাহাদুর খান
ধারাভাষ্য রচনা	ঋত্বিককুমার ঘটক